মুখবন্ধ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ ও বি, কম্ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ধনবিজ্ঞান বিষয়ের প্রথম পত্র হইল ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব (Economic Theory)। বিদেশী পরিবেশ হইতে উদ্ভূত এবং বিদেশী ভাষায় পরিবেষিত এই তত্ত্বসমূহ সহজ ও সরল বাংলা ভাষায় লেখা অসম্ভব নহে এবং অনেকক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার তুলনায় বাংলাতে প্রকাশ করা অধিকতর সুবিধাজনক, আশা করি, উহার পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ছাত্রছাত্রীগণ এই পুস্তকের দ্বারা উপকৃত হইবেন, এবং যে বিজ্ঞানকে দুরূহ বলিয়া ভয় করেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহাদের পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যবিষয়তালিকার উপর নির্ভর করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে, সুতরাং পরীক্ষার ব্যাপারে ইহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বহুক্ষেত্রে আমাকে পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে এবং সে ক্ষেত্রে শব্দার্থ ও ভাবার্থ উভয়েরই সঙ্গতি রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভারতের অন্যতম ভাষাবিদ্ শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই ব্যাপারে সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি, তাঁহাকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই শব্দ-প্রয়োগে ও ভাব-প্রকাশে বিশেষ ভঙ্গী ও ধরণ আছে ; ইংরেজী ভাষায় বহু আলোচনার ফলে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বালোচনায় এই বিশেষ ভঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছে ; ভাবপ্রকাশের এই বিশেষ ভঙ্গী এই বিজ্ঞানেরই নিজস্ব। সেই ভঙ্গী ও ধরণ বাংলা ভাষায় প্রবর্তিত করা কখনই অনুবাদের দ্বারা সম্ভব নয়। এই পুস্তক এবং ইহার পরবর্তী আরও অনেক পুস্তক প্রকাশের ফলে বাংলা ভাষায় এই ভঙ্গী ও ধরণ গড়িয়া উঠিবে। অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ বিচার করিবেন, এই ব্যাপারে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছি।

এই পুস্তক রচনায় বিদেশী ও দেশী খ্যাতনামা অনেক লেখকেরই সাহায্য পাইয়াছি, পৃথক করিয়া তাঁহাদের নামোল্লেখ সম্ভব নয়। লেখার সকল-স্তরে উৎসাহ, উপদেশ এবং নির্দেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান বিষয়ের রীডার অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন ;

এম্ এ, পি, এইচ, ডি, (লণ্ডন) তাঁহার নিকট আমি অশেষভাবে ঋণী। আমার নিজের শিক্ষাকেন্দ্র আশুতোষ কলেজের শিক্ষকবৃন্দকে এবং অন্যতম শিক্ষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধন বিজ্ঞান-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীজিতেন্দ্র প্রসাদ নিয়োগী মহাশয়কে এই সুযোগে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আমাকে পুস্তক লিখিবার কথা যাঁহারা প্রথমে বলিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের সহানুভূতি সর্বদাই আমাকে উৎসাহ দিয়াছে, বর্ধমান রাজ-কলেজের ধনবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীজগদ্বন্ধু রায় এবং পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকুলদারঞ্জন চৌধুরীকে আমার সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রকাশক বন্ধুস্থানীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যকুমার চ্যাটার্জি আমাকে বহুপ্রকার উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। চ্যাটার্জি পাবলিসার্স ও চ্যাটার্জি প্রিণ্টার্সের সর্বশ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বর্ধমান রাজ কলেজ,
৬ই শ্রাবণ, ১৩৬৩ } **শ্রীহরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য**

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

বিষয়-সূচী

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

আধুনিক ধন-বিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়-বস্তু

সংজ্ঞা (Definition) ঃ

ধন-বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংজ্ঞা ছিল এই যে, ইহা সম্পদ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। পরবর্তী কালে নিছক সম্পদের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের বিশ্লেষণকে ধন-বিজ্ঞানের কাজ বলিয়া মনে করা হইত। সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে, ইহা শুধু পথ মাত্র, মানবিক কল্যাণই ধন-বিজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য। আধুনিক কালে ইহাকে আর কল্যাণ-বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করা হয় না, দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা এই বিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া মনে করা হয়।

মানুষের জীবন যাত্রা সুচারুরূপে নির্বাহ করার সম্মুখে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা হইল উপকরণের অভাব। মানুষ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হইত, বাহির হইতে খাদ্য, বস্ত্র, ইত্যাদি কোন কিছুরই তাহার প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলে কোন অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইত না। যদি তাহার প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ রৌদ্রজলের মত সকল স্থানে সকল অবস্থাতে সুপ্রাপ্য হইত, তাহা হইলে তাহার অভাব থাকিত না, শ্রম করিয়া সেই অভাব মোচনের চেষ্টা করিতে হইত না। কিন্তু কৃপণা প্রকৃতি মানুষের সকল অভাব মিটাইবার উপযোগী উপকরণ সুপ্রাপ্য করেন নাই। অথচ মানুষের অভাবের অন্ত নাই, একটি অভাবের তৃপ্তি আর একটি অভাবকে ডাকিয়া আনে। অনন্ত অভাব অথচ সীমাবদ্ধ উপকরণ, এই অবস্থাই সৃষ্টি করে প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা—দুষ্প্রাপ্যতা।

দুষ্প্রাপ্যতা

শ্রীসত্যকুমার চ্যাটার্জি কর্তৃক প্রকাশিত
চ্যাটার্জি পাব্লিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—ঃ মূল্য ঃ—
—নয় টাকা মাত্র—

এস্, চ্যাটার্জ্জি কর্তৃক মুদ্রিত
চ্যাটার্জি প্রিণ্টার্স
৪২এ, মলঙ্গা লেন, কলিকাতা-১২

মুখবন্ধ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ ও বি, কম্ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ধনবিজ্ঞান বিষয়ের প্রথম পত্র হইল ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব (Economic Theory)। বিদেশী পরিবেশ হইতে উদ্ভূত এবং বিদেশী ভাষায় পরিবেষিত এই তত্ত্বসমূহ সহজ ও সরল বাংলা ভাষায় লেখা অসম্ভব নহে এবং অনেকক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার তুলনায় বাংলাতে প্রকাশ করা অধিকতর সুবিধাজনক, আশা করি, উহার পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ছাত্রছাত্রীগণ এই পুস্তকের দ্বারা উপকৃত হইবেন, এবং যে বিজ্ঞানকে দুরূহ বলিয়া ভয় করেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহাদের পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যবিষয়তালিকার উপর নির্ভর করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে, সুতরাং পরীক্ষার ব্যাপারে ইহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বহুক্ষেত্রে আমাকে পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে এবং সে ক্ষেত্রে শব্দার্থ ও ভাবার্থ উভয়েরই সঙ্গতি রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভারতের অন্যতম ভাষাবিদ্ শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই ব্যাপারে সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি, তাঁহাকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই শব্দ-প্রয়োগে ও ভাব-প্রকাশে বিশেষ ভঙ্গী ও ধরণ আছে ; ইংরেজী ভাষায় বহু আলোচনার ফলে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বালোচনায় এই বিশেষ ভঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছে ; ভাবপ্রকাশের এই বিশেষ ভঙ্গী এই বিজ্ঞানেরই নিজস্ব। সেই ভঙ্গী ও ধরণ বাংলা ভাষায় প্রবর্তিত করা কখনই অনুবাদের দ্বারা সম্ভব নয়। এই পুস্তক এবং ইহার পরবর্তী আরও অনেক পুস্তক প্রকাশের ফলে বাংলা ভাষায় এই ভঙ্গী ও ধরণ গড়িয়া উঠিবে। অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বিচার করিবেন, এই ব্যাপারে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছি।

এই পুস্তক রচনায় বিদেশী ও দেশী খ্যাতনামা অনেক লেখকেরই সাহায্য পাইয়াছি, পৃথক করিয়া তাঁহাদের নামোল্লেখ সম্ভব নয়। লেখার সকলস্তরে উৎসাহ, উপদেশ এবং নির্দেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান বিষয়ের রীডার অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন ;

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

আধুনিক ধন-বিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়-বস্তু

সংজ্ঞা (Definition) ঃ

ধন-বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংজ্ঞা ছিল এই যে, ইহা সম্পদ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। পরবর্তী কালে নিছক সম্পদের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের বিশ্লেষণকে ধন-বিজ্ঞানের কাজ বলিয়া মনে করা হইত। সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে, ইহা শুধু পথ মাত্র, মানবিক কল্যাণই ধন-বিজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য। আধুনিক কালে ইহাকে আর কল্যাণ-বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করা হয় না, দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা এই বিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া মনে করা হয়।

মানুষের জীবন যাত্রা সুচারুরূপে নির্বাহ করার সম্মুখে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা হইল উপকরণের অভাব। মানুষ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হইত, বাহির হইতে খাদ্য, বস্ত্র, ইত্যাদি কোন কিছুরই তাহার প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলে কোন অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইত না। যদি তাহার প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ রৌদ্রজলের মত সকল স্থানে সকল অবস্থাতে সুপ্রাপ্য হইত, তাহা হইলে তাহার অভাব থাকিত না, শ্রম করিয়া সেই অভাব মোচনের চেষ্টা করিতে হইত না। কিন্তু কৃপণা প্রকৃতি মানুষের সকল অভাব মিটাইবার উপযোগী উপকরণ সুপ্রাপ্য করেন নাই। অথচ মানুষের অভাবের অন্ত নাই, একটি অভাবের তৃপ্তি আর একটি অভাবকে ডাকিয়া আনে। অনন্ত অভাব অথচ সীমাবদ্ধ উপকরণ, এই অবস্থাই সৃষ্টি করে প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা—দুষ্প্রাপ্যতা।

দুষ্প্রাপ্যতা

কিন্তু অভাব না মিটাইয়া উপায় নাই, তাই মানুষ সীমাবদ্ধ উপকরণ লইয়া অনন্ত অভাব মিটাইবার চেষ্টা করে। সকল দিকের অভাব সম্পূর্ণ মিটাইবার ক্ষমতা তাহার নাই, অল্প কিছু উপকরণকে বিভিন্ন দিকে নিয়োগ করিয়া সকল অভাব মোচন সম্ভব নহে। জীবনের কালও সীমাবদ্ধ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাহাকে সকল অভাব মিটাইতে হইবে, কিন্তু দ্রব্য ও উপকরণের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত নহে। এইরূপ অবস্থায় তাহাকে নির্বাচন করিতে হয়, কোন অভাব-মোচনকে সে বর্ত্তমানে স্থগিত রাখিবে, কোন তৃপ্তির অগ্রাধিকার সে মানিয়া লইবে। কোন দিকে তাহার অভাব তীব্রতম, কোন উপকরণ সর্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য। দুষ্প্রাপ্য উপকরণ সর্বাপেক্ষা কম ব্যবহার করিবে, এবং তীব্রতম অভাব সর্বাগ্রে মিটাইবার চেষ্টা করিবে। একদিকে অপেক্ষাকৃত বেশী উপকরণ নিয়োগ করিলে অন্যান্য দিকে তাহার নিয়োগ কমাইতে হয়, প্রতিদ্বন্দ্বী অভাবের চাপে মানুষের সমস্যা হইল অভাব ও উপকরণের সঠিক নির্বাচন (choice)।

নির্বাচন

এই নির্বাচন মানুষকে নিজের সম্বন্ধেও করিতে হয়। তাহার শ্রমশক্তি, বুদ্ধি বা গুণাবলীর সার্থক নিয়োগ কোন দিকে হইতে পারে, তাহা তাহাকে স্থির করিতে হয়। আধুনিক সমাজ-দেহে কোন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য নিজে উৎপাদন করে না। যে দ্রব্য উৎপাদনে তাহার শ্রমশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী এবং যে উৎপাদন-ক্ষেত্রে তাহার শক্তি সামর্থ্য সর্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদন-ক্ষম, সে সেইদিকে তাহার শক্তি নিয়োগ করে। এই ভাবে সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন সুরু করে এবং নিজের প্রয়োজনীয় অপর সকল দ্রব্যাদি অন্যের উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত নিজ-দ্রব্যের বিনিময়ের দ্বারা পাইয়া থাকে। দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচনের অবশ্যম্ভাবী ফল হইল বিনিময়। তাই কেয়ার্ণক্রস্ বলিতেছেন যে "সীমাবদ্ধ উপকরণ লইয়া অনন্ত অভাব মিটাইবার যে প্রচেষ্টা মানুষ বিনিময়ের মধ্য দিয়া করিয়া চলিয়াছে, সেই কার্য্যাবলীর বিশ্লেষণ যে সমাজ-বিজ্ঞানের কাজ, তাহাই ধন-বিজ্ঞান।"

বিনিময়

কিন্তু এই ধরণের সকল প্রচেষ্টা ধন-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহে। সখের বিনিময়ে বা আনন্দের বিনিময়ে মানুষের কাজকর্ম অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সহিত জড়িত নয়, উহারা ধন-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুও নহে। বিনিময়ের

মাধ্যমরূপে যে অর্থ (money) সমাজে প্রচলিত আছে, মানুষের কোন প্রচেষ্টা সেই অর্থের সহিত জড়িত থাকিলে এবং অর্থের দ্বারা সেই প্রচেষ্টার তীব্রতা ও গভীরতা পরিমাপযোগ্য হইলেই তাহা ধন-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মে অর্থের ভূমিকা পর্য্যালোচনা করা, তাই ধন-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু বলা চলে; কারণ দুষ্প্রাপ্যতা, নির্বাচন ও বিনিময়-জনিত সকল অর্থনৈতিক সমস্যাকে আধুনিক সমাজের মানুষ অর্থের দ্বারাই সমাধানের চেষ্টা করিয়া থাকে।

মানুষের কার্য্যে অর্থের ভূমিকা

অন্যান্য সংজ্ঞা-সমূহ (Other Definitions):

ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে ধন-বিজ্ঞান হইল সম্পদ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত অ্যাডাম স্মিথের বই-এর নাম ছিল "জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতিও কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান"। ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীদের ধারণাতে মানুষের সকল কার্য্যের পিছনে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে সম্পদ আহরণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। অপর কোন উদ্দেশ্যে তাহারা কাজ করে না, সকল কার্যের কারণ হইল সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তাহারা সম্পদকে ধন-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন।

অ্যাডাম স্মিথ: সম্পদ-বিজ্ঞান

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিকদের রুচিবোধ এই সংজ্ঞাকে মানুষের কার্য্য সমূহের উদ্দেশ্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই; এই বিজ্ঞানকে স্থূল এবং অর্থগৃধ্নুতার পূজামন্ত্র বলিয়া উপহাস করিয়াছে। ব্যক্তিগত লাভ ও স্বার্থসিদ্ধি সকল মানুষের কার্য্যের নিয়ন্ত্রণকারী বলিয়া তাহারা স্বীকার করিতে চাহেন নাই, 'অর্থ-পিশাচের বাণী' বলিয়া এই বিজ্ঞানকে হেয়করার চেষ্টা করিয়াছেন।

তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্শাল পূর্ব্বের সংজ্ঞাকে পরিবর্তন করিয়া নূতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন যে সম্পদ সম্পর্কীয় মানুষের দৈনন্দিন কার্য্যাবলী ধন বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু। নিছক সম্পদ হইতে তিনি ধন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকে মানুষ ও তাহার কার্য্যাবলীর দিকে ফিরাইয়া দেন;

"সম্পদের আয় ও সম্পদের ব্যয় সংক্রান্ত সমাজবদ্ধ মানুষের কার্য্যের পর্য্যালোচনা", ধন-বিজ্ঞানের সংজ্ঞারূপে গৃহীত হয়। তাহার মতে সম্পদ হইল উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে, সুতরাং সম্পদ ধন-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

মার্শাল: সম্পদ-সম্পর্কীয় মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম

মানুষের কার্য্যও সকল সময় অর্থ-লিপ্সা দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা তিনি স্বীকার করেন না; ব্যক্তিপ্রেম, দেশপ্রেম, ধর্মবোধ, বন্ধুত্ব, সামাজিক হিতবোধ ইত্যাদি দ্বারাও মানুষের কার্য্য নির্ধারিত হইতে পারে। ধন-বিজ্ঞানে সকল প্রকার কার্য্য লইয়া আলোচনা হইবে না: সম্পদ সংশ্লিষ্ট কার্য্যাবলীই ইহার আলোচ্য বিষয়-বস্তু।

ক্যানানের মতে ধন বিজ্ঞানের কাজ হইল, মানুষের বস্তুজাত কল্যাণের কারণসমূহ পর্য্যালোচনা। কোন্ বিষয়ের উপর মানুষের কল্যাণ নির্ভরশীল এবং কি ভাবে কল্যাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব, সবই তাহার মতে এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। ইংরাজীতে সম্পদ শব্দের আদি অর্থ ছিল কল্যাণ, সুতরাং কল্যাণ-সম্পর্কীয় কার্য্যাবলী ধন-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু হিসাবে সহজেই গৃহীত হইয়াছিল।

বস্তুজাত কল্যাণ

কিন্তু আধুনিক কালে রবিন্‌স্ এই সংজ্ঞাকে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সম্পদ ও কল্যাণের মধ্যে গভীর পার্থক্য রহিয়াছে। দেশে মদ জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে সম্পদ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু কল্যাণ বৃদ্ধি হয় কিনা সন্দেহ। উপরন্তু কল্যাণ শব্দটির কোন সর্বজন-গ্রাহ্য অর্থ নাই। কল্যাণ বলিতে শারীরিক কল্যাণ, মানসিক কল্যাণ, আত্মিক কল্যাণ, অর্থনৈতিক কল্যাণ, সব কিছুই বুঝায়—সুতরাং এই শব্দটির ব্যাখ্যা খুবই অনির্দিষ্ট। তাহা ছাড়া, বস্তু-জাত দ্রব্যের বাহিরেও বহু কার্য্যাদি (services) আছে, যাহা মানুষের কল্যাণ সাধন করে (যেমন শিক্ষক, ড্রাইভার, গায়ক, ইহাদের কাজকর্ম)। অথচ তাহাদের এই সকল কাজ মোটেই বস্তু হইতে প্রস্তুত নহে বা বস্তু উৎপন্ন করে না। আরও বলা চলে যে, বস্তু-জাত দ্রব্যের নিছক বস্তুত্ব মানুষের প্রয়োজন নহে, তাহা হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতাই মানুষের কাম্য। সর্বোপরি, ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সত্যের অনুসন্ধান-ই বিজ্ঞানের কাম্য ও লক্ষ্য; মানুষের কল্যাণ বা অপর কোন আদর্শ প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। সত্যানুসন্ধান

রবিন্‌স্ কর্তৃক সমালোচনা

তাহার চরম লক্ষ্য ; প্রকৃত বিজ্ঞানের অপর কোন আদর্শ থাকে না। সুতরাং বস্তুত্ব বা কল্যাণ এই উভয়ের উপর জোর দেওয়াই অবৈজ্ঞানিক হইয়াছে, ইহাই রবিন্‌সের অভিমত।

রবিন্‌স্ বলিয়াছেন যে, বিভিন্নভাবে নিয়োগ করা সম্ভব এইরূপ উপায়ের (means) এবং মানুষের চরম লক্ষ্যের (ends) মধ্যে যে সকল প্রচেষ্টা সম্পর্ক স্থান করে, তাহাদের পর্য্যালোচনা ধনবিজ্ঞানের কাজ। তাহার মতে, মানুষের অভাব অসীম, কিন্তু অভাব মিটাইবার মত সময় ও উপকরণ সীমাবদ্ধ। আবার এই উপকরণ সমূহকে বিভিন্নভাবে নিয়োগ করা সম্ভব। এই সমস্যার সম্মুখে পড়িলে মানুষ যে ভাবে অল্প উপকরণের সাহায্যে সকল অভাব মিটাইবার চেষ্টা করে, তাহাদের সেই প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত সকলপ্রকার কাজকর্ম ধন-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু। তাঁহার মতে, মানুষের জীবনের বহু লক্ষ্য আছে কিন্তু উপকরণের স্বল্পতার জন্য সকল লক্ষ্য মানুষ লাভ করিতে পারে না, একটি লক্ষ্যে সফল হইতে হইলে অপর বহু লক্ষ্য বাদ পড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া, যে উপায়গুলির দ্বারা সে লক্ষ্যে পৌঁছিতে চেষ্টা করে তাহাদেরও বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব ; একটিতে ব্যবহার করিলে অন্যক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য তাহাদের পাওয়া যায় না। বাস্তব জীবনে যে দ্রব্যগুলির জন্য আমরা বেশী দাম দিতে প্রস্তুত থাকি তাহারা আমাদের অভাব বেশী মেটায়, অভাব কম মিটিলে আমরা কম দাম দিই। উপকরণের কোন্ দিকে ব্যবহার বেশী হইতেছে ও অভাব বেশী মিটিতেছে তাহা দাম-ব্যবস্থার দ্বারা বোঝা যায়। দাম-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া কে কি দাম দিতে চাহিতেছে তাহা বুঝিয়া উপকরণগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন অভাব মিটাইতে নিয়োজিত থাকে। সুতরাং দাম-ব্যবস্থাই হইল ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, যাহার মারফৎ উপকরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ ও তাহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করা যায়।

রবিনসের সংজ্ঞা

ধনবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি (Scope of Economics)

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয়ে যেরূপ মত পার্থক্য আছে, ইহার আলোচনার পরিধি' সম্বন্ধেও সেইরূপ কম মত-বিভিন্নতা নাই। মার্শালের সংজ্ঞা অনুযায়ী ইহার আলোচনার বিষয়বস্তু হইল সম্পদ-সম্পর্কীয় মানুষের কার্য্যাবলী ; রবিন্‌সের মতানুযায়ী ইহার আলোচনার বিষয়বস্তু হইল দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কীয় সমস্যাবলী।

কিন্তু রবিন্‌সের এই সংজ্ঞা ধনবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধিকে সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছে। ইহা যে একটি সমাজ-বিজ্ঞান, যাহার আসল আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত সমাজ-বদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক কাজ, তাহা রবিন্‌সের সংজ্ঞা হইতে বোঝা যায় না। মনে হয়, সমাজ ও বাস্তব অবস্থাগুলি এড়াইয়া শুধু 'মূল্য-নিরূপণ'কে লইয়া নিছক বুদ্ধিচর্চা ছাড়া ধনবিজ্ঞান আর কিছু নহে। স্পষ্ট বোঝা দরকার যে, ধন-বিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানেরই অংশ; ইহা একটি পৃথক মানুষের অর্থনৈতিক কাজ আলোচনা করে তাহা নহে, সমাজ-বদ্ধ মানুষের কার্য্য সামগ্রিক ভাবে বিশ্লেষণ করে। সমাজ ও সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন মানুষ একাকী কিভাবে অভাব মেটায় তাহা ধন-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নহে, সহযোগিতার ভিত্তিতে অপর সকল মানুষের সহিত একত্র হইয়া, কি ভাবে অন্যের কাজকে প্রভাবান্বিত করিয়া এবং নিজেও প্রভাবিত হইয়া মানুষ অভাব মোচনের চেষ্টা করে তাহাই ধনবিজ্ঞানের পরিধি।

রবিনস্ কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিধির সমালোচনা

ধনবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি কতদূর হইবে; অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ভালমন্দ বিচারের পর ধনবিজ্ঞানী বলিবে কি না যে, কি করা উচিত বা অনুচিত, তাহার সম্বন্ধে ধন-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। যেমন, রবিন্‌সের মতে, ধনবিজ্ঞানীর কাজ সত্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করা মাত্র; কাহাকেও ভাল বলা, মন্দ বলা বা কোন কিছু প্রচার করা নয়। উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ ভাবে, তথ্য বাছাই করিয়া বিষয়গুলির মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করাই ধন-বিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু অন্য অনেক ধন-বিজ্ঞানীদের অভিমতে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের আলোচনায় সম্ভব হইলেও সমাজ-বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা চলে না। মানুষ ও তাহার কার্য্য লইয়া যে বিজ্ঞানের আলোচনা, দায়িত্বহীন ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাহার পর্য্যালোচনা সম্ভব নহে। শুধু কেন দারিদ্র্য হয় তাহা বলিলেই চলিবে না, উহা দূর করার উপায় কি, এবং দূর করিলে মানুষের উপকার হইবে একথাও বলিতে হইবে। এ বিজ্ঞান শুধুই আলোক-দায়ী নহে, ফলদায়ীও বটে। মানুষের কার্য্যাবলীর গতি প্রকৃতির নিয়মগুলি বাহির করিয়া সেই নিয়মগুলিকে মানুষের কল্যাণে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তাহার কথা ধন-বিজ্ঞান চিন্তা করিবে,

শুধু আলোক-দায়ী নহে; ফলদায়ীও বটে।

ইহাকে কল্যাণ-ধর্ম্মী ধনবিজ্ঞান (welfare Economics) হইতে হইবে। ইহা যেরূপ শুদ্ধ-বিজ্ঞান, সেরূপ ফলিত-বিজ্ঞানও বটে।

ইহাকে বিজ্ঞান বলা চলে কিনা (Is Economics a Science ?) :

কোন বিষয় সম্বন্ধে কেবল কিছু তথ্য সংগৃহীত হইলেই তাহাকে বিজ্ঞান বলা চলে না। কিন্তু যদি সেই তথ্য হইতে বাছাই করিয়া, শ্রেণীবিভাগ করিয়া, একের সহিত অপরের কার্য্য-কারণ সম্পর্ক বাহির করিয়া, নিয়মের আকারে তাহাদের প্রকাশ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে আমরা তাহাকে বিজ্ঞান বলিতে পারি।

বিজ্ঞান কি ?

ধনবিজ্ঞানেও বিষয়বস্তু আছে, অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে মানুষের অর্থ নৈতিক কাজ সম্বন্ধে আলোচনা। বহু পর্য্যবেক্ষণের পর এই সম্বন্ধে বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং কার্য্য কারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়া ধনবিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক নিয়মও গঠন করিয়াছেন। সেই নিয়মের প্রয়োগ বহুস্থানে সার্থক হইয়াছে, বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া নিয়মগুলিব ভিত্তিতে, ভবিষ্যৎ বলিয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। এমতাবস্থায় ইহাকে বিজ্ঞান না বলা চলে না।

কেন ইহা বিজ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত

অবশ্য ইহা ঠিকই যে ধনবিজ্ঞানের নিয়মগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলির ন্যায় নিখুঁত নহে। কারণ মানুষের কার্য যাহার বিষয়বস্তু, মানুষের ইচ্ছা-শক্তির স্বাধীন সত্তাকে সে অস্বীকার করিতে পারে না। ধনবিজ্ঞানী মানুষের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, সে ইচ্ছা অসংখ্য কারণের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিফলন। নিষ্প্রাণ বস্তু হইলে তাহাদের সম্বন্ধে নিয়ম যেরূপ সম্পূর্ণ সত্য হয়, স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি-সম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম বেশী দেখা যায়। কিন্তু তবুও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী মানুষ কি ধরণের কার্য করে অথবা করা সম্ভব, তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে সঠিক নিয়ম বাহির করা যায়।

অপরাপর বিজ্ঞানের সহিত ইহার পার্থক্য

অনেকে বলেন যে ধনবিজ্ঞান কখনই বিজ্ঞান নহে, কারণ ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত-পার্থক্য খুব বেশী। উটন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন যে, ছয়জন বিজ্ঞানী একসঙ্গে থাকিলে সাতটি মত দেখা দেয়। ধন-বিজ্ঞানীদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু

বিসর্জন করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে কোনমতে ইহাকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উঠাইতে তাঁহারা বড়ই উৎসুক।

মনে রাখা দরকার যে, সকল বিজ্ঞানেই সকল বিষয় লইয়া মতবিরোধের সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি এখনও হয় নাই, তবুও তাহাদের বিজ্ঞান বলিতে কোন বাধা হয় না। আর ধনবিজ্ঞানীদের মতপার্থক্য বিজ্ঞানের নিয়ম সংক্রান্ত নহে, বাস্তব জগতের সমস্যা মিটাইবার পথ নির্ণয়ের ব্যাপারে। কোন্ বিজ্ঞানী কোন্ উপায় গ্রহণের সুপারিশ করিবেন, তাহা তাঁহার নৈতিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল। মতপার্থক্য থাকিলে তাহাকে বিজ্ঞান বলা চলে না ইহা ঠিক নহে কারণ মতপার্থক্যের মধ্য দিয়াই সত্যানুসন্ধান চলে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়।

মত পার্থক্য থাকিলেও তাহা বিজ্ঞান

ধনবিজ্ঞানের নিয়ম: ইহাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Laws of Economic Science)

কোন বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি বিষয়ের সহিত অপর বিষয়ের কার্য্য-কারণ সম্পর্ক থাকে, কোনটির প্রভাবের ফলে অপর কোনটি ঘটিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিক নিয়ম বলা হয়। যেমন মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, মেঘ ও বৃষ্টির এই কার্য্য-কারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি নিয়ম।

নিয়ম কাহাকে বলে?

মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিভিন্ন কারণ কি, আবার এই কাজকর্মগুলিই বা কোন ঘটনার কারণ, এই সম্বন্ধে বহু নিয়ম ধনবিজ্ঞানীরা বাহির করিয়াছেন এবং এই সকল নিয়ম ও তাহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ লইয়াই ধনবিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে। একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থার তাগিদে মানুষ কি ভাবে কাজ করিবে, কিরূপ ব্যবহার করিবে; এই অবস্থার কোন্ পরিবর্ত্তনে তাহার কার্য্য কিরূপভাবে পরিবর্তিত হইবে; ইহাই এই সকল নিয়মের উপজীব্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অর্থাৎ পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, প্রত্যেকেরই বিভিন্ন নিয়ম আছে, তাহাদের আলোচনার বিষয়বস্তুও বিভিন্ন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলির সহিত ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের এক

ক্ষেত্রে মিল আছে, তাহারা কেহই মানুষের ইচ্ছার অধীন নহে। মানুষ চাহিতে পারে বা না-চাহিতে পারে, পছন্দ করুক বা অপছন্দ করুক, এই সকল নিয়মের কার্য্যকারিতা সর্ব্বদা চলিতেছে। কোন দ্রব্য উপরে তুলিয়া দিলে আবার তাহা নীচে পড়িবে, ইহা যেরূপ মানুষের বিনাইচ্ছায় ঘটিয়া থাকে; কোন একটি নির্দিষ্ট জমিখণ্ডে বারবার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে তাহাদের প্রতিদান ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়িতে থাকে, ইহাও মানুষের ইচ্ছাধীন নহে। মানুষ এই নিয়মগুলি সৃষ্টি করে না, বদলাইতেও পারে না, যদিও মানুষ এই সকল নিয়মেরই প্রভাবাধীন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানের নিয়ম সমূহের সাদৃশ্য

কিন্তু ধনবিজ্ঞানের ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলির মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও দেখা যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম সমূহ যতটা নিখুঁত ভাবে কার্য্যকরী হয়, ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের কার্য্যকারিতা ততটা নিখুঁত নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই নিয়ম বিশেষ কার্য্যকরী হয় না, দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে যোগান বাড়ে, এই নিয়ম থাকিলেও শ্রমের দাম অর্থাৎ মজুরী বাড়িলে শ্রমিক অধিক পরিশ্রম করিবে তাহা নহে, অনেক সময় শ্রম কমাইয়া দিতেও পারে (মজুরীর হার বৃদ্ধির দরুণ এখন কম খাটিয়া সে পূর্ব্বের ন্যায় একই পরিমাণ আয় করিতে পারে)। মানুষের ইচ্ছা-শক্তি স্বাধীন, তাহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ন্যায় জীবনহীন বা বুদ্ধি বিবেচনাহীন দ্রব্য নহে।

ধন-বিজ্ঞানের নিয়ম সম্পূর্ণ সঠিক না-ও হইতে পারে—ইহা প্রধানতঃ ঘটনার ঝোঁক নির্ণয় করে।

ধনবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মসমূহের মধ্যে আরও পার্থক্য আছে। সকল নিয়মই একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থা-কাঠামোর মধ্যে (given set of circumstances) কার্য্যকরী হয়। বাহিরের কোন শক্তি ওই সময় সেই অবস্থাকে বদল করিতেছে না ইহা ধরিয়া লইতে হয়, নতুবা ঠিক কোন্ কারণের ফলে কার্য্যটি ঘটিতেছে তাহা পৃথক করিয়া আলোচনা করা সম্ভব নহে। যে সকল বিষয় সাময়িকভাবে স্থির আছে ধরিয়া লইয়া নিয়মটির ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাদিগকে স্বীকার্য্য-বিষয় (Assumptions) বলে। তাই ধনবিজ্ঞানের সকল নিয়ম বর্ণনা করার সময়েই "অন্যান্য সকল কিছু সমান থাকিলে" নিয়মটি কার্য্যকরী হইবে তাহা বলা হয়। অবশ্য সকল বিজ্ঞানের

স্বীকার্য বিষয় অধিক পরিমাণে লইতে হয়।

নিয়মগুলিই কম বা বেশী পরিমাণে "স্বীকার্য্য বিষয়" ধরিয়া লয়। যেমন, একটি দ্রব্য উপরে ছুঁড়িয়া দিলে নীচে নামিয়া আসিবে—এই নিয়ম বর্ণনার সময় ধরিয়া লওয়া হয় যে বাতাস হইতে তাহা ভারী (তাহা না হইলে উহা বেলুনের মত উপরে উঠিয়া যাইবে)। তবে অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহে "স্বীকার্য্য বিষয়"-এর পরিমাণ বেশী।

ধন-বিজ্ঞানের নিয়মসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, সমাজ-দেহের সহিত ইহারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজ-দেহে পরিবর্ত্তন হইলে পুরাণো নিয়মসমূহের বদলে নূতন নিয়মের কার্য্যকারিতা সুরু হয়। বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের নিয়মগুলি সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কার্য্যকরী ছিলনা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম্ম বিশ্লেষণের জন্য নূতন নিয়ম বর্ণনা করিতে হয়। উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের সহিত সংযুক্ত বিষয়গুলির কার্য্যকারণ সম্পর্কের পরিবর্ত্তন ঘটে।

অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সহিত ধন বিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation with other social sciences) ঃ

ধনবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Economics and Ethics) ঃ

মানুষের ন্যায়-অন্যায়বোধ নীতি-শাস্ত্রের বিষয়বস্তু, কিন্তু ধন বিজ্ঞানের বিষয় বস্তু হইল অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে মানুষের কার্য্যাবলী। নীতিবোধ মানুষকে যে কাজ করিতে বলে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সে হয়ত অন্য কাজ করিতে বাধ্য হয়। তাহা ছাড়া, নীতিবোধের দিক হইতে কোন বিষয় খারাপ হইলেও (যেমন মদ উৎপাদন), অর্থনৈতিক কারণে (যেমন বেকারী দূর করিতে) তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকা স্বাভাবিক।

ইহা নীতিশাস্ত্রের সহায়ক।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ধন বিজ্ঞান মানুষের সমস্যা লইয়াই আলোচনা করে এবং মানুষের কল্যাণ-ই বিশেষ করিয়া কল্যাণধর্ম্মী ধন-বিজ্ঞানের (welfare Economics) লক্ষ্য। সুতরাং নীতিশাস্ত্র এড়াইয়া, ন্যায় অন্যায় ও ভাল মন্দ বাদ দিয়া কাজ করিতে সে পারে না। তাহা ছাড়া মানুষের কাজকর্ম, নীতিবোধের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়। যদিও রবিন্‌স্‌-এর মতে ইহা নীতিবোধ-

নিরপেক্ষ খাঁটি বিজ্ঞান মাত্র, তবুও বাস্তবে নীতিশাস্ত্রের সহিত ধনবিজ্ঞান জড়িত। মার্শাল ইহাকে নীতিশাস্ত্রের সাহায্যকারী হিসাবেই ভাবিতেন।

ধন বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান (Economics and Politics) ঃ

এই দুই বিজ্ঞানের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক এত নিবিড় যে প্রাচীন কালে এই বিজ্ঞানকে 'রাজনৈতিক ধন-বিজ্ঞান' (Political Economy) বলা হইত। দেশের রাজনৈতিক কাজকর্ম সর্ব্বদাই অর্থনৈতিক কাজকর্মকে প্রভাবান্বিত করে। রাজনৈতিক কারণে বা যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থের দরকার হইলে কর বসাইবার ফলে অর্থনৈতিক জীবনেও কাজকর্মের রূপ বদ্‌লাইয়া যায়। বর্ত্তমানের রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক রূপ অথবা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে থাকায় উভয়ের সংযোগ অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে। কল্যাণ-রাষ্ট্রের আদর্শ ব্যাপকভাবে গ্রহনের ফলে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতি প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। রাষ্ট্রের রূপ ও কাঠামো বহুলাংশে অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠে।

উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ

ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Economics and History) ঃ

অতীত কালের সমাজের ক্রম পরিবর্ত্তনকে ইতিহাস বলে। অতীত কালের অর্থনৈতিক ঘটনাবলী হইতে ধনবিজ্ঞান বহু নূতন তথ্য পায় ও তাহা হইতে ইহার বহু তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। ইতিহাস হইতে নিজের প্রয়োজনীয় মাল-মশলা লইয়া সর্ব্বদাই ধনবিজ্ঞান উপকৃত হইয়াছে।

কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিই সমাজের গতি নির্ণয় করে অর্থাৎ ইতিহাস সৃষ্টি করে। বর্ত্তমানেও সমাজের পরিবর্ত্তন যে ইতিহাসের সামগ্রী হইতেছে সেই পরিবর্ত্তনের পিছনে অর্থনৈতিক কারণগুলি কাজ করিতেছে। প্রভাবশালী এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ আছেন যাহারা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (Economic Interpretation of history) করেন এবং সমাজের সকল কিছুর গতি অর্থনৈতিক কারণ ঘটে, (Economic Determinism) তাহা বিশ্বাস করেন।

সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদে পরিবর্ত্তন অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করে।

ধনবিজ্ঞান ও মনস্তত্ব (Economics and Psychology) :

মানুষের প্রত্যেক ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করা মনস্তত্ত্বের কাজ। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ তাহাদের বহু নিয়ম মনস্তত্ত্বের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন (যেমন, ক্রমহ্রাসমান মানসিক অনুভূতির নিয়ম হইতে প্রথমে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম গৃহীত হইয়াছিল)।

তাহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, মানুষ সর্ব্বদা চুলচেরা বিচারবিবেচনা করিয়া ক্রয়বিক্রয় করে, তাহার সকল অর্থনৈতিক প্রয়াস যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ সকলেই সুখ খোঁজে, যে কার্য্যে তাহার সর্বাধিক সুখের সম্ভাবনা সে তাহাই করে, দুঃখের সম্ভাবনা এড়াইয়া যায়। এই এই ধরণের মনস্তাত্বিক মতবাদকে হেডনবাদ (Hedonism) বলে।

এখনও ধনবিজ্ঞানীগণ মানুষের কাজকর্ম্মের পিছনে বহু মনস্তাত্বিক কারণ দর্শাইবার চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ, আধুনিক তত্ত্বগুলির অধিকাংশই প্রায় মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষের আবেগ, অনুকরণের ইচ্ছা, অহংকার, আসক্তি, সব কিছুই আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেইন্‌স্ বলেন যে সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন, মোট আয়, মোট কর্মনিয়োগ সকল কিছু, প্রধানতঃ, মানুষের মনস্তাত্বিক তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : ভোগ-প্রবণতা, নগদ্-পছন্দ, এবং ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থা। সুতরাং ধন-বিজ্ঞান বহুবিষয়ে আজ মনস্তত্ত্বের নিকট ঋণী।

ক্লাসিকাল বা আধুনিক ধন-বিজ্ঞান উভয়েই মনস্তত্ত্বের নিকট ঋণী

ধনবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Need of Economic Studies)

উনবিংশ শতাব্দীতে কার্লাইল, রাস্‌কিন্ প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌গণ ধনবিজ্ঞান পাঠের বিরোধিতা করিতেন। ইহাকে তাঁহারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর শাস্ত্র বলিতেন, কারণ তাহাদের ধারণা ছিল যে ইহা অর্থ-পূজা ছাড়া আর কিছু জানে না। স্থূল স্বার্থচিন্তা যে বিজ্ঞানের আদর্শ তাহা অপাঠ্য, ইহাই তাহাদের বক্তব্য ছিল। কিন্তু আজকাল আর ধনবিজ্ঞান সেই স্তরে নাই, বিদ্বৎ-সমাজে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানরূপে গৃহীত হইয়াছে।

সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তাশীল নাগরিক মাত্রেই আজকাল বিশেষ সচেতন। কিন্তু সেই সকল সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিন্তা করার মত

মানসিক শৃংখলা থাকা দরকার। কেহ হয়ত এই সকল সমস্যা চিন্তার ব্যাপারে গোঁড়ামি করিয়া বসেন, অথবা একের পর এক যুক্তিগুলিকে মনের মধ্যে সাজাইতে পারেন না। (ধনবিজ্ঞানের পাঠ মানুষকে যুক্তিবাদী করিয়া তোলে, তাহার গোঁড়ামি দূর করে। কোন বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োগ কিভাবে করিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দেয়। অনেকে আছেন, যাহারা রীতিমত রাজনৈতিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বহুপ্রকার মন্তব্য করেন, কিন্তু প্রত্যেক মন্তব্যকে পরিপূর্ণভাবে শেষ পর্য্যন্ত বিচার করেন না; ফলে দেশের জনমত অযৌক্তিক ধারায় প্রবাহিত হয়। ধনবিজ্ঞানের অনুশীলন তাহাদের গভীরভাবে চিন্তা করিতে এবং দায়িত্বশীল ধারণা গঠন করিতে সাহায্য করিবে। ঠিক কিভাবে এই অর্থনৈতিক কাঠামো চালু আছে, এই কাঠামোর বিভিন্ন অংশ কিভাবে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন, তাহা জানিতে হইলেও ধনবিজ্ঞান পাঠ প্রয়োজন।

মানসিক শৃংখলা, যুক্তিবাদী মন তৈরী করা, সমস্যার মূল তাৎপর্য্য অনুধাবন করা, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বুঝিতে পারা, এই সকল ইহা পাঠের উপযোগিতা।

সকল ব্যবসায়ীর পক্ষেই ধনবিজ্ঞান অবশ্য পাঠ্য, কারণ তাহাদের সমস্যাই ধন-বিজ্ঞানের আলোচনার একটি অংশ। প্রত্যেক ব্যবসায়ী কিছু না কিছু ধনবিজ্ঞানী, কারণ অর্থ উপায় করার বাস্তব পদ্ধতিগুলি তাহাদের জানা আছে। ধনবিজ্ঞান পাঠে তাহার সেই জ্ঞানও বাড়িবে।

ব্যবসায়ীর পক্ষে

বর্ত্তমান পৃথিবীতে ধনবিজ্ঞান অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। এ যুগের বহু আশা আকাঙ্খা, দুঃখ নৈরাশ্য ও বেদনা; সজ্ঘর্ষ ও সংগ্রামের মূলে অর্থনৈতিক কারণ বর্ত্তমান। খুব সচেতন নাগরিকের পক্ষে বর্ত্তমান পৃথিবী ও তাহার গতিবিধির প্রকৃতি বুঝিতে হইলে ধনবিজ্ঞান অবশ্য-পাঠ্য। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন যে বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহার অনুশীলন ব্যাপক সমাজ-বোধ ও গভীর চিন্তাশক্তি জাগ্রত করে।)

নাগরিকদের পক্ষে

ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (Methods of Analysis) :

সাধারণভাবে সকল বিজ্ঞান-ই বিশ্লেষণের ব্যাপারে দুইটি প্রচলিত পদ্ধতির যে কোন একটি গ্রহণ করে, একটি হইল অবরোহ (Deduction) আর একটি আরোহ (Induction)। পূর্ব্বে কোন সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া

তথ্যের সাহায্যে তাহার সত্যতা প্রমাণ করার পদ্ধতির নাম হইল অবরোহী পদ্ধতি (Deductive Method)। আর সকল তথ্যকে সাজাইয়া তাহার মধ্য হইতে বিজ্ঞানের নিয়ম বাহির করা এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়া অপর তথ্যের সাহায্যে তাহা যাচাই করা; ইহার নাম আরোহী পদ্ধতি (Inductive)।

অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাস্ প্রমুখ ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীগণ প্রধানতঃ অবরোহী পদ্ধতির উপর নির্ভর করিতেন। কতকগুলি মূল মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া ধরিয়া তাঁহারা তাহাদের ব্যাখ্যা করিতেন।

ক্লাসিকাল পদ্ধতি ও জার্মান পদ্ধতি।

এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে ছিল জার্মান ধন-বিজ্ঞানীদের ঐতিহাসিক পদ্ধতি, তাঁহারা প্রধানতঃ তথ্য হইতে ধনবিজ্ঞানের নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা দেখাইয়াছিলেন যে ধনবিজ্ঞানের নিয়মগুলি একটি বিশেষ ধরণের অবস্থা হইতে উদ্ভূত, অবস্থার পরিবর্তনে ওই নিয়ম কার্যকরী হয় না; কোন তত্ত্ব অবস্থা-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং আগে অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তাহার পরেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব।

নিউক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানী মার্শাল আসিয়া উভয় মতকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন যে মানুষের দুইটি পা যেমন হাঁটিতে গেলে দরকার, সেইরূপ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে উভয় পদ্ধতিই সমান প্রয়োজনীয়। যে ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণের সাহায্যে শীঘ্র সত্যে পৌঁছান যায়, তাহাই সে ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

উভয় পদ্ধতিই প্রয়োজনীয়।

অঙ্কশাস্ত্র ও সংখ্যা-শাস্ত্রের বিভিন্ন পদ্ধতি আজকাল ধন-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা হয়।

তাহা ছাড়া, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আজকাল ব্যবহৃত হইতেছে: একটি হইল আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ (Partial equilibrium) অপরটি সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ (General equilibrium analysis)। আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণে কেবল একটি বিষয়ের ভারসাম্যের সমস্যা লইয়া আলোচনা হয় (যেমন একটি ফার্ম, একটি দ্রব্যের দাম, যে কোন একটি শিল্প ইত্যাদি)। সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণে সকল বিষয়ের নিজের ভারসাম্য এবং প্রত্যেক বিষয়ের সহিত অপরটির অর্থাৎ পারস্পরিক ভারসাম্যের সমস্যার

আংশিক ভারসাম্য ও সামগ্রিক ভারসাম্য

আলোচনা হয়। যেমন দাম-স্তর, মোট উৎপাদন, মোট কর্মনিয়োগ, মোট আয়, এই জাতীয় বিষয় সমূহ সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের পদ্ধতির দ্বারা আলোচিত হয়।

ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আরও দুই প্রকার হইতে পারে—স্থির (Static) বা গতিশীল (Dynamic)। সকল দ্রব্য বা সকল বিষয় পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে সামগ্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে সেই ভারসাম্যের কারণ, তাহাতে পৌঁছিবার পথ ইত্যাদি আলোচনার নাম হইল স্থিরপদ্ধতি। আসল জগৎ কিন্তু এই ভারসাম্য বজায় রাখিতে দেয় না, সর্ব্বদাই কিছু না কিছু (জনসংখ্যা, মূলধনের পরিমাণ, শিল্প বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি) পরিবর্তিত হইতেছে, স্থির বিশ্লেষণে তাই সামগ্রিক ভারসাম্যের রূপ ধরা যায় না। সম্ভাব্য সকল প্রকার পরিবর্তনকে মানিয়া লইয়া গতিশীল বিশ্লেষণ পদ্ধতি সেই ভারসাম্যের সমস্যা আলোচনার চেষ্টা করে।

স্থির এবং গতিশীল

অনুশীলনী

1. "Economics is a social science studying how people attempt to accomodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange" (Cairncross) (C.U. B.A, '36, '56)—Elucidate.

2. "Economics is the study of the influence of scarcity on human conduct in circumstances where men have freedom of choice in allocating scarce resources between competing wants." (Cairncross)—Explain.

3. "Economics studies the part played by money in human affairs". Critically examine this statement. (B. com '54)

4. Discuss the scope of Economics. "Economics is neutral between ends as such". Discuss.

5. How far Economics should be called a science? (B. com, '46)

6. "The conclusions of Economics are not, like the conclusions of Mathematics, true for all time and under all conditions"—Discuss. (B. com. '48)

7. How is Economics related to (a) Ethics (b) Politics (c) History (d) Psychology ?

8. What are different Methods of studying Economics ?

9. Why should men study Economics, especially the businessmen ? (B. com '48)

10. "Above all, economics is of value in allowing us to judge and frame policies in the light of full knowledge of how the economic system works." (Cairncross)

—Elucidate.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধনবিজ্ঞানে প্রচলিত কয়েকটি ধারণা ও তাহার তাৎপর্য্য

সম্পদ (Wealth) ঃ

যে সকল দ্রব্যের আর্থিক-মূল্য (Money-Value) আছে, ধনবিজ্ঞানে তাহাদের সম্পদ বলে। কোন দ্রব্যের আর্থিক মূল্য থাকিতে হইলে তাহার কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, দ্রব্যটির উপযোগিতা থাকিতে হইবে; অভাব মিটাইবার ক্ষমতা না থাকিলে কেহ তাহার জন্য কোন মূল্য প্রদানে রাজী হয় না। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যটির পর্য্যাপ্ত যোগান থাকিলে তাহার মূল্য থাকে না। চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরবরাহ কম হইলেই উহা পাইবার জন্য লোকে অর্থব্যয করিতে প্রস্তুত থাকে, অর্থাৎ উহার জন্য মূল্য প্রদান করে। তৃতীয়তঃ, সম্পদ হইতে হইলে দ্রব্যটি বিক্রয়-যোগ্য (Marketable or Exchangeable) হওয়া প্রয়োজন। যদি দ্রব্যটি হস্তান্তর যোগ্য না হয়, তাহা হইলে উহার জন্য মূল্য প্রদানে কেহ রাজী থাকিবে না, কারণ উহাকে কেহ নিজস্ব ভোগের বা ব্যবহারের জন্য অন্যের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া আসিতে পারে না। সুতরাং সম্পদ হইল লোকের অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী, যাহা অর্থের বিনিময়ে লোকে ক্রয় ও বিক্রয় করিতে পারে।

উপযোগিতা, অপ্রাচুর্য্য ও বিনিময় যোগ্যতা।

(ক) উপযোগিতা বলিলে একটি দ্রব্য পাইবার জন্য আকাঙ্খাকে (desiredness) বুঝা যায়। সেই দ্রব্যটি ব্যক্তির নিকট উপকারী বা অপকারী, আবশ্যক বা অনাবশ্যক, যাহা কিছু হইতে পারে; কিন্তু ব্যক্তি তাহা পাইতে চাহে এবং দ্রব্যটির জন্য তাহার আকাঙ্খা আছে এইরূপ হইলেই সেই ব্যক্তির নিকট দ্রব্যটির উপযোগিতা আছে বুঝিতে হইবে।

(খ) অপ্রাচুর্য্য (Scarcity) : চাহিদার তুলনায় যদি দ্রব্যটির যোগান প্রচুর না হয়, তবে তাহাকে অপ্রাচুর্য্য বলা যাইতে পারে। চাহিদার তুলনায়

যোগান বেশী হইলে কেহ তাহার জন্য অর্থব্যয় করিতে রাজী হইবে না, বাজারে তাহার জন্য কোন মূল্য নির্ধারিত হইবে না, সুতরাং তাহা সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

(গ) বিক্রয়-যোগ্যতা : দ্রব্যটি বিক্রয়-যোগ্য না হইলে তাহা কখনই সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে না। বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীই সম্পদ। ব্যক্তির মানসিক গুণাবলী, চরিত্র, রুচি ইত্যাদি তাহার মনঃসম্পদ হইলেও ধনবিজ্ঞানে উহার আর্থিক মূল্য নাই বলিয়া উহাকে কখনই আমরা সম্পদের পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি না। ব্যক্তির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মনন ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য করে বটে কিন্তু উহা সম্পদ নহে। কেবল মাত্র যখন সমাজে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তখন এই সকলের আর্থিক মূল্য বাজারে স্থির হইত, ইহাদের সম্পদ বলা হইত।

বিক্রয়-যোগ্যতা থাকিলেই উহাকে সম্পদ বলা চলিবে, উহা সত্য সত্যই বাজারে আসিল কি না বা বিক্রয় হইল কি না তাহার প্রয়োজন নাই। যেরূপ রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এই সকল যদিও বিক্রয় হইতেছে না এবং কেহ ইহাদের বিক্রয় মূল্য হিসাবও করেন না, তবুও ইহা সমষ্টিগত সম্পদ। বহু প্রকার সম্পদ আছে যেমন রেলপথ, যাহার মুনাফাকে বাৎসরিক সুদ হিসাবে ধরিয়া, বাজারের সুদের হারের সহিত তুলনা করিয়া মূলধনে রূপান্তরনের দ্বারা তাহার আর্থিক মূল্য জানিতে পারি (capitalised value)। কিন্তু যাহা হইতে মুনাফা হয় না, (যেমন রাস্তাঘাট ইত্যাদি) সে ক্ষেত্রেও উৎপাদনের ব্যয় হিসাব করিয়া তাহার আর্থিক মূল্য নিরূপণ করা যায় সুতরাং, বাজারে বিক্রয়ের জন্য না আসিলেও সে সকল দ্রব্যের অর্থ-মূল্য আছে বা থাকিতে পারে তাহাকেই আমরা সম্পদ বলিব।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ এই ভাবে সম্পদের সংজ্ঞা নির্ণয় করেন। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের সুরুতে সম্পদের সংজ্ঞা অন্যরূপ ছিল, সমাজের অগ্রগতির সহিত সম্পদের রূপান্তর হইয়াছে, ফলে তাহার সংজ্ঞারও পরিবর্তন হইয়াছে। ফরাসী দেশের ফিজিয়োক্রাট্‌গণ শুধু কৃষিজাত শস্যদ্রব্যকেই সম্পদ বলিতেন; ইংলণ্ডের মার্কেণ্টাইলিষ্ট্‌গণ শুধু সোণারূপা, হীরা জহরৎ, ও মূল্যবান প্রস্তরাদিকেই সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন। ধনবিজ্ঞানী অ্যাডাম স্মিথের অভিমতে শুধু ধরা যায়, ছোঁয়া যায়,

প্রাচীন ধারণাসমূহ

স্থানান্তরিত করা যায় এরূপ বস্তুজাত দ্রব্য (Material goods) ছিল সম্পদ। আধুনিক কালে সম্পদ বলিতে বস্তু-জাত দ্রব্য বা অবাস্তব কার্য্য (Non-material goods or Services) সকলকেই বুঝা যাইবে; আর্থিক মূল্য আছে এইরূপ যে কোন দ্রব্য বা কার্য্য (Services)।

সম্পদ : ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ—

যে সকল সম্পদের উপর একটি ব্যক্তির মালিকানা থাকে, তাহাদের সেই ব্যক্তির সম্পদ বলা চলে; ইহাই ব্যক্তিগত সম্পদ (Individual wealth)। কিন্তু যে সকল সম্পদের উপর সমগ্র সমাজের মালিকানা এবং সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ রাষ্ট্রের মালিকানা, তাহাকে সমষ্টিগত সম্পদ বলা চলে; যেরূপ রাস্তাঘাট, রেলপথ, পার্ক, সরকারী স্কুল, কলেজ, হাঁসপাতাল ইত্যাদি।

ব্যক্তির নিকট যাহা সম্পদ, তাহা সমাজের দিক হইতে সম্পদ না-ও হইতে পারে। যে মুনাফাখোর কালোবাজারী ব্যবসা করিয়া তাহার ব্যবসায়ী বন্ধুদের নিকট তাহার দোকানের ব্যবসা-পরিচিতির (goodwill) আর্থিক মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহাতে তাহার ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পাইলেও, সমাজের সমগ্র সম্পদ ভাণ্ডারের তিলমাত্র বৃদ্ধি হইল না। এইরূপ বহু ব্যবসা রহিয়াছে, যাহা উঠিয়া গেলে সমাজের সম্পদ হ্রাস পায় না। বহু অসাধু ঐসব ব্যবসায়ী সমাজের অমঙ্গল সাধন করিয়াই ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে। গ্রামের নিকটেই একটি কয়লাখনি স্থাপিত হইলে দেশের উপকার বৃদ্ধির তুলনায় অধিক অপকার সাধিত হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যায় যে কোন ব্যবসায়ের বা উৎপাদনের ব্যক্তিগত মূল্য তাহার সামাজিক মূল্য হইতে কম বা অধিক হইতে পারে

ব্যক্তি স্বার্থে ও সমাজ স্বার্থে বিরোধ

ঠিক এইরূপ ভাবে, সম্পদের ব্যক্তিগত মূল্য উহার সামাজিক মূল্য হইতে কমও হইতে পারে। যদি রেলপথ খারাপ হইয়া যায় তবে রেল কোম্পানীর ব্যক্তিগত ক্ষতির তুলনায় অন্যান্য সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের মিলিত ক্ষতির পরিমাণ অধিক হওয়া সম্ভব। পোষ্ট অফিস, বিদ্যুৎ কোম্পানীর ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সম্পদকে ব্যক্তি ও সমাজ উভয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে ব্যক্তি-স্বার্থ ও সমাজ-স্বার্থে বিরোধ আসা সম্ভব।

সম্পদ ও কল্যাণ (wealth & welfare)

অর্থ-মূল্য বিশিষ্ট দ্রব্যের নাম হইল সম্পদ এবং কল্যাণ হইল কোন ব্যক্তির মানসিক ও চিন্তা-জগতের ধারণা। সুতরাং সম্পদ ও কল্যাণ একই জিনিষ নহে, ইহারা একই বিষয় বুঝায় না। যদিও সম্পদ থাকিলেই মানুষের কল্যাণ হয়, কারণ মানুষের অভাব মোচনের জন্য সম্পদের প্রয়োজন; কিন্তু সম্পদ ও কল্যাণ কখনই এক নহে।

সম্পদ বৃদ্ধি হইলেই কল্যাণ বা সুখ বৃদ্ধি হইবে এমন বলা চলে না। যে ব্যক্তি ৫০০৲ আয় করে তাহার তুলনায় ১০০০৲ আয়কারী দ্বিগুণ সুখী, ইহা বলা যায় না। তাহা ছাড়া, যেমন মদের উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে দেশে সম্পদের বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে কল্যাণ বাড়ে কি না সন্দেহ। প্রচুর সম্পদ উৎপাদন হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইলে, আমদানীকারী দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকারী না-ও হইতে পারে। সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া যদি দেশের মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমিয়া উঠিতে থাকে, তবে তাহা সমাজ-দেহের (Social fabric) পক্ষে শুভ কি না অর্থাৎ কল্যাণের বৃদ্ধি করে কি না তাহা চিন্তার বিষয়।

অধ্যাপক পিগু দুই ধরণের কল্যাণের কথা বলিয়াছেন:—অর্থজনিত কল্যাণ (Economic welfare) এবং অর্থব্যতীরকী কল্যাণ (Non-economic welfare)। অর্থবৃদ্ধির দরুণ কল্যাণের যে বৃদ্ধি ঘটে তাহাকে অর্থজনিত কল্যাণ বলা চলে এবং ইহা ব্যতীত অপরাপর ধরণের কল্যাণকে (যেমন দৈহিক বা চারিত্রিক কল্যাণ ইত্যাদি) অর্থ-ব্যতীরকী কল্যাণ বলে। অবশ্য ইহারা পরস্পর অসংশ্লিষ্ট নহে, মোটামুটি ভাবে একের সহিত অন্যের সম্পর্ক আছে। যেমন পিগু বলিয়াছেন যে সাধারণ কল্যাণ নির্ভর করে কিভাবে অর্থ আয় হইতেছে (কত ঘণ্টা খাটিয়া বা কিরূপ পরিবেশে, সৎ কিংবা অসৎ উপায়ে ইত্যাদি) এবং কি ভাবে অর্থ ব্যয় হইতেছে (১০৲ দিয়া এক ব্যক্তি বই কিনিতে পারে বা মদ কিনিতে পারে এবং উভয় ক্ষেত্রে সে একই পরিমাণ উপযোগিতা লাভ করিলেও একটি মঙ্গল বৃদ্ধি কারক, অপরটি মঙ্গল-হ্রাস কারক)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি হইলেও অনেক সময় সামগ্রিকভাবে কল্যাণ বা মঙ্গল কমিয়া যাইতে পারে।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

কিন্তু অধ্যাপক পিগুর অভিমতে এইরূপ ঘটা স্বাভাবিক নহে এবং সচরাচর সম্পদের বৃদ্ধি হইলে মোট কল্যাণ বৃদ্ধিই পায়। কেয়ার্নক্রসের ভাষায় বলা

যায়, ধনবিজ্ঞানীরা এই ধারণা লইয়াই অগ্রসর হইবেন যে, (কোন বিশেষক্ষেত্রে না হইলেও) সাধারণভাবে, সম্পদের বৃদ্ধি মানুষের কল্যাণকারী এবং সম্পদের হ্রাস সামাজিক ভাবে অকল্যাণজনক।

আয় (Income) ঃ

ধনবিজ্ঞানে আয় বলিতে দুইপ্রকার ধারণা প্রচলিত আছে ঃ আর্থিক আয় (Money Income) এবং আসল বা প্রকৃত আয় (Real Income)। শ্রমের পারিশ্রমিক হিসাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে অথবা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাজের পরে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা ব্যক্তির আর্থিক আয়, অর্থের পরিমাণের দ্বারা তাহার হিসাব করা হয় (যেমন ৫০৲, ১০০৲, ৫০০৲ ইত্যাদি)। কিন্তু ক্লাশিকাল ধন-বিজ্ঞানীগণের মতে অর্থ হইল পর্দা মাত্র ; উহার পিছনেই প্রকৃত বা আসল সামাজিক শক্তিগুলির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। সুতরাং তাহারা আয় বলিতে বুঝিতেন পরিশ্রমের ফলে ব্যক্তি কিরূপ দ্রব্যসামগ্রী উপভোগ করিতে পারিতেছে, কিরূপ তৃপ্তি ঘটিতেছে। দ্রব্যের ভোগ, মানসিক স্বস্তি, শান্তি ও সুখ, অভাব-মোচন—দ্রব্য ও কার্য্যাদি উপভোগের দ্বারা এই সকল পাওয়া, ইহাই ব্যক্তির আসল আয় (Real Income)।

আর্থিক আয় ও আসল আয়

এই ভাবে আয়কে ব্যাখ্যা করিলে দেখা যায় যে আর্থিক-আয় হইল কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত কিছু পরিমাণ অর্থ, আর প্রকৃত আয় হইল কিছুটা সময় ব্যাপিয়া ব্যক্তি সেই অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী হইতে কিরূপ ভোগ ও তৃপ্তি লাভ করিল। ভোগ ও তৃপ্তির প্রবহমান অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারা—দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহারের দ্বারা ব্যক্তি যাহা অবিরাম লাভ করে, তাহাকেই আয় বলে।

সম্পদের সহিত আয়ের পার্থক্য করা দরকার। মানুষের অভাব মিটাইবার উপযোগী মজুত করা সুযোগ-সুবিধাকে সম্পদ বলা হয়। কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদ হইতে যে অভাব-মোচন ও পরিতৃপ্তির ধারা অনেকদিন ধরিয়া চলে, তাহা হইল আয়। এই সম্পদ মূলধনরূপে ব্যবহার হইলেই তাহা আয় সৃষ্টি করে।

দ্রব্যকার্য্যাদির প্রবহবান স্রোতধারা

মূলধন ও আয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক নহে। আয়ের সৃষ্টিকারী সম্পদকেই মূলধন বলে (যেমন একটি যন্ত্র হইতে

অধিক দ্রব্যোৎপাদনের ফলে যন্ত্রের মালিকের আয় সৃষ্টি হইতেছে)। আবার সেই আয় সৃষ্টিকারী মূলধনের দাম আয়ের পরিমাণের দ্বারাই হিসাব করা হয়। যেমন, বাজারে সুদের হার বার্ষিক ৫% এবং কোন যন্ত্র হইতে ১০৲ বৎসরে আয় হইতেছে। তাহা হইলে ওই যন্ত্রের দাম হইবে ২০০৲। এইভাবে প্রচলিত সুদের হারের সহিত তুলনা করিয়া আয়কে মূলধনে রূপান্তরিত করা যায়, মূলধনী দ্রব্যের দাম বুঝা যায়। ইহাকে মূলধনীকৃত মূল্য (capitalised value) বলে।

প্রতিযোগিতা—ইহার সুফল ও কুফল (Competition—its merits and demerits)

ধনবিজ্ঞানের আদি যুগে সমাজের অবস্থা ছিল প্রতিযোগিতামূলক। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিপ্রাধান্য এবং ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার দ্বারা অর্থ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের পথ উন্মুক্ত করা শিল্প বিপ্লবের প্রধান সামাজিক ফল। এই যুগ ও পরিবেশ ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের তত্ত্বসমূহকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; তাঁহারা তাহাদের লেখায় এই নূতন পরিবেশের কল্যাণকর দিকের কথা মনে রাখিয়া অবাধ প্রতিযোগিতার জয়গান করিয়াছিলেন। আজিকার দিনে যদিও অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবেশ নাই, তবুও, আংশিকভাবে হইলেও, আমরা এই প্রতিযোগিতার প্রভাব প্রত্যহ আমাদের জীবনে অনুভব করিতে পারি।

প্রতিযোগিতার সুফল

প্রতিযোগিতামূলক সমাজে দ্রব্যের দাম, শ্রমের দাম, মুনাফা বা সুদ ইত্যাদি বংশ-মর্য্যাদা বা চিরাচরিত প্রথার দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না—একের সহিত অপরের কঠিন প্রতিযোগিতার ফলেই নির্ধারিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে যে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম (struggle for existence) অবিরাম চলিতেছে, প্রতিযোগিতা হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহারই নামান্তর।

প্রতিযোগিতার প্রধান সুফল হইল এই যে ইহার ফলে দক্ষতা, নৈপুণ্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। সকল ব্যক্তিই অধিক আয়ের উদ্দেশ্যে সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকে, প্রত্যেকেই নিজের গুণসমূহ বাড়াইবার জন্য সযত্নে চেষ্টা করিতে থাকে। প্রত্যেক উৎপাদক উৎপন্ন দ্রব্যকে আরও উন্নত করিয়া ভোগকারীদের মনোরঞ্জন

ও আকর্ষনের চেষ্টা করে। ইহার ফলে দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক বিক্রেতা নিজের মুনাফা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সর্বাধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি ও যন্ত্রের প্রচলনের দ্বারা ব্যয়-হ্রাসের চেষ্টা করে, উৎপাদন ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করে, উপাদান সমূহকে সর্বশ্রেষ্ঠভাবে নিয়োগ করার দিকে লক্ষ্য রাখে।

এইরূপে ব্যক্তির উন্নতির ফলে সমষ্টির উন্নতি হয়—সমাজের প্রগতি সম্ভবপর হয়। প্রতিযোগিতায় অন্যকে হটাইয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলে, নূতনতর দ্রব্য সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও চিন্তাধারায় সমগ্র সমাজের শিক্ষা ও কৃষ্টি উন্নত হইয়া ওঠে।

প্রাণিজগতে বিবর্ত্তনের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অবিরত এইরূপ জীবন সংগ্রামের ফলে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the Fittest) এবং অযোগ্যের বিলুপ্তি (Elimination of the unfit) ঘটে। ব্যবসা জগতেও সেইরূপ, অযোগ্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ হার মানিয়া উৎপাদন ক্ষেত্র হইয়া সরিয়া যাইতে বাধ্য হয় ; যোগ্য, উপযুক্ত, দক্ষ ব্যবসায়ী বা ফার্ম্ম তাহার ফলে আরও বেশী বাজার লাভ করিয়া যোগ্যতর হইয়া উঠে। প্রাকৃতিক এই নিয়ম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং ইহাই অর্থনৈতিক প্রগতি-ধারার মূলকারণ বা প্রধান চালনাশক্তি বলিয়া গৃহীত হয়।

প্রতিযোগিতার ফলে ক্রেতাদেরও সর্বাধিক সুবিধা হয়। ক্রেতাগণ দরকষাকষির দ্বারা দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। তাহারা দাম দিতে চাহেন বলিয়া উৎপাদকগণ তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের পছন্দ মিটান উৎপাদকদের প্রধান কাজ হইয়া উঠে। প্রতিযোগিতা-মূলকসমাজে তাই ভোগকারীদের সার্বভৌমতা (consumer's sovereignty) বজায় থাকে।

রাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রতিযোগিতা-নিয়ন্ত্রণের কুফল

রাষ্ট্রকর্তৃক আর্থিক কাজকর্ম সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলে প্রতিযোগিতাজনিত সুবিধা পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় শিল্পের পরিচালকদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় উৎপাদন বা বিক্রয় করিতে হয় না বা প্রতিযোগিতার চাবুকে ছুটিতে হয় না বলিয়া তাহাদের মধ্যে অকর্ম্মণ্যতা বৃদ্ধি পায়, দক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা দেখা যায় না, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার

থাকিলে দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধি বা উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে না। দীর্ঘসূত্রতা, অপব্যয়, অযোগ্য পরিচালনা সকল কিছুই প্রতিযোগিতা-হীন সমাজে আসিয়া পড়ে।

অবাধ প্রতিযোগিতার কুফল

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে প্রাণিজগতে যাহাই হউক না কেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এইরূপ অবাধ প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্পূর্ণ শুভ নহে। একে অন্যের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতার দ্বারা দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে বলিয়া তাহাদের বহু অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করিতে হয়, যাহা সমাজের পক্ষে প্রভূত অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে (যেরূপ বিজ্ঞাপন-জনিত অর্থ ও জনশক্তির ব্যয়)।

প্রতিযোগিতার ফলে দুর্বলদের কষ্টের সীমা থাকে না। বিশেষ করিয়া যদি প্রতিযোগীগণ সমান শক্তির অধিকারী না হন, তাহা হইলে অধিকতর সম্পদ বা সম্পত্তির মালিকরা কম বিত্তবান বা শক্তিবানদের উপর সুবিধা পাইবে এবং তাহার ফলে প্রতিযোগিতায় জয়ের সম্ভাবনা তাহাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই বেশী হইবে।

অবাধ প্রতিযোগিতা এইরূপে দুর্বল বা কম শক্তিশালীদের নিশ্চিহ্ন করিয়া সবলের একাধিপত্য বা একচেটিয়া ব্যবসার সৃষ্টি করে। পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ফার্ম দাম কমাইয়া অন্য ফার্মদের লোকসান ঘটাইয়া তাহাদের বাজার হইতে সরাইয়া দেয় এবং নিজে একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপন করে। একচেটিয়া অবস্থায় সমাজে মোট উৎপাদন কম হয়, দাম বেশী হয়, সর্বোন্নত এবং দক্ষতম (optimum) অবস্থায় উৎপাদন না-ও হইতে পারে।

এই সকল দোষের দরুণ বর্তমানে অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানীগণ সম্পূর্ণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা চাহেন না; তাহাদের মতে নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (controlled economy) সর্বোত্তম। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র অবাধ প্রতিযোগিতা-মূলক সমাজের দোষত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, যাহাতে একচেটিয়া ব্যবসা বা শিল্প-সঙ্কটের (Industrial crisis) উদ্ভব না হইতে পারে। অবাধ প্রতিযোগিতার সুফল ভোগ করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা, সম্পত্তির অধিকার এবং মুনাফা লাভকে উচ্ছেদ

নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা

করা হয় না, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক উদ্যোগ ও প্রেরণাকে সমাজের সম্পদ্ বৃদ্ধির অনুকূল হইলে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

অনুশীলনী

1. Define wealth and discuss its relation with welfare.

2. "An increase of wealth will, as a rule, be a real contribution to human welfare, while a decrease will be a real social loss." (Cairncross).—Discuss.

3. Discuss the merits and demerits of competition in Economic Sphere.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ও জাতীয় আয়

জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক রূপ* (A Total picture of National Economy).

সমাজের সামগ্রিক রূপ চোখের সামনে রাখিলে আমরা দেশের মোট অর্থনৈতিক গতিধারার আভাস পাইতে পারি। বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী যেমন সমুদ্রে প্রবাহিত হয় এবং আবার মেঘ হইয়া নূতন বারিধারায় পুষ্ট হইয়া সমুদ্রের সহিত মেশে—মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মও সেইপ্রকার ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি করিযা সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আয় সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত আয় হইতেই সমাজে মোট ভোগ ও চাহিদার সৃষ্টি হয়—পুনরায় উৎপাদন চলিতে থাকে—জাতীয় আয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠে। চক্রের ন্যায় সঞ্চরণশীল, উৎপাদন—আয় সৃষ্টি—ব্যয়—ভোগ ও সঞ্চয়—পুনরুৎপাদন, ইহাই সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রতিচ্ছবি।

সামগ্রিক দৃষ্টি

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি (যাহাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য) কোন না কোন উৎপাদনের উপাদান হিসাবেই সম্পদ উৎপাদনে (দ্রব্যাদি বা কার্য্যাদি) নিযুক্ত আছে। দেশে সকল উৎপাদনের উপাদান বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া বহুপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্য্যাদি (goods & services) উৎপন্ন করে। এই সকল দ্রব্য ও কার্য্য (goods & services) অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় অথবা তাহাদের অর্থ-মূল্য হিসাব করিতে পারা যায়। সেই বিক্রয়-মূল্য হইতে সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত আয়; মোট বিক্রয়-মূল্যই উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদান সমূহের আয় (অর্থাৎ খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা) সৃষ্টি করে। সকল উপাদান সমূহের আয় যোগ করিয়া আমরা জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানিতে

স্রোতধারা

*এই আলোচনায় বহু জটিলতা বাদ দেওয়া হইয়াছে, প্রাথমিক ধরণের আলোচনা মাত্র। বিশেষ আলোচনা 'কর্ম-নিয়োগ তত্ত্ব' পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে।

পারি। এই জাতীয় আয়-ই সমাজের মোট দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় হইয়া যায়* ; ইহা মোট ব্যয়ের সমান।†

মোট ব্যয়ের কিছু অংশ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় ; যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা নূতন মূলধনী দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়। সমাজে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন সুরু হয় ; সমাজের ব্যক্তিবৃন্দ উপাদান হিসাবে বিভিন্ন প্রকার কর্মে নিযুক্ত হইয়া যায়। এই ভাবে অবিরাম ধারায় সমাজে অর্থনৈতিক গতিধারার স্রোত বহিয়া চলে।

ইহাদের সাজাইলে দেখা যায় :

মোট উপাদানের নিয়োগ
|
মোট উৎপাদন (জাতীয় সম্পদ)
|
মোট আয় (জাতীয় আয়)
|
মোট ব্যয়
|
মোট ভোগ | মোট সঞ্চয়
|
ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন | মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন

মোট উপাদানের নিয়োগ

এই ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার গতি ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বোঝা যায়। দেশে উপাদান যদি উপযুক্ত পরিমাণে না থাকে বা তাহারা দক্ষতাবিহীন ও অনুন্নত হয় তাহা হইলে মোট দ্রব্য সামগ্রী বা মোট সম্পদের উৎপাদন কম হইবে। সম্পদ কম উৎপন্ন হইলে উহার বিক্রয়-মূল্যও কম হইবে, লোকের আয়ও কমিয়া যাইবে। ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে ব্যয় কম হইবে, এবং কম সঞ্চয়ের দরুণ মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ও কমিয়া যাইবে। দেশে জীবন যাত্রার মান,

জীবন যাত্রার গতি ও প্রকৃতি

*রাষ্ট্র যাহা কর হিসাবে আয় হইতে তুলিয়া লয়, তাহা ব্যক্তির ব্যয় না হইলেও রাষ্ট্র ব্যয় করে ; সুতরাং সমাজের মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

†দুই দিক হইতে ইহা দেখা যায়। এক ব্যক্তির আয় নিশ্চয় অন্য ব্যক্তির ব্যয়, সুতরাং মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান। মোট আয়ের কিছুটা ভোগ্যদ্রব্যে সরাসরি ব্যয়িত হইবে, কিছুটা সঞ্চিত হইবে। সেই সঞ্চয় মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয় হইবে। অথবা কিছুতেই ব্যয় না হইলে মোট আয় কমাইয়া দিবে, কারণ তাহার ব্যয় না হইলে অন্যের আয় সৃষ্টি হইতে পারিল না।

মোট আয়, মোট ব্যয়, মোট ভোগ-পরিমাণ এবং মোট মূলধন গঠন (capital-formation) সবই কমিয়া যাইবে।

দেশে কর্মনিয়োগের পরিমাণ মোট ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল

আরও জানা যায়, যে মোট ব্যয় যদি বাড়ান হয় তাহা হইলে উপাদান সমূহের অধিক নিয়োগ সম্ভবপর এবং তাহার ফলেই দেশে অধিক আয় সৃষ্টি হইতে পারে। রাষ্ট্র যদি সমাজের মোট ব্যয় বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে উপাদান বেকার থাকিবে না, সমাজে সম্পদ সৃষ্টি বাড়িয়া যাইবে এবং আয়ের স্তরও বৃদ্ধি পাইবে।

দেশের লোকের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে যে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন হয় তাহাই লোকে ভোগ করে বা নূতন দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। মোট উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই ভোগের জন্য দ্রব্যসামগ্রী বা বিনিযোগের জন্য মূলধনী দ্রব্যাদি সকল কিছু বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এইভাবে মোট উৎপাদন বা জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এই সকল কারণে জাতীয় আয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সমাজের কি পরিমাণ উপকরণ কোন অংশে (কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদিতে) কিরূপ ভাবে সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তাহা জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারাই জানা যায়।

জাতীয় আয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণের গুরুত্ব

এই সম্পদ কোন্ কোন্ দ্রব্য লইয়া গঠিত, কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ উৎপন্ন হইল, কোন্ শ্রেণীর হাতে জাতীয় আয়ের কত পরিমাণ চলিয়া যাইতেছে; দেশে ভোগ্যদ্রব্য কোন শ্রেণীর মধ্যে কিরূপে বণ্টিত হইয়া আছে, সব কিছুই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ইহার দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমগ্রভাবে দেখা এবং কি কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (component parts) পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর অর্থনৈতিক কাজকর্ম আপনগতিতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহা বোঝা সম্ভব, দেশের অর্থনৈতিক ব্রহ্মাণ্ডের রূপ পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব। ভাগীরথী যেরূপ মহাদেবের জটা হইতে নামিয়া আবার মহাদেবের জটাতেই ফিরিয়া যায়—মানুষের সকল দৈনন্দিন কাজকর্মের স্রোত-ধারাও জাতীয় আয় হইতে সৃষ্ট হইয়া জাতীয় আয়কেই পুনরায় পুষ্ট করিয়া তোলে।

জাতীয় আয় (National Income)

"কোন দেশের শ্রম ও মূলধন, প্রকৃতির উপকরণ আহরণের দ্বারা এক বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তুজাত দ্রব্য বা বিভিন্ন কার্য্যাদির নীট সমষ্টি (net aggregate) উৎপন্ন করে"—মার্শাল তাহাকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন।

উৎপাদনে নিযুক্ত সকল উপাদান যে পরিমাণ সম্পদ বৎসরের মধ্যে সৃষ্টি করে তাহার নাম মোট জাতীয় আয় (Gross National Income)। এই মোট জাতীয় আয় হইতে সেই সময়ে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইল তাহা পূরণের জন্য কিছু সম্পদ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় আয় (Net National Product) বা জাতীয় বিভাজ্য-আয় (National Dividend)। এই জাতীয় আয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক উপাদানের আয় সৃষ্টি করে। সকল উপাদান এই জাতীয়-বিভাজ্য-আয় হইতে নিজস্ব আয় পায় বলিয়া ইহাকে বিভাজ্য-আয় (Dividend) বলে।

জাতীয় আয়

এই জাতীয়-আয় কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার (fund) নহে, ইহা স্রোতশীল ধারা। প্রতি বৎসর সকল উপাদানের কার্য্যের ফলে এই সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং সকল উপাদানের মধ্যেই তাহা বণ্টিত হয়। উপাদান সমূহের মিলিত কার্য্যফলে উৎপন্ন এই সম্পদ তাহাদের আয়ের উৎসও বটে। এই জাতীয় আয় চারি প্রকার আয়ে বিভক্ত হইয়া (খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা) সমগ্র দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি করে।

মার্শাল এই জাতীয়-আয় বলিতে এক বৎসরে উৎপন্ন সামগ্রী ও কার্য্যাদির পরিমাণকে বুঝিয়াছেন। দ্রব্যসামগ্রী ও কার্য্যাদির এই পরিমাণকে বাস্তব ক্ষেত্রে হিসাব করা এবং তাহার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নহে। দেশের সকল প্রান্তে কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হইল তাহার ঠিকানা নাই। তাহা ছাড়া একই দ্রব্যের বহু প্রকার-ভেদ আছে (যেমন বহুপ্রকারের আম, কুমড়ো, চা, জুতো ইত্যাদি)। ইহাদের একই মানদণ্ডের মাধ্যম ব্যতীত হিসাব করিতে হইলে বিরাট তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। আরও অসুবিধা হয় 'আসল' ধারণা অনুযায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হিসাবের ক্ষেত্রে। ১০০০০ পেন্সিল হইতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কত পেন্সিল বাদ দিয়া রাখিতে

দ্রব্য কার্য্যাদির হিসাবে জাতীয় আয়ের পরিমাপে অসুবিধা

হইবে? আর যাহা বাদ দেওয়া হইল (ধরা যাক্ ২০০টি), তাহা কি ব্যবহৃত হইয়া দেশের সম্পদ ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে না? তাই জাতীয় আয়কে 'আসল' আয় হিসাবে গণনা করার বহু বাস্তব অসুবিধা আছে।

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে পিগু জাতীয় আয়কে হিসাব করিয়াছেন অর্থের মাধ্যমে; বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্য্যাদির অর্থ-মূল্যের মোট পরিমাণ হিসাব করিয়া। এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্য্যাদির দাম যোগ করিয়া মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায় এবং ওই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উহা হইতে বাদ দিয়া তাহাকে নীট জাতীয়-আয় বা জাতীয় আয় বলা হয়।

পিগু: মোট উৎপন্নের অর্থ-মূল্য

কিন্তু এই ভাবে অর্থ-মূল্যের সাহায্যে হিসাব করারও অনেক ত্রুটি আছে। বহু দ্রব্যসামগ্রী আছে যাহা উৎপাদক নিজেই ব্যবহার করে (যেমন চাষী নিজের উৎপন্ন ধান ভোগ করে, বা তাঁতী নিজের উৎপন্ন কাপড় ব্যবহার করে, শিক্ষক নিজের ছেলে মেয়েদের পড়ায়, হোটেলওয়ালা নিজের হোটেলেই খাদ্যাদি গ্রহণ করে)। এই সকল দ্রব্যের মূল্যকে অর্থের হিসাবে পরিমাপ করা চলে না, ইহারা অর্থ-মূল্য সৃষ্টি করে না। এবং ইহাদের বাদ দিলে জাতীয়-আয়ের প্রকৃত পরিমাণ বোঝা যায় না। কোন ব্যক্তি তাহার টাইপিষ্টকে বিবাহ করিয়া যদি তাহাকে আর মাহিনা না দিয়া টাইপের কাজ করাইয়া লয় তাহা হইলে সে কাজের মূল্য সৃষ্টি না হওয়ায়, অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় কমিয়া যায়। এই সকল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পরিমাণগত পরিমাপ করার সুবিধা থাকার দরুণ পিগুর সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অর্থ-মূল্যের হিসাবেই জাতীয় আয়ের পরিমাপ হইয়া থাকে।

অর্থ-মূল্যের হিসাবে ত্রুটি

অর্থমূল্যের সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপের আরও দুইটি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, অর্থের নিজেরই মূল্যে পরিবর্তন হইতে পারে, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণে পরিবর্তন হয়; কিন্তু তাহাতে দেশের সম্পদের পরিবর্তন হয় না। যেমন দাম-স্তর বৃদ্ধি পাইলে (অর্থাৎ অর্থের নিজস্ব মূল্য কমিয়া গেলে) অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু দেশের সম্পদ বাড়িল না। এই

অসুবিধা দূর করিবার জন্য অর্থের নিজস্ব মূল্য স্থির ধরিয়া লইয়া অর্থাৎ দামস্তর স্থির ধরিয়াই জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যকার্য্যাদির অর্থমূল্যে অর্থাৎ দামে কোন পরিবর্তন হইল না অথচ দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধি হইল বা হ্রাস পাইল, তাহা ঘটিতে পারে। ইহার ফলে জীবন যাত্রার মানে বাস্তব পরিবর্তন আসিবে, কিন্তু জাতীয় আয় পরিমাণগত ভাবে সমানই থাকিয়া যায়। যেমন পূর্বের ৪৲ ভিজিটের ডাক্তারের তুলনায় এখনকার একই দামের ডাক্তারের কার্য্য অনেক উন্নত ধরণের।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রাষ্ট্রের কার্য্য কলাপ

জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও দুইটি বিষয় বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, দেশের সম্পদের উপর বিদেশীদের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় আয় হইতে বাদ দেওয়া উচিত। বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় লোকের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করা উচিত। আমদানী রপ্তানী হইতে দেশের পাওনাকে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করা উচিত; অথবা দেনা-কে বিয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র কর ধার্য্য করার ফলে সকল উপাদানের আয় হইতে সেই কর গ্রহণ করা হয়। নীট জাতীয় আয় হইতে করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সকল উপাদানের ব্যয়োপযুক্ত আয়ের সমান। রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপন্নের মধ্যে যোগ করা দরকার। সরকারী কর্ম্মচারীদের মাহিনাকে অবশ্যই মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করা প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন কার্য্যাদির পারিশ্রমিক হিসাবেই সেই আয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income)

একদিকে জাতীয় আয় হইল এক বৎসরে উৎপন্ন সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির মোট দাম; আর একদিকে, সকল উপাদানের আয় সৃষ্টি হইবার উৎস ও ভাণ্ডার। সুতরাং ইহার পরিমাপ দুই ভাবে হইতে পারে। প্রথমতঃ, সেই বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রীর ও কার্য্যাদির দাম যোগ করিয়া; এবং দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের কার্য্যে সহায়তার দরুণ উপাদান সমূহের সকল পাওনা (payments) যোগ করিয়া। এই দুই সমষ্টি স্বভাবতঃই সমান হইবে, কারণ মোট উৎপন্নের দামের সমষ্টি হইতেই সকল উপাদানের আয় সৃষ্টি হয়; মোট

উৎপন্নের দাম সকল উপাদানের পাওনা লইয়াই গঠিত হয়। প্রথমটিকে বলা হয় সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (Final products total); দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Factor-payments total)। প্রথম পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন দ্রব্যকার্য্যাদির (goods & services) দাম যোগ করিয়া এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে, সকল উপাদানের দ্বারা প্রাপ্ত আয় যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ সম্ভব। সংখ্যাতাত্ত্বিকগণ (Statisticians) এই উভয় পদ্ধতিই গ্রহন করেন, কারণ কোন ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে সুবিধা (যেমন শিল্প, কৃষি, খনি ইত্যাদি)। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি সুবিধাজনক (যেমন ওকালতী, ডাক্তারী, শিক্ষকতা ইত্যাদি)।

পরিমাপের দুইটি পদ্ধতি

উৎপাদন-সুমারী পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি: (Census of Production Method or The Final Products Total):

এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্য কার্য্যাদির অর্থ-মূল্য যোগ করিলে আমরা মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) পাইতে পারি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবলমাত্র যোগ দিতে হইবে। যে সকল দ্রব্য অর্ধ-উৎপন্ন অথবা উৎপাদনের মাধ্যমিক স্তরে (intermediate stages) রহিয়াছে, তাহাদের ধরা চলিবে না। যেমন আসবাব-প্রস্তুতকারী যে কাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সে কাঠের দাম যোগ দেওয়া হইবে না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছায় নাই। কিন্তু যদি পুড়িবার জন্য কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সে কাঠের দাম হিসাব করিতে হইবে কারণ তাহা সম্পূর্ণ দ্রব্য (Final Product) হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে। এইভাবে হিসাব করিলে ডবল-গণনার (double counting) হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে আমদানী হয়। রপ্তানী ও আমদানীর মূল্যের পার্থক্য মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময় যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। যদি তুলনায় আমদানী বেশী হয়, তাহা হইলে বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানী বেশী হয়, তাহা হইলে যোগ হইবে।

এই ভাবে মোট জাতীয়-আয় হিসাব করিয়া মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের

জন্য কিছু অর্থ বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ দেশের সকলে মিলিয়া যে সকল ভোগ্যদ্রব্য বা কার্য্যাদি ক্রয় করিয়াছে তাহাদের দাম, গভর্ণমেণ্ট যাহা ক্রয় করিল তাহার দাম এবং নূতন মূলধনী দ্রব্যের দাম, এই সকল যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

আয়-সুমারী পদ্ধতি বা উপাদান-পাওনার সমষ্টি : (Census of Income Method or The Factor Payments Total)

এক বৎসরে, (ক) দেশের সমগ্র মজুরী, মাহিনা ইত্যাদি,

(খ) সকল ফার্ম বা ব্যবসার নীট আয় (মজুরী মাহিনা ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহা অন্যত্র ('ক'-তে) হিসাব করা হইয়াছে),

(গ) সকল ঋণ হইতে নীট সুদ,

(ঘ) সকল নীট খাজনা,

এই সকল বিষয় যোগের দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা চলে।

এই ভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

(ক) হস্তান্তর-পাওনা (Transfer Payments) সমূহ বাদ দিতে হইবে। যেমন, একখণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওনা জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আসিবে না ; কারণ তাহা কোন নূতন আয় নহে, কোন নূতন উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর অর্থ-মূল্য নহে। ভিক্ষুকের আয় বা কোন দান-গ্রহণ গণনার মধ্যে আসে না, কারণ ওইরূপ আয় কোন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ধারায় কার্য্য করিবার দরুণ সৃষ্টি হয় না। কোন দ্রব্যোৎপাদন বা কোন কার্য্যাদির দরুণ যে আয় তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে।

(খ) মালিকের নিজের যে সকল উপাদান (যেমন নিজের বাড়ী, জমি, পরিচালনা ক্ষমতা বা মুলধন) উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজার-দরের হিসাবে অর্থ-মুল্যে রূপান্তরিত করিয়া গণনার মধ্যে আনা প্রয়োজন।

(গ) বিনা দামে যে সকল দ্রব্য বা কার্য্যাদি পাওয়া যাইতেছে (যেমন বাড়ীতে স্ত্রীলোকের কার্য্য বা বাগানের তরী-তরকারী) তাহাদের কোন আয় বা অর্থ-মুল্য সৃষ্টি না হওয়ায় যোগ করা হইবে না।

(ঘ) ফার্মের মোট মুনাফার যে অংশ রিজার্ভফাণ্ডে জমাইয়া রাখা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার-ক্রেতাদের আয় সৃষ্টি করে নাই), তাহাও যোগ দিতে হইবে। কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না গেলেও ওই মূল্য দেশে সৃষ্টি হইয়াছে।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা ঃ (Difficulties in the Measurement of National Income)

জাতীয় আয়ের পরিমাপ সকল দেশেই বহু বাস্তব অসুবিধার মধ্য দিয়া করিতে হয়; বিশেষতঃ অনুন্নত দেশ সমূহে অসুবিধার পরিমাণ বেশী। প্রথমতঃ, যে সকল দ্রব্য বা কার্য্যাদি বিক্রয় হয় না এবং বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে না, তাহাদের ক্ষেত্রে বাজার-দাম কি হইতে পারিত ইহা ধরিয়া লইয়া জাতীয় আয়ে যোগ করিতে হয়। ইহা অসুবিধাজনক তো বটেই, হিসাবও নির্ভুল না হইবার সম্ভাবনা। অনুন্নত দেশসমূহে সমাজের উৎপন্নের একটি বৃহৎ অংশ উৎপাদকগণ নিজেরা ব্যবহার করে। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের প্রচলন কম; দ্রব্য বিনিময় (Barter) চালু আছে। এই সকল দেশে অর্থের হিসাবে জাতীয়-আয় পরিমাপের বিশেষ অসুবিধা। দ্বিতীয়তঃ, এক-মালিকানা ব্যবসা অধিক চালু থাকায় এবং অনুন্নত দেশে সাধারণভাবে ব্যবসার হিসাবপত্র বৈজ্ঞানিক ভাবে না রাখায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং দাম সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার সুবিধা কম। তৃতীয়তঃ, এই সকল দেশে উপাদান সমূহের বিশেষত্বতা অধিক প্রসার লাভ করে নাই। যেমন একই ব্যক্তি চাষ করিযা, মাছ ধরিয়া, বস্ত্রাদি উৎপাদন করিয়া এবং দোকান চালাইয়া আয় করে। জাতীয়-আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (Classification of sectors), অর্থাৎ কোন ক্ষেত্র হইতে কি আয় হইল তাহা স্পষ্ট ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার উপায় থাকে না।

অনুন্নত দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, পরিমাপের বাস্তব অসুবিধা

কি বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে ঃ (Factors determining the size of the National Income)

জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে দেশের নীট উৎপাদন এবং বিদেশ হইতে নীট আয়ের উপর। এই দুইটি বিষয় লইয়াই জাতীয় আয় গঠিত।

প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্থির ধরিয়া লইলে দেশের নীট উৎপাদন

নির্ভর করে কর্মনিয়োগের পরিমাণ এবং শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার উপর। দেশে কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কার্য্যকরী চাহিদার (Effective Demand) উপর। কার্য্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিক দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অধিক শ্রমিক নিয়োগ হইবে।

অনুন্নত দেশে জীবনযাত্রা ও আয়ের স্তর এত নিম্নে যে কার্য্যকরী চাহিদা কম ; তাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে প্রধানতঃ শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের পরিমাণের উপর। শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা তত বাড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং মূলধন ও তাহার নিয়োগের পরিমাণের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করিবে। বিদেশ হইতে নীট আয় নির্ভর করে—দেশ কত কম আমদানী করিয়া চালাইতে পারে এবং কত বেশী রপ্তানী করিতে পারে তাহার উপর। এই সকল বিষয়ের উপর জাতীয়-আয়ের আয়তন নির্ভব করে।

কার্য্যকরী চাহিদা, মূলধন নিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য

মূলধন সঠিক বজায় রাখা (Maintaining Capital Intact)

উৎপাদন ধারায় মূলধনী দ্রব্য নিয়োগের ফলে তাহাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হইল তাহা পূরণ করিয়া মূলধনের মূল্য পূর্ব্বের অবস্থায় বজায় রাখা—ইহাকে মূলধন সঠিক রাখা বা মুলধন বজায় রাখা বলে।

যদি একটি যন্ত্রের দাম ৫০০৲ টাকা হয় এবং ওই যন্ত্রটির আয়ু ১০ বৎসর ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে প্রতি বৎসর উহার ১০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ৫০৲ ক্ষয় হইতেছে ধরিয়া লওয়া যায়। ওই যন্ত্রদ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে এই পরিমাণ অর্থ প্রতি বৎসর সরাইয়া রাখিলে ১০ বৎসর পরে ওই যন্ত্রটী সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলেও নূতন যন্ত্র ক্রয় করিবার অর্থ সঞ্চিত হইবে, উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকিবে। যন্ত্রের এই ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত পূরণ না হইলে ১০ বছর পর যন্ত্র সচল থাকিবে না এবং ইহার ফলে ফার্মের আয় কমিয়া যাইবে।

ক্ষতিপূরণ কিভাবে পবিমাপ করে

'মূলধন বজায় রাখা'র এই তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিতভাবে পূরণ হইলে দেশে মূলধন বজায় থাকিবে। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ, একই

থাকিলে অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির (Economic growth) সম্ভাবনা থাকে না, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো একই স্তরে আবর্ত্তন করিতে থাকে। সুতরাং

মূলধন-গঠন ও অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধি

মোট জাতীয় আয় হইতে শুধু ক্ষয়ক্ষতি পুরণের জন্যই নহে, দেশে আরও মূলধন এবং আরও যন্ত্রপাতি প্রসারের জন্য, আরও অধিক অর্থ প্রতিবৎসর সঞ্চিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি বৎসর জাতীয় আয় হইতে আগের বৎসরের তুলনায় অধিকতর অর্থ মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে সরাইয়া লইলে দেশে ক্রমশঃ অধিক হারে মূলধন-গঠন সম্ভব হয় এবং ক্রমেই সেই মূলধন প্রয়োগের দ্বারা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ান যায়।

জাতীয়-আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য্য ঃ সামাজিক হিসাব গ্রহণ—
(Significance of National Income analysis : Social Accounting) :

জাতীয় সম্পদ ও আয় সম্বন্ধে এমন ভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয় এবং শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যে তাহা হইতেই আমরা জাতীয় আয়ের গঠনকারী বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (Component parts) বুঝিতে পারি। যেমন ব্যবসাদি হইতে কি পরিমাণ মুনাফা, চাকুরী ইত্যাদি হইতে কি পরিমাণ মাহিনা, ঋণ প্রদান হইতে কি পরিমাণ সুদ, এবং পরিশ্রমের দরুণ কি পরিমাণ মজুরী দেশের লোকে পাইতেছে—এই সকল আমরা জানিতে পারি জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের সাহায্যে। জাতির অর্থনৈতিক কাঠামো, ইহার সামগ্রিক রূপ, এক অংশের সহিত অপর অংশের সম্পর্ক, ইহার গতিপ্রকৃতি, সকল কিছু আমরা জাতীয়-আয় গঠনকারী অংশ সমূহের বিভাগ হইতে বুঝিতে পারি। আয় ব্যয়ের ধরণ (Pattern of Income and Expenditure), জাতীয় উৎপাদনের কোন্ অংশে কি পরিমাণ মূলধন নিযুক্ত, কোন্ অংশে শ্রমিক দক্ষতা কিরূপ, কোন্ অংশ হইতে মূলধন সরাইয়া আনিয়া কোন্ অংশে নিয়োগ করা দরকার—সবই এই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে জানিতে পারা যায়। কতটুকু আয় সরাইয়া লইলে (কর, ঋণ, ইত্যাদির সাহায্যে) মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়, তাহাও জানা যায়। জাতীয় আয়ের উঠানামা (Fluctuations in National Income) রোধ করিতে হইলেও এই সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দেশের উপকরণ সমূহের সর্বাধিক সুষ্ঠ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার

ব্যাপারেও জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা সঞ্চয়ের ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনুমান করা চলে। এক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত অপর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা মূলক বিচারে জাতীয় আয়ের ধারণা খুবই সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। একটি দেশের জাতীয় আয়ের উঠা নামা, অপর দেশের জাতীয় আয়কে কিরূপে প্রভাবান্বিত করে, তাহার পর্য্যালোচনা জাতীয় স্বার্থে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন দেশের অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধি ও প্রগতির হার (Rate of Economic Growth or Progress) পরিমাপ করার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্য্যকরী। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় জাতীয় আয় বিশ্লেষণ, তাই, কেন্দ্রীয়স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

অনুশীলনী

1. Discuss the circular flow of a National Economy.

Or, Give a Total picture of the National Economy.

2. Define National Income and discuss how to measure it. (B. A. 56)

3. What precautions should be taken in computing the National Income of a Country ?

4. Discuss the need and importance of National Income Calculation or Social Accounting.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উৎপাদন ও উপাদান

উৎপাদন (Production)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের, প্রধানতঃ অ্যাডাম স্মিথের মতে, উৎপাদন হইল পদার্থমূলক দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করা, বা পদার্থগত দ্রব্য সৃষ্টি করা (Creation of Material goods)। উৎপাদনের এই সংজ্ঞা আধুনিক কালে আর গ্রহণ করা হয় না, কারণ এযুগের ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা যে মানুষ পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে না; সে বস্তুকে বা পদার্থকে তাহার নিজস্ব অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা, মানুষের অভাব মিটাইবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী করিয়া রূপান্তরিত করে মাত্র। আজকাল, তাই, মানুষের অভাব মেটান-র ক্ষমতার সৃষ্টি বা উপযোগিতা সৃষ্টির কাজ-কে উৎপাদন বলা হয়।*

উপযোগিতা সৃষ্টি

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী শুধু পদার্থগত দ্রব্য বা বস্তুজাত দ্রব্য উৎপাদন করে এইরূপ শ্রমকে উৎপাদক শ্রম (Productive Labour) বলা হইত; সমাজের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কার্য্যাদি (Services) অনুৎপাদক শ্রম বলিয়া গণ্য হইত। আজকাল যে শ্রম উপযোগিতা উৎপাদন করে তাহাকেই উৎপাদক শ্রম বলা হয় এবং উপযোগিতা সৃষ্টি করিতে না পারিলে তাহাকে অনুৎপাদক (Unproductive) শ্রম বলে।

আধুনিক কালের অনেক ধনবিজ্ঞানী (যেমন কেয়ার্ণক্রস্) উৎপাদনের এই সংজ্ঞাকে আরও সঙ্কীর্ণ করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে, "বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য তৈরী করা বা অর্থের বিনিময়ে কাজ করা"-কেই একমাত্র উৎপাদন বলা যাইতে পারে।†"

* উৎপাদন শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার অর্থ হইল উপর দিকে বাড়িয়া ওঠা—শস্যাদির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফিজিয়োক্রাটগণের ন্যায় প্রাচীন ভারতে সম্পদ্-সৃষ্টি সম্বন্ধে এই-রূপ ধারণা ছিল। কিন্তু এখানে শুধু শস্যের ক্ষেত্রে নহে, ইহার প্রচলিত অর্থে সকল দ্রব্য সামগ্রী সৃষ্টির কাজকে উৎপাদন বলা হইবে।

† Production is the making of goods for sale or the rendering of paid services.

সমাজে প্রচলিত অর্থের (Money) দ্বারা যে সব কাজের হিসাব লওয়া সম্ভব নয় অথবা যে সকল কাজের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য সমাজের বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে না, তাহাকে উৎপাদন বলা সম্ভব হয় না। চাষীর নিজের ব্যবহারের জন্য ধান উৎপাদন, শিক্ষক কর্তৃক নিজের পুত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষা দান, নিজের ব্যবহারের জন্য তাঁতীর বস্ত্র বয়ন—এই ধরনের কাজকে আজকাল ধনবিজ্ঞানে উৎপাদন বলে না, (জাতীয় আয় পরিমাপের সময়েও তাহা গণনায় আসে না)। কারণ সমাজের বিস্তৃত বিনিময় কাঠামোর মধ্যে ইহারা সরাসরি প্রবেশ করে না এবং অর্থের হিসাবে ইহাদের আনা চলে না।

দ্রব্য-কার্য্যাদির আর্থিক মূল্য সৃষ্টি করা

উৎপাদনের উপাদান (Factors of Production)

যে সকল দ্রব্যসামগ্রী বা কার্য্যাদি উৎপাদন ধারায় ব্যবহৃত হয়, ধনবিজ্ঞানীরা তাহাদের চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীকে এক একটি উপাদান বলিয়া থাকেন। সাধারণভাবে চলিত প্রথা অনুযায়ী, উৎপাদনে ব্যবহৃত দ্রব্য ও কার্য্যাদিকে জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন, এই চার উপাদানে বিভক্ত করা হইয়াছে।

উৎপাদন ধারায় ব্যবহৃত, প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত সকল কিছুকে জমি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; যেমন, ভূপৃষ্ঠ, উর্ব্বরতা, বাতাস ও জলের গুণ, খনিজ দ্রব্যাদি ইত্যাদি। শ্রম বলিতে বোঝা যায় মানুষের সকল প্রকার পরিশ্রম, শারীরিক বা মানসিক, যাহা অর্থের বিনিময়ে করা হয়। জমি ও শ্রম—ইহারাই আদি উপাদান, ইহাদের হইতে প্রাপ্ত তৃতীয় উপাদান হইল মূলধন। মানুষের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া যে সকল দ্রব্যসমূহ প্রত্যক্ষভাবে ভোগ-কার্য্যে ব্যবহৃত না হইয়া উৎপাদন-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাকে মূলধন বলা হয়, যেমন যন্ত্রপাতি, কল-কব্জা, আধা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী, যাহা অতীত কালের জমি ও শ্রমের মিলিত ফল হিসাবে বাস্তবরূপ পরিগ্রহণ করিয়া রহিয়াছে (physical embodiment of past land and past labour)। জমি, শ্রম ও মূলধনকে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে একত্রিত করিয়া, উহাদের দৈনন্দিন পরিচালনা করিয়া ব্যবসার ঝুঁকি বহন করার যে বিশেষ ধরণের কাজকর্ম্ম, তাহাকে সংগঠন বলে।

যাহারা আর্থিক মূল্য সৃষ্টিতে নিযুক্ত হয়, তাহারাই উপাদান

বিভিন্ন উপাদানের উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ কিন্তু বাস্তবজগতে উৎপাদক উপাদান সমূহের সম্মিলনের জটিল প্রকৃতি প্রকৃতভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। কোন একটি উপাদানের সমস্ত ইউনিট এক ধরণের হয় না, ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব-সমতা নাই। ইউনিটগুলির কাজের মধ্যে গুণগত পার্থক্যও দেখা যায়। যেরূপ, যে জমিতে ধান উৎপাদন হয়, যে জমির উপর গৃহ-নির্মাণ হয় এবং যে জমি হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয় ইহারা সকলে ঠিক একই ধরণের কাজ করে না; উৎপাদন ধারায় সাহায্য করিবার প্রকৃতি ও পরিমাণে পার্থক্য আছে। সকল চাষের জমির উর্বরতা শক্তি যেমন সমান নহে, সকল খনিজ দ্রব্য বহনকারী জমির সম্পদ-সম্ভারও সমান নয়। শ্রমের ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক শ্রমে পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও, দক্ষতার পার্থক্যের দরুণ সকল শ্রমিককে এক শ্রেণীভুক্ত করা বিজ্ঞান সম্মত বলা চলে না।

এক উপাদানের সকল ইউনিট উৎপাদন ধারায় সমান কাজ করে না

বিভিন্ন উপাদানের মধ্যেও গুণগত পার্থক্য খুব গভীর নহে। যেমন, যোগানের সীমাবদ্ধতা ভূমির একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু স্বল্পকালীন হিসাবে বহু যন্ত্রপাতির যোগান-ও সীমাবদ্ধ। যেরূপ, সময় পাইলে মূলধনের যোগান বাড়ান যায় সেরূপ কৃত্রিম উপায়ে ভূমির যোগানও কিছুটা বাড়ান সম্ভবপর। ভূমি ও মূলধনের পার্থক্যকে তাই মৌলিক বলা চলে না। মূলধন ও শ্রমের পার্থক্যও মৌলিক নয়, কারণ মূলধন হইল অতীত শ্রমেরই ফল—'জমাট বাঁধা শ্রম' (congealed labour)। যেহেতু মূলধন শ্রমেরই ফল, তাই ইহাকে সম্পূর্ণ পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়।

পারস্পরিক পার্থক্য বেশী নহে

সংগঠন একটি বিশেষ ধরণের শ্রম মাত্র। প্রত্যেক শ্রমিকের মধ্যে দক্ষতা, বুদ্ধি ও সংগঠন ক্ষমতা আছে এবং দৈনন্দিন উৎপাদন ধারায় তাহার প্রয়োগও করিতে হয়। উৎপাদন ধারার ঝুঁকি কিছুটা শ্রমিকও বহন করে, তাহাকে বেকার হওয়ার বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহন করিতে হয়।

সুতরাং আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সর্বশেষ বিশ্লেষণে শুধু দুইটি উপাদানকেই আদি উপাদান বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব: প্রকৃতি ও মানুষ, একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করিয়া উৎপাদন কার্য্য চালাইতেছে, কারণ মূলধন

হইল শ্রম ও প্রকৃতির মিলিত ফল এবং সংগঠন একটি বিশেষ ধরণের শ্রম মাত্র।

ইহা সত্ত্বেও আলোচনার সুবিধার জন্য উপাদান সমূহকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়। এই শ্রেণী বিভাগের আরও বিশেষ প্রয়োজন, কারণ, প্রত্যেক উপাদানের পারিশ্রমিক নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং তাহাদের প্রকৃতি কিছুটা পৃথক।

উৎপাদন ও ফার্মের প্রকৃতি (Production and Nature of a Firm)

জমি, শ্রম ও মূলধনকে কোন না কোন রূপে একসঙ্গে সংযুক্ত করিয়া উৎপাদন সম্ভব হয়, উৎপন্ন দ্রব্য তাই প্রকৃতপক্ষে তিনটি উপাদানের মিলিত ফল। জমি শ্রম ও মূলধনকে একত্র করিয়া উৎপাদন কার্য্য চালান-র কাজ কোন ব্যবসায়ী একা বা কয়েকজন মিলিত হইয়া করিয়া থাকেন, সংগঠনের এই কাজ যে করে ধনবিজ্ঞানে তাহার নাম হইল ফার্ম। এই ফার্মই আজকাল সকল উৎপাদন সংগঠন পরিচালনা করে, ফার্মের আয়তন বা মাত্রা বৃদ্ধি বলিলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বোঝা যায়। জমি, শ্রম ও মূলধনের চাহিদা এই ফার্ম হইতেই সৃষ্টি হয়, ফার্মই উপাদান সমূহের সম্মিলন করায়, উৎপাদনের ব্যয় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দামের মধ্যে সমতা সাধনের চেষ্টা করে। সুতরাং ফার্মের গঠন, আকৃতি এবং কাজকর্ম সমাজের উৎপাদনকে প্রভাবান্বিত করে। সমাজে উৎপাদন কার্য্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা জুড়িয়া রহিয়াছে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন আকৃতির ফার্ম। কোন ফার্ম অতিক্ষুদ্র যেমন কৃষিকার্য্য বা মুদির দোকান; কোন ফার্ম অতি বৃহৎ, যেমন টাটা আয়রণ ওয়ার্কস্। ইহাদের মধ্যে পরিচালনা যোগ্যতার পার্থক্য থাকিতে পারে, সহায় সম্পদ ও শক্তির তারতম্য থাকে,

ফার্ম কি ?

কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য হইল উৎপাদন এবং লক্ষ্য হইল মুনাফা করা। ইউনিট প্রতি উৎপাদনের ব্যয় কমাইয়া অথবা বাজারের দামকে প্রভাবান্বিত করিয়া সর্বোচ্চ পরিমাণে মুনাফা আদায় করা ইহাদের সাধারণ লক্ষ্য। সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ইহারা আকৃতি ও উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্ত্তন সাধন করে এবং সাম্যাবস্থায় পৌঁছিতে চেষ্টা করে, যে অবস্থায় পরিবর্ত্তনের দিকে আর ঝোঁক থাকে না। কোন শিল্পে বহু ফার্ম, কোথাও বা কয়েকটি ফার্ম এবং অন্য কোনশিল্পে শুধু একটি মাত্র ফার্ম থাকিতে পারে।* বাজারে দ্রব্যের চাহিদা এবং শিল্পের অন্তর্গত ফার্ম সমূহের

* পরে দেখা যাইবে, ইহাদের পূর্ণ প্রতিযোগিতা, অলিগোপলি ও একচেটিয়া বলে

পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া এই ফার্ম উপাদানের চাহিদা করে, উৎপাদনের পরিমাণ ও দ্রব্যের দাম নির্দ্ধারণের চেষ্টা করে।

একটি শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মই যে ঠিক একই দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা নহে ; প্রত্যেকেরই কিছুটা নিজস্বতা থাকে (পরিচালনার ব্যাপারে, উৎপাদন পদ্ধতি অথবা কাঁচামালের ব্যাপারে)। এই নিজস্বতা প্রত্যেকের দ্রব্যটিকেই একটু পৃথক ও বিশেষ ধরণের করিয়া রাখে। কখনও এই পার্থক্য খুবই কম, কিন্তু ক্রমেই বিভিন্ন ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এই পৃথকীকরণ বাড়িয়া চলিতেছে, যাহার ফলে একটি ফার্মের সহিত অন্য ফার্মের প্রতিযোগিতা আর প্রত্যক্ষ ও সরাসরি হয় না ; প্রত্যেক ফার্মের উৎপাদনই একটি পৃথক দ্রব্যের রূপ গ্রহণ করিতেছে, এক একটি ফার্মই যেন ক্রমে এক একটি শিল্পে পরিণত হইতেছে। (যেমন সাবান শিল্পে, লাক্স, হামাম, এবং মার্গো সাবান ক্রমেই পৃথক দ্রব্যে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করিতেছে)।

একটি ফার্ম ঠিক কি ভাবে বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলন করিবে তাহা নির্ভর করে কিছুটা যন্ত্র সম্পর্কীয় (technical) এবং কিছুটা অর্থনৈতিক (economic) বিচার বিবেচনার উপর। ঠিক কি পদ্ধতিতে উৎপাদন সমূহের সম্মিলন হইবে তাহা প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন কৌশলের দ্বারা নির্দ্ধারিত ; কিন্তু সেই পদ্ধতি স্থির হইয়া গেলে কোন্ উপাদান কতখানি ব্যবহার করা হইবে তাহা অর্থনৈতিক বিচারের দ্বারা স্থির করার চেষ্টা হয় ; যে উপাদানের দাম কম, তাহা অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া বেশী দামী উপাদান কম প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়, যাহাতে সর্বাপেক্ষা অধিক মুনাফা লাভ হইতে পারে।

উপাদান-সম্মিলন

ফার্মের তত্ত্ব (Theory of the Firm) ঃ

ধনবিজ্ঞানে ফার্মের তত্ত্ব আলোচনায় ধরিয়া লওয়া হয় যে ইহা সর্বদা সর্বোচ্চ মুনাফা পাইবার চেষ্টা করিতেছে। কোন ভোগ-কারী ব্যক্তি সর্বদাই সর্বোচ্চ তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে—একমাত্র ইহা স্বীকার করিয়াই তাহার কার্য্যের বিশ্লেষণ করা সম্ভব। সেইরূপ ফার্মগুলিও সর্বোচ্চ মুনাফালাভের চেষ্টা করে, উহাই তাহাদের কাজের পিছনে প্রেরণা ও পরিচালনা-শক্তি—ইহা না ধরিয়া লইলে উৎপাদনের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বহু কারণে কোন ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফা না চাহিতেও পারে অথবা লাভ না করিতেও পারে। পাঁচটি কারণের দ্বারা ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের ইচ্ছা বা ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রথমতঃ, কোন ব্যবসায়ী হয়ত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতে চায়, সবচেয়ে বেশী মুনাফা চায় না। কেহ হয়ত বেশী ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিলে বা বেশী বিক্রয় করিতে পারিলেই সুখী; মুনাফা-সর্বোচ্চ হইল কিনা তাহা দেখে না। কোন ব্যবসায়ী আলস্য বা উদাসীনতার দরুণ তাহার পরিচালন-যোগ্যতার পূর্ণ ব্যবহার করে না। তাই ব্যবসায়ীদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী কম গুরুত্বের বিষয় নহে, অনেকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ প্রধান প্রেরণার বিষয় নয়।

পাঁচটি কারণে ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফালাভের ইচ্ছা বা ক্ষমতা না-ও থাকিতে পারে

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের প্রচলিত আইন কানুন, প্রথা ও রীতিনীতির বাধা-নিষেধ মানিয়া ফার্মকে ব্যবসা করিতে হয় বলিয়া অনেক সময় সে সর্বোচ্চ মুনাফা আয় করিতে পারে না। যেমন, শ্রমিকদের প্রতি সপ্তাহে কাজের ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট আছে, ছুটির দিন স্থির করা আছে। শ্রমিকসংঘ, মালিকসংঘ এবং রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বাধা নিষেধ মানিয়া ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরে উৎপাদন করিতে পারে না—এইরূপ অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, সর্বোচ্চ স্তরে মুনাফা পাইতে হইলে যে পরিমাণ উৎপাদন করা দরকার, যন্ত্রপাতির প্রকৃতি-ই এইরূপ যে সেই পরিমাণ উৎপাদন করা চলে না—অনেক সময় এই রকম বাধা থাকে। যেমন কোন ফার্মে আরও ২০০০ গজ কাপড় উৎপাদন করা দরকার, বিক্রয়ের বাজার আছে, মুনাফাও বাড়িবে। কিন্তু ঠিক ওই পরিমাণ উৎপাদন বাড়াইবার উপযোগী যন্ত্র নাই; এমন আয়তনের যন্ত্র বাজারে পাওয়া যায় যে তাহাতে উৎপাদন ২০০০ গজের বেশী হয় (এমন অবস্থায় যন্ত্রের শক্তি অব্যবহৃত থাকিবে) অথবা ২০০০ গজের কম হয়। কোন অবস্থাতেই সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করা সম্ভব হইল না। অথবা ঠিক ওই আয়তনের যন্ত্র প্রস্তুত করিতে কিছুটা সময় লাগিতে পারে, স্বল্পকালে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ না-ও হইতে পারে। দীর্ঘকালে দ্রব্যের চাহিদা পরিবর্তন হইল, তাই তখনও তাহা সম্ভবপর হইল না এইরূপ ঘটিতে পারে।

চতুর্থতঃ, বাস্তবক্ষেত্রে, ফার্ম জানে না যে তাহার দ্রব্যের চাহিদা ভবিষ্যতে

কি থাকিবে তাহা জানিতে পারিলে মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে ওঠান সম্ভব হইত। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও অজ্ঞানতার দরুণ ইহা সম্ভব হয় না।

পঞ্চমতঃ, স্বল্পকালীন স্বার্থ ও দীর্ঘকালীন স্বার্থে বিরোধ থাকে। যেমন স্বল্পকালে অতিরিক্ত দাম বাড়াইয়া মুনাফা বাড়াইলে ভবিষ্যতে ফার্মের বদনাম হইবার ভয় থাকে। ভবিষ্যতের মুনাফা কমিবে, তাই, অনেকে সুদূর ভবিষ্যতে মুনাফা করার বা ব্যবসাতে টিঁকিয়া থাকার আশায় স্বল্পকালে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের চেষ্টা করে না। এই সূত্রে অধ্যাপক হিক্স্ দুই ধরণের ফার্মের কথা বলিয়াছেন ঃ যে কোন মতে ব্যবসাতে লাগিয়া থাকে (sticker) এবং যে ছিনাইয়া লইতে চাহে (snatcher)।

ধনবিজ্ঞানে ধরিয়া লওয়া হয় যে ফার্মগুলি এই সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকিয়াই সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ কর্ম চালায় এবং যতটা সম্ভব এই সকল বাধানিষেধ ও সীমাবদ্ধতা দূর করার চেষ্টা করে।

উৎপাদনের গুরুত্ব ও আদর্শ-স্থানীয় উৎপাদন-পরিমাণ (Importance of Production and ideal output) ঃ

দেশের সকল উপাদান যদি যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত না থাকে তাহা হইলে দেশের উৎপাদন কম হইবে। জাতীয় আয় কমিয়া যাইবে, অধিবাসীদের মাথা পিছু আয়ও কমিবে। তাহারা কম দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করিতে পারিবে এবং জীবন যাত্রার মান যথোপযুক্ত পরিমাণে উন্নত থাকিবে না।

উৎপাদনের পরিমাণ সর্বোচ্চ হইতে পারে যদি, প্রথমতঃ, দেশের সর্বদাই পূর্ণ কর্মনিয়োগ (full employment) বর্তমান থাকে। লোকজন যদি বেকার থাকে, বা দেশের উপাদান যদি অলস ও অব্যবহৃত থাকে তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ সর্বোচ্চস্তর হইতে কম হইবে; কিছুতেই দেশ আদর্শ-স্থানীয় উৎপাদন-পরিমাণের (ideal output) স্তরে পৌঁছিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন শাখার কোন অংশে বেশী উপাদান এবং কোন অংশে কম উপাদান ব্যবহৃত হইতে থাকিলে মোট উৎপাদন কিছুতেই আদর্শ-স্থানীয় হইবে না, উহা অপেক্ষা কম হইবে। সুতরাং দেখিতে

আদর্শ স্থানীয় উৎপাদন, পূর্ণ কর্মনিয়োগ, উপাদানের সুসম নিয়োগ, এবং সর্বোত্তম উৎপাদন কৌশলের প্রয়োগ।

হইবে, যাহাতে বিভিন্ন শিল্পে উপাদানের সামঞ্জস্য-হীন নিয়োগ না হইতে পারে। বিভিন্ন শিল্পে উপাদানের বণ্টন ও নিয়োগ সুসম হইলে অপব্যয় কম হইবে। তৃতীয়তঃ, আদর্শ-স্তরে উৎপাদন তখনই সম্ভবপর হইবে যদি সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরণের উৎপাদন কৌশল ও পদ্ধতির প্রয়োগ হয়। যদি কোন কারণে (যেমন ভারতে কর্ম নিয়োগ বাড়াইবার জন্য বহু শিল্পে উন্নত ধরণের যন্ত্র-পাতির প্রয়োগ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন্ধ রাখা হইতেছে) যন্ত্রপাতির সর্বোন্নতধরণ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা না হয়; তবে সর্বোত্তম ও কাম্য (optimum) উৎপাদন-পরিমাণে পৌছান সম্ভবপর হইবে না।

উৎপাদন-সূত্র ও তাহাতে রদবদল

(Production Function and its variation) ঃ

উৎপাদন ধারায় উপাদান সমূহের যে সম্মিলন (combination of factors) থাকে তাহাকে অনেক সময় উৎপাদন-সূত্র (production formula) বা উৎপাদন-কারণ (production-function) বলা হয়। যেমন ১০টি দ্রব্য উৎপাদন করিতে একাধিক উৎপাদন সূত্র থাকিতে পারে। যদি ক, খ ও গ এই তিনটি উপাদান আমরা ধরিয়া লই তাহা হইলে ৩ক+১খ+২গ অথবা ১ক+৩খ+১গ এই উভয় সূত্র দ্বারাই ১০টি দ্রব্য উৎপাদন করা চলে; এইরূপ প্রত্যেক উপাদান সম্মিলনকে এক একটি উৎপাদন-সূত্র বলা চলে। উপাদান-সম্মিলনে কোন উপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া বা কোনটা কমাইয়া উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন করা হয়। আজকাল বহু প্রকার জটিল যন্ত্র প্রচলনের ফলে উৎপাদন-এন্‌জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের এরূপ উন্নতি হইয়াছে যে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে সঠিক কোন সূত্রটি প্রযোজ্য তাহা মোটামুটি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ফার্মগুলির উপাদানের রদবদলের স্বাধীনতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। তবুও উপাদান-সম্মিলনের কিছুটা রদবদল করিয়া উৎপাদনের পরিমান পরিবর্তন করা প্রায় সকল শিল্পেই কিছু পরিমাণ এখনও সম্ভব।

উৎপাদন-সূত্র ও উপাদান-সমূহের আনুপাতিক পরিবর্তন

যদি একটি উপাদানকে স্থির রাখিয়া অপর সকল উপাদান সমূহের প্রয়োগ বাড়ান যায়, তবে একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরের পরে উৎপাদনের বৃদ্ধির হার

ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে। ইহাকে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম বলা হয় (Law of Diminishing Returns)।

যদি নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে সকল উপাদানকেই একই সঙ্গে বাড়ান হয় তবে উপাদান বৃদ্ধির হার অপেক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধির হার অধিক হইতে পারে। ইহাকে বলা হয় ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Increasing Returns)।

যদি একটি নির্দ্দিষ্ট হারে উপাদান সমূহ বৃদ্ধি হইলে উৎপাদনও একই হারে বাড়িতে থাকে, তবে তাহাকে বলা হয় সমহার-প্রতিদানের নিয়ম (Law of Constant Returns)।

উৎপাদনের পরিমাণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সাধারণ বিষয় সমূহ (General factors infiuencing the volume of production)

দেশে সকল প্রকার দ্রব্য ও কার্য্যাদির মোট উৎপাদনের পরিমাণ বহু প্রকার বিষয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

প্রথমতঃ, দেশের উপকরণের যোগান-এর উপর মোট উৎপাদন নির্ভর করে। জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ, দেশের জন সংখ্যা ও তাহাদের কাজ করিবার শক্তি, মূলধনের পরিমাণ—এই সকল বিষয় মোট উৎপাদন-এর পরিমাণ স্থির করে।

দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, কৃষি ও শিল্পে উহার সার্থক প্রয়োগ, উৎপাদন কৌশলের (Technique of production) উন্নতি, শ্রমিকদের মধ্যে কারিগরী জ্ঞানের স্তর, ইহারা মোট উৎপাদনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

তৃতীয়তঃ, দেশের যান বাহন ব্যবস্থা, ঋণ ব্যবস্থার সুবিধা ও প্রসার, ব্যাঙ্ক ও বীমার প্রসার ইত্যাদি উৎপাদনের পরিমাণকে প্রভাবান্বিত করে।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের মনোভাব ও সাহায্যের উপর দেশের কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতি ও উৎপাদনের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে। কর ব্যবস্থা, শিল্পে ঋণ পাইবার ব্যবস্থা, শ্রমিক ও ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত আইন কানুন উৎপাদনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যেমন অনেক দেশে পরিকল্পনার সাহায্যে রাষ্ট্র উৎপাদনের গতি ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিতেছে।

পঞ্চমতঃ, প্রাকৃতিক কারণ সমূহকেও অগ্রাহ্য করা চলে না। দেশের জলবায়ু, আবহাওয়া, জমি, পর্বত, নদী ও সমুদ্রের তীররেখা (coastal line) প্রভৃতি সাধারণ ভাবে দেশের উৎপাদনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকম্প, ঝড়ঝঞ্ঝার ফলে উৎপাদন কমে, দেশে পর্য্যাপ্ত ও সুসম বৃষ্টিপাত হইলে উৎপাদন বাড়ে। যুদ্ধবিগ্রহ, আনবিক বোমা বিস্ফোরণ, তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকীরণ ইত্যাদি বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের উৎপাদন ক্ষমতাকেও কমাইয়া দিতে পারে।

ভূমি

সংজ্ঞা (Definition)

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রকৃতির সকল প্রকার দানকে ভূমি বলা হয়। ভূমির যে শক্তি কৃষিকার্য্যে বা অরণ্য-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, খনিজ পদার্থ ; জলশক্তি ; নৌকা বা জাহাজ চলাচলের উপযোগী জলের উপরিভাগ ; নদী ও সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ সকল কিছু ; আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি সকল কিছুই ভূমি। যে সকল আদি সম্পদ মানুষের শ্রম বিনা উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে এবং মানুষের সম্পদ-উৎপাদনের সহায়তা করিতেছে, সেই সকল দ্রব্যকেই ধনবিজ্ঞানে ভূমি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ ভূমিকে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেন এবং অন্যান্য উপাদানের তুলনায় ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতেন। প্রথমতঃ ভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। মানুষ ইচ্ছা করিলে প্রকৃতির দানকে বাড়াইতে পারে না ; ইহার যোগান প্রকৃতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। ইহার অন্যতম ফল হইল এই যে ভূমির উপর মালিকানা অনেকটা একচেটিয়া মালিকানার সমান। ভূমিজাত দ্রব্যের দাম যদি বাড়িয়া যায়, তবে ভূমির মালিকদের অতিরিক্ত আয় হইবে, কারণ আর ভূমির যোগান বাড়ান সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি ইহা মানুষকে দান করিয়াছে, ইহার জন্য মানুষের কোন ব্যয় করিতে হয় না। সুতরাং ইহার কোন উৎপাদন-ব্যয় নাই। তৃতীয়তঃ, ভূমির কতগুলি শক্তি আছে যাহা আদি

এবং অক্ষয়, বারবার উৎপাদন করিলেও সে শক্তির ক্ষয় নাই। রিকার্ডো ইহাকে বলিতেন "ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তি"। চতুর্থতঃ, ভূমি একজাতীয়া নহে (not homogenous), বহুজাতীয়া (heterogenous)। কোন জমিতে ধান হয়, কোন জমিতে গম হয়; কোথাও হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন হয়, কোনও জমি গৃহ বা কারখানা নির্মাণের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই ব্যবহারগত ভেদ ছাড়াও জমির বিভিন্ন খণ্ডে উর্বরতা শক্তির তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও ভূমির উর্বরতা বেশী, সেখানে ব্যয় অপেক্ষা উৎপন্নের মূল্য অধিক, সে সকল ভূমিকে উর্দ্ধ-প্রান্তিক বা প্রান্তোর্ধ ভূমি বলা হয় (Intramarginal)। কোনও ভূমিতে ব্যয়ের সমান মূল্যেরই উৎপাদন হয় তাহাকে প্রান্তিক ভূমি (Marginal Land) বলা চলে। যদি ব্যয় হইতে উৎপাদনের মূল্য কম হয়, তবে তাহাকে নিম্ন-প্রান্তিক বা প্রান্ত-নিম্ন ভূমি (Submarginal) বলা হইয়া থাকে। ভূমিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িলে প্রান্তিক ও নিম্ন-প্রান্তিক জমি উর্ধ-প্রান্তিক জমিতে পরিণত হয়, ভূমিজাত দ্রব্যের দাম কমিলে উর্ধ-প্রান্তিক জমি প্রান্তিক ও নিম্ন-প্রান্তিক জমিতে পরিণত হয়। ভূমির এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য ক্লাসিকাল লেখকদের ধারণা ছিল যে ভূমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাস মান প্রতিদানের নিয়মাধীন।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ অন্যান্য উপাদানের তুলনায় ভূমির এই সকল বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে চাহেন না। ভূমির ন্যায় সকল দ্রব্যই তাহাদের সর্বপ্রাথমিক অবস্থাতে নিশ্চয় প্রকৃতিরই দান, ভূমি একা এই বৈশিষ্ট্য দাবী করিতে পারে না। ভূমি হইতে শ্রমের ফলে সম্পদ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূমির যোগান ভৌগলিক ভাবে সীমাবর্দ্ধ হইলেও ইহার কার্য্যকরী যোগান (effective supply) কৃত্রিম সারের সাহায্যে বাড়ান সম্ভবপর। ভূমির উৎপাদন-ব্যয় নাই ইহা বলাও ঠিক নহে, কারণ ভূমিকে উৎপাদনের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে বহু শ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বিশ্লেষণের সময়ে, স্বল্পকাল বিবেচনা করিলে অন্যান্য উপাদানের যোগান, (বিশেষ করিয়া, বহু যন্ত্রপাতি জমির যোগানের ন্যায়ই সঙ্কোচপ্রসারবিহীন (অর্থাৎ দাম বাড়িলেও যোগান তত বেশী বাড়ে না)। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদনের নিয়ম যে শুধু ভূমির ক্ষেত্রে দেখা যায় তাহা নহে, অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns)

ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে ভূমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম মানিয়া চলে। সাধারণ কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই নিয়মের উৎপত্তি হইয়াছে বলা হয়। এই নিয়ম অনুসারে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে শ্রম ও মূলধন যদি ক্রমেই বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান ভাবে বৃদ্ধি পাইবে। যে হারে শ্রম ও মূলধনের বৃদ্ধি হইতেছে উৎপাদন ঠিক সেই হারে বৃদ্ধি পাইবে না; উৎপাদন-বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিয়া আসিবে।

নিয়মের ব্যাখ্যা

মনে করা যাউক নির্দিষ্ট এক বিঘা জমিতে ৫৲ টাকার শ্রম ও মূলধন প্রয়োগের ফলে ৩ মণ শস্য উৎপাদন হইতেছে। যদি শ্রম ও মূলধন দ্বিগুণ করা যায় তাহা হইলে প্রথমে উৎপাদন বৃদ্ধির হার তাহা হইতে অধিক হইতে পারে, যেমন ১০৲ ব্যয়ের ফলে উৎপাদন ১০ মণ হইল। কিন্তু ক্রমে উৎপাদন বৃদ্ধি এমন এক স্তরে আসিয়া পড়িবে, যাহার পরে শ্রম ও মূলধনের প্রয়োগ আরও বৃদ্ধি করিলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। যদি ১০৲ টাকার স্থলে ২০৲ টাকার শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদন দ্বিগুণ না হইয়া তাহা অপেক্ষা কম, যেমন ১৬ মণ হইবে। আরও ১০৲ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে উৎপাদন মাত্র ৪ মণ বৃদ্ধি পাইয়া ২০ মণ হইবে। এইরূপে দেখা যাইবে যে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু সে বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান। সর্বোন্নত (optimum) স্তরের পরেও উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিলে ভূমি হইতে প্রতিদান ক্রমশঃ হ্রাস পায়। এই নিয়ম উৎপন্নের পরিমাণের উপর প্রযোজ্য, কিন্তু তাহার দামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের কারণ ভূমির উর্বরতাশক্তির হ্রাস নহে; উর্বরতাশক্তি সমান আছে তাহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

উদাহরণ

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের এই নিয়ম দুইটি উপায়ে কার্য্যকরী হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে চাষী ক্রমশঃ অনুর্বর জমি চাষ করিতে সুরু করে; সুতরাং শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া ক্রমশঃই তাহা হইতে হ্রাসমান প্রতিদান পাইতে থাকে। ইহাকে বলা হয় ব্যাপক-চাষ (extensive cultivation)। ইহা ব্যতীত, যদি একই জমিতে বারবার শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বাড়াইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির

ব্যাপক-চাষ ও প্রগাঢ়-চাষ

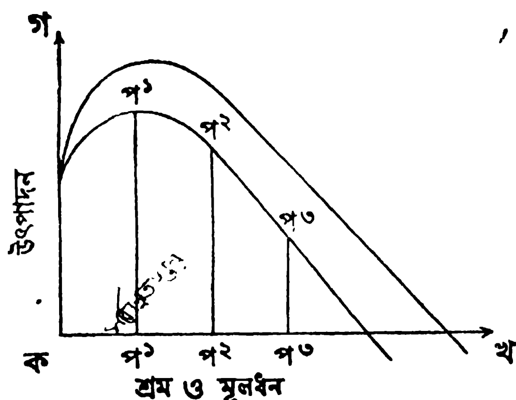
চেষ্টা করা হয় তাহা হইলেও শ্রম ও মূলধনের পরবর্ত্তী নিয়োগ হইতে ক্রমশঃ প্রতিদান হ্রাস পায়। এইরূপ চাষকে বলা হয় প্রগাঢ়-চাষ (intensive cultivation)।

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের ফলে উৎপাদনের ইউনিট প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি পায়; এই নিয়মকে তাই ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়মও বলা যাইতে পারে।

ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন ব্যয়

প্রথমে ৫৲ ব্যয়ে ৩ মণ ধান উৎপাদন হইতেছিল, মন প্রতি উৎপাদন-ব্যয় ছিল ১॥৵৮ পাই। ১০৲ ব্যয়ে ১০ মণ ধান উৎপাদন হইল, ফলে প্রথমে মণ প্রতি উৎপাদন ব্যয় কমিয়া গেল; ১৲ হইল। তাহার পর ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন-ব্যয় সুরু হইল ২০৲ ব্যয়ে ১৬ মণ, মণ প্রতি ব্যয় ১।০; ৩০৲ ব্যয়ে ২০ মণ প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ১॥০ হইল।

এই নিয়মকে রেখা চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা চলে।



মনে করা যাউক, **ক খ** রেখা শ্রম ও মূলধন এবং **ক গ** রেখা উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করে। প্রথমে **কপ১** পর্য্যন্ত শ্রম ও মূলধন বাড়াইলে অধিক হারে উৎপাদন বাড়িতে থাকিবে। **প১** বিন্দু সর্বোন্নত স্তরের নির্দেশক। কিন্তু তাহার পরে উৎপাদনের রেখা নিম্নাভিমুখী অগ্রসর হইয়াছে, **কপ১**-র পরে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়াইতেছে।

এই নিয়মের দুইটি স্বীকার্য্য বিষয় (assumptions) আছে, যাহা ধরিয়া লইলে এই নিয়মটি কার্য্যকরী হইবে। প্রথমতঃ, যদি জমি পূর্ববর্তী চাষের সময়ে যথোপযুক্তভাবে কর্ষিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে পরবর্ত্তীকালে শ্রম ও

মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার না কমিয়া বাড়িয়া যাইতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ, যদি কৃষির উৎপাদন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, কৌশল ও দক্ষতা উন্নত হইয়া উঠে এবং ওই জমিতে তাহার প্রয়োগ হয় তাহা হইলে এই নিয়ম কার্য্যকরী হইবে না। উন্নত যন্ত্রপাতি ও কৌশলের প্রয়োগ উৎপাদনের পরিমাণ সেই সময়ে অবশ্যই বাড়াইয়া দিবে। কিন্তু সেই বর্দ্ধিত স্তরেও শ্রম ও মূলধনের বারবার প্রয়োগ এই নিয়মকে কার্য্যকরী করিবে। রেখা চিত্রে দেখা যায়, যে যদি ইহাদের উন্নতি হয় তবে উৎপাদনের রেখা উর্দ্ধে উঠিয়া যাইবে বটে, কিন্তু ইহার আকৃতি একই থাকিবে, অর্থাৎ অধিক উৎপাদনের স্তরেও, ক্রমশঃ অধিক শ্রম ও মূলধনের প্রয়োগের ফলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী হইবার ঝোঁক থাকিবে।

দুইটি স্বীকার্য্য বিষয়

আধুনিক ধনবিজ্ঞানে বলা হয় যে, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম শুধু জমি হইতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নহে, শিল্পের উৎপাদনেও কার্য্যকরী হয়। যখনই কোন স্থির উপাদানের সহিত অন্যান্য উৎপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়াইতে হয়, তখন এই নিয়মের প্রভাব সুরু হয়, শিল্পে বা কৃষিতে উভয় ক্ষেত্রেই ইহার কার্য্যকারিতা দেখা যায়।

পরিবর্ত্তনীয় অনুপাতের নিয়ম (The Law of variable Proportions)

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ বলিতে চাহেন যে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম শুধুমাত্র ভূমি হইতে উৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাহা নহে। উৎপাদনের যে কোন শাখায়, শিল্পে বা কৃষিতে, যখনই কোন উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখনই উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রভাব দেখা যায়। যান্ত্রিক, অথবা যে কোন কারণেই হউক না কেন, কোন একটি উপাদানের যোগান হয়ত বাড়ান সম্ভবপর হইতেছে না; অথবা বাড়াইতে হইলে সেই উপাদানের নিকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ইউনিটগুলি প্রয়োগ করিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় একটি উপাদানের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অথবা নিকৃষ্ট জাতীয় সেই উপাদানের সহিত অন্য উপাদানের ক্রমাগত বৃদ্ধির দ্বারাই উৎপাদন বাড়ান সম্ভবপর। কিন্তু এই অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে গেলে উৎপাদনধারায় স্থির উপাদানের সাহায্যশক্তি বা প্রদানক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া আসিবে; ফলে উৎপাদন

স্থির উপাদান ও উহার ক্রমহ্রাসমান সাহায্য-শক্তি

বৃদ্ধির হার ক্রমেই হ্রাস পাইবে এবং ইউনিট প্রতি উৎপাদন-ব্যয় ক্রমেই বৃদ্ধি হইবে। এই নিয়ম শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহা নহে। যন্ত্রের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অন্য উপাদান ক্রমাগত বৃদ্ধি করিলেও উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিয়া আসে। শ্রমের পরিমাণ বা সংগঠনের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অন্য উপাদান-সমূহ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে একইরূপ ঘটে। ইহাকে পরিবর্ত্তনীয় অনুপাতের নিয়ম বলে। উপাদানের অনুপাত ও সম্মিলন ক্রমাগত পরিবর্ত্তন করিলে প্রথমে উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়িয়া যাওয়া ও পরে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিয়া যাওয়া ইহাকেই পরিবর্ত্তনীয় অনুপাতের নিয়ম বলা হইয়া থাকে। এই ব্যাপক নিয়মের একটি অংশই হইল ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম।

পরিবর্ত্ততা ও তাহার সীমা

উৎপাদন বাড়াইবার ফলে যখন কোন উপাদানের যোগান কমিয়া আসে, ফলে তাহার দাম বাড়ে এবং পাইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়, তখন উদ্যোক্তা চেষ্টা করিবে যাহাতে সহজ-প্রাপ্য এবং কম-দামী উপাদান বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া দুষ্প্রাপ্য ও দামী উপাদান (উপাদান-সম্মিলন হইতে) সে বাদ দিতে পারে। অর্থাৎ সে উপাদান-সম্মিলন বদলাইবার চেষ্টা করিবে, দুষ্প্রাপ্য ও দামী উপাদানের স্থলে উহার পরিবর্ত্তে সহজ-প্রাপ্য কমদামী উপাদানের প্রয়োগ বৃদ্ধি করিবে। দুষ্প্রাপ্য উপাদানের পরিবর্ত্তে সহজ-প্রাপ্য উপাদান ব্যবহার করিলে যদি উৎপাদনের কোন ক্ষতি না হয়, তবে কোন উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ হইয়া তাহা স্থির উপাদানে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সে এইরূপ উপাদান পরিবর্ত্তন চালাইয়া যাইতে থাকিবে। কিন্তু এই পরিবর্ত্ততার (Substitution) সীমা আছে। কারণ একটি উপাদান কখনই অন্য উপাদানের সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত পরিবর্ত্ত-দ্রব্য হইতে পারে না। তাই ক্রমেই উৎপাদনের নিপুণতা কমিতে থাকে এবং ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে থাকে। উপাদান-পরিবর্ত্ততা (Factorial Substitution) অসীম কাল ধরিয়া চলিতে পারে না, কারণ এমন স্তরে উৎপাদন-সম্মিলন আসিয়া পড়ে যাহার পরে দুষ্প্রাপ্য উপাদানটি আর বাদ দেওয়া চলে না, উহাকে বাদ দিলে উৎপাদন পণ্ড হইয়া যায়, উৎপাদন-সূত্র গঠন করা যায় না। সেই অবস্থায় উপাদানটি স্থির উপাদান (Fixed factor) হইয়া পড়ে এবং

তাহার সহিত অন্যান্য উপাদান বৃদ্ধির ফলেই ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান পাওয়া যায়। যে উপাদানটির পরিবর্ত্তন আর সম্ভব নহে তাহাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট (specific) উপাদান বলে। এই বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদানের সহিত অন্য উপাদানের প্রয়োগের ফলেই উৎপাদনবৃদ্ধি ক্রমহ্রাসমান হইয়া পড়ে। কত শীঘ্র ক্রমহ্রাসমান নিয়মের প্রভাব সুরু হইবে তাহা নির্ভর করে উপাদানের নির্দ্দিষ্টতার মাত্রার (Degree of Specificity) উপর। জমির ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জমি হইল একটি নির্দিষ্ট উপাদান (Specific factor) যাহাকে উপাদান-সম্মিলন হইতে বাদ দিয়া অপর কোন উপাদানের দ্বারা উহার কাজ চালান যায় না ; ফলে কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম শীঘ্র কার্য্যকরী হইয়া থাকে। যে উৎপাদন সূত্রে বিশেষ-নির্দিষ্ট-উপাদানের পরিমাণ যত বেশী থাকিবে সেক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম তত শীঘ্র ও তীব্রভাবে কার্য্যকরী হইবে।

বিশেষ-নির্দ্দিষ্ট উপাদান—জমি প্রকৃষ্ট উদাহরণ

সীমাবদ্ধতা : এই নিয়মের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমতঃ, এই নিয়ম ধরিয়া লয় যে ইতিমধ্যে উৎপাদন কৌশলে (Technique of Production) কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। নূতন কৌশলে নূতন উপাদান-সম্মিলনের প্রয়োজন হইবে, তাহাতে উৎপাদন ধারায় কোন উপাদানের প্রদানক্ষমতা বাড়িয়া যাইতে পারে এবং ফলে এই নিয়ম ঠিক সেই সময়ে কার্য্যকরী না-ও হইতে পারে। কিন্তু সেই নূতন কৌশল অনুযায়ী উৎপাদন ক্রমেই বাড়াইতে গেলে এই নিয়মের প্রভাব অবশেষে সুরু হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ধরিয়া লওয়া হয়, যে কোন উপাদান-কে অল্প মাত্রায় বাড়ান বা কমান সম্ভব। কিন্তু অনেক উপাদানের ক্ষুদ্র অংশ নিয়োগ করা চলে না বা অল্প একটু সরাইয়া আনা চলে না (যেমন বড একটি যন্ত্র)। বাস্তবে এইরূপ অবিভাজ্য উপাদান থাকায় সঠিকভাবে উপাদানের পরিবর্ত্ততা বা এক উপাদানের পরিবর্ত্তে অল্প মাত্রায় অপর উপাদানের ব্যবহার (Substitution of factors) করা চলে না।

উৎপাদন-কৌশল স্থির থাকিবে এবং উপাদানসমূহ সম্পূর্ণ বিভাজ্য হইবে

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম ; ইহার প্রয়োগ—

যে ক্ষেত্রেই একটি উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ এবং তাহার সহিত অন্যান্য উপাদান বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সে ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্য্যকরী হইবেই।

খনি হইতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ক্রমশঃই খাদের গভীরতর অংশ হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করিতে হয়। ক্রমশঃ অধিক শ্রমিক ও মূলধন প্রয়োগ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিয়া আসে এবং ইউনিট প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, অনেকে বলেন যে খনিজ-উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের প্রভাব দেখা যায়।

কিন্তু কেয়ার্ণক্রসের অভিমতে সঠিকভাবে বিচার করিলে খনিতে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। জমি হইতে উৎপাদন চিরকাল আসিতে থাকিবে; উহা হইতে বারবার অবিরত ধারায় উৎপাদন হইবে। কিন্তু খনির সম্পদ-সম্ভার আজ বা কাল ফুরাইবেই, জমির উর্বরতা শক্তির ন্যায় উহার চিরস্থায়িত্ব নাই। জমির পরিমাণ কম থাকায় অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগের দ্বারা ক্রমশঃ উহা হইতে উৎপাদন বাড়াইতে হয়; কিন্তু খনিজ সম্পদ যাহা আছে, উহা তুলিযা আনিতে হইবে—ইহাই মাত্র সমস্যা। উহা জমির নীচে মজুত দ্রব্য, জমির উপরে তুলিয়া আনাই এক্ষেত্রে উৎপাদন। জমির ক্ষেত্রে যেমন একই শক্তির (উর্বরতার) বারবার ব্যবহার, খনির ক্ষেত্রে তাহা নহে। যদি ব্যয়ে পোষায় তাহা হইলে তোলা হইবে, যদি ব্যয়ে না পোষায়, তবে তোলা হইবে না। এই কারণে, তিনি খনিতে এই নিয়মের সঠিক ও সম্পূর্ণ কার্য্যকারিতা স্বীকার করেন না।

মৎস-চারণ ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্য্যকরী হয়। ক্রমশঃই আরও গভীরে অথবা আরও দূরে গিয়া মাছ ধরিতে হয়, ফলে মণ প্রতি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

গৃহ-নির্মাণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে গৃহ যতই উপরে উঠিতে থাকে, উপরতলার ঘরগুলি হইতে আয় কমে, নির্মাণের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

শিল্প-ক্ষেত্রে, স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির যন্ত্রপাতির পরিমাণ পরিবর্ত্তন করা সম্ভব না হয়, ততদিন এই নিয়ম কার্য্যকরী হয়। দীর্ঘকালে, পরিচালনা-শক্তি নিজেই স্থির উপাদানে পরিণত হয়, সুতরাং আরও উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অবশেষে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের প্রভাব সুরু হয়।

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের মূল কারণ কি : উপাদানের ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ক্ষমতা (Why Diminishing Returns : The Diminishing Productivity of a Factor) :

কোন উপাদানকে স্থির রাখিয়া যদি অন্যান্য উপাদানকে বাড়ান যায় তাহা হইলে উৎপাদন-ধারায় পরিবর্তনীয় উপাদানের সাহায্য করার ক্ষমতা বা প্রদান-ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া যাইতে থাকে। অর্থাৎ যে উপাদানের নিয়োগ বাড়ান হইতেছে, তাহার উৎপাদনক্ষমতা ক্রমশঃ কমিয়া আসে। নীচের তালিকায় জমির পরিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইলে কি ভাবে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় তাহা দেখান হইতেছে। জমির পরিমাণ ১ বর্গ মাইল ধরা হইয়াছে ; ইহা স্থির উপাদান।

শ্রমিকের পরিমাণ	মোট ধান্য উৎপাদন মণের হিসাবে	শ্রমিক প্রতি গড় উৎপাদন মণের হিসাব	শ্রমিক প্রতি প্রান্তিক উৎপাদন মণের হিসাবে
১	৫০	৫০	৫০
২	১৬০	৮০	১১০
৩	২৮৫	৯৫	১২৫
৪	৪০০	১০০	১১৫
৫	৫০০	১০০	১০০
৬	৫৮২	৯৭	৮২
৭	৬৩০	৯০	৪৮
৮	৬৫৬	৮২	২৬
৯	৬৫৬	প্রায় ৭৩	০
১০	৬৪০	৬৪	—১৬

মোট উৎপন্ন ধানকে শ্রমিক সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে শ্রমিক পিছু গড

উৎপাদনের পরিমাণ পাওয়া যায়। ৫ জন শ্রমিক পর্য্যন্ত গড় উৎপাদন বেশী, তাহার পর উহা কমিয়া যাইতেছে।

একজন অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। ৪ জন শ্রমিক পর্য্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িতেছে, তাহার পর উহা কমিয়া যাইতেছে।

১ হইতে ৪ জন শ্রমিকের নিয়োগ পর্য্যন্ত ক্রমবর্দ্ধমান হারে উৎপাদন বাড়িতেছে, তাহার পর ক্রমহ্রাসমান নিয়োগের প্রভাব সুরু হইয়াছে। ইহার

গড় ও প্রান্তিক উভয় ব্যয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে

কারণ হইল যে ১ জন, ২ জন, ৩ জন বা ৪ জন শ্রমিক ওই জমি ক্রমেই আরও ভালভাবে চাষ করিতে পারায় প্রত্যেক শ্রমিক নিয়োগের ফলেই প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন বাড়িতেছে। কিন্তু ৫ জনের বেশী হইলেই জমির নির্দ্দিষ্টতার দরুণ শ্রমিকের প্রদান ক্ষমতা কমিতেছে; তাই মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হারও ক্রমহ্রাসমান। শ্রমিকের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা উভয়-ই কমিতেছে।

যখন উভয়ই বাড়ে, তখন প্রান্তিক উৎপাদন গড হইতে বেশী (২ হইতে ৪ পর্য্যন্ত); যখন উভয়ই কমে, তখন প্রান্তিক উৎপাদন গড হইতে কম (৬ হইতে ১০ পর্য্যন্ত)। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মকে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখা করা যায়:

"কোন উপাদান-সম্মিলনে যদি একটি উপাদানের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে, একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরের পরে, প্রথমে সেই পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও পরে তাহার গড উৎপাদন ক্ষমতা, উভয়ই কমিতে থাকে।"

শ্রম

সংজ্ঞা (Definition):

বিনিময়ের জন্য দ্রব্য-সামগ্রী বা কার্য্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত মানুষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলা হয়।

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে,

(ক) ইহা মানুষেরই পরিশ্রম হইতে হইবে (জীবজন্তুর পরিশ্রমকে ধনবিজ্ঞানে শ্রম বলা চলে না),

(খ) এই শ্রম শারীরিক বা মানসিক উভয় প্রকারের হইতে পারে,

(গ) নিছক আনন্দ পাওয়া এই শ্রমের উদ্দেশ্য নয়, বিনিময়ের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমকেই ধনবিজ্ঞানে শ্রম বলা চলে। আনন্দের জন্য ফুলবাগানে কাজ করিলে তাহা শ্রম নহে, কিন্তু মালী অর্থের বিনিময়ে যে কাজ করে, তাহা শ্রম।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) ঃ

উপাদান হিসাবে শ্রমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ (ক) শ্রমিক হইতে শ্রমকে পৃথক করা চলে না। যদিও শ্রমিক শ্রম বিক্রয় করে তাহা হইলেও শ্রম-শক্তির উৎস তাহার শরীর নিজের নিকটেই থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য ফল হইল যে অন্যান্য উপাদানের মালিক যতখুসী উপাদানের উপর মালিকানা স্থাপন করিয়া আয় বাড়াইতে পারে, কিন্তু শ্রমকে পৃথক করা চলে না বলিয়া শ্রমিক তাহা পারে না।

(খ) কোথাও শ্রম বিক্রয় করিতে হইলে শ্রমিককেও সেই স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। শ্রমিক উপস্থিত না হইয়া শ্রম করিতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে শ্রমিকদের গতিশীলতা বা চলনশীলতা (mobility) অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

(গ) কাজ না করিলে শ্রমশক্তি জমাইয়া রাখা যায় না। একটি দিন কাজ না করিলে সেই দিন আর ফিরিয়া আসে না। অন্যদিন কাজ করিলেও পূর্বের দিনটি শ্রমিকের নিকট লোকসান হইয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যের দরুণ মালিকরা শ্রমিকদের অনেক সময়ে কম মজুরীতে কাজ করাইতে পারে এবং মালিকের সহিত দরকষাকষির ব্যাপারে শ্রমিকদের অসুবিধা হয়।

দেশে শ্রমিকের যোগান অতি ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়। জন্মহার, কারিগরী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ইহাদের দ্বারা শ্রমিকের যোগান প্রভাবান্বিত হয়। সুতরাং শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে হওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিকের যোগান শীঘ্র কমেও না ; কারণ শ্রমিকরা সহসা একটি কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে যাইতে চাহে না বা হঠাৎ দেশে জন্মহার কমিয়াও যায় না।

কেয়ার্নক্রস বলেন যে, শ্রমিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বুদ্ধি ও বিচার শক্তি। তাঁহার মতে পরিশ্রম ও খাটুনি হইল যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, যাহা সর্ব্বক্ষণ অবিরাম চলিতে পারে। কৃষি-প্রধান সমাজেও ঘোড়া এবং গরুতেই প্রধান খাটুনির

কাজটা করিয়া দেয়। যে কাজে কোন বুদ্ধির প্রয়োজন নাই, নিছক খাটুনি, তাহা প্রধানতঃ যান্ত্রিক ধরণের এবং ক্রমেই যন্ত্রের সাহায্যে সে কাজ সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু মানুষের মনের কাজ বা বুদ্ধির কাজ যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। যন্ত্রকে চালাইবার উপযোগী বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি শ্রমের অঙ্গ বলিলেও চলে।

সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে শ্রম সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ উপাদান। কেবলমাত্র উৎপাদন-পদ্ধতিতে ইহার প্রয়োগ করিতে হয় তাহা নহে; সকল দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য হইল মানুষের ভোগ বা অভাব মোচন। সুতরাং মানুষ সমাজে উৎপাদনকারী ও ভোগকারী উভয়রূপেই কাজ করে, মানুষের জন্যই উৎপাদন, আবার মানুষের দ্বারাই উৎপাদন।

দেশের মোট উৎপাদনে শ্রম কি পরিমাণ সাহায্য করিবে তাহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর—জনসংখ্যা এবং শ্রমিকদের দক্ষতা।

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব (The Malthusian Theory of Population) ঃ

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়ার দিকে ১৭৯৮ সালে ইংলণ্ডের জন ম্যালথাস্ নামে এক ধর্ম্মযাজক "Essay on the Principle of population as it affects the future improvement of society" নামক এক পুস্তক প্রকাশ করেন এবং তাঁহার জনসংখ্যা সম্পর্কীয় তত্ত্ব প্রচার করেন। তাহার মতে, প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যার প্রতি ২৫ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হইবার দিকে ঝোঁক থাকে। দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্ব্বদাই অধিক থাকে। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের ফলে, জমির যোগান সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ খাদ্যোৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইয়া উঠে না, কিন্তু জনসংখ্যা বাড়িতেই থাকে। তাহার মতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় সমান্তর অগ্রগতির হারে (Arithmatic Progression যেমন ২+২+২+২……), অথচ জনসংখ্যা জ্যামিতিক অগ্রগতির হারে (Geometric Progression যেমন ২×২×২×২……) বাড়িতে থাকে। সুতরাং কিছুকাল পরেই জনসংখ্যা অধিক হইয়া উঠে, খাদ্যোৎপাদন তাহা হইতে বহু পিছনে পড়িয়া থাকে। ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনশন, রাষ্ট্রবিপ্লব ও গৃহবিবাদ সুরু হইয়া যায়; দেশের খাদ্যশস্য যে পরিমাণ লোককে

খাদ্যের ক্রম-বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যার ক্রম বৃদ্ধি দ্রুততর

ভরণপোষণ করিতে সক্ষম তাহার অধিক লোকসংখ্যা নিঃশেষ হইয়া যায়, খাদ্য ও জনসংখ্যার ভারসাম্য পুনরায় ফিরিয়া আইসে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির দৌড় সুরু হয় এবং চক্রের মত প্রকৃতির এই নিয়ম আবার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার মৃত্যু ঘটাইয়া খাদ্যের সহিত উহার সমতা আনে। মানুষ যদি বিবাহ হইতে বিরত থাকে, সংযম অভ্যাস করে, তাহা হইলে সে এইরূপ ভয়াবহ ভবিষ্যৎ-এর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। যদি সে এই সকল প্রতিষেধক পদ্ধতি গ্রহণ না করে, তবে প্রকৃতি "উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা" কমাইবার জন্য নিজেই প্রত্যক্ষ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষ নিজের চেষ্টায় যদি জন্মের হার না কমাইয়া দেয়, তবে প্রকৃতি মৃত্যুর হার বাড়াইয়া খাদ্যোৎপাদন ও জনোৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া থাকে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

তদানীন্তন চিন্তা জগতে এই ম্যালথুসীয় তত্ত্বের গভীর প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল। সমাজ-কল্যাণ, দরিদ্রদের উপকার করা, সব কিছুই প্রকৃতির অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধাচরণ—এই ছিল তাঁহার তত্ত্বের প্রকৃতি। শিল্পবিপ্লব ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়াইবে, দুঃখ দুর্দশা দূর করিবে, নিত্য নতুন ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহার করা সম্ভব হইবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই আশাবাদী ধারণার মূলে ম্যালথাস সজোরে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। শ্রমিক-কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, মানব জাতির কল্যাণ করা—এই সকল ছিল তাঁহার মতে অসম্ভব এবং প্রকৃতির বিধানের বিরুদ্ধাচরণ। নৈরাশ্যবাদ (Pessimism) এবং সন্দেহবাদ (Scepticism) তাঁহার তত্ত্বের গোড়ার কথা। কিন্তু মানব জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়,—জীবন যাত্রার মান কখনই অস্তিত্ব রক্ষার স্তর (Subsistence level) হইতে উপরে উঠিতে পারে না, এই ধারণা তদানীন্তন চিন্তাধারাকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়াছিল, এমন কি ডারউইন-এর অস্তিত্ব-রক্ষার সংগ্রাম (Struggle for Existence), যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest). যোগ্যতাহীনের বিলুপ্তি (Elimination of the unfit), এই সকল জীব-জগতের বিবর্তনের সূত্রাবলী এই তত্ত্বেরই ভাবগত ফল।

সমালোচনা ঃ—

(ক) এত প্রভাব সত্ত্বেও, ইতিহাস ম্যালথাসের তত্ত্বকে কিন্তু সর্ব্বতোভাবে **ভুল প্রমাণিত করিয়াছে।** ঘটনার গতি দেখাইয়াছে যে ম্যালথাস খাদ্যোৎপাদন

ও জনোৎপাদন বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অভূতপূর্ব্ব বিজ্ঞানের অগ্রগতি কৃষির ক্ষেত্রে নূতন উৎপাদন কৌশল ও যন্ত্রের প্রচলন করিয়া খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পথ সুগম করিয়াছে। (খ) শুধু তাহাই নহে, ম্যালথাসের এই তত্ত্বের ফলেই এরূপ শক্তির উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব আজ বাস্তব জগতে কার্য্যকরী নাই। নয়া ম্যালথুসীয়গণ মানুষের যৌন-আবেগ এবং প্রজনন-আবেগের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া দিয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির বহুল প্রচারের দ্বারা, বিশেষ করিয়া সমগ্র ইউরোপে, জন্মের হার কমাইয়া দিয়াছে। ম্যালথুসীয় সংযমের তত্ত্ব এড়াইয়া তাহারা জন্ম-হার কমাইবার বাস্তব পদ্ধতির প্রসার করিয়া এরূপ অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জনসংখ্যার-আধিক্য (overpopulation) আর সমস্যা ছিল না; জনসংখ্যার হ্রাসই ইউরোপে সমস্যার রূপ ধারণ করিয়াছিল।

(গ) খাদ্যোৎপাদন ও জনোৎপাদন সম্পর্কীয় আঙ্কিক সূত্রগুলিও বাস্তব জগতে সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই; খাদ্যোৎপাদন সমান্তর অগ্রগতির হার অপেক্ষা দ্রুত লয়ে বৃদ্ধি পায়, জনোৎপাদনও জ্যামিতিক অগ্রগতির হার অপেক্ষা ধীর লয়ে বৃদ্ধি হয়।

(ঘ) তাহা ছাড়া, ক্যানান বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের পরিমাণ বাড়ে, কৃষি ও শিল্পে ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী হইতে পারে।

(ঙ) ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে জনসংখ্যার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ শুধু খাদ্যোৎপাদনের নহে, দেশের সকলজাতীয় মোট সম্পদের। মোট সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোন ভয়ের নহে, যেমন ইংলণ্ডের খাদ্যোৎপাদন জনসংখ্যার তুলনায় কম হইলেও ইংরাজদের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উঁচু। সেলিগ্‌ম্যান্ তাই বলিয়াছেন যে জনসংখ্যার আসল সমস্যা পরিমাণগত নহে, সুদক্ষ উৎপাদন এবং সুসম বণ্টনের।

সুতরাং বলা চলে যে, ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব গ্রহণের পক্ষে আজকাল কোন যুক্তি নাই। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়া ইউরোপে

প্রধান সমস্যা হইল কি করিয়া জনসংখ্যা হ্রাসের হার কমান যায়। জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, অধিক বয়সে বিবাহ, বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনে অনিচ্ছা, জীবনযাত্রার মান উঁচুতে রাখার প্রচেষ্টা, সব কিছু মিলিয়া জন্ম-হার হ্রাস করিয়া দিয়াছে। এশিয়ার বহু অনুন্নত দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পাইয়াছে, অথচ শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে জন্ম-হার অত্যন্ত অধিক রহিয়াছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ খুবই অধিক, জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত নীচু। এই সকল দেশে ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সমর্থক এখনও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছেন এবং জনসংখ্যাধিক্য (over-population) বাস্তব সমস্যারূপে জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অনুন্নত দেশসমূহে ইহার প্রভাব

সর্বোন্নত বা কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্ব (Optimum Theory of Population) ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কার-সণ্ডার্স ও ক্যানান কাম্য-জনসংখ্যার তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি বৈজ্ঞানিক মান নির্দ্ধারণ করা যাহার দ্বারা দেশের জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে উপযোগী বা অনুপযোগী তাহার সঠিক বিচার করা যায়। একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে, একটি দেশে, যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকিলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম্ম এরূপ হয় যাহাতে অধিবাসীদের মাথা পিছু আসল আয় সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহাকে কাম্য জনসংখ্যা (optimum population) বলা হয়। দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা যদি এই কাম্য জনসংখ্যা হইতে বেশী হয়, তাহা হইলে মাথাপিছু আসল আয় কমিয়া যাইবে। এই অবস্থাকে জনাধিক্যতা (over-population) বলা হয়। যদি দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যা হইতে কম হয়, তাহা হইলেও মাথাপিছু আসল আয় কমিয়া যাইবে। এই অবস্থাকে জন-অপূর্ণতা (under-population) বলা হয়।

সর্বোন্নত বা কাম্য

সর্বোন্নত ফার্ম যেমন সকল উপাদানের সুষ্ঠু সম্মিলন ও প্রয়োগের দ্বারা সর্বনিম্ন ইউনিট ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে, কাম্য জনসংখ্যাও সেইরূপ দেশের সকল প্রকার সম্পদকে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিতে পারে, যাহাতে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। মনে রাখিতে হইবে যে শ্রম-বিভাগ;

যন্ত্র, উৎপাদন কৌশল, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণা, এবং শিক্ষার পরিবর্ত্তন হইলেই কাম্য জনসংখ্যা আর পূর্বের ন্যায় থাকিবে না; পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। কাম্য বিন্দু তাই কোন স্থির বিন্দু নহে, পরিবর্ত্তনশীল বিন্দু।

দুইটি শক্তির পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতের ফলেই কাম্য জনসংখ্যা স্থির হইয়া থাকে: (ক) প্রাকৃতিক সম্পদ (খ) অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুবিধা। প্রকৃত জনসংখ্যা প্রথমে যখন বাড়িতে থাকে তখন প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুবিধা অধিক হারে বৃদ্ধি হয়। এইরূপে দেশের উন্নতি হয় এবং দেশ কাম্য জনসংখ্যার স্তরে পোঁছে। কাম্য সংখ্যার স্তরে পৌঁছিবার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুবিধা বৃদ্ধির তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত কমে; মাথাপিছু আয় কমিয়া যাইতে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নতির সময়ে সহযোগিতার সুবিধা দ্রুততর বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ ইত্যাদি গণ্ডগোলের সময়ে সে সুবিধা দ্রুত হ্রাস পায়। কাম্য জনসংখ্যা তাই বাড়িতেও পারে আবার অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে কমিতেও পারে।

কি ভাবে সর্বোন্নত বা কাম্য সংখ্যা দেখা দেয়

ডাঃ ডাল্টন একটি সূত্রের সাহায্যে কাম্যসংখ্যা হইতে প্রকৃত জনসংখ্যার বিচ্যুতি অর্থ্যাৎ অসামঞ্জস্য (Maladjustment) পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সূত্রটি এইরূপ: $\text{অসামঞ্জস্য} = \frac{\text{প্রকৃত সংখ্যা} - \text{কাম্য সংখ্যা}}{\text{কাম্য সংখ্যা}}$।

সংক্ষেপে এই সূত্রটিকে লেখা যায়: $\text{অ} = \frac{\text{প্র} - \text{কা}}{\text{কা}}$। অ যদি শূণ্য হয় তবে দেশে কাম্য জনসংখ্যা রহিয়াছে। অ যদি শূণ্যের অধিক (ধনাত্মক বা positive) হয়, তবে দেশে জনাধিক্য রহিয়াছে। অ যদি শূণ্যের কম হয় (ধ্বনাত্মক বা Negative) তাহা হইলে দেশে জন-অপূর্ণতা রহিয়াছে বলা চলিবে।

সর্বোন্নত বিন্দু হইতে বিচ্যুতির পরিমাপ

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব ও কাম্য সংখ্যাতত্ত্বের পার্থক্য: (Distinction between Malthusian and Optimum theory of Population):

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী আনিয়া দেওয়াই হইল কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রধান দান। ম্যালথুসীয়

তত্ত্বানুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি সর্বদাই অনিষ্টকর ; কিন্তু কাম্য সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী ইহা সর্বদাই শুভ বা সর্বদাই অশুভ তাহা নহে।

(খ) ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী যখন "প্রত্যক্ষ" পদ্ধতিগুলি (দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি) দেশে চলিতেছে, তখনই জনসংখ্যাধিক্য রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু কাম্য সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যা কিছু কমাইলে মাথাপিছু আয় বাড়িবে এরূপ হইলে দেশে জনসংখ্যাধিক্য রহিয়াছে বোঝা যায়। কোটিপতিদের দেশেও যদি কয়েকজন কোটিপতিকে কমাইলে অবশিষ্ট কোটিপতিদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়; তাহা হইলে সে দেশেও জনাধিক্য রহিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। ম্যালথাসের ন্যায় মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীকেই জনাধিক্যের লক্ষণ বলিয়া ইহারা মনে করেন না।

(গ) শুধুমাত্র খাদ্যোৎপাদনের সহিত জনসংখ্যার তুলনা না করিয়া দেশের সমগ্র সম্পদের সহিত তুলনা করিয়া কাম্য সংখ্যাতত্ত্বের সমর্থকগণ ইহা দেখাইয়াছেন যে, যে দেশে উপযুক্ত খাদ্যোৎপাদন হয় না তাহাদের জীবনযাত্রার মান কমিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

(ঘ) ম্যালথুসীয় নৈরাশ্যবাদ এবং মানব জাতির অন্ধকারময় ভবিষ্যতের ভয় দূরীভূত করিয়া কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব পৃথিবীতে মানুষকে আশার বাণী শুনাইয়াছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভবপর, শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যময় জীবনের অবসান ঘটিতে পারে, এই তত্ত্ব হইতে ইহাই প্রচারিত হইয়াছে।

কাম্য সংখ্যাতত্ত্বের সমালোচনা (Criticisms) ঃ

(ক) এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমালোচনা হইল এই যে ইহা ঠিক জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্ব নহে। এই তত্ত্বের দ্বারা জানা যায় না যে কেন এবং কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় অথবা তাহা কমিয়া যায়। বহুল প্রচারিত "কাম্য" বা "সর্বোন্নত স্তরের" ধারণা জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই জনসংখ্যার গতিশীলতা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে কোন প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় না।

জীব-বৃদ্ধির মূল কারণে ও ধরণে যে তত্ত্ব আলোকপাত করে না, তাহা প্রকৃত জনসংখ্যা তত্ত্ব নহে

(খ) কাম্য জনসংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা একটি নিশ্চল ও স্থির জগতের ধারণা মাত্র। যদি অর্থনৈতিক পরিবেশে কোন পরিবর্তনই না ঘটে তাহা হইলে

কাম্য জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবেশ কখনই অচল বা স্থির নহে। চলমান সমাজের সদা-পরিবর্তনময় অর্থনৈতিক পরিবেশে মরুভূমির আলেয়ার ন্যায় কাম্য জনসংখ্যাকে খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নহে।

(গ) এই তত্ত্ব জনসংখ্যাধিক্য পরিমাপ করার উপযোগী কোন বাস্তব মানদণ্ডের নির্দেশ দেয় না। জনসংখ্যা কমাইয়া মাথাপিছু আয় বাড়িল কি বাড়িল না তাহা পরিদর্শন করিয়া জনাধিক্য হইয়াছে স্থির করা কোন সম্ভবপর কার্য্যকরী পন্থা নহে। এই তত্ত্ব এমনই যে কোন প্রয়োগ-গত সার্থকতা ইহার নাই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বরূপ ঃ

কি ভাবে একটি দেশের জনসংখ্যার পরিবর্ত্তন হয় তাহার সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে। বর্ত্তমানে লজিষ্টিক্ রেখা নামে একটী ধারণা সুপ্রচলিত আছে। এই রেখা অনেকটা ইংরাজী S শব্দের মত। ইহাতে বুঝা যায় যে একটি দেশে প্রথমে জনসংখ্যা ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে পরে বৃদ্ধির গতি দ্রুত হইয়া উঠে, অবশেষে আবার ধীর গতি আসিযা পড়ে, একেবারে শেষের দিকে হ্রাস পাইবার ঝোঁকও দেখা যায়। সভ্যতার সুরুতে জীবন যাত্রার উপকরণের ও শান্তি শৃংখলার অভাবের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি দ্রুত হইতে পারে না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাত্রার উপকরণের যোগান বাড়িতে থাকে মৃত্যু হারও কমিয়া যায় জনসংখ্যাও দ্রুত গতিতে বাড়িতে থাকে। কিন্তু জীবন যাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত হইবার পর জনসংখ্যা আর বাড়িতে চাহে না, অনেক সময় জনসংখ্যা হ্রাস পাইবার দিকে ঝোঁক আসিয়া পড়ে।

সভ্যতার স্তর ও জনসংখ্যা

জনসংখ্যা পরিবর্ত্তনের পরিমাপ (Measurement of Population Change) ঃ

রেমণ্ড পার্ল নামে এক লেখক জনসংখ্যা পরিবর্ত্তনের পরিমাপ করার জন্য একটি নিয়ম বাহির করিয়াছিলেন। যদি একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা জন্মের সংখ্যা হইতে বেশী হয়, তাহা হইলে জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান বলা চলে; যদি মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে, জনসংখ্যা ক্রমপ্রসারমান; যদি মৃত্যুর সংখ্যা ও জন্মের সংখ্যা সমান হয়, তবে বলা চলে যে জনসংখ্যা স্থিতিশীল। জন্মের হার ও মৃত্যুর হারের অনুপাতের সাহায্যে

জন্মহার ও মৃত্যুহারের অনুপাত

জনসংখ্যা পরিবর্ত্তনের ধারা বোঝা যাইতে পারে। ইহাকে প্রাণ-সূচী (Vital-Index) বলা হয়।

কিন্তু পার্লের এই নিয়ম বাস্তব জীবনে ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দেশে সন্তান প্রজননের গড় ক্ষমতা, মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্ত্রী পুরুষের অনুপাত, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি, গড় আয়ু ইত্যাদি বাদ দিয়া শুধু জন্মহার ও মৃত্যুহারের অনুপাত সঠিকভাবে জনসংখ্যা পরিবর্ত্তনের পরিমাপ করিতে পারে না। মৃত্যুহার অধিক হইলেও যদি প্রায় সকল মৃত্যু বৃদ্ধ ব্যক্তিদের (যাহাদের সন্তান প্রজননের বয়স পার হইয়া গিয়াছে) মধ্যে ঘটে, তবে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা কমিবে তাহা বলা চলে না। যদি জন্মহার অধিক থাকে, কিন্তু মৃত্যুগুলি প্রাক-যৌবন স্তরেই ঘটিয়া থাকে তবে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা কমিবার সম্ভাবনা। অধিক সংখ্যায় পুরুষ-শিশু জন্মগ্রহণ করিলে জনসংখ্যা কমিতে পারে এবং অধিক সংখ্যায় স্ত্রী-শিশু জন্মগ্রহণ করিলে জনসংখ্যা বাড়িতে পারে।

সমালোচনা

কুস্‌জিন্‌স্কি তাই একটি নতুন নিয়মের দ্বারা এই পরিবর্তন পরিমাপের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাকে নীট প্রজনন হার (Net Reproduction Rate) বলা হয়। যেমন সর্বপ্রথম ১০০০টি নূতন স্ত্রী-শিশু লইয়া হিসাব সুরু হইল এবং লক্ষ্য করা হইল ইহাদের মধ্যে কতটি স্ত্রী-শিশু সন্তান প্রজননের বয়স (১৫-৪৫) পর্যন্ত পৌঁছায়, এবং ইহাদের হইতে মোট কতজন স্ত্রী-শিশুর জন্ম হয়। যদি ১০০০ নবজাত স্ত্রী-শিশু সন্তান প্রজননের বয়স পার হইয়া আসিবার মধ্যে ঠিক ১০০০টি স্ত্রী-শিশু রাখিয়া আসে, তবে জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা। যদি কম স্ত্রী-শিশু রাখিয়া আইসে (যেমন ৭০০), তাহা হইলে জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান (নীট প্রজনন হার হইল ·৭), যদি ১০০০-এর অধিক স্ত্রী-শিশু রাখিয়া আইসে (যেমন ১৫০০) তাহা হইলে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান, (নীট প্রজনন হার হইল ১·৫)।*

গড় প্রজনন-শক্তি ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা

শ্রমিক-দক্ষতা (Efficiency of Labour) :

উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় শ্রমিকরা কতখানি সাহায্য করিতে পারে, তাহা শুধু

* ভারতের নীট প্রজনন হারের বিভিন্ন হিসাব আছে, তবে প্রচলিত হিসাব হইল ১·১১৯

জনসংখ্যার উপরই নির্ভর করে না ; শ্রমিকদের গড় দক্ষতার উপরও নির্ভরশীল। সকল শ্রমিক সমান দক্ষ নয়, তাই শ্রমিক-দক্ষতার একটি সাধারণ মান-দণ্ড হিসাব করিয়া তাহার সাহায্যে অপর সকল শ্রমিকদের দক্ষতা পরিমাপ করা বাঞ্ছনীয়।

গড় শ্রমিক দক্ষতা কাহাকে বলে

শ্রমিকের ক্ষেত্রে, এই সাধারণ মানদণ্ডের ইউনিট হইল একটি স্বাভাবিক-ইউনিট দক্ষতা যেমন, কোন এক অনিপুণ শ্রমিকের ১ ঘণ্টার কাজের ফল। সেই কাজের ফলকে স্বাভাবিক ইউনিট ধরিয়া অন্যান্য শ্রমিকদের দক্ষতা সেই স্বাভাবিক-ইউনিটের তুলনায় পরিমাপ করা সম্ভব। যেমন একজন অনিপুণ শ্রমিক যদি ঘণ্টায় ২ খানা কাপড় তৈরী করে, তবে যে শ্রমিক ঘণ্টায় ৬ খানা কাপড় প্রস্তুত করিতেছে, সে ৩ জন অনিপুণ শ্রমিকের সমান অর্থাৎ ৩টি স্বাভাবিক-ইউনিটের সমান। এই ভাবে সকল শ্রমিককে আমরা দক্ষতা অনুযায়ী একই হিসাবের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে পারি। বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিককে এইভাবে একই হিসাবের মধ্যে আনিয়া ফেলা সম্ভব।

দেশে মোট জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট অংশ (ভারতবর্ষে যেমন ৪০%) শ্রমিক হিসাবে উৎপাদনে সাহায্য করে। ইহা নির্ভর করে আয়ু, স্বাস্থ্য, শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদির উপর। এইভাবে শ্রমিক সংখ্যা হিসাব করিয়া দক্ষতার স্বাভাবিক-ইউনিট দিয়া গুণ করিলে দেশে মোট শ্রমের যোগান পাওয়া যায়।

শ্রমিকদের দক্ষতা বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। শিল্প সংগঠনের রূপ, যন্ত্রের প্রকৃতি, সংগঠকের পরিচালন-যোগ্যতা এবং শ্রমিকের নিজস্ব গুণ এই সকল কিছুই শ্রমিকের দক্ষতা বা উৎপাদন-ক্ষমতাকে (Productivity) স্থির করে। দক্ষ শ্রমিক হইতে হইলে তাহাকে শারীরিকভাবে সুস্থ সবল ও দৃঢ় হইতে হইবে। দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যের অনুকূল কিনা দেখিতে হইবে। সবল স্বাস্থ্যের ভিত্তি হইল বলকারী ও শরীরপোষণকারী খাদ্যদ্রব্য, স্বাস্থ্যকর গৃহ, বস্ত্র, উপযুক্ত পরিমাণে বিশ্রাম। উৎপাদন-কেন্দ্রে কাজ করিবার সুস্থ পরিবেশও কর্মক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। মানসিক গুণাবলী, যেমন সাধারণ-শিক্ষা ও যন্ত্রসম্বন্ধীয় শিক্ষা, আশাবাদী ধারণা পোষণ করা, বুদ্ধি ও বিবেচনার যথোপযুক্ত ব্যবহার করা, ইত্যাদি সকল কিছুর উপরে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নির্ভর করে।

ইহা কিসের উপর নির্ভর করে

মূলধন

সংজ্ঞা (Definition)ঃ

মানুষের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য পুনরায় উৎপাদনের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহাকে মূলধন বলে। উইক্সেলের ভাষায় বলিতে গেলে "মূলধন হইল সঞ্চিত শ্রম এবং সঞ্চিত ভূমির মিলিত ও একত্রীভূত ফল, বহু বৎসর ধরিয়া তিলে তিলে ক্রমশঃ জমাট-বাঁধা রূপ ধারণ করিয়াছে।" অতীত কালের শ্রম ও প্রকৃতির সম্পদ মিলিয়া যে প্রথম মূলধন সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া অধিক আয় ও অধিক সঞ্চয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, পরবর্তী কালে আরও বেশী মূলধন গঠনে সহায়তা করিয়াছে। আজিকার মূলধন তাই অতীত কালের বহু সঞ্চয়ের ফল স্বরূপ।

মূলধন কথাটির অর্থ বুঝিতে হইলে মনে রাখা দরকার যে ইহার প্রকৃতি হইল আয়সৃষ্টি করা বা আয় প্রদান করা। যে সকল সম্পদ ইহার মালিককে আয় প্রদান করে, অথবা যাহা সরাসরি উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া আয়-সৃষ্টি করে তাহাকেই মূলধন বলে। কেয়ার্ণক্রসের অভিমতে মূলধন শব্দটি তিন ধরণের পৃথক দ্রব্য বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়ঃ দ্রব্যরূপ মূলধন (Concrete Capital); অর্থরূপ মূলধন (Money Capital); ঋণরূপ মূলধন (Debt Capital)।

দ্রব্যরূপ মূলধন হইল সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী যাহা প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, কারখানা এবং অর্ধ-প্রস্তুত দ্রব্যাদি হইল মূলধন এবং তাহারা সরাসরি আয়সৃষ্টি করে নূতন দ্রব্যাদি তৈরী করে। **অর্থরূপ মূলধন** হইল, কোন ব্যবসায়ীর বা ফার্মের হাতে মজুত অর্থের পরিমাণ যাহা দিয়া তাহারা উপাদান সমূহের কার্য্যশক্তি ক্রয় করিতে পারে। অর্থের দ্বারা মূলধনের উপর ব্যক্তির বা ফার্মের মালিকানা আসিতে পারে, কিন্তু অর্থ নিজেই মূলধন নহে, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই সমাজে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না। অর্থরূপ মূলধন মালিককে আয়-প্রদান করে, নিজেই উৎপাদন ধারায় স্বশরীরে ব্যবহৃত হইয়া আয় সৃষ্টি করে না। **ঋণরূপ মূলধন** হইল যে অর্থের সাহায্যে ব্যক্তি বা ফার্ম নিজে উৎপাদন না না করিয়া অন্যকে ঋণ দেয় এবং তাহার দরুণ নিয়মিত সুদ পায়। কোন

ঋণপত্র বা ওই জাতীয় দলিলের মালিক নিয়মিত আয় পাইতে থাকে, তাই বলা যায় যে ইহা আয়-প্রদান কারী। ইহা আয় সৃষ্টিকারী হইতেও পারে বা নাও হইতে পারে। সরকারী ঋণপত্র ইহার মালিকের নিকট আয়-প্রদানকারী, কিন্তু যদি উৎপাদনের কার্য্যে সেই অর্থ নিয়োজিত হয়, তবেই তাহা আয়-সৃষ্টিকারী, যদি উৎপাদনের কার্য্যে সরকার তাহাকে নিয়োগ না করেন তবে ব্যক্তির নিকট আয়-প্রদানকারী হইলেও ইহা নিজে কখনই আয় সৃষ্টিকারী নয়। শেয়ারের ও ডিবেঞ্চারের মালিক ইহা হইতে আয় পায়, তাহাদের নিকট এই দলিলগুলি ঋণ-রূপ মূলধন।

মূলধন ও সম্পদ (Capital and wealth) ঃ

সম্পদের যে অংশ মানুষের দ্বারা উৎপন্ন এবং যাহা অপর দ্রব্য উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োজিত হয় তাহাকে মূলধন বলে। ভোগকার্য্যে নিয়োজিত দ্রব্যাদি হইল সম্পদ এবং উৎপাদনকার্য্যে নিয়োজিত দ্রব্যাদি হইল মূলধন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। লোকে আয়ের সাহায্যে সম্পদ ভোগ করে বলিয়াই উৎপাদন কার্য্যে নিজের শক্তি নিয়োগ করিতে পারে এবং উৎপাদন সম্ভব হয়। সুতরাং সমাজের সর্কল সম্পদই মূলধন বলা চলে।

মূলধন ও আয় ঃ

মূলধনের উপর মালিকানার দরুণ তাহা হইতে নিয়মিত যে প্রতিদান পাওয়া যায় তাহাকে আয় বলে। মূলধন হইল সঞ্চিত ও একত্রীভূত রূপ, আয় হইল স্রোতধারা। আয় হইতে সঞ্চয় হইয়া পুনরায় মূলধন গঠিত হইতে পারে। অবশ্য মূলধনের মালিকানা ছাড়াও শ্রম ও কাজের দ্বারাও আয় হইতে পারে।

ভূমি ও মূলধন ঃ

মূলধন মানুষের শ্রমের ফল, কিন্তু ভূমি প্রকৃতির দান। সুতরাং ভূমি উৎপাদনকার্য্যে ব্যবহৃত হইলেও ইহা কখনই মূলধন নহে। ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ, কিন্তু মূলধনের যোগান পরিবর্ত্তনীয় ; ইহাকে বাড়ান বা কমান যায়।

স্থিরমূলধন ও সঞ্চরণশীল (Fixed and circulating) মূলধন ঃ

যে সকল দ্রব্য একবার উৎপাদন কার্য্যে নিয়োজিত হইলে তাহার আকৃতি এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে পুনরায় একই উৎপাদন ধারায় তাহাদের নিয়োগ করা সম্ভবপর হয় না, তাহাদের সঞ্চরণশীল মূলধন বলে। আর যে

সকল দ্রব্যকে বারবার একই ধরণের উৎপাদন কার্য্যে নিয়োগ করা চলে এবং আকৃতিতে পরিবর্ত্তন হয় না তাহাকে স্থির মূলধন বলে। প্রত্যেকবার উৎপাদন কার্য্যের পর উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বাজারের স্বাভাবিক অবস্থায় সঞ্চরণশীল মূলধনের দাম সম্পূর্ণ উঠিয়া আসে; কিন্তু স্থির মূলধনের দামের অংশ-মাত্র প্রতিবারে উঠিয়া আইসে। এই পার্থক্য কিন্তু কোন মৌলিক পার্থক্য নহে। যদি ১০ মাইল চড়া যায় তাহা হইলে মোটরের চাকা স্থির মূলধন এবং পেট্রল সঞ্চরণশীল মূলধন। কিন্তু যদি ১০০০০ মাইল চড়া হয় তাহা হইলে উভয়ই সঞ্চরণশীল মূলধনের শ্রেণীতে পড়ে। কারণ ওই চাকা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আবার উৎপাদনে নিয়োগের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে এবং আকৃতিতেও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

মূলধনের কার্য্য (Functions of Capital) :

আধুনিক উৎপাদনকে পুঁজিবাদী উৎপাদন বলা হয়, কারণ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মূলধন বা পুঁজি অতীতের সঞ্চয়ের ফল; আর সঞ্চয় হইল কিছুটা সময় ভোগকার্য্য হইতে বিরত থাকা। সেইজন্য উৎপাদনে পুঁজির নিয়োগকে বম্-বোযার্ক সময়ের নিয়োগ বলিযাছেন, যেন অধিক পরিমাণে জমাট-বাঁধা সময়কে উৎপাদনে নিযুক্ত করা হইতেছে।

মনে করা যাউক এক শিকারী শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে। রোজই তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্য সে শিকার করিযা আনে। ভাল অস্ত্র বা উন্নত ধরণের মূলধন তৈযারী করিতে হইলে তাহাকে দুই সপ্তাহ শিকার হইতে বিরত থাকিয়া পাথর বা লোহা হইতে নূতন অস্ত্র তৈরী করিতে হইবে। এই দুই সপ্তাহ হয় সে কিছুই ভোগ করিবে না, অথবা পূর্ব্বের শিকারের সঞ্চয় দ্বারা চালাইয়া লইবে। মূলধন তৈয়ারীর পরে সেই অস্ত্রের সাহায্যে সে অধিক শিকার বা উৎপাদন করিতে পারিবে। যদি দুই সপ্তাহের স্থলে চার সপ্তাহ যাবৎ সে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে সে আরও পুঁজি উৎপাদন করিয়া ভবিষ্যতে খাটাইতে পারিত, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যাইত। কিছুটা উৎপাদন—মূলধন উৎপাদন—অধিক দ্রব্য উৎপাদন—আরও মূলধন উৎপাদন—আরও অধিক দ্রব্য উৎপাদন এই ভাবেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অন্য উপাদানের তুলনায় পুঁজির অনুপাত বাড়িতে থাকে। ইহাকে চক্রাকৃতি

উৎপাদন পদ্ধতি (round-about methods of production) বলে। যত অধিক মূলধন বা জমাট-বাঁধা শ্রম সে নিয়োগ করিতে পারে, অর্থাৎ উৎপাদন-পদ্ধতির চক্রের পরিধি যত বিস্তার লাভ করে, ততই সে পদ্ধতি অধিক উৎপাদন-ক্ষম হইয়া উঠে। মূলধনের প্রধান কার্য্য হইল উৎপাদন পদ্ধতিকে অধিক উৎপাদনক্ষম করিয়া তোলা। সুতরাং যত মূলধন নিয়োগ সম্ভব হইবে, উৎপাদন ততই বাড়িবে, ফলে দেশে কম ব্যয়ে অধিক দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব হইবে, জাতীয় আয় ও ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পাইবে, লোকের জীবন যাত্রার মান বাড়িয়া যাইবে।

কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়, সেই সময়ের পরে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া শ্রমিকদের কাজের মূল্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে যতদিন পর্য্যন্ত দ্রব্য-উৎপাদনের ধারা শেষ না হইয়া চলিতে থাকে ততদিন শ্রমিকরা যে মজুরী পাইয়া তাহাদের জীবন ধারণ করে,—যে সকল খাদ্য, বস্ত্র, বা ভোগ্য দ্রব্যাদি ব্যবহারের ফলেই উৎপাদন কার্য্য চালাইয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় তাহাদের মূলধন বলা হয়, কারণ উৎপাদন কার্য্যে তাহারা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। শ্রম ও ভোগের মধ্যে সংযোগ সাধন করা মূলধনের একটি কার্য্য সন্দেহ নাই। আধুনিককালে কাঁচা মাল জোগাড় করিয়া উৎপাদন শুরু করা ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করার মধ্যে প্রচুর সময়ের ব্যবধান থাকে, সেই সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের মজুরী ফার্ম্মের সঞ্চরণশীল পুঁজি হইতে দেওয়া হয়।

ফার্মের উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা মূলধনের একটি বিশেষ কার্য্য বলিয়া ধরা হয়। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত যদি উৎপাদককে বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের ধারা ব্যাহত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; বহু উপাদানকে অলস ও বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হয়, ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয়ও বৃদ্ধি হয়। মূলধন থাকিলে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় সম্পূর্ণ না হইলেও উৎপাদন চলিতে পারে, একই সঙ্গে বিক্রয় ও উৎপাদন চালু রাখা সম্ভবপর হয়।

মূলধন-গঠন (Capital formation) :

দেশের মোট আয়ের সবই যদি ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হইয়া যাইতে থাকে, অধিবাসীরা যদি মোটেই সঞ্চয় না করে, তাহা হইলে মূলধন গঠন সম্ভব

হয় না। মূলধন গঠন করিতে পারিলে তাহার পর উহার নিয়োগের দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। দেশের লোক যদি বর্ত্তমানে ভোগ হইতে বিরত থাকে, আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করিয়া তাহা মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ করে, তবেই দেশে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধন সৃষ্টি করা সম্ভবপর, ভবিষ্যতে অধিক আয় ও অধিক ভোগ্যদ্রব্য পাইবার আশায় তাহারা বর্ত্তমানে সঞ্চয় করিলে এবং সেই সঞ্চয় সঠিক ভাবে বিনিয়োগ করা হইলে (অর্থাৎ নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে খাটান হইলে) দেশে মূলধন-গঠন হইয়া থাকে।

মূলধন আসে সঞ্চয় হইতে

এই সঞ্চয় কিসের উপর নির্ভর করে? নিও-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সঞ্চয় করিতে হইলে লোককে বর্ত্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হয়। কিন্তু মানুষের মনই এমন যে তাহারা বর্ত্তমানের অভাবকে বড় করিয়া দেখে, ভবিষ্যতের অভাব মোচনের চিন্তা অপেক্ষা বর্ত্তমানের অভাব মিটাইবার চিন্তা প্রবলতর। বর্ত্তমানে ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করা বেদনা-দায়ক সুতরাং সঞ্চয় কারীকে বেদনা উপশমের জন্য কিছুটা সুদ দিতে হইবে। এই সুদের হারের উপর দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করিবে। সুদের হার বাড়িলে দেশে সঞ্চয় বাড়িবে এবং দেশে মূলধন গঠন বৃদ্ধি হইবে।

সঞ্চয় কিসের উপর নির্ভর করে: ১। সুদের হার

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে সুদের হারের সহিত সঞ্চয়ের সম্পর্ক ভিন্নরূপ। দেশে অনেক লোক আছেন যাঁহারা সুদের হার সম্পর্কে উদাসীন হইয়া সঞ্চয় করিয়া থাকেন, ব্যবসায়ী ফার্মগুলির সঞ্চয় সুদের হারের অপেক্ষা রাখে না। কেইনস্ বলিয়াছেন যে, সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে দেশে শিল্প ও ব্যবসাতে কম অর্থ বিনিয়োগ হয়, ফলে লোকের মোট আয় কমিয়া যায়, তাহাদের সঞ্চয় করিবার শক্তিও কমে, দেশে মোট সঞ্চয়ও কমে। সুদের হারের সহিত সঞ্চয়ের সম্পর্ক তাই বিপরীত বলিলেও চলে, সুদের হার কম থাকিলেই মোট আয়, মোট সঞ্চয় এবং মোট মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ, দেশের বেশীর ভাগ সঞ্চয় আসে যৌথব্যবসায়ী ফার্মগুলির

অবণ্টিত মুনাফা হইতে। তাহারা প্রতিবৎসর নূতন মূলধন গঠনের জন্য মুনাফার বৃহৎ অংশ সঞ্চয় করে, দেশের মূলধন বৃদ্ধি পায়। (ক) যন্ত্রপাতির বা মূলধনীদ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতির পূরণের জন্য, (খ) ব্যবসা সঙ্কট ভালভাবে কাটাইয়া উঠিবার জন্য, (গ) ব্যবসা বা ফার্মের আয়তন ও সম্পদ আরও বাড়াইবার জন্য, ও (ঘ) প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের হটাইবার উদ্দেশ্যে অথবা আক্রমণ সুরু করিবার জন্য, এই ফার্ম সমূহ বাৎসরিক মুনাফা হইতে প্রভূত পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া থাকে। এই সঞ্চয় দেশের মূলধন গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে।

২। মুনাফা
৩। আয়স্তর
৪। সঞ্চয়-প্রবণতা

তৃতীয়তঃ, সঞ্চয় নির্ভর করে দেশের আয়স্তরের উপর। যদি সাধারণভাবে দেশের আয়স্তর বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মোট সঞ্চয়ও বাড়িবে, আয়স্তর কম থাকিলে মোট সঞ্চয়ও কম হইবে।

চতুর্থতঃ, সঞ্চয় নির্ভর করে দেশের লোকের গড় সঞ্চয়-প্রবণতার উপর। আয় হইতে যে পরিমাণ সঞ্চয় হয়, অর্থাৎ আয় ও সঞ্চয়ের অনুপাতকে সঞ্চয়-প্রবণতা (propensity to save) বলা হয়। কোন লোকের সঞ্চয়-প্রবণতার বহুবিধ কারণ থাকে। যদি লোকটি বিশেষ হিসাবী প্রকৃতির ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে সঞ্চয়ী হইবে। যদি সে ভবিষ্যতের উন্নতির কথা ভাবে অথবা নিজের অবর্ত্তমানে স্ত্রীপুত্রের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, তাহা হইলে সে সঞ্চয়ী হইবে। অনেক সঞ্চয় করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ধনী বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইবে, এই আশায় বা অহংবোধ চরিতার্থের সুযোগ লাভের জন্য সে সঞ্চয় করিতে পারে। কৃপণ স্বভাবের লোকদের কোন কারণ বিনাই সঞ্চয় হইতে পারে। লোকের মনে এই সকল কারণে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি কতটা শক্তিশালী হইবে তাহা নির্ভর করে, (ক) নিরাপত্তা, (খ) বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা, এবং (গ) অভ্যাস রীতিনীতি ইত্যাদির উপর। দেশের আইন শৃংখলা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা বজায় থাকিলে, বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা থাকিলে এবং সঞ্চয়োপযোগী অভ্যাস ও রীতিনীতি থাকিলে দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

কিন্তু শুধু সঞ্চয় হইলেই মূলধন-গঠন হয় না। যদি এই সঞ্চয় সোনা-রূপা বা অলঙ্কার-ক্রয়ে আবদ্ধ হইয়া থাকে অথবা বিদেশে রপ্তানী হইয়া

যায় তাহা হইলে সে সঞ্চয়ে মূলধন-গঠন হইতে পারে না। ইহার জন্য চাই বিনিয়োগ অর্থাৎ সেই সঞ্চয়কে নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে খাটান। কেবলমাত্র সঞ্চয় হওয়ার অর্থ ভোগ্যদ্রব্যের বিক্রয় ও চাহিদা কম হওয়া। বিনিয়োগ হইলেই সে সঞ্চিত অর্থ উপাদান সমূহের চাহিদা সৃষ্টি করিবে এবং মূলধনী দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারিবে।*

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

বিনিময় নির্ভর করে দুইটি শক্তির উপর, (ক) নূতন মূলধনী দ্রব্য হইতে সম্ভাব্য মুনাফার হার, এবং (খ) সুদের হার। যদি নূতন মূলধনী দ্রব্য হইতে সম্ভাব্য মুনাফার হার বাজারে প্রচলিত সুদের হার হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীগণ অবশ্যই সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্ক বা ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ করিয়া লাভের আশায় নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করিবে। কেইন্‌সের ভাষায় বলা যায়, যদি মূলধনের প্রান্তিক কার্য্যকারিতা (Marginal Efficiency of capital) সুদের হার হইতে বেশী থাকে তবেই সঞ্চয়ের বিনিয়োগ হইবে এবং দেশে মূলধন গঠন হইবে।

মূলধন-গঠনের স্তর বিভাগ এবং অনুন্নত দেশে মূলধন-গঠনের সমস্যা (Stages of capital formation and its problem in under-developed economy.)

উন্নত দেশগুলিতে প্রচুর মূলধন পাওয়া যায়। সেই সকল দেশে বহুপূর্ব্বে শিল্প প্রসার সুরু হওয়ায় তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় মূলধন গঠনের ব্যাপারে বহু অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদের প্রাথমিক সঞ্চয় হইয়াছিল দেশ বিদেশ লুণ্ঠন করিয়া, উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এবং শিল্প বিপ্লবের প্রথম সুযোগ গ্রহণ করিয়া দেশে বিদেশে প্রচুর মুনাফা করিয়া। ফলে তাহাদের মোট আয়, মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় বেশী। মূলধনও বেশী।

কিন্তু অনুন্নত দেশসমূহের মূলধন গঠনের উপায় তাহাদের ন্যায় হইতে পারে না। উপনিবেশ স্থাপন বা দেশ লুণ্ঠনের উপযোগী পৃথিবীর অবস্থা আর নাই, অবাধ বাণিজ্যের দিনও শেষ হইয়াছে। সর্ত্ত-কণ্টকিত ও রাজনৈতিক-

* শুধু সঞ্চয় করিলে সেই অর্থ অন্যের আয় সৃষ্টি করিতে পারে না, তাঁহারা সঞ্চয়ও করিতে পারেন না—সুতরাং বিনিয়োগহীন আজিকার সঞ্চয়, ভবিষ্যতের সঞ্চয়কে কমাইয়া দেয়। তাই রবার্টসন বলিয়াছেন যে "সঞ্চয়কে সঞ্চিত করিয়া রাখা চলে না।"]

স্বার্থ-জড়িত বিদেশী সাহায্যে মূলধন গঠন দ্রুত শিল্পসম্প্রসারণের পক্ষে উপযোগী না-ও হইতে পারে।

মূলধন-গঠনের প্রধানতঃ তিনটি স্তর-বিভাগ আছে। (ক) ভোগ্যদ্রব্যের ব্যয়-সঙ্কোচ ও সঞ্চয় (খ) সঞ্চয়ের সংগ্রহ ও বিনিয়োগের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তাহাকে প্রবাহিত করার উপযোগী প্রতিষ্ঠান (গ) সংগৃহীত সঞ্চয়কে মূলধনী দ্রব্যে (যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে) রূপান্তরিত করা।

অনুন্নত দেশে জীবন যাত্রার মান এবং আয়ের স্তর উভয়ই এত নীচু যে ভোগ্যদ্রব্যের ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে হইলে জনসাধারণের অস্তিত্ব-রক্ষার স্তর (Subsistence level) বজায় রাখা সম্ভব হয় না ; সঞ্চয়ের পরিমাণ তাই খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল দেশসমূহে লোকের সোণা বা জমির উপর আকর্ষণ বেশী—শিল্প, বিশেষ করিয়া মূলধনী দ্রব্যের শিল্প গঠনে সাহস ও ইচ্ছা নাই বলিলেই চলে। দেশে সঞ্চয় সংগ্রহ করার উপযোগী প্রতিষ্ঠানের একান্ত অভাব ; ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, শেয়ারের বাজার, উৎপাদক শ্রেণী, সকল কিছুই অনুন্নত। সর্বশেষে, শিল্পের নেতা হইবার উপযুক্ত প্রচেষ্টা, এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনের উপযোগী মূল ও ভারী শিল্প সব কিছুরই অভাব।

মূলধন-গঠনের তিনটি স্তরেই অনুন্নত দেশে অসুবিধা

সাধারণ ভাবে দুই ধরণের অনুন্নত দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, যে দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী এবং জমি কম দ্বিতীয়তঃ, যে দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব কম এবং জমি বেশী। প্রথম ধরণের দেশসমূহে প্রচুর লোক কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও বলা চলে যে দেশে ছদ্ম-বেকারী (Disguised unemployment) আছে (অর্থাৎ অপর কোন কাজে যোগদানের সুযোগ না থাকার দরুণই লোকে জমি চাষে নিযুক্ত আছে, অন্য কাজ পাইলে কিয়দংশ কৃষি কার্য্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছে)। এই সকল দেশে মূলধন গঠন কার্য্যে (যেমন রাস্তাঘাট, জলসেচ বা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণে) লোক নিয়োগ করা চলিতে পারে, কারণ তাহাতে কৃষি উৎপাদন না কমিবারই সম্ভাবনা। যাহারা কৃষিতে নিযুক্ত রহিয়া গেল তাহারা দেশের সকলের (নিজেদের এবং মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের) জন্য অন্ততঃ পূর্বের পরিমাণ

জীবন যাত্রার মান না কমাইয়া

খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করিবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে কৃষিতে নিযুক্ত লোকজন তাহাদের ব্যক্তিগত আয় তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধি করিতে না পারে, কারণ তাহা হইলে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিরা উপযুক্ত পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইবে।

যে সকল দেশে জমির পরিমাণ বেশী অথচ লোকসংখ্যা কম, সেখানে কৃষিতে নিযুক্ত লোকজনের কোন অংশ সরাইয়া আনিলে কৃষি উৎপাদন কমিয়া জীবন যাত্রার মান কমিবার সম্ভাবনা; সুতরাং মূলধন-গঠন অসুবিধা-জনক। সেই দেশে, প্রথমে, কিছুটা জীবন যাত্রার মান কমাইয়া, উন্নতধরণের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়া বা বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া, পরে তাহার সাহায্যে জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও কৃষিজ উৎপাদন কিছুটা বাড়াইতে হইবে। এইরূপে স্তরে স্তরে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর হইবে। সেই বর্দ্ধিত উৎপাদন হইতে কিছুটা সঞ্চয় করিয়া দেশের কিয়দংশ লোককে মূলধনী-দ্রব্য উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ করা চলিবে।

প্রথমে জীবন যাত্রার মান কিছুটা কমাইয়া

সংগঠন

সংজ্ঞা (Definition) : শিল্প-বিপ্লবের ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সমগ্র উৎপাদনের ধরণ আজকাল বিশেষায়িত (Specialised) এবং ঝুঁকিবহুল হইয়া উঠিয়াছে। বিরাট আয়তনে জটিল ও বহুমূল্য যন্ত্রপাতির ব্যবহারের দ্বারা বহুসংখ্যক শ্রমিকের সাহায্যে অনির্দ্দিষ্ট চাহিদার উদ্দেশ্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া আধুনিক কালের ফার্মগুলি উৎপাদন করে। সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার জটিলতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বিশেষজ্ঞ এবং উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া এই কার্য্য সম্পাদন করা দুরূহ ব্যাপার। সমাজে যাহারা উৎপাদনের উদ্যোগ ও পরিচালনা করেন, তাহাদের বলা হয় উদ্যোক্তা (Entrepreneur)।

সংগঠনকে পৃথক উপাদান বলা উচিত কি না (Is Organisation a separate factor ?)

নিওক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ সংগঠনকে একটি পৃথক উৎপাদনের উপাদান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সংগঠনের কাজ হইল শ্রম, মূলধন

ও ভূমির সংযোগ সাধন এবং উৎপাদনের উপযোগী করিয়া ইহাদের আয়ত্তাধীন রাখা। উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করাও সংগঠনের কাজ।

কেন পৃথক বলা উচিত

বিপদের মুখে ধৈর্য্য সহকারে কার্য্য পরিচালনা করা, সময়নিষ্ঠা, এই সকল প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণ অপর উপাদানের কম থাকিলেও চলে, কিন্তু এই সকল গুণই সংগঠন-পরিচালকের বৈশিষ্ট্য। সুদক্ষ বিবেচনা, নৈপুণ্য ও স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা, সংগঠন-পরিচালনাকে অপর সকল উপাদান হইতে পৃথক করিয়া ইহাকে এক বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। সুতরাং ইহাকে পৃথক উপাদান বলা উচিত।

কিন্তু সকল আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ সাধারণভাবে সংগঠনকে পৃথক উপাদান হিসাবে স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে, ইহা শ্রমের একটি রূপ মাত্র, শ্রম হইতে এই উপাদান পৃথক নহে। শ্রমিকই মানুষ ও দ্রব্যাদি লইয়া কাজ চালাইবার উপযোগী জ্ঞান রাখে ; কেয়ার্নক্রস্ বলিতেছেন যে "শ্রমের বৈশিষ্ট্যই হইল বুদ্ধি ও বিবেচনা।" সকলের মধ্যেই কম বেশী সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে ; যাহাদের বেশী, তাহারা উদ্যোক্তা বা পরিচালক হইতেছেন ;

কেন উচিত নহে

যাহাদের কম, তাহারা তাঁহাদের অধীনে আছেন এবং হয়ত কিছু কম আয় করেন। একই যোগ্যতার পরিমাণগত পার্থক্য তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায়, গুণগত পার্থক্য নহে। ঝুঁকি বহন করা শুধুমাত্র সংগঠন পরিচালকের গুণ নহে ; সকল শ্রমিকই শরীর, স্বাস্থ্য ও বেকারীর ঝুঁকি মাথায় করিয়া কাজ করে। অর্থের ঝুঁকি ও জীবনের ঝুঁকির পার্থক্য এরূপ নহে যে, ইহাদের পৃথক উপাদান বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। অপর যে সকল গুণের জন্য সংগঠনকে একটি পৃথক উপাদানের স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহা শ্রমিকদের মধ্যেও যথেষ্ট আছে, তাহা না হইলে বর্ত্তমান যুগের জটিল ও যান্ত্রিক উৎপাদন তাহাদের দ্বারা সম্ভব হইত না। সুতরাং সংগঠনকে একটি পৃথক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

কিন্তু উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে কাজের পার্থক্য নাই বটে, কিন্তু যে ভাবে ইহাদের আয় হয় তাহা পৃথক। মজুরী ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য খুবই বেশী, ইহাদের নির্দ্ধারণের নিয়মও পৃথক। সুতরাং এমতাবস্থায় বিশ্লেষণ ও আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাকে পৃথক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা চলিয়া আসিতেছে।

উদ্যোক্তার কার্য্য ও গুরুত্ব (Functions and importance of Entrepreneur) :

এক] ভূমি, শ্রম ও মূলধন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে উৎপাদন সম্ভব হয় না ; ইহাদের একত্র সমাবেশ করিলেও আপনাআপনি দ্রব্যোৎপাদন সুরু হইতে পারে না। চিন্তা ও পরিকল্পনা করিয়া ইহাদের এমনভাবে সম্মিলনের ও সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা করিতে হয় যাহাতে ইহারা উৎপাদনপ্রক্রিয়ার কার্য্য সুরু করিতে পারে। উদ্যোক্তা তাহাই করে। সে অন্য সকল উপাদানের নিয়োগকর্ত্তা, তাহাদের উৎপাদনকার্য্যের উপযোগী ইউনিটে বিভক্ত করিয়া উৎপাদন পদ্ধতি এবং এবং উপাদান-সম্মিলন স্থির করিয়া উৎপাদন সুরু করে।

দুই] উদ্যোক্তাকে স্থির করিতে হয়, সে কি উৎপাদন করিবে, কোথায় করিবে, দ্রব্যের উৎকর্ষ কিরূপ হইবে, কত পরিমাণে, এবং কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে। অর্থাৎ তাহাকে বাজারের চাহিদা বুঝিয়া দ্রব্য স্থির করিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে যাহাতে উৎপাদন করা যায় সেরূপ স্থান নির্বাচন করিতে হইবে। প্রতিযোগী ও পরিবর্ত্ত সামগ্রীর গুণাগুণ বিচার করিয়া, ব্যয় ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভবিষ্যৎ দ্রব্যের গুণ স্থির করিবে। বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা এবং ব্যয়-রেখার (cost-curve) [illegible] করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক করিবে। এবং বিভিন্ন উৎপাদন সম্মিল[illegible] ফলাফল হিসাব করিয়া নিজের উৎপাদন-পদ্ধতি ও উপাদান-সম্মিলন গ্রহণ করিবে।

তিন] ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করা উদ্যোক্তার কার্য্যের অঙ্গ। পূর্ব্ব ধারণা ছিল যে, ব্যবসার দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও পরিদর্শন তাহার কাজের অংশ। কিন্তু বর্তমানে যৌথ ব্যবসায়ী ফার্ম সমূহে দৈনন্দিন পরিচালনা সংক্রান্ত কাজগুলির ভার মাহিনা-ভোগী কর্মচারীদের উপর দেওয়া হইয়াছে। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব উদ্যোক্তাগণ নিজেদের হাতে রাখিয়াছে। শেয়ারক্রেতাগণ বাৎসরিক সভায় সকল কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্য দিয়া উদ্যোক্তার কার্য্য চালাইয়া থাকে।

চার] অন্যান্য উপাদানকে শুধু নিয়োগ করাই উদ্যোক্তার কার্য্য নহে, প্রত্যেককে নির্দিষ্ট সময়ের পর পূর্বচুক্তি অনুযায়ী তাহাদের প্রাপ্য বেতন বা অর্থ দেওয়াও তাহার কার্য্য। ভূমির মালিককে খাজনা, শ্রমিককে

মজুরী, মূলধনের মালিককে সুদ দেওয়ার পরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সে নিজে মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করিবে। কিছু অবশিষ্ট না থাকিলে সে কিছু পাইবে না ; কম পড়িলে তাহারই লোকসান হইবে।

পাঁচ] উদ্যোক্তার অন্যতম প্রধান কার্য্য হইল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করা। এই ঝুঁকি বহু বিষয়ের। ফ্যাশান ও রুচি বদ্‌লাইয়া দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে ; প্রতিযোগী বা পরিবর্ত্ত সামগ্রীর উৎপাদন সুরু হইতে পারে ; অচিন্ত্যপূর্ব কারণে ব্যয়বৃদ্ধি হইতে পারে। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বাভাবিক গতিশীলতার (Dynamicity) ফলেই এরূপ বহু ঝুঁকি তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। আগুন লাগা বা অপর কোনরূপ দুর্ঘটনার ঝুঁকি সে সর্বদা পূর্বেই ইনসিওর করিয়া কমাইয়া রাখে, কিন্তু ব্যবসার যে সকল ঝুঁকি ইনসিওর করা যায় না সেই প্রকার ঝুঁকি সর্বদাই তাহাকে বহন করিতে হয়। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিলেও তাহা সর্বদা কমাইবার চেষ্টা করাও উদ্যোক্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ছয়] জে, বি, ক্লার্ক বলেন যে, উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হইল নূতনত্ব আনয়ন করা (Innovation)। কোন উদ্যোক্তা নূতন দ্রব্য, নূতন পদ্ধতি বা যন্ত্র এইরূপ কিছু সুরু করিতে পারিলে অন্যান্য ফার্মের তুলনায় তাহার অধিক মুনাফা হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত অন্যান্য উদ্যোক্তা তাহাকে অনুকরণ না করে, ততদিন সে এই অধিক মুনাফা লাভ করিতে থাকে। কিন্তু ইহার পরে ক্রমে সকলেই ইহা গ্রহণ করিলে আবার তাহাকে নূতনত্ব আনয়নের চেষ্টা করিতে হয়। সমাজে আবিষ্কার ও নূতন-প্রচলন করা উদ্যোক্তার কার্য্যের অঙ্গ।

উদ্যোক্তার এই সকল কাজ হইতে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাহার স্থান কত গুরুত্বপূর্ণ ইহা বোঝা যায়। আধুনিক কালে, চাহিদার স্থান হইতে বহুদূরে, দীর্ঘকাল ব্যাপী উৎপাদনই সাধারণভাবে প্রচলিত হইয়াছে। স্থান ও কালের ব্যাপারে বহুদূরে অবস্থিত উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে উদ্যোক্তাকে উৎপাদন চালাইতে হয়। নূতন প্রতিযোগী ফার্ম কম ব্যয়ে ইতিমধ্যে উৎপাদন চালাইতে পারে, নূতন ফ্যাশানের দ্রব্য উৎপাদন হইতে পারে, ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে, বিদেশী প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইয়া উঠিতে পারে—অজানা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ব্যবসা-সমুদ্রে আধুনিক উদ্যোক্তাকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়। বিজ্ঞানের নব নব

আধুনিক যুগে তাহার গুরুত্ব

আবিষ্কারকে যন্ত্রবিজ্ঞানে রূপান্তরিত করিয়া ব্যয় না কমাইলে কোন ব্যবসা প্রতিযোগিতায় টিকিবে না ; বাজার ও ক্রেতাদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণা না করিলে ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী সামগ্রীকে হটাইয়া নিজের দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। দেশে যে জটিল ধরণের ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, শেয়ার বাজার ও মূলধনের বাজার সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে নিজের সুনাম রক্ষা করিয়া প্রয়োজন মত মূলধন তুলিতে না পারিলে চলিবে না। এই যুগে, তাই, বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং বিচার বুদ্ধি ও বিবেচনাসম্পন্ন উদ্যোক্তাশ্রেণী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে নেতৃস্থানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

অনুশীলনী

1. "Production has been defined as creation of utilities". Discuss.

2. What are factors of Production ? What is the effect of variations in the proportions of the different factors ? (C. A. '47)

3. State clearly the Law of Diminishing Returns and explain the circumstances under which it holds good. (B. A. '37, C. A. '52)

4. "The Law of Diminishing Returns is only one phase of the universal law of Variable Proportions." Elucidate (B.com. '51)

5. Explain why the Law of Diminishing Returns prevails in agriculture and the Law of Increasing Returns mainly in manufacture. (B. A. '52)

6. How far is the teaching of Malthus relevent to the population problem of our days ? (B.com. '34)

7. When is a country said to be over-populated and when under-populated ? (C. A. '50, '51)

8. What is capital ? Is money capital ? Justify your answer by proper reasoning. (B. A. '37, '42, '55)

Discuss its functions.

9. Distinguish between the different senses in which the word capital is used in popular and economic language. (B. A. '44)

10. Point out the different factors that affect the supply of capital in a country. (B. A. '45)

11. Discuss the problem of capital-formation in an under-developed country like India.

12. What are the functions of the entrepreneur ? Estimate his importance in the modern economic organisation. (C. U., B. A. '43, '48, '52, C. A. '45, '50)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উদ্যোক্তার বিভিন্ন সাংগঠনিক রূপ

(Forms of Entrepreneurial Organisation)

এক-মালিকানা ব্যবসা : (Single Entrepreneur ship)

একজন মালিক কোন ফার্মের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, সবই যদি নিজে করেন তাহা হইলে সেই ব্যবসাকে এক-মালিকানা-ব্যবসা বলে। বহু প্রাচীন-কাল হইতে এই এক-মালিকানা ব্যবসার প্রচলন আছে। মুনাফা করিতে পারিলে সেই মালিকই মুনাফা সম্পূর্ণরূপে একা ভোগ করিবেন। লোকসানের ঝুঁকিও তিনি একাই বহন করেন। এইরূপ ব্যবসার কয়েকটি সুবিধা আছে।

এক-মালিকানার সুবিধা

(ক) ইহাতে অপব্যয় কম হয়। যে ব্যবসার মালিক নিজে সর্বদা পরিদর্শন ও পরিচালনা করেন সেই ব্যবসাতে অপব্যয় হওয়া শক্ত, বেতনভুক্ কর্মচারীর চক্ষে যে ব্যয়বাহুল্যের কারণ ধরা পড়ে না, মালিকের চক্ষে সে অপব্যয় নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে।

(খ) মালিক মাত্র একজন থাকায় ব্যবসা সংক্রান্ত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করিতে পারেন ; কাহারও সহিত আলোচনা বা কাহারও মত লইবার প্রয়োজন হয় না। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা থাকায় সঙ্কটের সময়ে বা অনিশ্চয়তার মুখে এই ব্যবসা-সংগঠন অন্যান্যরূপ সংগঠনের তুলনায় সহজে টিকিয়া যাইতে পারে।

(গ) মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক সৌহার্দ্রপূর্ণ থাকে। শ্রমিকদের অবস্থা মালিক স্বচক্ষে সর্বদা দেখিতে পান, শ্রমিকরাও প্রয়োজন হইলে স্বয়ং মালিকের শরণাপন্ন হন, মালিকের উপস্থিতি শ্রমিকদের কাজে উৎসাহিত করে। দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মধ্য দিয়া উভয়ের সম্পর্ক মোটামুটি ভাবে সম্প্রীতিপূর্ণ থাকে।

(ঘ) একক মালিক দ্রব্যের ঔৎকর্ষ সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকে এবং জনসাধারণের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করিতে পারে। বহু-মালিকানা থাকিলে ইহাতে অসুবিধা হইতে পারে।

কিন্তু ইহার অনেক ত্রুটি আছে।

(ক) মূলধনের স্বল্পতা এইরূপ এক-মালিকানার প্রধান অসুবিধা। আধুনিক কালের বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন কখনই অল্প মূলধনের দ্বারা সম্ভব নহে।

(খ) তাহা ছাড়া, এইরূপ ব্যবসাতে ঝুঁকিও অত্যধিক, কারণ একজন মালিকই সকল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিয়া থাকেন। আজকাল কৃষি, হোটেল, খুচরা বিক্রয়ের দোকান ইত্যাদি ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদন ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবসার প্রচলন থাকিলেও বৃহৎ মাত্রার উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে ইহারা দ্রুত অপসৃয়মান।

এক-মালিকানার অসুবিধা

অংশীদারী ব্যবসা (Partnership) :

অল্প কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া কোন ব্যবসার মালিক হইলে এবং সকলে মিলিয়া তাহা পরিচালনা করিলে তাহাকে অংশীদারী ব্যবসা বলা হয়। ইহার দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, অংশীদারদের মিলিত ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করিতে হইবে, এবং দ্বিতীয়তঃ, কোন অংশীদারের আর্থিক লেন-দেনের দায়িত্ব অন্য অংশীদারকে গ্রহণ করিতে হইবে। অংশীদারী ব্যবসা অসীম-দায়-সম্পন্ন (unlimited liability)। অংশীদারদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া এই ব্যবসা চলে।

বৈশিষ্ট্য

অংশীদারী ব্যবসার সুবিধা অনেক।

(১) ইহা একক মালিকানা ব্যবসায়ের তুলনায় অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। একা যে পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ করা সম্ভব তাহার তুলনায় কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া অধিকতর ঝুঁকি গ্রহণ করিতে পারেন।

(২) পরিচালনার মোট কাজকে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন অংশীদার পরিচালনার এক এক ক্ষেত্রে দক্ষতা লাভ করেন—ফলে মোট দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

সুবিধা

(৩) ইহার সাংগঠনিক কাঠামো খুবই নমনীয় (flexible)। প্রয়োজন হইলে নূতন অংশীদার গ্রহণ করিয়া মূলধন বা পরিচালনযোগ্যতা বাড়ান সম্ভবপর।

(৪) যেহেতু মিলিতভাবে সকলের নিকট হইতে বা যে কোন অংশীদারের নিকট হইতেই আদায় হওয়া সম্ভব, সেই জন্য অংশীদারী ফার্মের পক্ষে বাজারে ঋণ পাইবার সুবিধা থাকে।

কিন্তু ইহার বহু ত্রুটি ও অসুবিধাও আছে।

(১) অংশীদারদের মধ্যে মতের অমিল হইলে পরিচালনযোগ্যতা হ্রাস পায়।

(২) কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে বা ব্যবসা হইতে কোন অংশীদার সরিয়া আসিতে চাহিলে অংশীদারী-সংগঠন ভাঙিয়া যায়।

অসুবিধা

(৩) সাধারণতঃ, ধনী ব্যক্তিরা সম্পত্তি ও সম্পদ হারাইবার ভয়ে অংশীদারী ব্যবসাতে প্রবেশ করিতে চাহেন না কারণ এই ব্যবসার দায় অসীম। ইংলণ্ডে, কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ দায় সম্পন্ন অংশীদারী ব্যবসা দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) আধুনিক যুগের উৎপাদনের পক্ষে যে মূলধন দরকার তাহা কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া সংগ্রহ করিতে পারেন না, বা যে পরিমাণ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয়, তাহা কয়েকজনের পক্ষে সম্ভব নয়।

যৌথ মূলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (Joint Stock Company):

বহুব্যক্তি একত্রে মূলধন সংগ্রহ করিয়া এবং সঙ্ঘবদ্ধ পরিচালনার দ্বারা যখন ব্যবসা গড়িয়া তোলে, তাহাকে যৌথ মূলধনী ব্যবসা বলে। অর্থনৈতিক কাজকর্মে এই প্রতিষ্ঠানের একটি পৃথক সত্তা থাকে, কোম্পানী নিজের নামেই ব্যবসা চালায়, ক্রয় বিক্রয়, ঋণ গ্রহণ ও ঋণদান, কাহারও সহিত চুক্তি ইত্যাদি সকল কিছু করিতে পারে। কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিয়া, কি কি ব্যবসা করিবে এবং কোম্পানীর নিয়মাবলী সংক্রান্ত স্মারকলিপি (Article of Memorandum) জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া, শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয়ের দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিবে। সেই শেয়ার ক্রেতাগণ সভায় মিলিত হইয়া ভোটাধিকার প্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া একটি পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) গঠন করিবে।

কি ভাবে গঠিত ও পরিচালিত হয়

প্রতি বৎসর নূতন পরিচালকমণ্ডলী গঠনের অধিকার কোম্পানীর শেয়ার ক্রেতাদের থাকিবে। এই 'পরিচালকমণ্ডলী' কোম্পানী চালাইবার উপযোগী উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিবে এবং বাৎসরিক সভায় গৃহীত নীতি অনুযায়ী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের কার্য্য করিবে। এইভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবসা

পরিচালনা যৌথ-মূলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য, যদিও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকজন উদ্যোক্তা বা শেয়ার ক্রেতার হাতেই আসল পরিচালন ক্ষমতা চলিয়া যায়।

কি ভাবে মূলধন সংগৃহীত হয়ঃ

সাধারণতঃ যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান দুইটি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে ; শেয়ার বা ষ্টক্ বিক্রয় এবং ডিবেঞ্চার বা বণ্ড বিক্রয়। শেয়ার বা ষ্টক্ হইল কোম্পানীর অংশপত্র, ইহার ক্রেতারা কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, ডিবেঞ্চার হইল কোম্পানীর ঋণপত্র, ইহার ক্রেতারা কোম্পানীকে ঋণদানকারী। শেয়ারক্রেতাদের আয় হইল লভ্যাংশ (Dividend), তাহা মোট মুনাফা এবং তাহার বণ্টন-নীতির উপর নির্ভরশীল ; ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের আয় হইল সুদ তাহা ডিবেঞ্চার-ক্রয়ের সময়ই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। অন্যান্য সকলকে মিটাইয়া দেওয়ার পরেই শেয়ার ক্রেতাদের লভ্যাংশ পাইবার সম্ভাবনা : ডিবেঞ্চার ক্রেতাগণ সর্বাগ্রে তাহাদের পাওনা পাইয়া থাকেন। কোম্পানী যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের পাওনা প্রথমে মিটিবে ; শেয়ার-ক্রেতাদের পাওনা সর্বশেষে। সংক্ষেপে, শেযার ক্রেতাদের ঝুঁকি সর্বাধিক : ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম।

শেয়ার ও বণ্ড

বণ্ড বা ডিবেঞ্চার বহু প্রকারের থাকিতে পারে। কোন কোন ডিবেঞ্চারে কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তি (যেমন বাড়ী, যন্ত্র ইত্যাদি) বন্ধক দেওয়া থাকে, কোন ডিবেঞ্চারে কোম্পানীর সকল সম্পত্তিই সাধারণভাবে বন্ধক দেওয়া থাকে। ইহা ব্যতীত প্রথম—বন্ধকী বণ্ড, দ্বিতীয়—বন্ধকী বণ্ড, ইত্যাদি শ্রেণীর বণ্ড থাকে। কোম্পানী উঠিয়া গেলে প্রথম-বন্ধকী বণ্ড ক্রেতাগণ প্রথমে পাওনা পাইবে, তাহার পরে দ্বিতীয়-বন্ধকী বণ্ডক্রেতাগণ পাওনা পাইবে। এইরূপে ডিবেঞ্চারে ঝুঁকির তারতম্য করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার বণ্ড

শেয়ারের ক্ষেত্রেও বহুপ্রকারের শেয়ার বা ষ্টক (অংশপত্র) থাকে। বহু শ্রেণীতে বিভক্ত এই শেয়ারগুলি বিভিন্ন পরিমাণের ঝুঁকিবহনেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট উপস্থাপিত করিলে শেয়ার ক্রেতা ও কোম্পানী উভয়েরই শেয়ার ক্রয়ে ও বিক্রয়ে সুবিধা হয়। সাধারণ শেয়ার (Ordinary Shares) সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিবহুল। সর্বাগ্রে লভ্যাংশ দেয় শেয়ারের (Preference Shares)-

ক্রেতাদের লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট থাকে, মুনাফা হইলে সেই নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায়, মুনাফা না হইলে লভ্যাংশ পায় না। সর্বাগ্রে লভ্যাংশ-দেয় শেয়ার হইতেও কম ঝুঁকি সম্পন্ন হইল ইহারই আর এক ধরণ। যে কয় বৎসর মুনাফা না হওয়ায় এই শেয়ার-ক্রেতা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইল না ; পরবর্তীকালে মুনাফার বৎসরে সেই হারে সেই পুরাতন কম বৎসরের লভ্যাংশও পাইবে (Cumulative Preference Shares)। সর্বাগ্রে লভ্যাংশ-দেয় শেয়ারগুলি সংলগ্ন (Participating) অথবা অসংলগ্ন হইতে পারে (Non-participating)। সংলগ্ন শেয়ারগুলি নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইবার পরেও সাধারণ শেয়ারের ন্যায় লভ্যাংশ পাইয়া থাকে। অসংলগ্ন শেয়ারগুলি শুধু নির্দিষ্ট হারেই লভ্যাংশ পাইয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রকার শেয়ার

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) ঃ

যৌথ-মূলধনী ব্যবসার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার ফলে ইহা অন্যান্য ধরণের প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথক। প্রথমতঃ, শেয়ার ক্রেতাদের অর্থাৎ মালিকদের দায় সীমাবদ্ধ (Limited Liability)। অন্যান্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কোম্পানীর ঋণের দায় অসীম ; মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেও ঋণশোধ ~~করিতে~~ করিতে হইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে মূল্যের শেয়ার-ক্রয় করা হইয়াছে কোম্পানী ঋণ করিয়া উঠিয়া গেলে তাহার বেশী দায়িত্ব শেয়ার ক্রেতার নাই।

১০০৲ টাকার একটি শেয়ার ক্রয় করিয়া কেহ সম্পূর্ণ টাকা-ই কোম্পানীকে দিয়াছে এরূপ হয়, তাহা হইলে তাহার আর কোন দায় নাই। যদি ১০০৲ টাকার শেয়ারের (ধরা যাউক) ৭০৲ দেওয়া হইয়া থাকে (Paid-up) ; তবে বাকী ৩০৲ পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে আদায় হইতে পারে, ইহার বেশী নহে। অর্থাৎ কোম্পানীর ঋণের জন্য শেয়ার ক্রেতাদের দায় নিজের নামে ক্রীত শেয়ার-মূল্যের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ।

সীমাবদ্ধ দায় ও মালিকানা পরিচালনার মধ্যে পার্থক্য

দ্বিতীয়তঃ, যৌথ-মূলধনী ব্যবসাতে ব্যবসার মালিকানা ও দৈনন্দিন পরিচালনার মধ্যে পার্থক্য থাকে। যাহারা মালিক তাহারা বেতনভুক্ কর্মচারীদের দ্বারা ব্যবসা-পরিচালনার সাধারণ কাজগুলি করাইয়া থাকেন।

সুবিধা (Advantages) :

এক] বলাই বাহুল্য যে, আধুনিক যুগের বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদনী ফার্ম সমূহ গঠন করিতে হইলে যৌথ-মুলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তির নিকট অংশপত্র বিক্রয় করিয়া প্রভূত মূলধন সংগ্রহ করা ইহার পক্ষেই সম্ভব। শুধু তাহাই নহে। অসংখ্য ব্যক্তি প্রত্যেকে স্বল্পমূল্যের শেয়ার ক্রয় করার দরুণ ঝুঁকি-বহুল উৎপাদন ও ব্যবসা সুরু করা সম্ভব হয়, কারণ প্রত্যেক শেয়ার ক্রেতার নিজস্ব ঝুঁকির পরিমাণ কম থাকে।

দুই] দায় সীমাবদ্ধ থাকায় এবং শেয়ারের দাম কম হওযায বিনিয়োগ-কারীদের ঝুঁকি কমিয়া যায়।

তিন] কোম্পানীকে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া, যে কোন শেয়ার-ক্রেতা, নিজের প্রয়োজনে বা অপছন্দ হইলে যখন খুসী শেয়ার বিক্রয় করিয়া অর্থ ফিরিয়া পাইতে পারে।

চার] শেয়ারগুলি হস্তান্তর যোগ্য ও যখন খুসী বিক্রয় করা সম্ভব। শেয়ার-ক্রেতার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীরা অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় শেযারেরও মালিকানা পাইয়া থাকে। সুতরাং শেয়ার ক্রেতাদের মৃত্যুতে ফার্মের উৎপাদন ধারায় কোন ক্ষতি হয় না, তাহা অব্যাহত থাকে।

পাঁচ] আধুনিক সমাজে সাধারণ লোকদের ব্যবসাতে যোগদান করিবার সুযোগ এই ধরণের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া সম্ভব। এবং তাহারা ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের দ্বারা অল্প দামের শেয়ার ক্রয় করিয়া বিনিযোগের সুযোগ পাইতেছে।

ছয়] পরিচালনার যোগ্যতাবিহীন অর্থবান ব্যক্তি অর্থের বিনিয়োগ করিবার সুযোগ পায় ; যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজেদের অর্থ না থাকিলেও (বেতনভুক্ কর্মচারী হিসাবে) ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ পায়।

সাত] শেয়ার ক্রেতাদের মোট ঝুঁকি কম বলিয়া এই ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বহু অর্থ গবেষণা ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ব্যয় করে। সভ্যতার অগ্রগতিতে ইহাদের দান কম নহে।

অসুবিধা ও ত্রুটি (Difficulties and Defects) :

ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা এবং মালিকানার বিকেন্দ্রিকতা দুইটি মিলিয়া যৌথ মূলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বহু ত্রুটি বিচ্যুতির সৃষ্টি করিয়াছে।

এক] পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা সাধারণতঃ সকল শেয়ার ক্রেতাদের নিকট থাকে না। কয়েকজন ·বুদ্ধিমান চালাক চতুর ব্যক্তি একটি উপদল গঠন করিয়া শেয়ারের অল্পাংশের মালিক হইয়া প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পায়। ফলে গণতান্ত্রিক প্রকৃতির বদলে উপদলীয় চক্রান্তের আবহাওয়া দেখা যায়।

দুই] মুষ্টিমেয় ব্যক্তির নিকট ক্ষমতা থাকিলে যত ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়া সম্ভব, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে তাহার সবই থাকিতে পারে। কোম্পানীর বাৎসরিক বিবরণীতে মিথ্যা প্রচার করা, আত্মীয়তোষণ ও স্বজনপোষণ, নিজ দলের লোকদের লইয়া ভুয়া ব্যবসার নামে দ্রব্য বা শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের দালালি করিয়া অর্থোপার্জন, শেযারের দামের উঠানামা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে উপদলভুক্ত ব্যক্তিদের আয় ও সুবিধা প্রাপ্তি ঘটে—এইরূপ বহুদোষ যৌথ-মূলধনী ব্যবসার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

তিন] বেতনভুক্ কর্মচারীদের সাহায্যে পরিচালনার দরুণ সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা দেওয়া অসম্ভব নহে। মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগে বহু দোষত্রুটি এই সংগঠনকে দুর্বল করিয়া দেয়।

চার] শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সাধারণতঃ শান্তিপূর্ণ থাকে না। শ্রমিকগণ জানেনই না তাঁহাদের মালিক কাহারা, মালিকদের সম্বন্ধে কোন সহানুভূতি তাঁহাদের মনে সৃষ্টি হয় না। 'কোন এক অশরীরী অদৃশ্য যন্ত্রের হুকুমে চাকুরী করা' এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। মালিকরাও শ্রমিকদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থাকিয়া কেবল মুনাফার তাড়নায় এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করেন যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কোন বিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে মুখোমুখি অবস্থায় দুই পক্ষের মিলিত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ মালিকবৃন্দ সারা পৃথিবীময় অগণিত শেয়ার ক্রেতারূপে ছড়াইয়া থাকেন।

পাঁচ] ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আধুনিক একচেটিয়া ধনতন্ত্রবাদ এই যৌথ মূলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সৃষ্টি হইয়াছে। অল্প সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করিয়া অধিক ক্ষমতা হাতে আনার এবং একই শিল্পের সকল ফার্মের কিছু কিছু শেয়ার কিনিয়া ইহাদের সকলকে নিজের হাতে আনার সুবিধা হইয়াছে। যেহেতু দৈনন্দিন পরিচালনার ভার নিজের হাতে লওয়ার প্রয়োজন হয় না, তাই এক ব্যক্তি দেশের সকল শিল্প, ব্যাঙ্ক ও পুঁজির কারবারের

মালিকানা করায়ত্ত করিতে পারেন। কয়েকজন ব্যক্তি সকল শিল্পেরই প্রধানতম ব্যক্তি হইয়া উঠেন, দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পরিচালক হইয়া উঠেন। বিভিন্ন শিল্পের ও ফার্মের প্রধান পরিচালক হিসাবে ইঁহারা গণ্য হয়.এবং অনেক সময় দেশের রাজনীতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করে। একই ব্যক্তি একটি শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ফার্ম বা শিল্পের পরিচালক হইতে পারে, ইহাকে পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত পরিচালনার অবস্থা (Interlocking Directorship) বলে।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগের ঝুঁকি : (Joint stock Company and Risks of Investment) :

এক] বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন চালাইতে গেলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। শুধু তাহাই নহে, সেই মূলধন সুদীর্ঘকাল ব্যবসাতে আবদ্ধ থাকে। ঝুঁকিবহুল উৎপাদনে সেই মূলধন নিযুক্ত হয়। প্রধানতঃ, সেই মূলধন কোম্পানীর স্থির পুঁজি রূপে আবদ্ধ থাকে। স্থির পুঁজির স্থায়িত্ব যত দীর্ঘ হইবে, মূলধন-বিনিয়োগকারী ব্যক্তিকে তত বেশী দিনের জন্য মূলধন নিজের আয়ত্তের বাহিরে রাখিতে হইবে। এই ধরণের দীর্ঘকালীন ও বিশেষরূপ যন্ত্রে অর্থ বিনিয়োগের ত্রুটি এই যে, যখন প্রয়োজন তখনই এই স্থির পুঁজিকে অর্থে রূপান্তরিত করা চলে না। প্রয়োজন-মত অর্থে রূপান্তরিত করিতে পারিলে সে বিনিয়োগ সুবিধাজনক ; কিন্তু বৃহৎ ও বিশেষ ধরণের যন্ত্র বা স্থির পুঁজিতে মূলধন আবদ্ধ থাকিলে বিনিয়োগের এই তারল্য (liquidity) বজায় থাকে না।

অর্থ আয়ত্তের বাহিরে থাকার ঝুঁকি

যৌথ মূলধনী ব্যবসার সুবিধা হইল এই যে যদিও কোম্পানীর সকল সম্পত্তি এইরূপ স্থির পুঁজি এবং প্রয়োজন-মত নগদ অর্থে রূপান্তরের অযোগ্য (Illiquid) অবস্থায় থাকে, ব্যক্তির বিনিয়োগের রূপ কিন্তু এই তারল্য বজায় রাখে। যে ব্যক্তি শেয়ার ক্রয় করিয়াছে, সে ইচ্ছা করিলেই তাহার শেয়ারপত্রখানা প্রয়োজনমত শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থে রূপান্তরিত করিতে পারে। ব্যক্তি বিনিয়োগ করে শেয়ার ক্রয় করিয়া, সেই শেয়ার সে তাহার সুবিধা মত সময়ে ও দামে বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। ইহার ফলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ঝুঁকি অনেক কমিয়া যায়।

দুই] বিনিয়োগের আর একটি ঝুঁকি হইল মূলধন লোকসান যাইবার ভয়। বহুকাল পরে দ্রব্য বাজারে আসিবে, বহুদূরের বাজারে যাইবে, যে বাজারের চাহিদা অনিশ্চিত সেইরূপ বাজারে গিয়া পড়িবে। ভবিষ্যৎ-এর অনিশ্চয়তার ঝুঁকি বহন করিয়া উৎপাদন করিতে হইবে। ভুল, ভ্রান্তি, দুর্ঘটনা সকল কিছুর ফলে লোকসান হইতে পারে, বিনিয়োগকারীর মূলধন সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে নষ্ট হইতে পারে। এই ভয় দূর করার ব্যাপারে যৌথ পুঁজি বিভিন্ন ভাবে যথেষ্ট সহায়তা করে।

অর্থ লোকসান যাইবার ঝুঁকি

(ক) প্রচুর মূলধন ও সুদক্ষ পরিচালন-যোগ্যতার সম্মিলন সাধনের ফলে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের ঝুঁকি ও অনিচ্ছা কমিয়া যায়।

(খ) যে বিনিয়োগকারী যতখানি ঝুঁকি গ্রহণ করিতে চায় সে সেইরূপ বণ্ড বা শেয়ার ক্রয় করে। সমাজে ঝুঁকি গ্রহণের ইচ্ছা কাহারও বেশী, কাহারও কম; সেই অনুযায়ী যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ঝুঁকি-সম্পন্ন বণ্ড ও শেয়ারের ব্যবস্থা আছে।

(গ) প্রতিটি পৃথক শেয়ারের মূল্য খুব কম এবং শেয়ার-ক্রেতাদের দায় সীমাবদ্ধ থাকায় শেয়ার-ক্রেতাদের ব্যক্তিগত এবং নিজস্ব ঝুঁকির পরিমাণ খুবই কম থাকে।

(ঘ) বর্তমানে ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, বিনিয়োগকারী সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠা হওয়াতে ব্যক্তির ঝুঁকি নাই বলিলেই চলে, কারণ ব্যক্তি এই সংস্থার মারফৎ অর্থ বিনিয়োগ করিলে ইহারা সেই ঝুঁকি নিজেরা লইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, ইহাদের সামর্থ্য অনেক এবং এবিষয়ে দক্ষতা এমনই যে ব্যক্তির ঝুঁকি অনেক কম। দু'একটা ক্ষেত্রে লোকসান হইলেও মোটের উপর সামগ্রিকভাবে ইহাদের ক্ষতি হয় না।

সমবায় (Co-operation):

পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ। শ্রমিকদের মতে, পুঁজির মালিকরা শ্রমিকদের শোষণ করেন; শ্রমিকরা ধনোৎপাদন করেন বটে, কিন্তু সেই ধনের মালিক হন পুঁজির মালিক। পুঁজিপতি ও মালিক ছাড়া নিজেরাই ব্যবসা ও উৎপাদনী ফার্ম সংগঠন করিলে এই শোষণ দূর হয়। যখন পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে সকলে মিলিয়া

মূলধন ও উদ্যোগশক্তি সরবরাহ করিয়া শ্রমিকরা নিজেরাই একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন, তখন তাহাকে 'সমবায়' বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই সমবায় সমিতি গঠিত হয়। কোন একদল শ্রমিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সমবায় গঠন করিতে পারে। অথবা, সমিতির সভ্যরা কম সুদে প্রয়োজন মত ঋণ পাইবার উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি স্থাপন করিতে পারেন। বেশী দামে বা ন্যায্য দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধার উদ্দেশ্যে সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইতে পারে। পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া সকলের সুবিধার জন্যও সমবায় গঠিত হয়।

এই সমবায়ী ব্যবসার সুবিধা হইল, যে ইহার ফলে সমিতির সভ্যদের আয় বৃদ্ধি হয়। শোষণ হইতে কিছুটা মুক্তি পায়। অনেক ক্ষেত্রে (যেমন সমবায় বিক্রয় সমিতির দরুণ) ব্যয় হ্রাস পায়। উৎপাদনী সমিতির ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে। শ্রমিক-মালিক সঙ্ঘর্ষ দূর হয়। শ্রেণী সংগ্রাম দূরীভূত হয়।

সুবিধা ও অসুবিধা

ইহার অসুবিধা হইল এই যে উৎপাদনে উৎসাহ ও প্রেরণা কমিয়া যায়। সকলের মিলিত দায়িত্ববোধের স্থলে সকলের মিলিত দায়িত্বহীনতা আসিয়া পড়িতে পারে। শৃংখলা বজায় রাখা শক্ত হইয়া পড়ে। ব্যবসায়ে বা উৎপাদনে নেতৃত্ব ও পরিচালনার যথেষ্ট প্রয়োজন, সমবায়-প্রথায় সকলের সমান দায়িত্ব থাকায় নেতৃত্বের ও পরিচালনার অভাব ঘটিতে পারে। এখন পর্য্যন্ত এই জাতীয় সমবায় সমিতিগুলির কার্য্য খুবই সীমাবদ্ধ।

রাষ্ট্র-পরিচালনা (Public Enterprise):

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (Laissez Faire) যখন প্রচলিত ছিল, তখন রাষ্ট্র কর্তৃক কোন শিল্প বা ব্যবসার মালিকানা গ্রহণ বা পরিচালনা অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বর্তমানে আর সে নীতি ধনবিজ্ঞানীগণ গ্রহণ করেন না। বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্রের মালিকানায় এবং পরিচালনায় সকল দেশেই আজকাল কম বা বেশী পরিমাণে শিল্প ও ব্যবসা পরিচালিত হইতেছে। যে সকল দ্রব্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হইলে দেশের পক্ষে তাহা ব্যয়সঙ্কোচশীল (economical), যেমন রেলপথ, যানবাহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি, ইহাদের রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত হওয়া উচিত,

পৃথিবীর সকল দেশেই আজকাল এইরূপ ধারণা বিদ্যমান। সরকারী ও আধা-সরকারী ভাবে বিরাট আর্থিক বা শিল্প সংস্থাসমূহ পরিচালিত হইলে দেশের পক্ষে কল্যাণকর, ইহা আজকাল সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ, তিনটি পদ্ধতিতে সরকারী মালিকানাভুক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহ পরিচালিত হয়। সরকারের দপ্তর হিসাবে পরিচালিত হইতে পারে, যেমন পোষ্ট আফিস ইত্যাদি; অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত স্বাধীন করপোরেশন দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে, যেমন, দামোদর ভ্যালি করপোরেশন। আধা-সরকারী বা বে-সরকারী বোর্ডের বা কমিটির দ্বারা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতে পারে; যেমন রেলওয়ে বোর্ড।

অনুশীলনী

1. Compare the merits and defects of the following types of business organisation. (a) Private Firm (b) Joint stock Company; (c) Co-operative enterprises.

(B. com. '43, B. A. '46)

2 Examine the reason for the predominance of Joint stock Companies over other forms of business organisation.

(B. com. '52)

3. How finance for Large-scale Production is raised in modern times?

4. How the Joint-stock Company reduces the risks of investment?



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উৎপাদন সংগঠন ও অর্থনৈতিক কাঠামো

বিশেষায়ণ (Specialisation) :

বর্তমান সমাজে মানুষ বহুপ্রকার দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করে, কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে সে নিজে সকল প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে না। হয়ত ইচ্ছা করিলে কাহারও পক্ষে অনেক প্রকার উৎপাদন করা সম্ভব; কিন্তু তাহা না করিয়া মাত্র এক প্রকার বা একটি দ্রব্যের উৎপাদন সে নিজে করে, এবং অপরের উৎপাদিত অন্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লয়। নিজের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা বা বিভিন্নমুখী উৎপাদন-ক্ষমতা বিসর্জন দিয়া একটি নির্দিষ্ট দিকে ব্যক্তির সামর্থ্যকে সীমাবদ্ধ রাখা এবং উৎপাদন ধারায় নিয়মিতভাবে একটি বিশেষ ধরণের কার্য্য করাকে বিশেষায়ণ (Specialisation) বলে।

কাহাকে বলে

আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইল বিশেষায়ণ। অ্যাডাম্ স্মিথ্ ১৭৭৬ সালে তাহার গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রম-বিভাগ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন শ্রমিকের উৎপাদনী-শক্তির সর্বাধিক উন্নতি, তাহার দক্ষতা, নিপুণতা ও উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি—এই সব কিছুর মূলেই রহিয়াছে শ্রম-বিভাগ। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এমন গুণ আছে যাহা দ্বারা কোন এক দিকে তাহার সকল শক্তি নিয়োগ করিলে সে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পদ উৎপাদন করিতে পারে। ব্যক্তি যদি সেই দ্রব্য উৎপাদনেই নিযুক্ত হয় তাহা হইলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তাহার শক্তি-সমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়।

শ্রম বিভাগ

আদিম সমাজেও শ্রম-বিভাগ প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোক গৃহের কার্য্যাদি করিত, পুরুষরা শিকার বা কৃষিকার্য্য করিত। বর্তমানে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এই পুরাতন ধরণের শ্রম-বিভাগ কমিয়া আসিতেছে। তাহার পরবর্ত্তী স্তরে একদল লোক সমাজে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত হইত, অপর কিছু লোক অন্য দ্রব্যাদি উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকিত; কেহ ধান, কেহ কাপড়, কেহ বা নৌকা। কোন দ্রব্য উৎপাদনের মোট ধারার সম্পূর্ণটাই তাহারা উৎপন্ন করিত। প্রাচীন

শ্রম বিভাগের ক্রম প্রসার

ভারতের সমাজে একটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনকারী বা কার্য্যাদি সাধনকারী শ্রেণী রাখিয়া দেওয়া হইত। গ্রামের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য গ্রামেই বিভিন্ন শ্রেণী দ্বারা উৎপন্ন হইত।*

কিন্তু আধুনিক জগতে শ্রম বিভাগ আরও প্রসার লাভ করিয়াছে। একটি দ্রব্য উৎপাদনের মোট উৎপাদনধারা বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হইয়াছে, এবং ক্রমশঃই বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্রতর অংশে পরিণত হইয়াছে।

শ্রম বিভাগের ফলই হইল সহযোগিতা। যেহেতু মানুষ সকল দ্রব্য উৎপাদন করে না, এমন কি একটি দ্রব্যও সম্পূর্ণ উৎপাদন করে না, সুতরাং তাহার অভাব মিটাইতে হইলে অন্যের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। এইভাবে সকলেই অন্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি বলা চলে। যতদিন সমাজে বিশেষায়ণ ছিল না, ততদিন সহযোগিতা না করিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু বিশেষায়ণের ক্রমপ্রসারের ফলে সহযোগিতা ব্যতীত সকল অভাব মোচনের কোন উপায় আর বর্তমান সমাজের ব্যক্তিদের নাই।

বিশেষায়ণ, সহযোগিতা ও বিনিময়

এই বিশেষায়ণের আর একটি ফল হইল বিনিময়: কারণ নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে অপরের উৎপন্ন দ্রব্য না পাইলে শ্রম বিভাগ চালু থাকা অসম্ভব।

শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of Division of Labour):

শ্রম বিভাগের বহু সুবিধা আছে।

(ক) সমাজে জনসাধারণের মধ্যে যে কাজে যাহার যোগ্যতা (Ability) সর্বাধিক সে সেই কাজে তাহার শক্তি নিয়োগ করে। ফলে তাহার দক্ষতা ও নিপুণতা বৃদ্ধি পায়। অল্প পরিমাণ একই কাজ বহুবার অভ্যাসের ফলে খুবই সহজসাধ্য হইয়া উঠে, শ্রমিকের উৎপাদনী-শক্তি বৃদ্ধি পায়। শ্রমবিভাগের ফলে সময়ের ব্যয় সঙ্কোচ ঘটায়। কম সময়ের মধ্যে সে তাহার কাজ শিখিতে পারে, কারণ তাহাকে উৎপাদনের সম্পূর্ণ ধারা শিক্ষা করিতে হইতেছে না;

* এই স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামীন অর্থনীতি সামন্ত যুগের ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সামন্ত-তন্ত্রের একটি বিশেষ ভারতীয়রূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

অল্প একটু অংশ শিখিলেই তাহার কাজ চলিবে। (খ) শ্রমবিভাগ না থাকিলে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সকল প্রকার যন্ত্র থাকা দরকার হয়; সে যখন একটিতে উৎপাদন করে, অপর স্তরের যন্ত্রগুলি অলস হইয়া বসিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে যন্ত্রেরও অপচয় ঘটে। কিন্তু শ্রম-বিভাগ থাকার দরুণ একটি যন্ত্রেরই দ্বারা এক ব্যক্তি সারাদিন উৎপাদন করে, কোন যন্ত্র অলস থাকে না, অপচয় হয় না। তাহা ছাড়া, একটি যন্ত্রের কাজ শেষ হইলে শ্রমিককে উঠিয়া গিয়া নতুন স্তরের যন্ত্রের সামনে দাঁড়াইয়া তাহা দ্বারা উৎপাদন সুরু করিতে প্রচুর সময়ের অপচয় হয়, শ্রমবিভাগ চালু থাকিলে সেরূপ সময় অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে না। (ঙ) উৎপাদন ধারাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হইলে প্রত্যেক অংশের কাজ মোটামুটি ছকে-বাঁধা ধরণের হইয়া যায়, ইহার ফলে সেই কাজটুকু করার জন্য যন্ত্র আবিষ্কার সম্ভপর হয়।

গুণ-সমূহ

অসুবিধার কথা বলিতে গেলে (ক) প্রথমেই বলিতে হয় যে ইহার ফলে ব্যক্তির কাজের পরিধি সঙ্কুচিত হয়, ফলে তাহার দৃষ্টিভঙ্গীও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। (খ) একই ধরণের কাজ সদাসর্বদা করার ফলে একঘেয়েমি ও বিরক্তিকর মনোভাবের সৃষ্টি করে। (গ) ব্যক্তি তাহার মনের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং জীবনশক্তি হারাইয়া ফেলে এবং সে যন্ত্রের একটি অংশ মাত্রে পরিণত হয়। (ঘ) মনের সঙ্কীর্ণতার ফলে উপদলীয় ক্ষুদ্র মনোভাবের সৃষ্টি হয়, সমাজের সাধারণ স্বার্থের কথা তাহারা চিন্তা করে না। (ঙ) উৎপাদন ধারা বিভিন্ন জাতীয় শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায়, কোন ক্ষুদ্র অংশে উৎপাদনকারী শ্রমিকের দল কাজ বন্ধ করিলে অন্যান্য সকল ধারার কার্য্য বন্ধ হইয়া এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। (চ) সর্বোপরি শ্রমবিভাগের ফলে যে ফ্যাক্টরী প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বহু দোষ আছে। সহুরে আবহাওয়া, গ্রাম্য জীবনের সহিত সম্পর্কচ্যুত সহরের ক্লেদাক্ত এবং বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সৃষ্টির আনন্দ হইতে বঞ্চিত মানুষের দল, সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের অভাব, সকল কিছু ইহার ফলেই হইয়াছে। অর্থনৈতিক কাঠামোতে বেকারীর সম্ভাবনা বাড়িয়াছে, ফ্যাক্টরীতে অধিকোৎপাদনের ক্ষমতা সৃষ্টির ফলে পূর্বের তুলনায় ব্যবসা সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

দোষ-সমূহ

শ্রম-বিভাগ প্রসারের সীমা (Limits to Division of Labour) :

বাস্তব ক্ষেত্রে উৎপাদনের ধারা ক্রমাগত বিভক্ত করিয়া শ্রম বিভাগের প্রসার করার সম্ভাবনা বিভিন্ন কারণে সীমাবদ্ধ।

(ক) প্রত্যেক উৎপাদন-পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদান-সম্মিলনে গঠিত হয়। কোন শিল্পে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে কোন উপাদান-সম্মিলন গ্রহণ করা হইবে তাহা আজকাল মোটামুটিভাবে স্থির থাকে এবং সঠিক উৎপাদন-পদ্ধতিও সুনির্দিষ্ট থাকে। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তার পক্ষে সেই পদ্ধতি ও উৎপাদন-সূত্র অনুযায়ী কাজ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও তাহার প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে না, উৎপাদন-সূত্র অনুযায়ী চালিত শ্রম-বিভাগ মানিয়া কাজ চালাইতে হয়। সকল শিল্পে সমান পরিমাণ শ্রম-বিভাগ সম্ভব নয়, শিল্প ও উৎপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী ইহার প্রসার নির্দিষ্ট হয়।

(খ) অ্যাডাম স্মিথ্ বলিয়া গিয়াছেন যে শ্রম বিভাগ বাজারের বিস্তৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাজার ছোট হইলে ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদন হয়, শ্রম বিভাগের প্রসার সম্ভব হয় না; বাজার বড় হইলে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি হয়, উৎপাদনের ধারাকে বিভক্ত করার প্রয়োজন হয়, শ্রম বিভাগ প্রসারিত হইতে পারে।

(গ) শ্রম-বিভাগের প্রসার মূলধনের পরিমাণের উপরও নির্ভর করে। অধিক মূলধন থাকিলে যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্ভব, উৎপাদনের ধারা বিভক্ত করিয়া যন্ত্রপাতির প্রয়োগ করা চলে। যন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের উপরও শ্রমবিভাগের প্রসার নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশ-সমূহে মূলধন ও যন্ত্র-জ্ঞানের অভাবের দরুণ শ্রম-বিভাগ বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে না।

যন্ত্র (Machinery) ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের এবং ইউরোপের দুএকটি দেশে নূতন কয়েকটি যন্ত্রের আবিষ্কার হয় এবং শিল্প ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগ সুরু হয়। তাহার ফলে ক্রমশঃ সমাজের সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতিতে বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয়, মানুষের দ্বারা পরিচালিত যন্ত্রের বদলে শক্তি দ্বারা পরিচালিত যন্ত্র উৎপাদন-কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে সুরু করে। বিজ্ঞানের উন্নতি ও যন্ত্রের প্রসার পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিয়া অগ্রসর হইতে

থাকে, মানব সভ্যতা যন্ত্রযুগে উত্তরণ করে। উৎপাদন পদ্ধতিতে এই মৌলিক পরিবর্তন ইতিহাসে শিল্প-বিপ্লব নামে পরিচিত। ইহার ফলে ক্রমশঃ ফ্যাক্টরী সমূহের প্রসার হইতে থাকে, বৃহৎ আকারের ও অধিক উৎপাদনশীল যন্ত্র উৎপন্ন হইতে থাকে, উৎপাদনের মাত্রা বাড়ে, বিক্রয় বৃদ্ধি পায় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি হয়। শ্রমবিভাগের প্রসার যন্ত্র প্রয়োগের সম্ভাবনাকে বাড়াইয়া দেয় এবং যন্ত্র নিয়োগের ফলে উৎপাদনের ধারাকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করার সুবিধা হয়। এই যন্ত্র-প্রচলনের অর্থনৈতিক ফলাফল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপকার এবং অপকার উভয়ই সাধিত হইয়াছে।

যন্ত্র ও শ্রম বিভাগ

(ক) যন্ত্র প্রচলনের সর্বাধিক সুবিধা হইল এই যে, প্রকৃতির অন্ধ শক্তিসমূহকে মানুষ নিজের অভাব মিটাইবার উপযোগী দ্রব্য-উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছে; কৃপণা প্রকৃতি মানুষকে অপর্য্যাপ্ত সম্পদ সম্ভারে বঞ্চিত করিলেও তাহার অনিচ্ছুক হস্ত হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছে।

সুবিধা

(খ) মনে রাখিতে হইবে, যে উচ্চ জীবন যাত্রার মান লইয়া আজিকার মানব সভ্যতার গর্ব, তাহার ভোগ্য দ্রব্য সম্ভারের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার তাহা যন্ত্রেরই দান। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের প্রভাব খর্ব করিয়া যন্ত্র কৃষির উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে।

(গ) মানুষের শক্তির তুলনায় যন্ত্র অনেক বেশী পরিমাণ শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াতে নিয়োগ করিতে পারে; পরিশ্রম সাধ্য কাজগুলি হইতে মানুষকে অব্যাহতি দেয়; অনেক বেশী শক্তিশালী কার্য্য করিতে সক্ষম হয়।

(ঘ) কম সময়ে এবং অনেক বেশী পরিমাণে একই আকৃতি ও গুণ সম্পন্ন দ্রব্য যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত হইতে পারে। সূক্ষ্ম ও চুলচেরা সঠিক কাজকর্ম একমাত্র যন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব।

(ঙ) কম শ্রমিকের দ্বারা ও কম সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্যোৎপাদন হওয়ার দরুণ ইউনিট প্রতি ব্যয় কমিয়া যায়, ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী হয়।

কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার যে (ক) বর্তমান যন্ত্র যুগ ও ফ্যাক্টরী সভ্যতা

মানুষের জীবনের সুখ শান্তি কাড়িয়া লইয়াছে, ইহাকে কোলাহলময় ও অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সর্বদা কোন্ অতৃপ্তি লইয়া মানুষ কিসের আশায় বাস করিতেছে, তাহা সে নিজেও জানে না। ফ্যাক্টরীর চতুষ্পার্শে শ্রমিক বস্তি স্থাপন করিয়াছে, আকাশ বাতাস কলুষিত করিয়াছে, মুনাফার লোভে শোষণের মাত্রা তীব্রতম করিয়াছে। যন্ত্রকে ব্যবহার করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে মানুষই যন্ত্রের দাসে পরিণত হইয়াছে।

অসুবিধা

(খ) যন্ত্রোৎপাদন প্রধানতঃ একসঙ্গে অধিকোৎপাদন, ইহাতে দ্রব্যের গুণগত ঔৎকর্ষের তুলনায় পরিমাণগত আধিক্যের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে।

(গ) কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ হইল এই যে, যন্ত্র-প্রচলনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে মালিকরা শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্র নিয়োগের সুযোগ পাইয়াছে, শ্রমিক শ্রেণীর সম্মুখে বেকারীর আশঙ্কা যন্ত্র-প্রচলনের ফলে গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রের উন্নতি সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতিকে মূলধন-প্রগাঢ় (Capital-intensive) করিয়া তুলিয়াছে, প্রতিটি নূতন যন্ত্রের প্রচলন বহুসংখ্যক শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিতেছে।

ধনবিজ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন যে, যন্ত্র-জনিত বেকারী বহুদিন স্থায়ী হয় না, উহা স্বল্পকালীন ঘটনামাত্র। শ্রমিকদের মধ্যে অনেকাংশ পুরানো ফার্মেই থাকিয়া যাইবে, কারণ নূতন যন্ত্র চালাইতেও কিছু লোক দরকার হয়। কিছু শ্রমিক ওই যন্ত্র উৎপাদনকারী ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত হইবে, উক্ত যন্ত্র মেরামতের কার্য্যেও কিছু শ্রমিক প্রয়োজন হইবে। যন্ত্রের প্রচলনের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর ব্যয় ও দাম কমিয়া যাইবে, সমাজের ভোগকারীগণ অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করার সুযোগ পাইবে। এইরূপে বহু দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে, দেশে মোট কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে।

যন্ত্রজনিত বেকারী

যন্ত্রের প্রচলন বন্ধ করিলে সর্বশেষ বিশ্লেষণে শ্রমিক শ্রেণীরই ক্ষতি হয়, কারণ, তাহা হইলে দেশের মোট উৎপাদন ও সঙ্গে-সঙ্গে মোট আয়ও কমিবে এবং মোট আয় কমিলে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর জন্য দেশের মোট কার্য্যকরী চাহিদাও কম হইবে, দ্রব্যের উৎপাদন ও কর্ম সংস্থান উভয়ই কমিয়া যাইবে।

শিল্পের স্থানিকতা (Localisation of Industries) :

দেশের একটি অঞ্চলে কোন বিশেষ ধরণের শিল্পের অন্তর্গত অধিকাংশ ফার্ম স্থাপিত হইলে তাহাকে শিল্পের স্থানিকতা বলে। যে দ্রব্য উৎপাদনে সেই অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী, যে দ্রব্য সর্বাধিক সুবিধার সহিত সেই অঞ্চলটিতে উৎপন্ন হইতে পারে, উক্ত অঞ্চল সেই দ্রব্য উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আঞ্চলিক বিশেষায়ণের বা শ্রমবিভাগের ফলই হইল শিল্পের স্থানিকতা। একটি অঞ্চলে কোন্ শিল্প গড়িয়া উঠিবে তাহা তিন প্রকার কারণের উপর নির্ভর করে।

কাহাকে বলে

(ক) অঞ্চলটিতে সেই শিল্পের উপযোগী প্রাকৃতিক সুবিধা (Natural Advantages) কি পরিমাণ আছে তাহার উপর।

(খ) কালক্রমে অঞ্চলটি সেই শিল্পের উপযোগী যে সুবিধাগুলি লাভ করিয়াছে, সেই লব্ধ সুবিধাগুলির (Acquired Advantages) উপর।

(গ) অন্যান্য শিল্পের পক্ষেও সেই অঞ্চলটি সুবিধাজনক হইলে তুলনামূলক ভাবে কোন্ শিল্প সেই সুবিধাগুলিকে সর্বাধিক সুযোগের সহিত ব্যবহার করিতে পারে, সেই তুলনামূলক সুবিধার (Comparative Advantages) উপর।

এক] প্রাকৃতিক সুবিধাসমূহ :

(ক) এমন অনেক শিল্প আছে যাহারা কোন বিশেষ স্থান ব্যতীত কখনই স্থাপিত হইতে পারে না, অন্যত্র স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে, যেমন যে মাটির নীচে খনিজ দ্রব্য আছে সেখানেই খনি শিল্প স্থাপিত হইতে পারে, অন্যত্র নয়। কিন্তু সকল শিল্প এইরূপ নহে। তাহারা বিভিন্ন সুবিধা পর্য্যালোচনা করিয়াই নিজের স্থান নির্বাচন করিয়া থাকে।

স্থান, আবহাওয়া, শক্তি, শ্রমিক, কাঁচামাল, বাজার সংক্ষেপে নিম্নতম উৎপাদন ব্যয়

(খ) জমি, আবহাওয়া ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া শিল্পের স্থান নির্বাচন হয়। যে জমিতে যে দ্রব্য বা যে আবহাওয়াতে যে দ্রব্য উৎপাদনের সুবিধা বেশী তাহারা সেখানে স্থাপিত হয় (যেমন পাহাড় অঞ্চলে চা উৎপাদন)।

(গ) যন্ত্র চালাইবার উপযোগী শক্তির উৎস যেখানে আছে, সেখানে সস্তায় শক্তি ব্যবহারের সুবিধা পাইবার জন্য শিল্প স্থাপিত হয়। পূর্বে জলশক্তি

ছিল প্রধান, তাহার পর বাষ্প-প্রস্তুতের উপযোগী কয়লা বা পেট্রল, বর্তমানে বিদ্যুৎশক্তির উৎসের নিকটেই শিল্প স্থাপিত হওয়ার চেষ্টা করে।

(ঘ) সস্তা মজুরীতে শ্রমিক পাইবার সুবিধা যে অঞ্চলে আছে, অধিক পরিমাণে শ্রমিক-নিয়োগকারী ফার্মগুলি সেই অঞ্চলেই স্থাপিত হওয়ার চেষ্টা করিবে।

(ঙ) যেখানে কাঁচামালের পরিবহন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম, শিল্পটি সেই জায়গায় স্থাপিত হইবে। যদি শিল্পটির একাধিক কাঁচামালের প্রয়োজন থাকে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহারা ছড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে সে অন্যান্য সুবিধা অনুযায়ী, বিশেষ করিয়া বাজারের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হওয়ার চেষ্টা করিবে।

(চ) মালের অর্ডার পাইবার সুবিধা থাকিলে এবং বাজারে মাল পাঠাইবার ব্যয়-হ্রাসের উদ্দেশ্যে বাজারের নিকটবর্তী স্থানে শিল্প স্থাপনের চেষ্টা চলিবে।

মনে রাখা দরকার যে, কাঁচামাল ও বাজারের সান্নিধ্য, এই উভয় শক্তি শিল্পটিকে বিরোধী দিকে আকর্ষণ করিতে পারে। দ্রব্যটির বিভিন্ন বাজার বা কাঁচামালের বিভিন্ন উৎস থাকিতে পারে। সকল কিছু বিচার করিয়া যে স্থানে তাহার উৎপাদন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম, ফার্মটি সেস্থানেই স্থাপিত হইবে। বিরোধী শক্তি-সমূহের টানা-পোড়েনের চাপে তাহার স্থান নির্দ্ধারিত হইবে। কাঁচামাল ও দ্রব্যের প্রকৃতির উপরেও শিল্পের স্থানিকতা নির্ভর করে।

দুই। লব্ধ সুবিধাসমূহ:

কোন অঞ্চলে শিল্পটি গড়িয়া উঠিলে সেই অঞ্চলটিও ওই শিল্পের পক্ষে আরও উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠে, ওই দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী আরও সুবিধা লাভ করে। যেমন, উহার অনুপূরক শিল্প গড়িয়া উঠে, উপদ্রব্য (By-Product) প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়, সুদক্ষ শ্রমিকের যোগান বাড়িয়া যায়, শিল্পের পক্ষে উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। উৎপাদক সঙ্ঘ স্থাপিত হয়, স্থানের সুনাম সৃষ্টি হয়। এই সকল লব্ধ সুবিধার (acquired advantages) আকর্ষণে নূতন ফার্মগুলি আসিয়া জড়ো হয়, ফলে লব্ধ সুবিধার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়।

বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ

তিন] তুলনামুলক সুবিধা বা আপেক্ষিক সুবিধা সমূহ ঃ

একটি স্থানে অনেক শিল্প গঠনের উপযোগী উপকরণ থাকিতে পারে। সে অবস্থায় সেই উপকরণ পাইবার জন্য এক শিল্পের সহিত অন্য শিল্পের দরাদরি চলে। যে শিল্পের ওই অঞ্চলে সর্বাধিক সুবিধা, সে ওই উপকরণসমূহকে চড়া দাম দিয়া তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারে। এইরূপ তুলনামূলক সুবিধা অনুযায়ী কোন শিল্প স্থান নির্বাচন করে এবং এই সকল কারণের ফলেই শিল্পের স্থানিকতা স্থির হইয়া যায়।

স্থান লইয়া শিল্পসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

এই সকল সুবিধাগুলি যত অধিকতর ভাবে নির্দিষ্ট স্থানে বেশী পরিমাণে পাওয়া যাইবে ; ততই সেই স্থানের স্থানিকতার হার (Degree of Localisation) অধিক হইবে। যে অঞ্চলে উপকরণ স্বল্প ও বিশেষ ধরণের, সেখানে শিল্পের বিশেষতা অধিক ; যে অঞ্চলে উপকরণের যত প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য, সেখানে শিল্পের বিভিন্নতা (diversity) তত বেশী।

স্থানিকতার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantges of Localisation) ঃ

সুবিধা ঃ
(ক) উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যাওযা,
(খ) অনুপূরক শিল্প-গড়িয়া উঠা,
(গ) শ্রমিকদের শিক্ষা ও চাকুরীর সম্ভাবনা বৃদ্ধি,
(ঘ) উৎপাদকগণের পারস্পরিক আলাপ আলোচনার সুবিধা ও
(ঙ) স্থানের সুনাম বৃদ্ধি।

অসুবিধা ঃ (ক) প্রধান অসুবিধা হইল এই যে, অঞ্চলটির আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে একটি শিল্পের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি সেই শিল্পের অবস্থা খারাপ হইয়া যায় তাহা হইলে সমগ্র অঞ্চলের অধিবাসীদের আয় ও ব্যয় কমিয়া যায়। অঞ্চলটির অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়, উহা দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে (Depressed area) পরিণত হয়।

(খ) অনেক সময় সেই অঞ্চলের প্রধান শিল্পটি শুধু মাত্র পুরুষ শ্রমিকদের নিয়োগ করে, ফলে মেয়ে শ্রমিকগণ বেকার থাকে ; পরিবারের আয় কম হয়। এরূপ অবস্থায় বেশী মজুরী না দিলে কোন শ্রমিক সেই শিল্পে আসিতে চাহে না ; শিল্পের পক্ষে ইহা ক্ষতিকর।

(গ) স্থানিকতার হার খুব বেশী হইলে অঞ্চলটির স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এত কম থাকে যে, তাহাদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই বাহির হইতে আনিতে হয়। যদি বাহির হইতে যোগানের ধারা বন্ধ হইয়া যায়, তবে অঞ্চলটির অর্থনৈতিক দুর্দশা আসিয়া পড়ে।

(ঘ) স্থানিকতার হার বেশী হইলে শিল্পসমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট হয়। শিল্পের এই ঘনসন্নিবেশ ঘটিবার ফলে অতিরিক্ত ভিড, গৃহসমস্যা ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

(ঙ) ঘন সন্নিবিষ্ট শিল্পাঞ্চল যুদ্ধের সময়ে অধিক বিপদ্‌জনক।

এই সকল কারণের ফলে আজকাল শিল্পসমূহকে সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়াইয়া স্থাপন করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। দেশের সমস্ত অঞ্চলগুলিকে সমানভাবে শিল্পোন্নত করিয়া আঞ্চলিক দুর্দশা বা দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলের (Depressed areas) সমস্যা দূর করা যাইতে পারে, সেইজন্য শিল্পের আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ (Delocalisation) প্রয়োজন। আঞ্চলিক ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ক্রমেই শিল্প প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচনের ক্ষমতা নিজের হাতে তুলিয়া লইতেছে।

আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ —আধুনিক ঝোঁক

অনুশীলনী

1. Show how modern Industrial organisation is based upon Specialisation as well as Co-operation. (B. A. '51)

2. What is meant by Division of Labour? Discuss its merits and demerits and how the modern society is based upon it. (B. A. '53)

3. In the Short run, Labour and Capital are Competitive; in the long run, they are Complementary. (B. A. '32)

4. What are the influences that have brought about the Concentration of industries in particular localities? Indicate the chief advantages and drawbacks of such Concentration. (B.com. '37)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উৎপাদনের মাত্রা (The Scale of Production)

বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন কাহাকে বলে (What is Large-Scale Production) :

দেশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ফার্ম পাশাপাশি থাকিলেও দেখা যায় যে আধুনিক কালে উৎপাদনী ফার্মসমূহের গড়-আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিক সংখ্যক শ্রমিক, প্রভূত পরিমাণ মূলধন, সুবৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে এক সঙ্গে অধিক পরিমাণে দ্রব্যোৎপাদন—আধুনিক কালের এই উৎপাদন সংগঠনের রূপকে বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন (Large-scale Production) বলা হয়।

মনে রাখিতে হইবে যে, বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন এবং বৃহৎ পরিমাণ উৎপাদন এক নহে। ভারতে প্রত্যেক পরিবারে অম্বর চরকার সাহায্যে বস্ত্র উৎপাদন করিলে বৃহৎ পরিমাণ উৎপাদন হইতে পারে, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদন। অপর পক্ষে কিন্তু ফার্মে প্রচুর মূলধন ও শ্রমের সাহায্যে, উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির দ্বারা, সর্বোত্তম উৎপাদন সূত্রের প্রয়োগ করিয়া সংগঠনের বৈজ্ঞানিক ও ব্যাপক বিস্তারের ফলে একই সঙ্গে অধিক পরিমাণে দ্রুতগতিতে উৎপাদনকে বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন বলা হয়।

বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন কাহাকে বলে

বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের সুবিধা (Advantages of Large-Scale Production) :

বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনের ক্রম-প্রসারের কারণ হইল এই যে কোন ফার্ম বা কোন শিল্পের উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি বিশেষ ব্যয়-সঙ্কোচ হয় এবং ফলে ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া যায়। অধ্যাপক মার্শাল এই ব্যয়-সঙ্কোচগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ ও আভ্যন্তরীন ব্যয়-সঙ্কোচ (External and Internal economies)

সাধারণভাবে সমগ্র শিল্পের অগ্রগতির ফলে, যে সুবিধাগুলি শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেক ফার্ম নিজে লাভ করিতে পারে—যেমন কম মজুরীতে উপযুক্ত পরিমাণে শ্রমিকের যোগান; সুবিধাজনক যানবাহন ব্যবস্থা ইত্যাদি—ইহাদের বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচ বলা হয়।

অপর পক্ষে, নিজস্ব অর্থ, ব্যবসা পরিচালন-যোগ্যতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধির দরুণ শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেক ফার্ম যে সকল সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে, তাহাকে আভ্যন্তরীন ব্যয়-সঙ্কোচ বলা যাইতে পারে। বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মই লাভ করিতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীন ব্যয়-সঙ্কোচ শুধু মাত্র একটি ফার্ম তাহার নিজস্ব শক্তি ও যোগ্যতার দরুণ লাভ করে, যাহার ফলে অপরাপর ফার্মের তুলনায় তাহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, উন্নতধরণের উপাদান, উপকরণ ও যোগ্যতা-সম্পন্ন ফার্মগুলি বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচের কারণগুলি হইতে অন্য ফার্মের তুলনায় অধিকতর সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারে।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন ব্যয় সঙ্কোচ কাহাকে বলে

কেয়ার্ণক্রস্ বলেন যে এই দুই ধরণের ব্যয়-সঙ্কোচের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নাই। একটি ফার্মের উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে তাহার আভ্যন্তরীন ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটিল; ইহার ফলে সেই শিল্পের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল। শিল্পের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায়, সেই শিল্পের অন্য ফার্মগুলি বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা পাইতে পারে। যে সকল ফার্মগুলি বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচের সুবিধা ভোগ করে, তাহারা একত্র হইয়া একটি মিলিত-ফার্ম (Combination) গঠন করিলে শিল্পের বাহ্যিক সুবিধাগুলি ফার্মটির আভ্যন্তরীন ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধাতে পরিণত হয়।

এইরূপ বিভাগ করা চলে কিনা

বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচ : একটি শিল্পের মধ্যে মোট ফার্মের সংখ্যা বা মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেক ফার্ম যে ধরণের সুযোগ সুবিধা লাভ করে তাহাকে বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচ বলা হয়। বহু কারণে এই বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচগুলির উদ্ভব হয়।

(ক) স্থানিকতা-জনিত ব্যয়-সঙ্কোচ (Economies of Location or Concentration) : যখন একটি অঞ্চলে কোন শিল্পের অন্তর্গত অনেক

ফার্ম স্থাপিত হয়, তখন সকল ফার্মই দক্ষ শ্রমিক, সস্তা যানবাহন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক শিল্পের সুবিধা পাইতে পারে।

(খ) সংবাদ-সম্বন্ধীয় ব্যয়-সঙ্কোচ (Economies of Information) : বৃহৎ শিল্পগুলিতে সকল ফার্ম একত্রে মিলিয়া গবেষণার কাজ চালায়, বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশ করে, যন্ত্র ও বাজার সম্পর্কীয় তথ্যাদি সকলেই পাইয়া থাকে, ফলে প্রত্যেকেরই সুবিধা হয়। সংবাদ-সম্বন্ধীয় ব্যয় সঙ্কোচের সুবিধা দেশের সকল শিল্পই সমান ভাবে পাইয়া থাকে, কোন বিশেষ শিল্প একা পায়, তাহা নহে।

(গ) বিশেষায়ণ-জনিত বা বিযোজন-জনিত ব্যয়-সঙ্কোচ (Economies of Specialisation or Disintegration) : কোন শিল্প যখন আকারে বড় হইয়া উঠে, তখন উহার অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্ম বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। কাপড়ের শিল্পে কেহ ধুতি, কেহ সার্টের কাপড়, অপর কেহ কোটের কাপড ইত্যাদির উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, ফলে মোট শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং সেই শিল্পের মধ্যে সকল ফার্মের দ্রব্যেরই ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া যায়।

আভ্যন্তরীণ ব্যয় সঙ্কোচ ঃ

বৃহৎ আয়তন, বড় যন্ত্র, অধিক মূলধন, ও উন্নতধরণের সাংগঠনিক ব্যবস্থার দরুণ একটি ফার্মের উৎপাদন-মাত্রা (Scale of Production) বৃদ্ধি হইলে যে সকল সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায় ও ফলে ইউনিট-পিছু উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়, তাহাদের আভ্যন্তরীন ব্যয়-সঙ্কোচ বলা হয়। এইরূপ বহু প্রকারের আভ্যন্তরীন ব্যয় সঙ্কোচ হইতে পারে।

(ক) যন্ত্র সম্পর্কীয় ব্যয়-সঙ্কোচ (Technical Economies) : বৃহৎ যন্ত্র বা উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে দেখা যায় যে, তুলনামূলক ভাবে বৃহৎ যন্ত্র অধিকতর উৎপাদন-ক্ষম। বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদনে ব্যাপক ভাবে বাষ্প বা বিদ্যুৎ ব্যবহার করা চলে এবং সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের সুযোগ গ্রহণ করা যায়। বৃহৎ যন্ত্র চালাইবার ব্যয় উহার উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী তুলনামূলক ভাবে ক্ষুদ্র যন্ত্র হইতে কম পড়ে। বৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তাহার সঙ্গেই আনুষঙ্গিক (Subsidiary) দ্রব্যের উৎপাদন হইতে পারে, ফলে ব্যয় হ্রাস পায় ও দ্রব্যের

উৎকর্ষ বাড়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, কাপড় তৈরীর কারখানা সার্ট বা কোট তৈরীর কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারে। বৃহৎ কারখানা নিজের পরিত্যক্ত উপকরণ সমূহের দ্বারা বিভিন্ন উৎপন্ন-দ্রব্য বা উপ-দ্রব্য (By-Product) প্রস্তুত করিতে পারে। ক্ষুদ্র ফার্মে পরিত্যক্ত উপকরণের পরিমাণ কম বলিয়া তাহাদের ব্যবহার করিবার সুযোগও কম। বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদনে উৎপাদন ধারার সংযুক্তির (Linked Process) ফলে সময়, যানবাহনের ব্যয়, জ্বালানি ও শক্তি প্রভৃতির ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটে। এইরূপে উৎপাদনে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া, উৎপাদনের ধারা আরও ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া, শ্রম-বিভাগের প্রসার করা যায়, ফলে শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়া যায়।

যন্ত্র-সম্পর্কীয় ব্যয-সঙ্কোচের কিন্তু সীমা আছে। ফার্মের মাত্রা কিছু দূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ার পর উৎপাদনের আরও বৃদ্ধি হইলে ব্যয়-সঙ্কোচ না হইয়া ব্যয়-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ফার্মের এই মাত্রায় উৎপাদনকে যন্ত্র-সম্পর্কীয় সর্বোন্নত স্তর (Technical Optimum) বলা চলে। এই স্তরের পরে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে আর একটি কারখানা স্থাপন করিতে হয়, নতুবা ইউনিট-প্রতি ব্যয-বৃদ্ধি হয়।

(খ) **পরিচালন-সম্পর্কীয় ব্যয়-সঙ্কোচ ঃ (Economies of Management) :** ফার্মের উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমদিকে ফার্মের পরিচালন-যোগ্যতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কারণ পরিচালক-বর্গের মধ্যে শ্রম বিভাগের আরও প্রসার করা চলে। ক্ষুদ্র ফার্মে মালিক একা সকল কিছু পরিচালনা করে। বৃহৎ ফার্মে মাহিনা-ভোগী যোগ্য কর্মচারীদের হাতে অনেক ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া যায়। দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, প্রত্যেক দপ্তরে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিযোগ করা সম্ভব হয়।

পরিচালন-সম্পর্কীয় ব্যয় সঙ্কোচ বেশীদিন লাভ করা চলে না। উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন দপ্তরসমূহের মধ্যে সংযোগ সাধন অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে এবং সাংগঠনিক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। বৃহদাকার শিল্প সংগঠন প্রায় একটি ঘড়ির ন্যায়, (এক চাকার মধ্যে আবদ্ধ আর এক চাকা), প্রত্যেক দপ্তর তাহার কাজের জন্য অপর দপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট। নিয়মবদ্ধতা এবং দীর্ঘসূত্রতা কাজের উৎসাহ নষ্ট করিয়া ফেলে এবং

একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরের পরে আরও উৎপাদন করিলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি হয়, ব্যয়সঙ্কোচ ব্যয়বাহুল্যে পরিণত হয়। সেই স্তরকে পরিচালন-সম্পর্কীয় সর্বোন্নত স্তর (Managerial Optimum) বলে।

(গ) **ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যয়-সঙ্কোচ : (Trading or Commercial economies) :** বৃহৎ ফার্ম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে বহু প্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ করে। এক সঙ্গে অধিক পরিমাণ কাঁচামাল বা অন্যান্য উপাদান পাইকারী দরে ক্রয় করিলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় কম পড়ে। বিক্রেতাগণ শীঘ্র যোগান দেয়, সতর্ক মনোযোগ দেয় এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর তুলনায় বেশী সুযোগ সুবিধা দেয়। এক সঙ্গে অধিক ক্রয় করায় উৎপাদনের গতিধারা (Continuity) অব্যাহত থাকে। সংগঠন বৃহৎ থাকায় নিপুণ বিক্রেতা নিয়োগ করিতে পারে। বিক্রয়ব্যবস্থা সুসংগঠিত হয়। নিপুণ বিক্রেতাগণ নূতন নূতন উপায়ে অনাবিষ্কৃত বাজার খুঁজিয়া বাহির করে। বিজ্ঞাপনের দরুণ ইউনিট-প্রতি ব্যয় হ্রাস পায়।

(ঘ) **আর্থিক ব্যয়-সঙ্কোচ : (Financial Economies) :** বৃহৎ ফার্ম প্রয়োজন অনুযায়ী, সুবিধাজনক সর্তে ও ক্ষুদ্র ফার্মের তুলনায় কম সুদে ঋণ পাইতে পারে। ফলে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকে। সহজে বিভিন্ন সূত্রে ও কম সুদে ঋণ পাওয়া সম্ভব হয়। অধিক মূলধনের জন্য প্রয়োজন হইলে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের সুবিধাও সে অধিক পরিমাণে পায়।

(ঙ) **ঝুঁকি-বণ্টন জনিত ব্যয়-সঙ্কোচ : (Risk-spreading Economies) :** বৃহৎ ফার্ম আনুপাতিক ভাবে বহু কম ঝুঁকি বহন করে। তাহার উৎপাদন ও কাজকর্ম এরূপ বহুবিধ যে কোন বিশেষ ব্যবসা হইতে তাহার ঝুঁকি কম হইবে। যতই বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন হইবে, মোট উৎপাদনের হিসাবে আনুপাতিক ভাবে ঝুঁকি ততই কমিয়া যাইবে। এই ঝুঁকি-বণ্টন নীতি কার্য্যকরী হয়, (১) উৎপন্ন দ্রব্য, (২) কাঁচামালের উৎস, (৩) শক্তি যোগানের উৎস, (৪) উৎপাদন পদ্ধতি, এবং (৫) বাজার ইত্যাদি বিবিধকরণের দ্বারা (diversification)। বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন কেন্দ্র কখনই একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে চায় না, সে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে ; একটির চাহিদা কমিয়া গেলে বা বাজার খারাপ হইয়া গেলে সে অন্য দ্রব্যের বিক্রয় দ্বারা লোকসান পোষাইয়া লইতে পারে।

কাঁচামাল বা শক্তি যোগানের বিভিন্ন উৎস সে রাখে, একটি বন্ধ হইলে অপর উৎস ব্যবহার করে; উৎপাদনের গতিধারা হঠাৎ ব্যাহত হয় না। উৎপাদন-পদ্ধতি ও বাজার সে এই উদ্দেশ্যে বিভক্ত করিয়া রাখে।

উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য এবং মুনাফা বৃদ্ধির জন্য ঝুঁকি-বণ্টনের এই নীতি বেশী দূর অগ্রসর হইলে সাংগঠনিক জটিলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং যন্ত্র-জনিত সুবিধা, পরিচালনগত সুবিধা পাওয়া, এবং উৎপাদনের ধারা সর্বদা চালু রাখা—এই সকল চিন্তা অধিক পরিমাণে বিভাগীকরণকে বাধা দেয়। দেখা যায় যে, দুই একটি দ্রব্য উৎপাদনকারী ছোট ফার্ম তাহাদের সহজ সরল যন্ত্র ও সংগঠন লইয়া ব্যবসা সঙ্কটে অনেক সহজে বাঁচিয়া যাইতে পারে।

সর্বোন্নত ফার্ম (Optimum Firm):

একটি ফার্মের উৎপাদন-মাত্রা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন সকল প্রকার ব্যয়-সঙ্কোচ একই সঙ্গে বা একই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহা নহে। একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছিবার পর আরও অধিক উৎপাদন হয়ত যন্ত্র সম্পর্কীয় ব্যয় সঙ্কোচ আনিবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সাংগঠনিক ব্যয়বাহুল্য ঘটিতে পারে; উৎপাদন দ্রব্যের পৃথকী-করণ ঝুঁকি কমাইতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-সম্পর্কীয় সুবিধাও কমাইয়া দিতে পারে। ফার্মটিকে তাই একই সঙ্গে উদ্ভূত সকল প্রকার ব্যয়-সঙ্কোচ ও ব্যয়-বাহুল্য হিসাব করিয়া উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইবার কথা চিন্তা করিতে হয়। ব্যয় সঙ্কোচ বা ব্যয় বাহুল্য—ইহাদের মোট ফলাফল অনুযায়ী ফার্মটির বৃদ্ধি ও আয়তন নির্দ্ধারিত হয়। যদি ইহাদের মোটফল অনুযায়ী ইউনিট-প্রতি ব্যয় (প্রান্তিক ও গড় ব্যয়) হ্রাস পাইতে থাকে, তখন ফার্মটি উৎপাদন বাড়াইতে থাকিবে। কিন্তু এইরূপে উৎপাদন-ব্যয়ের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছাইবার পর উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ব্যয়-বাহুল্য ঘটে। এই স্তরে যে ফার্ম পৌঁছিয়াছে, সে দ্রব্যপিছু সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতেছে, তাহাকে সর্বোন্নত ফার্ম (Optimum Firm) বলা হয়। যোগ্য পরিচালক সর্বদা এই স্তরে উন্নীত হইয়া উৎপাদন করিতে চাহে। সর্বোন্নত ফার্মে পৌঁছিবার পূর্বের অবস্থায় যখন উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধির ফলে ইউনিটপিছু ব্যয় কমিতেছে, সেই অবস্থায় ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিদানের নীতি (Law of Increasing Returns) কার্যকরী হইতেছে বলা চলে।

উৎপাদনের সর্বোন্নত মাত্রা ও বিভিন্ন প্রতিদানের নিয়ম

সর্বোন্নত ফার্মের পরেও উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি করিলে ব্যয় বাহুল্যের ফলে যখন ইউনিট-পিছু ব্যয় বাড়িয়া যায়, সেই অবস্থায় ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে বলা চলে।

স্থান, কাল ও শিল্পভেদে সর্বোন্নত ফার্মের আয়তনে পার্থক্য থাকিতে পারে

সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন বিভিন্ন শিল্প, বিভিন্ন সময়, বা বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী পৃথক হইয়া থাকে; একটি বিশেষ শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা ও বাজারের বিস্তৃতি অনুযায়ী সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন নির্ধারিত হয়। আবার কালক্রমে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন পৃথক হইতে পারে। বিভিন্ন দেশের পৃথক অর্থনৈতিক পরিবেশেও (উপকরণের যোগান ও ঔৎকর্ষ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, চিন্তার স্তর ইত্যাদি) সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন পৃথক হয়।

ফার্মের লক্ষ্য: সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরে পৌঁছান

ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ফার্মগুলির মূল লক্ষ্য হইল সর্বাপেক্ষা অধিক মুনাফা লাভ। সর্বনিম্ন উৎপাদনব্যয়ের স্তরে উৎপাদন করিলেই যে সর্বাপেক্ষা অধিক মুনাফালাভ হয় তাহা নহে। সুতরাং ফার্মগুলি সেই আকারে থাকিবার চেষ্টা করে, যেখানে উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া তাহাদের মুনাফা সর্বাধিক হইতেছে।

ফার্মের আয়তন (Size of the Firm):

সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহাদের মিঃ রবিন্‌সনের মত অনুযায়ী পাঁচভাগে ভাগ করা যায়: যন্ত্রসম্পর্কীয়, পরিচালন-জনিত, অর্থসম্পর্কীয়, বাজারজনিত এবং ঝুঁকিবহনজনিত।

(ক) কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ থাকে যে সুবৃহৎ যন্ত্রের ব্যবহার ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নহে, সেই সকলের ফার্মের আয়তন বৃহৎ হওয়া স্বাভাবিক। আবার কোন ক্ষেত্রে এরূপ আছে যে, ক্ষুদ্র ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যয় কমাইয়া দেয় এবং উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; সে সকল ফার্মের আয়তন ক্ষুদ্র হওয়া সম্ভব।

(খ) কখন কখন পরিচালনার কাজ খুবই সহজ, কয়েকজন পরিচালক রাখিলেই কাজ চলে, ফার্মের আয়তন ছোট হইতে পারে। কখনও বা পরিচালনার কাজ খুবই জটিল, অধিক সংখ্যক পরিদর্শক না রাখিলে কাজ ভাল হয় না। সে ক্ষেত্রে ফার্মের আয়তন বৃহৎ হইবার সম্ভাবনা।

(গ) ফার্মটির আর্থিক সঙ্গতির উপরও ইহার আয়তন নির্ভর করে। দেশে শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন বাড়াইবার সুযোগ থাকিলে ফার্মের আয়তন বাড়িতে পারে, সুযোগ না থাকিলে ফার্মের আয়তন সেখানে ক্ষুদ্র হইবে।

(ঘ) বাজার যদি স্থানীয় এবং ক্ষুদ্র রকমের অথবা দামের উঠানামা বেশী হয়, তাহা হইলে বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন করিয়া লাভ নাই, কারণ বিক্রয়ের সম্ভাবনা কম ও ঝুঁকি বেশী ; ফার্মের আয়তন ক্ষুদ্র থাকারই সম্ভাবনা। বাজার যদি বড় হয় এবং সেখানে দামের উঠানামা কম হয়, তাহা হইলে বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন সম্ভব, ফার্মের আয়তনও বড় হইয়া উঠিবে।

(ঙ) আয়তন বাড়াইলে ঝুঁকির পরিমাণও বাড়িয়া যায়, অধিক উপাদান ও অধিক উৎপাদন সঙ্গে লইয়া সঙ্কটের সময় বাঁচিয়া থাকার অসুবিধা। কিন্তু আয়তনে ক্ষুদ্র হইলে ফার্মের নমনীয়তা (flexibility) অর্থাৎ অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা বেশী থাকে ; অবস্থার পরিবর্তনে ফার্মের কাঠামোতে (Structure) পরিবর্তন আনা সম্ভবপর।

এই সকল বিষয় মনে রাখিয়া একটি ফার্ম তাহার আয়তন নির্দ্ধারণ করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য সর্বাধিক মুনাফা এবং অবস্থা অনুযায়ী সে সেই ভাবেই আয়তন স্থির করিবে। (পরে দেখিতে পারা যাইবে যে,) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদনকারী ফার্ম হইলে) সে এমন ভাবে তাহার আয়তন স্থির করে যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাজার-দরের সমান। আবার একচেটিয়া বা একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতাশীল বাজারে উৎপাদনকারী ফার্ম হইলে সে এমন ভাবে আয়তন স্থির করে, যে অবস্থায় উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক-রেভিনিউ-র সমান। এই সকল বিষয়ের উপর ফার্মের আয়তন নির্ভর করে।

বাস্তবক্ষেত্রে, যে আয়তনে সে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করে, সেই আয়তনই স্থির করিবে

বৃদ্ধির বাধা এবং ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদনী ফার্মের অস্তিত্বের কারণ (Obstacles to Expansion and why Small-scale Firms still exist):

প্রায় সকল শিল্পেই কোন ফার্ম যখন নূতন উৎপাদন সুরু করে তখন তাহার উৎপাদন-মাত্রা কম থাকে। তবে সে সময়ের ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, ভবিষ্যতে অবস্থা বুঝিয়া তাহার উৎপাদন-মাত্রা বাড়াইয়া ফেলে। কিন্তু অনেক

শিল্প আছে যাহাতে সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন ও মাত্রা ক্ষুদ্র। ইহার অর্থ হইল যে, উৎপাদন-মাত্রায় বৃদ্ধির অনেক বাধা আছে। কোন শিল্পে এই বাধাগুলি প্রবল, কোথাও প্রবল নহে। আয়তন ও মাত্রা-বৃদ্ধির কোন এক স্তরে এই বাধাগুলি কার্য্যকরী হইয়া উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দেয়। এই বাধাগুলি অনেক দিক হইতে আসিতে পারে।

বৃদ্ধির বাধাসমূহ

এক] পরিচালন সংক্রান্ত বাধা ঃ

ফার্মের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পরিচালন-গত সমস্যার জটিলতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। যে ধরণের শিল্পে সর্ব্বদা পরিদর্শনের এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন থাকে, সেখানে পরিচালনগত অসুবিধাগুলি বেশী; ফলে ফার্মগুলির আয়তন সাধারণতঃ ছোট থাকে, যেমন দোকান, কৃষি ইত্যাদি। এই সকল শিল্পে ব্যক্তিগত পরিদর্শন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন বেশী।

যে ক্ষেত্রে পরিচালনার কাজ রুটিন-মাফিক করিলেই চলে সে সকল শিল্পে ফার্মের আয়তন বাড়ান সহজ, যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেলওয়ে, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি। এই সকল শিল্পে নূতন নীতি-নির্দ্ধারণ বা দ্রুত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ খুব কম ক্ষেত্রেই করিতে হয়।

আধুনিক কালে পরিচালনার কার্য্যের সুবিধার জন্য বহু নূতন ধরণের সংগঠন-পদ্ধতি ও বিজ্ঞান-সম্মত পরিচালনার (Scientific Management) উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বহু শিল্পে এই সকল পদ্ধতির সফল প্রয়োগ সম্ভব নয়। সেই সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদন চালু থাকে।

সর্বশেষে, পরিচালন-গত বাধা আসিবেই, কারণ মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। খুঁটিনাটি সমস্যার বোঝা বিরাট হইয়া দাঁড়ায়, দায়িত্বশীল অধঃস্তন কর্মচারীদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ সাধ্য নহে। সুদক্ষ দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাবান কর্মচারীদের আয়ত্তে রাখাও শক্ত। সুতরাং পরিচালকের যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির বাধাস্বরূপ হইয়া পড়ে।

পরিচালনগত বাধা মনস্তাত্ত্বিক স্তরেও থাকিতে পারে। মানুষের মনের বহু প্রকার খেয়াল-খুসীর ফলে ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদন পরিচালনা চলিতে পারে। অন্য স্থানে বেশী মাহিনায় চাকুরী পাইলেও সেখানে না যাইয়া পরিচালক নিজেই ক্ষুদ্র

ফার্মের পরিচালনা চালাইয়া যাইতে পারে। স্বাধীন ব্যবসার প্রতি আকর্ষণ, অনিশ্চয়তার রোমান্স, গর্ব, অহমিকা, নিজস্ব সৃষ্টির আকাঙ্খা, সকল কিছু মিলিয়া ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদন চালান সম্ভবপর।

সুতরাং যোগ্যতা থাকিলেই যে সে অন্য ফার্মে কাজ করিয়া উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে তাহা বলা যায় না।

দুই] বাজার-জনিত বাধা :

অ্যাডাম্ স্মিথ্ বলিয়াছিলেন যে, শ্রম-বিভাগের প্রসার বাজারের আয়তনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। স্থানীয় বাজারে বা অল্প পরিমাণে বিক্রয় হইবে, এরূপ দ্রব্যের বাজার খুবই ছোট এবং এমতাবস্থায় উৎপাদনের মাত্রাও কম হইবে, ফার্মের পক্ষে সর্বোন্নত স্তরে পৌঁছান সম্ভব না-ও হইতে পারে। বাজার-জনিত বাধা তিন দিক হইতে আসিতে পারে : ভৌগলিক, মানসিক ও উপাদান-গত।

অনেক শিল্পে একটি ফার্মে কেন্দ্রীয়ভাবে উৎপাদন সম্ভব নয় কারণ ক্রেতারা ছড়ান থাকে এবং বিক্রয়ের ব্যয় অধিক, যেমন পাঁউরুটি উৎপাদন, আসবাব প্রস্তুত ইত্যাদি। অনেক শিল্পে কাঁচামাল ছড়ান থাকে এবং তাহাদের একটি উৎপাদন-কেন্দ্রে একত্রে সংগ্রহ করা খুবই ব্যয়সাধ্য। এই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বাজারের বা কাঁচামালের নিকটবর্তী স্থানে ক্ষুদ্রমাত্রায় হইতে থাকিবে।

মানসিক বাধা আসে দ্রব্য পৃথকীকরণের (Product Differentiation) মধ্য দিয়া। একই শিল্পের মধ্যে প্রত্যেক ফার্ম নিজের দ্রব্যকে পৃথক দ্রব্য বলিয়া প্রচার করে এবং হয়ত বা একটু গুণের তারতম্য করিয়া পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া তোলে। ক্রেতাদের মধ্যেও, তাহাদের রুচি, আয় ও পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন দল ও উপদলে ভাগ হইয়া, কেহ এই দ্রব্য বা কেহ ওই দ্রব্য ক্রয় করিতে থাকে। প্রত্যেক দ্রব্যেরই একটি নিজস্ব বাজার সৃষ্টি হইয়া উঠে। ফলে, অনেক সময় ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদন চলে ; উৎপাদনের মাত্রা বাড়ান সম্ভব হয় না।

ফার্মগুলি দুই উপায়ে বাজার-জনিত সীমাবদ্ধতা অপসারণের চেষ্টা করে :

(ক) মালপত্র চলাচলের অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে কোন ফার্ম বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা ও উপশাখা স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ করিলে কিছু পরেই পরিচালন-জনিত বাধা উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। (খ) ফার্মটি বিভিন্নজাতীয় পৃথক রুচিসম্পন্ন ক্রেতাদের লক্ষ্য করিয়া অনেক ধরণের দ্রব্য

উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু তাহার ফলে সেই ফার্ম প্রত্যেক ধরণের দ্রব্যই ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদন করিতে থাকিবে, মাত্রা-বৃদ্ধিজনিত ব্যয়সঙ্কোচ লাভ করিতে পারিবে না।

বাজারজনিত বাধার আর একটি দিক হইল উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা। ফার্মের চাহিদা থাকিলেও বাজারে সেই উপাদান না থাকিতে পারে এবং উপাদান দুষ্প্রাপ্য হইলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করা চলে না। স্থির উপাদান থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধি চালাইয়া গেলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের কার্য্য সুরু হয়, ইউনিট প্রতি উৎপাদনের ব্যয় বাড়িয়া যায়।

তিন] মূলধনের দুষ্প্রাপ্যতা-জনিত বাধা ঃ

অনেক ক্ষেত্রে মূলধন না পাওয়াতে ক্ষুদ্র ফার্মের বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। অতিরিক্ত সুদের হার থাকিলে বা শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের ভাল প্রতিষ্ঠান না থাকিলে এরূপ ঘটে। তবে এক্ষেত্রে আসল বাধা মূলধনী দ্রব্য বা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতা। অর্থের দুষ্প্রাপ্যতাকে গুরুত্বপূর্ণ বাধা বলা চলে না।

ফার্মের বৃদ্ধির কারণ ও অভিপ্রায় (Causes and Motives of growth of a Firm) :

আধুনিককালে বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনের প্রসার হইতেছে। যদিও অনেক ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদনকারী ফার্ম এখনও আছে, কিন্তু বিভিন্ন প্রকার সুবিধা লাভের জন্য ফার্মের উৎপাদন-মাত্রার বৃদ্ধির দিকেই আজকাল ফার্মগুলির সাধারণ ঝোঁক। নিজের অর্থ, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ বাড়াইয়া ফার্মটি বাড়িতে পারে। অথবা অন্যান্য অনেক ফার্মের সহিত সম্মিলিত হইয়া একটি সংযুক্ত ফার্ম (Combined firm) গঠন করিয়া উহার বৃদ্ধি হইতে পারে। কোন ফার্মের নিজের বৃদ্ধির লক্ষ্য হইল সর্বোন্নত স্তরে পৌঁছান। সকলে মিলিয়া সম্মিলিতভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্য হইল একচেটিয়া অবস্থায় পৌঁছান।

বৃদ্ধির উপায়—নিজের চেষ্টায় বা অপরের সহিত মিলিত হইয়া

কোন ফার্মের নিজের বৃদ্ধির বহু অভিপ্রায় থাকিতে পারে।

এক] ব্যয়সঙ্কোচের অভিপ্রায় ঃ

উৎপাদন-মাত্রা বাড়াইলে বিভিন্ন কারণে ব্যয়-সঙ্কোচ লাভ হয়, ইউনিট প্রতি ব্যয় কমিয়া যায়। যন্ত্রজনিত, পরিচালন-জনিত, আর্থিক, বাণিজ্য-

জনিত, ঝুঁকিবণ্টন-জনিত বহুবিধ ব্যয় সঙ্কোচের সুবিধা লাভ করা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান অভিপ্রায়। কিন্তু অভিপ্রায় থাকিলে কি হইবে, বাস্তব ক্ষেত্রে বাজার-জনিত, পরিচালন-জনিত অথবা অর্থ-সম্পর্কীয় বাধা উৎপাদন বৃদ্ধির পথকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে।

দুই] একচেটিয়া স্থাপনের অভিপ্রায়ঃ

উৎপাদন-মাত্রা বাড়াইয়া সমগ্র বাজারে একাই বিক্রয় করিতে পারিলে মুনাফা বৃদ্ধি হয়, সুতরাং একচেটিয়া-জনিত মুনাফা লাভের অভিপ্রায়ে ফার্মসমূহ বাড়িতে থাকে। বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া, দাম বাড়াইয়া, মুনাফা বাড়ান-ই হইল একচেটিয়া স্থাপনের উদ্দেশ্য। মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যয়-সঙ্কোচের অভিপ্রায়ে বাড়িলেও ফার্মটি একচেটিয়া অবস্থায় আসিয়া পড়িতে পারে, আবার একচেটিয়া স্থাপনের অভিপ্রায়ে বাড়িলেও ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা পাইতে পারে।

তিন] ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায়ঃ

বড় ব্যবসার মালিক হইলে বেশী মুনাফা, বেশী ক্ষমতা, সমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভের সম্ভাবনা থাকে। তাই অনেক সময় নিজের অহঙ্কার এবং ক্ষমতা লিপ্সার ফলে উদ্যোক্তা ফার্মের বৃদ্ধি ঘটায়। নিজের শক্তির পূর্ণ ব্যবহার, স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করার আকর্ষণ; অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্য হইতে নিজেকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সাধনা, সব কিছুই উদ্যোক্তাকে প্রেরণা দেয়। সৃষ্টিশীল, দায়িত্বশীল এবং ক্ষমতাশীল কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়ার এই আবেগের ফলেও ফার্মের বৃদ্ধি হইতে পারে।

স্বাধীন কার্য্যের প্রতি উদ্যোক্তার এই আকর্ষণ অন্যের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে সংযুক্ত-ফার্ম গঠনে অনেক সময় বাধা দেয়।

চার] অর্থলাভের অভিপ্রায়ঃ

অন্যের সহিত মিলিত হইয়া কোন ফার্মের যখন বৃদ্ধি হয়, তখন সেই ফার্ম-সম্মিলনের ও ফার্ম-সংযুক্তির উদ্যোক্তাগণ প্রচুর অর্থ কমিশন ইত্যাদি হিসাবে পাইয়া থাকেন। শেয়ার বাজারের দালালগণ বা ব্যাঙ্কগুলি কোন শিল্পে ফার্ম-সম্মিলন ঘটাইয়া দিতে পারিলে শেয়ারের দাম বাড়াইয়া এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রচুর

অর্থ আয় করিবার সুযোগ পায়। এই সুযোগ লাভের অভিপ্রায়ে সংযুক্তির দ্বারা ফার্মের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

পাঁচ] বিবিধ অভিপ্রায়ঃ

অনেক সময় দেশের প্রচলিত আইনের পরিবর্তন হইলে ফার্মগুলির বাড়িতে হয়। নূতন আইনের ফলে তাহাদের নূতন শাখা স্থাপন বা নূতন দ্রব্য উৎপাদন বা নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইতে পারে। যেমন অবন্টিত মুনাফার উপর কর ধার্য্য করা হইবে না স্থির করা হইলে ফার্মগুলি মুনাফা কম বণ্টন করিয়া বেশীর ভাগ মুনাফাকে পুনরায় উৎপাদনের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে। এইরূপে মুনাফার পুনর্কর্ষণের (Plough back) ফলে ফার্মের বৃদ্ধি হইতে পারে।

ফার্ম-বৃদ্ধির দিক্ নির্ণয় (Direction of growth of a Firm) ঃ

কোন ফার্মের বৃদ্ধি হয় নিজের যন্ত্রপাতি, কাচামাল, মূলধন, শ্রমিক সংখ্যা ইত্যাদির পরিমাণ বাড়াইয়া। ইহার ফলে তাহার নিজের কাঠামোতে পরিবর্তন হইতে পারে (Structural Changes), অথবা তাহার কার্য্যাবলীর পরিধিতে (Scope of Operation) রদবদল হয়। যদি নূতন দ্রব্য, নূতন পদ্ধতি এবং নূতন বাজার ইত্যাদি, তাহার পুরাণো কার্য্যাবলীর সহিত যুক্ত হয় তবে এই রূপ বৃদ্ধিকে সংযোজন (Integration) বলা হয়। যেমন, বাটা কোম্পানী পূর্বে শুধু জুতা উৎপাদন করিত ; বর্তমানে উহার সহিত গেঞ্জি, ছাতা ইত্যাদির উৎপাদন সুরু করিয়াছে। যদি পুরাণো কার্য্যাবলীর কিছু কিছু অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিযোজন (Disintegration) বলা হয়।

এই সংযোজন বিভিন্ন মুখী হইতে পারে।

এক] সমমুখী সংযোজন (Horizontal Integration) ঃ

যখন কোন ফার্ম তাহার দ্রব্য বা পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন না করিয়া যন্ত্রপাতি, কারখানা, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি বাড়াইয়া দেয় তখন তাহাকে সমমুখী সংযোজন বলে। এই সময়ে ফার্মের কার্য্যাবলীর বিস্তৃতি (Range) পরিবর্ত্তিত হয় না। সাধারণতঃ ফার্মের বৃদ্ধি এইভাবেই হইয়া

থাকে। ইহাতে মাত্রাজনিত ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয়। যদি

ইহার সুবিধা

নূতন দ্রব্য বা পদ্ধতি গৃহীত হয় অর্থাৎ ফার্মের কার্য্যাবলীর পরিধি বাড়ে, তাহা হইলে বহু প্রকার দ্রব্য প্রত্যেকটিই ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদন হইবে, মাত্রাজনিত ব্যয়সঙ্কোচ তাহার পক্ষে লাভ করা সম্ভব হইবে না।

দুই] লম্বমুখী সংযোজন (Vertical Integration) :

একটি সম্পূর্ণ দ্রব্যের উৎপাদন বহু স্তরের উৎপাদনের মধ্য দিয়া সাধিত হয়। যেমন ইস্পাত উৎপাদনের বহু স্তর আছে; খনি হইতে উত্তোলন, লোহা উৎপাদন এবং লোহাকে ইস্পাতে পরিণত করা। যদি লোহা উৎপাদনকারী কোন ফার্ম উহার পরবর্ত্তী স্তর অর্থাৎ ইস্পাত উৎপাদন সুরু করে, অথবা লোহার পূর্ববর্তী স্তর অর্থাৎ খনির কাজ হাতে লয়, তাহা হইলে ফার্মের এইরূপ বৃদ্ধিকে লম্বমুখী সংযোজন বলে।

দ্রব্যোৎপাদনের স্তর-ক্রমের কয়েকটি বা সবগুলি এক ফার্মের হাতে থাকিলে প্রত্যেক স্তরের সহিত অন্য স্তরের উৎপাদনের সামঞ্জস্য সাধন করা যায় এবং সকল স্তরের উপযোগী যন্ত্রপাতিরই প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যেক স্তরের

ইহার সুবিধা

উৎপাদন যদি বিভিন্ন ফার্মের হাতে থাকে তাহা হইলে পরস্পর বিরোধী স্বার্থে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, প্রত্যেকের উৎপাদনেই ঝুঁকির পরিমাণ বেশী থাকে। লম্বমুখী সংযোজনের ফলে সকল স্তর মিলাইয়া ব্যাপক উৎপাদন-পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়, ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় কমিতে পারে।

কেয়ার্নক্রস্ এই লম্বমুখী সংযোজনকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন :

(ক) পশ্চাৎমুখী সংযোজন (Backward Integration) : কাঁচামাল উৎপাদন সুরু করা, যেমন ইস্পাতের ফার্ম কর্তৃক কাঁচা লোহার উৎপাদন সুরু করা।

(খ) অগ্রমুখী সংযোজন (Forward Integration) : পরবর্তী স্তরের উৎপাদন নিজে সুরু করা, যেমন লোহা উৎপাদনকারী ফার্ম কর্তৃক ইস্পাত উৎপাদন সুরু করা।

(গ) কৌণিক সংযোজন (Diagonal Integration) : আনুষঙ্গিক

দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন যেমন মোটর কোম্পানী কর্ত্তৃক মেরামতী কারখানা স্থাপন ইত্যাদি।

পশ্চাৎমুখী সংযোজনের উদ্দেশ্য হইল প্রধানতঃ কাঁচামালের যোগান সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকা এবং অগ্রমুখী সংযোজনের উদ্দেশ্য হইল বাজার সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া। কৌণিক সংযোজনের উদ্দেশ্য হইল যন্ত্র-জনিত ব্যয়-সঙ্কোচের বা উপদ্রব্য প্রস্তুতের সুবিধা পাওয়া।

তিন] পার্শ্বিক সংযোজন (Lateral Integration) ঃ

যখন কোন ফার্ম বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন সুরু করে তখন তাহাকে পার্শ্বিক যুক্তীকরণ বলে। যেমন, কোন রেল কোম্পানী যদি হোটেল, বাস বা ষ্টীমার চালান হাতে নেয়।

চার] আঞ্চলিক সংযোজন (Territorial Integration) ঃ

যখন কোন ফার্ম কোন নূতন স্থানে শাখা স্থাপন করে তাহাকে স্থানিক সংযোজন বলা হয়। মাল চলাচলের ব্যয় অত্যধিক হইলে এইরূপ নূতন শাখা স্থাপন করিয়া ফার্ম বর্দ্ধিত হইতে পারে।

একচেটিয়া ব্যবসা (Monopoly) ঃ

কোন দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান যখন একটি ফার্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, ফার্মটিকে দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় না, সেই অবস্থাকে নিখুঁত একচেটিয়া ব্যবসা বা একচেটিয়া অবস্থা বলা হয়।

একচেটিয়া শক্তির ভিত্তি ঃ

(ক) বাস্তবে পূর্ণ একচেটিয়া অবস্থা (Perfect Monopoly) থাকে না। সকল দ্রব্যেরই দূরবর্ত্তী বা ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী থাকে। যদি সেই দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী থাকে তাহা হইলে কিছুতেই একচেটিয়া ব্যবসা শক্তিশালী হইতে পারে না, কারণ দাম বৃদ্ধি করিলে ক্রেতাগণ তাহার দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য ব্যবহার করিবে। যদি পরিবর্ত-সামগ্রী দূরবর্ত্তী জাতীয় হয়, তাহা হইলে একচেটিয়া শক্তিশালী হইয়া থাকে। যেমন বিদ্যুত-এর কোন ঘনিষ্ট পরিবর্ত সামগ্রী নাই, কিন্তু লাক্স সাবানের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী আছে (মার্গো, হামাম, পামলিভ ইত্যাদি)।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া শক্তির ভিত্তি নির্ভর করে নূতন প্রতিযোগীদের

ওই ব্যবসাতে প্রবেশ করার সম্ভাবনার উপর। আইনের দ্বারা, কাঁচামালের উৎসের উপর মালিকানা বজায় রাখিয়া, জোর করিয়া বা যে কোন উপায়ে যদি একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে নূতন প্রতিযোগী ফার্মের প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা না হয় তাহা হইলে একচেটিয়া শক্তি টিঁকিতে পারে না।

একচেটিয়া অবস্থা উদ্ভবের উপায় দুইটি : ফার্মের উৎপাদন মাত্রা ক্রমাগত বাড়াইয়া বাজার দখল করা, অথবা অনেক ফার্ম একত্র হইয়া একটি সংযুক্ত ফার্ম গঠন করা।

একচেটিয়া শিল্প-সংযুক্তির কারণ কি ? (Causes of Monopolistic or Industrial Combinations) :

১। একচেটিয়া মুনাফালাভ

এক] একচেটিয়া ফার্ম বাজারের যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া এমনভাবে দাম বাড়াইতে পারে, যেখানে তাহার সর্বোচ্চ একচেটিয়া মুনাফা হইবে। প্রতিযোগিতা থাকিলে দাম বাড়ান সম্ভব নহে ; একচেটিয়া থাকিলেই দাম বাড়ান এবং অধিক মুনাফা পাওয়া সম্ভব। তাহা ছাড়া কাঁচামাল, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি সকল উপাদানের মালিককে অনেক ক্ষেত্রে একচেটিয়া ফার্ম কম দামে উপাদান বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতে পারে, ফলে মুনাফা বেশী পাইবার সম্ভাবনা। তাই দেখা যায় যে, একচেটিয়া মুনাফালাভ করিবার জন্যই ফার্মগুলি একত্র হইয়া শিল্প-সংযুক্তি গঠন করিবার দিকে ঝোঁকে।

২। উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইয়া ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধালাভ

দুই] ফার্ম সমূহ অনেক সময়ে ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধালাভ করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয়। প্রতিযোগিতা থাকিলে প্রত্যেকের উৎপাদন-মাত্রা কম থাকিবার সম্ভাবনা, সকলে মিলিত হইয়া একটি ফার্ম গঠন করিলে উৎপাদনের মাত্রা বৃহৎ হইবে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচের সুবিধাসমূহ লাভ করা সম্ভব হইবে। প্রতিযোগিতার দরুণ যে অপচয়গুলি (যেমন, বিজ্ঞাপনের ব্যয় ইত্যাদি) হইয়া থাকে, একচেটিয়া শিল্প গঠিত হইলে সেইরূপ অপচয় রোধ হইবে, ব্যয় বাহুল্য কমিয়া যাইবে। যানবাহন-সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস পাইবে। কোন অনিপুণ ও দক্ষতাহীন ফার্ম থাকিলে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। অথবা, সংযুক্ত হইবার পরে ফার্ম সমূহের মধ্যে দ্রব্যোৎপাদন বিভক্ত করিয়া দেওয়া চলিবে,

ফলে, প্রত্যেক ফার্ম অল্প পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে ঔৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে। প্রত্যেক ফার্মের শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞান, উৎপাদন কৌশলের খুঁটিনাটি ও শিল্প সম্পর্কীয় ধারণাবলী একত্রে মিলিয়া সকলেরই ব্যয়সঙ্কোচে সাহায্য করিবে।

৩। আত্মরক্ষার সুবিধালাভ

তিন] আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অনেক সময় ফার্মসমূহ একত্র হইয়া শিল্প-সম্মিলন গঠন করিয়া তোলে। বিদেশী প্রতিযোগিতার ভয়ে, নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য, অথবা যাহাতে আরও নূতন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য ফার্মসমূহ সংযুক্ত হইতে পারে। জাভার চিনি শিল্পের প্রতিযোগিতার ভয়ে যেমন এক সময় ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট গঠিত হইয়াছিল।

৪। প্রতিযোগিতা-মূলক অবস্থার ঝুঁকি কমান

চার] অনেক সময় প্রতিযোগিতা-মূলক অবস্থার ঝুঁকি কমাইবার উদ্দেশ্যে ফার্মগুলি একচেটিয়া সংস্থা গড়িয়া তোলে। প্রতিযোগিতায় সর্বদাই লোকসানের সম্ভাবনা, তাই ফার্মগুলি একত্র হয়।

৫। মনস্তাত্ত্বিক কারণ সমূহ

পাঁচ] ক্ষমতা ও সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে ফার্মের মালিকরা মিলিত হইয়া বিরাট একচেটিয়া সংস্থা গড়িয়া তোলে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর কিছুটা আয়ত্তে রাখা এবং একটি দ্রব্যের যোগানকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া যে আনন্দ ও উত্তেজনা লাভ করা যায়, তাহার আকর্ষণেও অনেক সময় ফার্ম সমূহ মিলিত হইয়া থাকে।

৬। আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

ছয়] অনেক সময়ে আইনের দ্বারা একচেটিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়। যে সকল শিল্প জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট (যেমন পোষ্ট অফিস, রেলপথ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি) সেই সকল শিল্পে প্রতিযোগিতা দেশের সম্পদের অপচয় করে। এই সকল ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা অনেক সময়ে নূতন ফার্ম স্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয় না।

শিল্প-সংযুক্তির রূপ ঃ (Forms of Combinations) :

একটি শিল্পের অন্তর্গত ফার্ম-সমূহের সংযুক্তি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করিতে পারে, উৎপাদনের পরিমাণ, বিক্রয় বা দাম সম্বন্ধে আলোচনা ও সংযুক্তির উদ্দেশ্যে

অলিখিত চুক্তি হইতে সুরু করিয়া নিজেরা সম্পূর্ণ মিশিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সংযুক্তির গভীরতা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। প্রথমাবস্থায় দাম, বাজার ও উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে **অলিখিত চুক্তি** হয়। কিন্তু ফার্মসমূহ মুনাফার লোভে বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ অলিখিত চুক্তি মানিতে চাহে না। তখন ফার্ম সমূহ আর একটু পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হইয়া **লিখিতভাবে চুক্তি** করে। তাহার পরবর্ত্তী স্তরে ফার্মগুলি মিলিয়া একটি সমিতি বা সঙ্ঘ স্থাপন করে এবং ধীরে ধীরে এই সঙ্ঘ বা সমিতির মারফৎ দাম, বাজার বা উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা হইতে থাকে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে **কার্টেল** বলা হয়। সর্বশেষ স্তরে তাহারা নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়া একটি ফার্মে পরিণত হয়, সেই প্রতিষ্ঠানকে **ট্রাষ্ট** বলা হয়।

অলিখিত চুক্তি, লিখিত চুক্তি, কার্টেল, ট্রাষ্ট

কার্টেল হইল শিল্প-সংযুক্তির এমন একটি রূপ যাহা শুধু দ্রব্যের বা প্রত্যেক ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে তাহাই নহে, দ্রব্য বিক্রয়ের ভারও হাতে তুলিয়া লয়। উৎপাদন ও পরিচালনা হইতে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত পৃথক হইয়া যায়। স্বাধীন ফার্ম সমূহ উৎপাদন চালায়, যদিও তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। একচেটিয়া দামের সুবিধা প্রত্যেক ফার্ম পায়। যখন খুসী যে কোন ফার্ম কার্টেল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে।

কার্টেল

বহু ফার্ম মিলিয়া যখন একটি ফার্ম গঠিত হয় এবং মিলিত ফার্মগুলির পৃথক সত্তা বজায় থাকে না, বা কেহ পৃথক হইয়া যাইতে পারে না, এরূপ সম্মিলনকে ট্রাষ্ট বলে। উৎপাদন, পরিচালনা ও বিক্রয়-বন্দোবস্ত সব কিছুই কেন্দ্রীয় সংস্থা হইতে করা হয়। এই ট্রাষ্ট উহার অন্তর্গত কোন ফার্ম বন্ধ করিয়া দিতে পারে, ফার্মসমূহকে একই কোম্পানীর বিভিন্ন উৎপাদনকারী কেন্দ্র হিসাবে ধরা হয়। যদি ফার্ম সমূহের মালিকগণ কোন নূতন কোম্পানী গঠন করেন এবং সকল ফার্মের স্বত্ব এই নূতন কোম্পানী কিনিয়া লয় তাহা হইলে সেই কোম্পানীকে হোল্ডিং কোম্পানী বলা হয়। ইহা কার্য্যতঃ ট্রাষ্টেরই একটি সাংগঠনিক রূপ, আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ট্রাষ্ট-বিরোধী আইন পাশ করার পর সেই আইন এড়াইবার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল।

ট্রাষ্ট ও হোল্ডিং কোম্পানী

শিল্প-সংযুক্তি কার্টেলের রূপ বা ট্রাষ্টের রূপ গ্রহণ করিবে তাহা প্রধানতঃ তিন জাতীয় কারণের উপর নির্ভর করেঃ ব্যক্তিগত, আইনগত এবং অর্থনৈতিক সুবিধা-অসুবিধার বিচার। শিল্প-সম্মিলনের রূপ সম্বন্ধে ফার্মের মালিকদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে। কোন্ দেশের আইন কিরূপ শিল্প-সম্মিলনের বিরোধী তাহাও দেখিতে হইবে। তবে অর্থনৈতিক সুবিধা-অসুবিধা সমূহ-ই এক্ষেত্রে প্রধান বিচার্য্য বিষয়। ট্রাষ্টের বহু সুবিধা আছে। যে ক্ষেত্রে বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদনের ফলে ব্যয়-সঙ্কোচের পরিমাণ অধিক হওয়ার সম্ভাবনা, সে ক্ষেত্রে কার্টেলের তুলনায় ট্রাষ্টই সুবিধাজনক। কারণ, কার্টেলে পৃথক ফার্মগুলি প্রত্যেকে অল্প উৎপাদন করে, ট্রাষ্টে এক সঙ্গে বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন হওয়া সম্ভব। ট্রাষ্ট সাধারণতঃ দীর্ঘ স্থায়ী। কার্টেলের স্থায়িত্ব কম, যে অবস্থায় কার্টেল গঠিত হইয়াছিল সেই অবস্থার পরিবর্ত্তনে ফার্মগুলি কার্টেল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। তাহা ছাড়া মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে কার্টেলের তুলনায় ট্রাষ্টের সুবিধা বেশী।

ট্রাষ্ট ও কার্টেলের তুলনামূলক দোষ-গুণ বিচার

কিন্তু কোন শিল্পের সকল ফার্মই নিজের পৃথক অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়া ট্রাষ্টে যোগ না দিয়া কার্টেলে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চাহে, এরূপ হইতে পারে। সুতরাং কার্টেল সমগ্র শিল্পকে হাতের মুঠোয় রাখে, ট্রাষ্টের পক্ষে তাহা সম্ভব না-ও হইতে পারে। তাহা ছাড়া, ট্রাষ্ট খুবই ব্যয়বহুল, কিন্তু কার্টেলের সংগঠন অল্প ব্যয়-সাধ্য। যে সকল শিল্পে সর্বোন্নত ফার্মের উৎপাদন-মাত্রা ও আয়তন খুবই কম, সেক্ষেত্রে ট্রাষ্ট সংগঠন করিয়া উৎপাদন-মাত্রা বাড়ান ব্যয়-বাহুল্য আনিতে পারে, এরূপ অবস্থায় ট্রাষ্টের তুলনায় কার্টেলই সুবিধাজনক। সর্বোপরি, কার্টেল একটি নমনীয় প্রতিষ্ঠান; অবস্থা বুঝিয়া ফার্মগুলি ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে এবং অবস্থা ও সুবিধামত বাহির হইয়া আসিতে পারে। এই নমনীয়তা পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক জগতে খুবই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়।

শিল্প-সংযুক্তি গঠনের দিক-নির্ণয়: (Directions or Types of Growth of Industrial Combinations):

যদি কোন শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্ম অর্থাৎ এক-জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্ম মিলিত হইয়া শিল্প-সম্মিলন গঠন করে, তাহা হইলে

তাহাকে সমমুখী সংযুক্তি (Horizontal Combination) বলে। আর যদি একটি দ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন স্তরের দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্ম মিলিত হয় তবে তাহাকে লম্বমুখী সংযুক্তি (Vertical Combination) বলা হয়।

কোন দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর, যেমন খনিজ লোহা, কাঁচা লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্য সাধারণতঃ বিভিন্ন ফার্ম উৎপাদন করে। একটি দ্রব্যের বিভিন্ন স্তরের উৎপাদনকারী ফার্মসমূহ সকলে একত্র হইয়া সংযুক্তি ঘটিলে সকল ফার্মেরই সুবিধা হওয়ার কথা। পরিচালনার সুবিধা হয়, উৎপাদনের প্রতিটি স্তরের প্রত্যেকটি ফার্ম যে পৃথক মুনাফা করে তাহা বন্ধ হয়; বিক্রয়-জনিত ব্যয়, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞাপনের ব্যয় কমিয়া যায়; প্রত্যেক পৃথক স্তরে অধিকোৎপাদন হইয়া লোকসানের ঝুঁকি তিরোহিত হয়। প্রয়োজনের সময় কাঁচামাল না পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, কাঁচামাল উৎপাদকেরও দ্রব্য অবিক্রীত থাকার ভয় থাকে না। ব্যাপক পরিকল্পনার সাহায্যে শিল্প পরিচালনা সম্ভব হয়, বহু দিক হইতে ব্যয় সঙ্কোচ ঘটে। একটি যন্ত্র চালাইয়া তাহা হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন স্তরের উৎপাদন চলিতে পারে, যানবাহনের ব্যাপারে ব্যয় কমিয়া যায়।

শিল্প-সংযুক্তির অর্থ-নৈতিকভাবে শুভ ফলাফল

কিন্তু বহু কারণে ব্যয়-বাহুল্যের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। প্রথমতঃ, সমগ্র সংস্থাটি নির্ভর করে সর্বশেষ স্তরের ফার্মটি উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিল কি না তাহার উপর। যদি বিক্রয়ে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সকল স্তরের উৎপাদনই হ্রাস পাইবে। সম্মিলন না ঘটিলে বিভিন্ন স্তরের প্রত্যেকটি ফার্ম নিজেই নিজের পথ খুঁজিয়া লইতে পারিত, অন্য যে কোন স্থানে যে কোন দামে বিক্রয় করিয়া নিজের কাঠামোতে পরিবর্তন আনিয়া বাঁচিয়া যাইতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ শিল্প-সংযুক্তির পক্ষে ব্যবসা-সঙ্কটের সময়ে অন্যস্থান হইতে অল্প দামে কাঁচামাল ও পূর্ববর্তী স্তরজাত দ্রব্য ক্রয়ের সুবিধা থাকে না। তৃতীয়তঃ, চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্তরের উৎপাদনের কাঠামোতে পরিবর্তন আনা সম্ভব নহে, ফলে ব্যয়-বাহুল্য ঘটিতে পারে। যেমন ইস্পাতের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেল, সর্ব্বশেষ স্তরের ইস্পাত উৎপাদনকারী ফার্মটি তাহার যন্ত্রপাতি বাড়াইয়া

লম্বমুখী সংযুক্তির অসুবিধা

ফেলিল, ধরা যাক, দ্বিগুণ করিল। পূর্ববর্ত্তী স্তর অর্থাৎ লোহার উৎপাদন দ্বিগুণ করা দরকার। কিন্তু সেক্ষেত্রে যন্ত্রের আকৃতি এইরূপ থাকিতে পারে যে তাহা বৃদ্ধি করিলে লোহার উৎপাদন হয় দ্বিগুণের কম হইবে অথবা তিনগুণ হইবে। এমতাবস্থায় দ্বিগুণের কম হইলে ফার্ম্মটিকে বাহির হইতে বাজার দরে লোহা ক্রয় করিতে হইবে (চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ সম্ভবত বেশী দাম দিয়া,) অথবা বেশী লোহা বাজারে বিক্রয় করিয়া (লোহার যোগান বাড়িয়া যাওয়ায়, সম্ভবত কম দামে) প্রতিযোগী ফার্মদের ইস্পাত উৎপাদনের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যেক স্তরের উৎপাদন একই সঙ্গে এরূপ মাত্রায় হওয়া সম্ভব না-ও হইতে পারে, যখন সকলেই সর্বোন্নত (optimum) অবস্থায় উৎপাদন করিতেছে।

একই দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্মসমূহ একত্র হইলে বহু সুবিধা পাওয়া যায়—ইহারা প্রধানতঃ একচেটিয়া ব্যবসার সুবিধাগুলি পাইয়া থাকে।

সমমুখী সংযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধা

নিজেদের মধ্যে দাম কাটাকাটি বন্ধ হয়, ঝুঁকি কমিয়া যায়, বিজ্ঞাপনের ব্যয় কমে। পরিচালন-গত সুবিধা হয়, এবং সংযুক্ত ফার্মটি এক-চেটিয়াসুলভ মুনাফা লাভে সক্ষম হয়।

ইহার প্রধান অসুবিধা হইল এই যে যদি দ্রব্য-পার্থক্য (Product-differentiation) থাকে, তাহা হইলে ক্রেতাদের মনে প্রত্যেক ফার্মের দ্রব্য সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা থাকে যে তাহা অপর ফার্মের দ্রব্য হইতে একটু বা বেশী পৃথক। এইরূপ ক্ষেত্রে সেই শিল্প-সম্মিলনের পক্ষে একই দ্রব্যের বিভিন্ন ধরণ বাজারে চালু রাখিতে হইতে পারে। ইহাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে বিক্রয়-জনিত ব্যয়সঙ্কোচ না হওয়ার সম্ভাবনা এবং উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করাও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব না হইতে পারে।

শিল্প-সংযুক্তি গঠনের সম্ভাবনা (Chances of Combination) :

শিল্প সংযুক্তি গঠনের সম্ভাবনা বহু বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, যদি প্রতিযোগী ফার্মের সংখ্যা খুব কম থাকে তাহা হইলে শীঘ্র ও সহজে চুক্তির এবং সঙ্ঘ গঠনের সম্ভাবনা বেশী। সম্মিলনের জন্য প্রয়োজন হইল আলাপ আলোচনা, বোঝাবুঝি এবং একমত হওয়া। অনেক ফার্ম থাকিলে ইহাতে অসুবিধা। কয়েকজনের মধ্যে মতৈক্যের সম্ভাবনা অনেকের মধ্যে মতৈক্যের সম্ভাবনা হইতে অধিক। দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রতিযোগী

ফার্মসমূহের পারস্পরিক ক্ষমতা মোটামুটি সমান হয় তাহা হইলেই তাহারা সহজে বোঝা পড়ার মধ্যে আসিতে পারে। অল্প শক্তি-সম্পন্ন ফার্মদের বৃহৎশক্তি সম্পন্ন ফার্ম আমল না দিতে পারে, সে দামের লড়াই-এ ছোট ফার্মকে দমাইয়া নিজে একচেটিয়া স্থাপন করিবার আশা পোষণ করিতে পারে।

কম সংখ্যা, সমান ক্ষমতা এক জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন, নিকটে অবস্থান, সংরক্ষণী শুল্ক

তৃতীয়তঃ, যদি একই শিল্পে দ্রব্য পার্থক্য দেখা যায়, তাহা হইলে শিল্প-সম্মিলন হওয়া দুরূহ। প্রত্যেক ফার্ম যদি ওই শিল্পের মধ্যেই নিজের মার্কা-মারা দ্রব্যটির জন্য একটি পৃথক বাজার সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে এবং আধা-একচেটিয়া অবস্থা গঠন করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সম্মিলনের সম্ভাবনা কম। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকিলে প্রতিযোগী ফার্মগুলি নিজেদের মধ্যে আত্মধ্বংসী প্রতিযোগিতা হইতে বিরত হইয়া সকলের স্বার্থে সম্মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে। চতুর্থতঃ, যদি শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলি মোটামুটি পরস্পরের নিকটেই অবস্থিত থাকে তাহা হইলে দৈনন্দিন আলাপ আলোচনা ও পরিচয়ের ভিত্তিতে পারস্পরিক সমস্যার বোঝাপড়া হইতে পারে এবং সম্মিলনের চিন্তা করা সহজ হইয়া উঠে। পঞ্চমতঃ, যদি ফার্মগুলি কোন সংঘ বা সমিতিতে যুক্ত থাকে তাহা হইলে সঙ্ঘের মারফৎ সংযুক্তির আলোচনা সম্ভব হয়, একসঙ্গে কাজ করিবার অভ্যাসও গড়িয়া উঠে। ষষ্ঠতঃ, সংরক্ষনী শুল্ক অনেক সময়ে শিল্প সম্মিলনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। বিদেশী দ্রব্যের দাম ও শুল্কের পরিমাণ যোগ করিলে যদি দেশীয় বাজারের দাম অপেক্ষা বেশী হয়. তাহা হইলে দেশীয় ফার্মগুলি একত্র হইয়া দাম বাড়াইয়া বেশী দামে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে পারে। কারণ, সংযুক্তি না হইলে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে তাহারা দাম বাড়াইতে পারিবে না। এইজন্য বলা হয় যে, সংরক্ষনী শুল্কই ট্রাষ্টের জন্মদাতা।

একচেটিয়া দোষ-গুণ বিচার : (Advantages and Defects of Monopoly) :

একচেটিয়া ব্যবসার বহুপ্রকার সুবিধা আছে, সকল সময়েই যে ইহা সমাজের স্বার্থ-বিরোধী, তাহা নহে। প্রথমতঃ, এরূপ অনেক শিল্প আছে যাহাতে প্রতিযোগিতা থাকার দরুণ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ফার্ম চালু থাকে। ইহার ফলে কোন ফার্মের পক্ষেই বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন করিয়া ব্যয়সঙ্কোচ ঘটান সম্ভব

হয় না। এইরূপ অবস্থায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হইলে ফার্মটি উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির দরুণ সকল প্রকার ব্যয়-সঙ্কোচ পাইতে পারে এবং উৎপাদন ব্যয় কমাইয়া ফেলিতে পারে। প্রতিযোগিতা-জনিত ঝুঁকি কমিয়া যায়, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জন্য ব্যয় হ্রাস পায়। অধিকোৎপাদন (Over-Production) ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্ভাবনা কমে। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ অনেক শিল্প আছে যাহাদের জন-প্রয়োজনীয় (Public utility) শিল্প বলা হয়, যেমন রেলওয়ে, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি। এই সকল শিল্পে একচেটিয়া অধিকার থাকিলে জাতীয় সম্পদের অপব্যয় কম হয়। যেমন, দুইটি স্থানের মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানী যদি রেল লাইন স্থাপন করিতে থাকে তাহা হইলে দেশে চাষের জমি কম পড়িয়া যাইবে, এই সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সুবিধা-সমূহ

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, একচেটিয়া ব্যবসা প্রায় সকল সময়েই সমাজ-বিরোধী। প্রথমতঃ, প্রতিযোগিতার চাবুক না থাকিলে উদ্যম, প্রেরণা ও নূতনত্বের প্রতি আকর্ষণ কমিয়া যায়. উৎপাদন-ব্যয় কমান বা বাজার-সৃষ্টির দিকে নজর থাকে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ পরিত্যাগ করিয়া, নিজের লব্ধ একচেটিয়া শক্তিকে কোন মতে টিঁকাইয়া রাখার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ, মাত্রা-বৃদ্ধির দরুণ যে ব্যয় সঙ্কোচ সে লাভ করে কম দামের মারফৎ জনসাধারণের নিকটে তাহা পৌঁছায় না। একচেটিয়া ফার্ম দাম যথাসম্ভব অধিক রাখিয়া জনসাধারণকে শোষণ করার চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া ফার্মের দরকষাকষির শক্তি (Bargaining Power) অনেক বেশী, সুতরাং শ্রমিক ও কাঁচামালের যোগানদারদের সে বিশেষভাবে শোষণ করিতে পারে। যদি কোন কাঁচামালের শিল্পে কোন ফার্মের একচেটিয়া অধিকার থাকে, তাহা হইলে এইরূপ মূল্য-কাঠিন্যের (Price-rigidities) দরুণ ব্যবসা-সঙ্কটের সময়ে সে সঙ্কট তীব্রতর হয়, কারণ কাঁচামালের ফার্ম অনেক সময় অন্য ফার্মকে নিজের ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার উদ্দেশ্যে গুণ্ডামি, ঘুষ, রাজনৈতিক দল করায়ত্ত করা—এইরূপ সকল প্রকার অসৎ কাজ করিয়া সমাজ-দেহ কলুষিত করে। যেমন, সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেড্ ফ্রুট কোম্পানী একচেটিয়া স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে গুয়েতেমালার রাজনৈতিক বিপ্লবকে বানচাল করিয়া দিয়াছে।

অসুবিধা-সমূহ

একচেটিয়া-নিয়ন্ত্রণ (Control of Monopoly) :

একচেটিয়া শক্তির ভিত্তি দুর্বল করিয়া তাহার দৌরাত্ম্য কমাইবার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র বহু প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

এক] একচেটিয়া ব্যবসায়ী বিভিন্ন উপায়ে নূতন প্রতিযোগিদের নিজের শিল্পে প্রবেশ করিতে বাধা দেয় ও এইভাবে তাহার ক্ষমতা বজায় রাখে। নূতন ফার্ম একচেটিয়া শিল্পে প্রবেশের উপক্রম করিলেই সে তৎক্ষণাৎ দর কমাইয়া দিয়া তাহাকে বাজার হইতে হটাইয়া দিবার চেষ্টা করে। পরে পুনরায় দাম বাড়াইয়া লোকসান পূরণ করিয়া লয়। রাষ্ট্র যদি এইরূপ নিয়ম করে যে একবার দাম কমাইলে আবার খুসী মত বাড়ান চলিবে না, তাহা হইলে একচেটিয়া ব্যবসাদার কিছুটা নিরস্ত হইতে পারে এবং সেই শিল্পে প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহার অসুবিধা হইল এই যে কোন ফার্ম পরীক্ষামূলক ভাবেও দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে দাম কমাইতে চাহিবে না ; সুতরাং ওই দ্রব্যের দাম ভবিষ্যতে কোনদিনই হ্রাস না পাইবার সম্ভাবনা রহিয়া যাইবে।

দুই] রাষ্ট্র একচেটিয়া ব্যবসারদের উপর উচ্চহারে কর বসাইতে পারে এবং সেই কর হইতে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে নূতন ব্যবসাদারদের আর্থিক সাহায্য (Subsidy or Bounty) করিয়া একচেটিয়া শিল্পে প্রতিযোগিতার প্রসারে সহায়তা করিতে পারে।

তিন] রাষ্ট্র সর্বোচ্চ দাম বা সর্বোচ্চ মুনাফার হার বাঁধিয়া দিয়া একচেটিয়া ব্যবসাকে এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, যাহাতে প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারে যে দাম থাকিতে পারিত, তাহা হইতে দাম বৃদ্ধি হয় না। সর্বোচ্চ দাম নির্দ্ধারিত করিলে একচেটিয়া ফার্ম দ্রব্যের গুণ ও উৎকর্ষ কমাইবার চেষ্টা করিবে ; সুতরাং ইহার সহিত উৎকর্ষ-নিয়ন্ত্রণও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহার অসুবিধা হইল এই যে সর্বোচ্চ মুনাফা কাহাকে বলে তাহা লইয়া মতবিরোধ আছে, আর অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ মুনাফার হার পরিবর্তন করিতে হইতে পারে। সর্বোচ্চ দাম নির্দ্ধারণের আরও অসুবিধা হইল যে, ব্যয় বা চাহিদার কোন পরিবর্তন হইলেই এই নির্দ্ধারিত দাম পরিবর্তন করিতে হয়।

চার] রাষ্ট্র আইন করিয়া একচেটিয়া সংগঠনগুলি ভাঙিয়া দেওয়ার চেষ্টা

করিতে পারে, এবং বহুস্থানে এইরূপ চেষ্টা করিয়াছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে 'শেরম্যান ট্রাষ্ট-বিরোধী আইন' এবং 'ক্লেটন আইন' পাশ করা হইয়াছে। আইনবিদ্‌দের বুদ্ধি ও চাতুরীর ফলে এই আইনগুলির প্রয়োগ সার্থক হয় নাই। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, এই আইনগুলি সাময়িক সাফল্য লাভ করিলেও তাহার ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইবে এমন বলা চলে না।

সুতরাং দেখা যায় যে বাস্তবক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সহজ-সাধ্য নহে। রাষ্ট্রের আইন এড়াইবার মত চাতুর্য্য একচেটিয়া ব্যবসাদারদের আছে এবং বহুক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের উপর যথেষ্ট পরিমাণে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। দেশের জনমত যদি অত্যন্ত সচেতন ও প্রবল থাকে এবং একচেটিয়া ফার্মের কাজের উপর সর্বদা তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখিতে পারে, একমাত্র তাহা হইলেই যথেচ্ছ একচেটিয়া মুনাফা লাভে বাধা দেওয়া সম্ভব হয়। অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি যে রকম ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ ; সেই রকম উহা ভোগকারীর স্বাধীনতার (Consumers Sovereignty) রক্ষাকবচও বটে ৮

অনুশীলনী

1. Explain and Illustrate what you understand by internal and external economies. (B. A. '50)

2. Why does the small-scale producer still persist in many industries ? (B. A. '40, B.com. '38, '42, '54)

3. What are the conditions under which small-scale production-units are preferable to large-scale units. (B.com. '51)

4. Distinguish between Horizontal and vertical combinations. Discuss their advantages & disadvantages. (B. A. '44, '49 ; B.com '49, '52)

5. What are trusts and cartels ? Examine their merits and demerits. (B. A. '45)

6. Discuss the relative merits and demerits of trusts and cartels. (B.com. '54)

7. Discuss the various motives which impel different firms to combine. Are all such motives anti-social ?

(B.com '49, '54, B. A. '56)

8. Discuss the factors that determine the size of business units. (B. A. '55)

9. Account for the fact that in certain industries efficiency and economy can be secured only by monopolistic control. How is the interest of consumer safeguarded in such cases ? (B.com. '47, '49)

10. Contrast the different purposes for which the producers and labourers combine. (B. A. '47, '50)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভোগ ও চাহিদা

ভোগ (Consumption) :

মানুষের অভাবপূরণের নাম হইল ভোগ। ভোগের দ্বারাই মানুষের অভাব মোচন হইতে পারে। অভাব না থাকিলে ভোগের প্রয়োজন হয় না, ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বণ্টন, বিনিময় বা কোন প্রকার অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রয়োজন হইত না। সুতরাং অভাব এবং অভাব মোচনের চেষ্টাই হইল মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ভিত্তি।

ব্যক্তি যেহেতু স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, বাহির হইতে দ্রব্যাদি না পাইলে তাহার জীবনধারণ করা সম্ভব নয় সেইজন্যই তাহার অভাব সৃষ্টি হইয়া থাকে। কেবলমাত্র শরীর রক্ষার প্রয়োজনেই তাহার বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য সামগ্রী ভোগ করা আবশ্যক। অবশ্য, সকল দেশে, সকল সময়ে, এমন কি একটি দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও ব্যবহৃত এই সকল ভোগ্য দ্রব্যের পার্থক্য রহিয়াছে। আদিম অসভ্য যুগের পর হইতেই মানুষের অভাব বোধের মধ্যে শুধুমাত্র শারীরিক প্রয়োজন ছাড়াও মানসিক ও রুচির বিকাশের ফলে নূতন নূতন দ্রব্য সামগ্রীর জন্য অভাববোধ জাগ্রত হইয়াছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাই মানুষের অভাবের পরিমাণ এবং বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরের নিকট নিজেকে জাহির করা, অনুকরণ করা, অভ্যাস, এই সকল অভাববোধ সৃষ্টি করে এবং নূতনতর ভোগের প্রেরণা আনে। সরল জীবন যাপন এবং উচ্চ চিন্তা আজ আর মানুষের আদর্শ নাই, জীবন যাত্রার মান ক্রমাগত বৃদ্ধি করা, বিভিন্ন প্রকারের অভাব সৃষ্টি করা ও তাহার পূরণ করা, ইহাই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির প্রকাশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈচিত্র্যময় ক্রমবর্দ্ধমান অভাব, বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তোষ, উন্নততর ও অধিকতর ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবহার-অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশগুলির জীবন যাত্রার বৈশিষ্ট্য।

ভোগের প্রকৃতি

অভাবের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Wants) :

এই শ্রেণী বিভাগ চরম নহে, ইহা স্থান, কাল পাত্রানুযায়ী আপেক্ষিক

যে সকল ভোগ্য দ্রব্যের সাহায্যে মানুষের অভাব মোচন হয় সাধারণতঃ তাহাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ; আবশ্যক-দ্রব্য, আরাম-দ্রব্য ও বিলাস-দ্রব্য। ভোগদ্রব্যের এই প্রকার শ্রেণী-বিভাগ যে খুবই নিখুঁত তাহা নহে ; স্থান, কাল ও ব্যক্তি ভেদে কোন দ্রব্য একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বলা চলে। এইরূপ বিভাগকে তাই চরম সত্য বা বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

আবশ্যক দ্রব্য : আবশ্যক দ্রব্য বলিতে বুঝা যায় যাহা ব্যক্তির জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য। এই আবশ্যক দ্রব্যসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :

(ক) জীবন ধারণের পক্ষে আবশ্যক, যেরূপ খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি

(খ) দক্ষতা রক্ষার পক্ষে আবশ্যক, যেরূপ শিক্ষকের পক্ষে, কলম, বই পাঠগৃহ ইত্যাদি

(গ) সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ও অভ্যাস-জনিত আবশ্যক, যেরূপ চা, সিগারেট ইত্যাদি। বহুব্যবহার ও অভ্যাসের ফলে এই সকল দ্রব্য এমনই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে যে, অন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় না করিয়াও ব্যক্তি অনেক সময় ইহাদের ক্রয় করিয়া থাকে।

আরাম দ্রব্য : যে সকল দ্রব্য ব্যবহারের ফলে মানুষ আরাম পায়, সুখ অনুভব করে, তাহাকে আরাম দ্রব্য বলা হয়। এই সকল দ্রব্য ব্যবহারের ফলে ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু সে তুলনায় ইহাদের দরুণ ব্যয় অধিক হইয়া থাকে। এই আরাম দ্রব্যসমূহও স্থান, কাল ও শ্রেণী ভেদে পৃথক হইয়া থাকে। আরও দেখা যায় যে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে আরাম পাওয়া ও আরাম-দ্রব্য ব্যবহার করা মোটামুটিভাবে অভ্যাসের ফলে নির্দ্দিষ্ট থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর আয়-স্তর ও দামের উপরেও ভোগ্য দ্রব্যের এই বিভাগ নির্ভর করে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারে চাকর রাখা আরামের ব্যাপার হইলেও, ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় মধ্যবিত্তদের নিকট তাহা একান্তভাবে বিলাসের সামগ্রী।

বিলাস দ্রব্য : যে সকল দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যয়ের তুলনায় প্রাপ্ত উপযোগিতা অত্যন্ত কম; যাহা দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক না হইয়া বাস্তবে দক্ষতা কমাইয়া দিতেও পারে, মানুষের মন ও চিন্তা হইতে উদ্ভূত অস্বাভাবিক অভাববোধ তৃপ্ত করা যাহাদের ভোগের পরিণতি, তাহাদের বিলাস-দ্রব্য বলা হয়। বিলাস-দ্রব্য অনেক সময় অনিষ্টকারী (harmful), আবার অনেক সময় অনিষ্টকারী নহে (harmless)।

বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত কি না :

বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি করে না, অনেক ক্ষেত্রে দক্ষতা কমাইয়া দেয়, সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের উপভোগ করা অর্থনৈতিক বিচারে অপব্যয়। বিপরীতভাবে, ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার না হইলে তাহাদের উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদান ও উপকরণগুলি কর্মক্ষম থাকিয়াও বেকার থাকিবে, অর্থনৈতিক দিক হইতে তাহাও কম অপব্যয়ের ব্যাপার নহে। এই কারণে দেখা যাইতেছে যে, যদি বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিয়া সেই সময় উপাদানসমূহকে অধিকতর আবশ্যকদ্রব্য ও আরামদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সে অপব্যয় রোধ হইতে পারে। সুতরাং অনেকের বক্তব্য যে, বিলাস সামগ্রীর ব্যবহার ও উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। ইহারা স্বীকার করেন যে, জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করিতে উৎসুক ব্যক্তিবৃন্দ বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিবে, আয় বাড়াইয়া উহা ব্যবহার করিবার প্রেরণায় অধিকতর পরিশ্রম করিবে, তাহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা তীব্রতর করিবার জন্য প্রত্যেক বিলাস-দ্রব্য শ্রমিককে লোভ দেখাইবে। এতদ্‌সত্ত্বেও ইঁহারা বলেন যে, সমাজে প্রভূত পরিমাণে আবশ্যক-দ্রব্যের জন্য অভাব থাকা অবস্থায় ইহাদের উৎপাদন ক্ষতিকারক; ব্যক্তির আয়ের অপচয় নিবারণের জন্য বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদন স্থগিত রাখাই বাঞ্ছনীয় এবং আরও আবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে উপাদানসমূহের নিয়োগ করা কর্তব্য।

প্রেরণাদায়ক হইলেও ইহা অপচয়মূলক, সুতরাং বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদন স্থগিত থাকা উচিত

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিতে গেলে উপরোক্ত যুক্তি মানিয়া চলা যায় না। সমাজে উপাদান নিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে কার্য্যকরী

চাহিদার উপর, অর্থাৎ সমাজে সকল প্রকার দ্রব্য ও কার্য্যাদির মোট চাহিদার উপর ; সুতরাং কার্য্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি না করিয়া আবশ্যকদ্রব্য বা আরামদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা চলে না। দেখা যায় যে, বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন স্থগিত রাখিলে লোকে বেকার হইবে, সমাজের মোট ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাইবে, আরামদ্রব্য বা আবশ্যকদ্রব্যের চাহিদা ও উৎপাদন হ্রাস পাইবে, সমস্যা জটিলতর হইবে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে আয়-বৈষম্য এতই প্রকট যে, সমাজের ক্রয়-শক্তির বিপুল অংশ ধনিকশ্রেণীর হাতে চলিয়া যায় এবং গরীবদের হাতে ক্রয়শক্তির পরিমাণ কম। ধনীদের ব্যয়ের কম অংশ আবশ্যক দ্রব্যে ব্যয় হয়, অধিকাংশ বিলাস দ্রব্যক্রয়ে ব্যয়িত হয়, সুতরাং বিলাসদ্রব্য উৎপাদন না হইলে, তাহাতে নিযুক্ত লোকজন বা উপাদান বেকার হইবে ; আবশ্যকদ্রব্য বা আরামদ্রব্যের চাহিদা বাড়িলেই একমাত্র তাহাদের কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিবার সম্ভাবনা। ধনিকদের ক্রয়ক্ষমতা থাকিলেও তাহাদের ভোগপ্রবণতা কম, দরিদ্রদের ভোগপ্রবণতা বেশী। সুতরাং পূর্বে আয়-বৈষম্য কমাইয়া সমাজে আয়ের পুনর্বণ্টন করিয়া, ক্রয়শক্তিকে ধনীদের হাত হইতে দরিদ্রের হাতে সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া, তাহার পরে বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন স্থগিত রাখিলে বেকারী হইবে না, বা উপাদানসমূহের অপচয় ঘটিবে না।

আয়-বৈষম্য কমাইয়াই উহা স্থগিত রাখা চলে, নতুবা বেকারী হইবে

তাই বলা চলে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বজায় রাখিলে বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন উপাদানের অপচয় আনে, তাহা ঠিক নহে। কিন্তু যদি পরিকল্পিত অর্থনীতির কাঠামো দেশ গ্রহণ করে, তবে স্বভাবতঃই বিলাস দ্রব্যোৎপাদন দেশের সম্পদ শক্তির বিরাট অপচয় ; আয়-বৈষম্য কমাইয়া এবং সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন পরিকল্পনার সাহায্যে এরূপ করা যাইতে পারে, যে অবস্থায় বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন স্থগিত রাখিলে বেকারী ঘটিবে না। অনুন্নত দেশ সমূহের পরিকল্পনায় মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন সর্বাগ্রে স্থান পাওয়া দরকার ; সুতরাং এইরূপ দেশের স্বল্পপরিমাণ মূলধন বিলাসদ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অভাবের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of wants) :

ধনবিজ্ঞানে অভাবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়।

(ক) অভাব সীমাহীন—প্রথমতঃ, মানুষের অভাব অনন্ত। তাহার

জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় অভাবগুলি সংখ্যায় কম হইলেও ইহা সর্বজনবিদিত যে বর্তমানের প্রবলভাবে অনুভূত অভাব মিটিলেই আবার নূতন অভাবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। একটি অভাবের তৃপ্তি আর একটি অভাবকে ডাকিয়া আনে।

(খ) কোন বিশেষ অভাব সীমাবদ্ধ—সাধারণভাবে মানুষের সকল দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব অনন্ত হইলেও, কোন একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের অভাবের কিন্তু সীমা আছে। একই দ্রব্য, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রমাগত পাইতে থাকিলে সেই দ্রব্যের অভাব ক্রমশঃ মিটিয়া যায়।

(গ) বিভিন্ন অভাব পরস্পর প্রতিযোগী :—একটি দ্রব্যের অভাব অন্য দ্রব্যের অভাবের সহিত প্রতিযোগিতা করে। কোন্ অভাব প্রথমে মিটান দরকার, তাহা লইয়া ব্যক্তির মনে দ্বন্দ্ব চলে। আরও বলা চলে যে, কোন অভাব মিটাইবার বিভিন্ন উৎস থাকিতে পারে। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি হয় ভাত অথবা রুটির সাহায্যে অভাব মিটায় ; জামার অভাব, হয় সার্ট অথবা পাঞ্জাবীর সাহায্যে মিটিতে পারে ; পরস্পর-প্রতিযোগী কোন্ দ্রব্যের সাহায্যে অভাব মিটাইবে, তাহা লইয়া ব্যক্তির মনে পছন্দ-অপছন্দের খেলা চলে। অবশ্য, সকল ব্যক্তির নিকট ইহা সমভাবে প্রযোজ্য নয়। নিরামিশাষী ব্যক্তি আমিষ খাদ্যের দ্বারা অভাব মিটাইতে পারে না। একটি অভাব মিটাইবার বিভিন্ন উৎস আছে বলিয়াই মানুষের ক্রয়তালিকায় স্থান পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে। যেহেতু অভাব মিটাইবার উপযোগী উপাদান সীমাবদ্ধ সেজন্যই, হয় ইহা অথবা উহা ক্রয় করিতে হয়। অন্যান্য সকল কিছু সমান থাকিলে, ব্যক্তি সেই দ্রব্যটিই ক্রয় করে যাহাতে তাহার উপযোগিতা সর্বাধিক অথবা অর্থব্যয় সর্বাপেক্ষা কম।

(ঘ) অভাব পরিপূরক :—কোন একটি অভাব মিটাইতে হইলে মাত্র একটি দ্রব্য প্রয়োজন হয় তাহা নহে, সেই দ্রব্য ব্যবহারের জন্য উহার সহিত অন্য দ্রব্য ক্রয় করা দরকার হইতে পারে। ভাতের সহিত ডালের, জামার সহিত জুতার, কলমের সহিত কালির অভাব তাই যুক্ত থাকে। কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে গেলেও, বিভিন্ন উপাদানের জন্য অভাব একই সঙ্গে অনুভূত হয়। উহারা একে অন্যের পরিপূরক দ্রব্য (Complementary good)।

উপযোগিতা (Utility) ঃ

কোন দ্রব্যের মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের উপযোগী যে ক্ষমতা থাকে এবং যে ক্ষমতার জন্য ব্যক্তির নিকট উহার চাহিদা সৃষ্টি হয় তাহাকে উপযোগিতা বলা হয়। এই উপযোগিতাকে আকাঙ্খা নামেও অনেক সময় অভিহিত করা হয়। একটি দ্রব্যের জন্য চাহিদার পিছনে দ্রব্যটির জন্য আকাঙ্খা বা দ্রব্যটির অভাব পূরণের উপযোগী ক্ষমতা বা উপযোগিতা আছে বলিয়া ধরা হয়। কোন শুভ-অশুভ, ন্যায় বা অন্যায়, কল্যাণ বা অকল্যাণ কোন কিছু ধারণা দ্রব্যটির উপযোগিতার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। দ্রব্যটির জন্য চাহিদা থাকিলেই বুঝা গেল যে ইহার উপযোগিতা আছে, দ্রব্যটির ব্যবহারে ব্যক্তি পরিতৃপ্তি পাইলেন কিনা তাহা বিচার্য্য নহে। একই দ্রব্যের বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট উপযোগিতা থাকিতে পারে, যেরূপ ধূমপায়ীর নিকট সিগারেটের উপযোগিতা একরূপ, কিন্তু ব্যবসায়ীর নিকট অন্যরূপ। সুতরাং, ব্যবহারের দ্বারা প্রাপ্ত পরিতৃপ্তি উপযোগিতার মাপকাঠি নহে। বিভিন্ন সময়ে দ্রব্যটির উপযোগিতা ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন হইতে পারে। তাহার অভ্যাস, রুচি, পরিবেশ ইত্যাদিতে পরিবর্তন হইলে তাহার নিকট দ্রব্যের উপযোগিতাও অন্যরূপ হইবে।

উপযোগিতা ও পরিতৃপ্তির মধ্যে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য অনেকে আজকাল উপযোগিতা শব্দটি বাদ দিয়া অন্য শব্দ ব্যবহার করিতে চাহেন। যেমন পিগু বলেন যে, উহার স্থলে 'আকাঙ্খা প্রগাঢ়তা' শব্দটি (Intensity of desire) ব্যবহার করা উচিত। যাহাই হউক, এই উপযোগিতা পরিমাপ করা হয়, দ্রব্যটির জন্য ব্যক্তি কি দাম দিতে রাজী আছে, সেই অর্থের পরিমাণের দ্বারা। যদি সে দ্রব্যটির জন্য বেশী দাম দিতে রাজী থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহার নিকট উহার উপযোগিতা বেশী, যদি কম দাম দিতে রাজী থাকে, তবে তাহার নিকট উহার উপযোগিতা কম। কি পরিমাণ অর্থ সেই দ্রব্যটি পাইবার জন্য কোন ব্যক্তি ব্যয় করিতে ইচ্ছুক, সেই অর্থত্যাগের পরিমাণের দ্বারাই উপযোগিতার পরিমাণগত পরিমাপ করা সম্ভব। সুতরাং ব্যক্তি অর্থের হিসাবে কি দাম দিতে প্রস্তুত আছে, তাহার দ্বারাই দ্রব্যের উপযোগিতা পরিমাপ করা হইয়া থাকে।

উপযোগিতা কি এবং তাহার পরিমাপ কিরূপে সম্ভব

উপযোগিতাতত্ত্বের সমালোচনা ঃ

প্যারেটো এবং আরও অনেক ধনবিজ্ঞানী বলিয়া থাকেন যে উপযোগিতার পরিমাণ পরিমাপ করা সম্ভব নহে। তাহাদের অভিমতে কোন দ্রব্যের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা ওই দ্রব্যটির মধ্যে নিহিত নাই ; অভাব মোচন বা পরিতৃপ্তি ব্যক্তির মানসিক ব্যাপার, তাহার মনের এক বিশেষ অবস্থা। এই মানসিক অনুভূতি বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রূপ হইবে ; পাত্রভেদে পরিতৃপ্তির পার্থক্য থাকে। স্থান-ভেদেও এই অনুভূতি পৃথক হয়, কালভেদেও দ্রব্যের উপযোগিতার তারতম্য ঘটে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে মনে করা যাউক ২ কাপ চা পান করিয়া ব্যক্তি কি পরিমাণ উপযোগিতা পাইতেছে, তাহার পরিমাপ সম্ভব নয়। ব্যক্তি শুধু নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারে যে, অপর দ্রব্যটি না চাহিয়া সে এই দ্রব্যটি চাহিতেছে ; তিন কাপ হরলিক্সের বদলে সে ২ কাপ চা বেশী পছন্দ করে।*

অর্থের দ্বারা উহার পরিমাপ সম্ভব নহে, কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অর্থের উপযোগিতা পৃথক

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ ধরিয়া লইতেন যে, মানুষ সকল কিছু বিচার বিবেচনার পর সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্তভাবে দ্রব্যটির উপযোগিতা অনুযায়ী দাম দিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেন যে, দ্রব্যটি ক্রয় করিবার সময়ে বাস্তবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ মনে মানুষ কাজ না করিতেও পারে। চুলচেরা উপযোগিতার হিসাব করিয়া দ্রব্য ক্রয় এবং সকল দ্রব্য ক্রয়ে নিস্পৃহ যুক্তির প্রয়োগ—ব্যবহারিক জগতে কম-ই দেখা যায়। হঠাৎ উৎসাহে উদ্বেল হইয়া যুক্তিজাল ছিন্ন করিয়া ব্যক্তি দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া ফেলিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি জানে-ও না যে কোন্ দ্রব্যের দ্বারা তাহার অভাব মিটিবে, সম্মুখে যে দ্রব্য পাওয়া গেল বিজ্ঞাপনের আকর্ষণে, বিক্রেতার বাক্‌চাতুর্যে বা সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে নিছক অভ্যাসের বশে ক্রয় করিয়া বসিতে পারে। ব্যবহার করিয়া উহার গুণ ও ঔৎকর্ষ যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে আবিষ্কারকের মনোভাব লইয়া পরীক্ষামূলক ক্রয় করিতেও পারে। সুতরাং দ্রব্যের চাহিদার পিছনে নিছক যৌক্তিকতার ও স্বার্থরক্ষার দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তি-মানসের

উপযোগিতা ব্যক্তির চাহিদার পিছনে প্রচ্ছন্ন প্রভাব হিসাবে গণ্য হইতে পারে না

* আধুনিক কালে ব্যক্তির চাহিদাসংক্রান্ত তত্ত্ব পছন্দ-তালিকার সাহায্যে নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

উপযোগিতার হিসাব বর্ত্তমান, একথা আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেন না। জে, এম্, ক্লার্কের ভাষায় বলিতে গেলে, উপযোগিতা-তত্ত্বের দোষ হইল যে, ইহার মধ্যে "আবেগহীন যৌক্তিকতার জন্য যুক্তিহীন আবেগ" দেখিতে পাওয়া যায়।

ষ্টিগ্‌লার এইরূপ সমালোচনার উত্তরে বলিতে চাহেন যে, নিয়মিত দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপযোগিতার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। যুক্তিবিচারের পর সর্বাধিক উপযোগী দ্রব্য-ই মানুষ ক্রয় করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়, সুতরাং নিয়মিত ও অভ্যাস-গত ক্রয়, ব্যক্তির যুক্তি-বিচার ও উপযোগিতার দ্বারাই মোটা-মুটি-ভাবে নির্ধারিত তাহা ধরিয়া লইতে হইবে। অযৌক্তিক কারণে দ্রব্য ক্রয় ব্যক্তির মোট ক্রয়-পরিমাণের ক্ষুদ্র অংশ, উহাকে হিসাবে না আনিলেও চলে। মানুষের সকল ব্যবহার যুক্তিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্বীকার করিয়া না লইলে জটিল অর্থনৈতিক ঘটনার প্রকৃত বিশ্লেষণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে; সুতরাং উপযোগিতা তত্ত্বকে অন্তত: বহুলাংশে সঠিক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু তত্ত্ব-বিশ্লেষণে ইহা মোটামুটি-ভাবে গ্রহণযোগ্য

ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম (Law of Diminishing Utility)

ব্যক্তির চাহিদার পিছনে কি শক্তি কাজ করে এবং চাহিদার রেখা কেন নিম্নাভিমুখী হয় তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য ধনবিজ্ঞানে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম ব্যবহার করা হয়। মনস্তত্ত্বের ক্রমহ্রাসমান মানসিক অনুভূতির অনুরূপ এই নিয়মে বলা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, অপরাপর সকল কিছু স্থির অবস্থায়, দ্রব্যটি ক্রমাগত পাইতে থাকিলে, আরও অধিক পাইবার ইচ্ছা ক্রমে কমিযা যায়। একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের অভাব সীমাবদ্ধ; সুতরাং যত অধিক পরিমাণে পাইতে থাকিবে ততই সেই দ্রব্যটির আর একটি ইউনিট পাইবার আকাঙ্ক্ষা কমিবে, অর্থাৎ দ্রব্যটির উপযোগিতা কমিতে থাকিবে। কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে উপযোগ দ্রুত হ্রাস পায়, কোন ক্ষেত্রে ধীরে হ্রাস পায়, কিন্তু অধিক পরিমাণে পাইতে থাকিলে উপযোগ হ্রাসের ঝোঁক সকল দ্রব্য উপভোগের ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী হইবে। ভোগকারীদের ব্যবহার ও কার্য্যপ্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ নিয়ম ধনবিজ্ঞানে গৃহীত হইয়াছে।

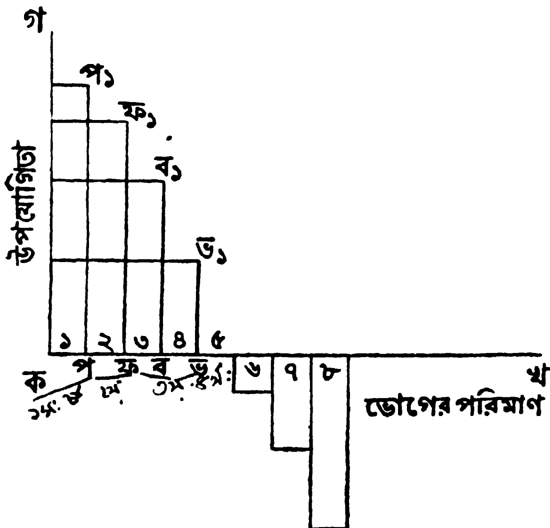
প্রান্তিক উপযোগিতা কমে

উপযোগিতার পরিমাণগত পরিমাপ করা হয় উহার জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত অর্থের পরিমাণ বা দামের দ্বারা; সুতরাং ব্যক্তি দ্রব্যটি ক্রমাগত পাইলে

পরবর্ত্তী ইউনিটের জন্য দাম কম পরিমাণে দিতে চাহে। প্রথম কাপ চা-এর জন্য যদি কেহ ১৲ দিতে প্রস্তুত থাকে, দ্বিতীয় কাপের জন্য সে নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা কম, ধরা যাউক ॥০ দিবে, তৃতীয় কাপ চা-এর জন্য ।০ এবং চতুর্থ কাপ-এর জন্য সে ৵০ আনার বেশী দিতে রাজী হইবে না। এই রূপে দেখা যায় যে, সে যতই চা ক্রয় করিতেছে, পরবর্তী কাপ চা-এর উপযোগিতা তাহার নিকট কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু বাজারে দাম নির্দিষ্ট আছে, ব্যক্তি সেই বাজার দামেই তাহার চাহিদার পরিমাণ স্থির করে। সুতরাং বাজারে প্রতিকাপ ৵০ দাম থাকিলে সে চার কাপ চা-ই ক্রয় করিবে এবং শেষ কাপ-ই হইবে দ্রব্যটির প্রান্তিক ইউনিট্; ৵০ হইবে তাহার প্রান্তিক উপযোগিতা। এই ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়মকে তাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম বলা যায়। যত বেশী পরিমাণে ক্রয় হইবে, মোট উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা কমিতে থাকে, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তাহা বাজার দামের সমান হয়।

উদাহরণ

ক্রমহ্রাস উপযোগিতার এই নিয়মকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করা চলে। মনে



করা যাউক যে, কখ রেখা চা-এর ইউনিট এবং কগ রেখা ইউনিট-প্রতি দামের বা উপযোগিতার পরিমাপসূচক রেখা।

কপ হইল প্রথম কাপ চা; ইহার জন্য ব্যক্তি **পপ১** পর্য্যন্ত দাম দিতে প্রস্তুত আছে; **পফ হইল** দ্বিতীয় কাপ, তাহার জন্য **ফফ১**; **ফব হইল** তৃতীয় কাপ, তাহার জন্য **বব১**, **বভ হইল** চতুর্থ কাপ, ইহার জন্য **ভভ১** দাম দিতে প্রস্তুত আছে। পঞ্চম কাপ চা হইতে সে কোন উপযোগিতা পায় না; ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম কাপ হইতে সে ক্রমেই অধিক অনুপযোগিতা (Disutility) লাভ করিতেছে। প্রত্যেক ইউনিট পাইবার পরে পরবর্তী ইউনিট পাইবার আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ পরবর্তী ইউনিটের উপযোগিতা কমিয়া যায়। **কপ১ পফ১, ফব১, বভ১**, আয়তক্ষেত্রগুলিকে যোগ দিলে মোট উপযোগিতা বোঝা যায়। **প১, ফ১, ব১, ভ১**, বিন্দুগুলিকে কোন রেখা দ্বারা যুক্ত করিলে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার রেখা পাওয়া যায়।

এই নিয়মের কার্যকারিতা চলিবার সময় কতকগুলি বিষয় স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে, তাহা ধরিয়া লইতে হইবে। যেরূপ,

(১) ব্যক্তির রুচি ও পছন্দ;

(২) ব্যক্তির আয়;

(৩) অন্যান্য দ্রব্যের দাম;

ইহাদের মধ্যে কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলে তাহার ফলে, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই নিয়ম সেই সময়ে কার্য্যকরী না-ও হইতে পারে। ইহা ব্যতীত যদি দ্রব্যটির ইউনিট অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অসম্পূর্ণ হয় তবে তাহা ব্যবহারের ফলে উপযোগিতা না কমিয়া বাড়িয়া যাইতেও পারে। কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় উপযোগিতা ক্রমশঃ হ্রাস পায় না, যেমন অর্থ, ডাকটিকিট সংগ্রহকারীর নিকট টিকিট ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম

মোট উপযোগিতা ও প্রান্তিক উপযোগিতার পার্থক্য ঃ

কোন ব্যক্তি একটি দ্রব্যের কয়েকটি ইউনিট ক্রয় করিয়া মোট যে পরিমাণ উপযোগিতা লাভ করে, তাহাকেই মোট উপযোগিতা বলা হয়। বাজারে নির্দিষ্ট দামে ব্যক্তি যে সর্বশেষ ইউনিট ক্রয় করে তাহা হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতাকে প্রান্তিক উপযোগিতা বলা হয়। চার কাপ চা-ক্রয় করিলে ব্যক্তি ১৮৶০ আনার মোট উপযোগিতা লাভ করে, তাহার প্রান্তিক উপযোগিতা হইল ৶০। ব্যক্তির ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট উপযোগিতা

বাড়িয়া যায় কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা কমিতে থাকে। যখন প্রান্তিক উপযোগিতা দামের সমান হইয়া পড়ে, তাহার পরে ব্যক্তি আর ক্রয় করে না, কারণ তখন দামের তুলনায় প্রান্তিক উপযোগিতা কমিতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির আয় ও রুচি অনুযায়ী সে কোন দ্রব্য কি পরিমাণ ক্রয় করিবে তাহা এই প্রান্তিক উপযোগিতা ও বাজার দামের দ্বারাই স্থির হয়। মোট উপযোগিতা বিশেষ কোন বাস্তব ও কার্য্যকরী ধারণা নহে, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা ব্যক্তির চাহিদার পরিমাণকে প্রভাবান্বিত করে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মনেই, স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে চিন্তা করিয়া সেই পর্য্যন্ত ক্রয় করে, যে স্থলে দ্রব্যটির সর্বশেষ ইউনিট হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগিতা উহার বাজার দামের সমান। ব্যক্তির চাহিদা নির্ণয় করে যে মানসিক চিন্তা তাহা হইল আর এক ইউনিট বেশী বা কম, দামের তুলনায় এই ইউনিটটির উপযোগিতা কম কি বেশী। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে প্রান্তিক উপযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

প্রান্ত ও ইহার গুরুত্ব

পরিবর্ত্তনীতি বা সমপ্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম (Principle of Substitution or Law of Equimarginal Returns)

ব্যক্তির ভোগকার্য্য সম্পর্কে বিশেষ একটি নীতিকে দ্রব্য-বদল নীতি বা পরিবর্ত-নীতি বলা হয়। যখন কোন ব্যক্তির হাতে বিভিন্ন দ্রব্যে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকে, তখন সে যে ভাবে এবং যে নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে সেই অর্থকে বণ্টন করে, তাহাকে সমপ্রান্তিক উপযোগিতার নীতি বলা হয়।

মনে করা যাউক যে, তাঁতীর হাতে যে বস্ত্র আছে তাহার প্রতি ইউনিটের উপযোগিতা হইল ৩ এবং বাজারে এক ইউনিট বস্ত্রের পরিবর্তে যে পরিমাণ ধান পাওয়া যায় তাহাতে সে ৫ ইউনিট উপযোগিতা পাইতে পারে। এক্ষেত্রে তাঁতী যদি বস্ত্র বিক্রয় করিয়া ধান ক্রয় করে, অর্থাৎ বস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া তাহার স্থলে ধান আনে, তবে সে বর্তমান অবস্থার তুলনায় ২ ইউনিট বেশী উপযোগিতা লাভ করিতে পারে। ঠিক এইরূপে কোন উৎপাদক যদি বেশী দামী উপাদান ছাড়িয়া দিয়া কম দামী উপাদান উৎপাদন-কার্য্যে নিয়োগ করিতে থাকে, তবে সে লাভবান হইবে। কম উপযোগী দ্রব্য বদলাইয়া বেশী উপযোগী দ্রব্য ব্যবহার বা বেশী দামী

পরিবর্ত্ত-নীতি

উপাদানের পরিবর্তে কম দামী উপাদানের ব্যবহারকে বলা হয় দ্রব্য-বদল নীতি বা পরিবর্ত্ত-নীতি (Principle of Substitution)।

দ্রব্য-বদলের এই ধারা ততক্ষণ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে যখন এইরূপ বদলের ফলে আর অধিক উপযোগিতা বা অধিক ব্যয়সঙ্কোচের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ অবস্থায় বিভিন্ন দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগিতা সমান হইয়া পড়ে বা বিভিন্ন উপাদান হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক প্রতিদানসমূহ (Marginal Returns) সমান হইয়া আসে। ইহাকে তাই সমপ্রান্তিক প্রতিদানের নীতি (Principle of Equi-marginal Returns) বলা হয়। মার্শাল বলিয়াছেন: "যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন ব্যবহারে প্রয়োগ করা সম্ভব এইরূপ কিছু বিষয় থাকে, তাহা হইলে সে তাহাদের এই সকল ব্যবহারে এরূপভাবে নিয়োগ করিবে যাহাতে সকল ক্ষেত্রেই সে সমান প্রান্তিক উপযোগিতা লাভ করিতে পারে।" যদি ব্যক্তি দেখিতে পায় যে কোন দিকের ব্যয় হইতে সে বেশী উপযোগিতা পাইতেছে না, অপর কোন দিকে ব্যয় বাড়াইয়া অধিক উপযোগিতা পাইবার সম্ভাবনা, তখন সে প্রথম দিকের ব্যয় কমাইয়া দ্বিতীয় দিকে ব্যয় বাড়াইবে এবং এই ভাবে কম উপযোগিতা ছাড়িয়া দিয়া অধিক উপযোগিতা লাভ করিবে, মোট উপযোগিতা বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। প্রথম দিক হইতে ব্যয় কমাইলে, দ্রব্য কম পাইবার দরুণ, উহার প্রান্তিক উপযোগিতা বাড়িবে, আবার দ্বিতীয় দিকে ব্যয় বাড়াইবার দরুণ, দ্রব্য বেশী পাইতে থাকায়, তাহার প্রান্তিক উপযোগিতা কমিবে। অবশেষে উভয় দিক হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগিতা সমান হইবে। দ্রব্য-বদলের দ্বারা আর তাহার লাভবান হইবার সম্ভাবনা নাই, সে এস্থলে সর্বাপেক্ষা অধিক মোট উপযোগিতা পাইতেছে। এই অবস্থাকে ভোগকারীর ভারসাম্যাবস্থা (Consumers Equilibrium) এবং এই তত্ত্বকে সর্বোচ্চতৃপ্তির মতবাদ (Doctrine of Maximum Satisfaction) বলা হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এইরূপে এই নীতি কার্য্যকরী হয়। উৎপাদক বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ এরূপ ভাবে কমাইবে ও বাড়াইবে যাহাতে সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা সমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়। এরূপ অবস্থায় পৌঁছিলে সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয়।

ভোগকারীর ভারসাম্যাবস্থা ও সর্বোচ্চ তৃপ্তির মতবাদ

কোন দ্রব্য ক্রয়ের সময়ে ভোগকারী ক্রয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াইয়া এরূপ অবস্থায় আসে যেখানে প্রান্তিক উপযোগিতা ও বাজার দাম সমান হয়। সেই অবস্থায় সে সর্বাপেক্ষা অধিক মোট উপযোগিতা লাভ করে সুতরাং সে ওই অবস্থায় যতটা সম্ভব পৌঁছিবার চেষ্টা করে। সকল দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই সে যদি উক্ত অবস্থায় পৌঁছিতে পারে, তাহা হইলে সাম্যাবস্থায় পৌঁছিলে নিম্নরূপ সম্পর্ক পাওয়া যায়:

বিভিন্ন ব্যবহারে দাম-উপযোগিতার অনুপাত সমান হইবে

$$\frac{\text{ক এর প্রান্তিক উপযোগিতা}}{\text{ক এর দাম}} = \frac{\text{খ এর প্রাঃ উঃ}}{\text{খ এর দাম}} = \frac{\text{গ এর প্রাঃ উঃ}}{\text{গ এর দাম}} \ldots\ldots$$

অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন প্রান্তিক উপযোগিতা তাহাদের দামের সহিত আনুপাতিক ভাবে সমান বা সমানুপাতিক হইয়া পড়ে। (Marginal utilities are Proportional to their Prices).

দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু এই নীতির প্রয়োগগত কার্য্যকারিতা খুবই সীমাবদ্ধ।

(ক) বাস্তব জগতে এইরূপ সূক্ষ্ম ও চুলচেরা হিসাব করিয়া সাধারণভাবে ক্রয় বা উৎপাদন না-ও হইতে পারে। উত্তেজনা, আবেগ, মোহের বশে, বিজ্ঞাপনের চাপে, অনুকরণের লোভে বা পরিবর্তসামগ্রীর গুণাগুণ না জানিয়াই ব্যক্তিরা দ্রব্য ক্রয় করে, এরূপ হইতে পারে।

(খ) এই নীতিকে সর্বোচ্চ তৃপ্তির মতবাদ (Doctrine of Maximum Satisfaction) বলিয়া যেরূপভাবে অভিহিত করা হয় তাহা উচিত কি না, চিন্তার বিষয়। উপযোগিতার অর্থ হইল আকাঙ্খা, তৃপ্তি নহে। প্রান্তিক আকাঙ্খা ও প্রান্তিক তৃপ্তি উভয় অর্থেই উপযোগিতার ব্যবহার সঙ্গত নহে। অধিক আকাঙ্খা থাকায় বেশী দাম দিয়া দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া তাহা হইতে অধিক তৃপ্তি পাওয়া গেল না, এরূপ অনেক ক্ষেত্রেই ঘটা সম্ভব। সুতরাং, সমপ্রান্তিক উপযোগিতার ফলে সর্বোচ্চ পরিমাণ তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব, তাহা বলা চলে না।

(গ) কোন কোন দ্রব্য এত বৃহৎ ও অবিভাজ্য (Indivisible) যে, ব্যক্তিরা তাহাদের ব্যয়কে এরূপ অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে না যেখানে প্রান্তিক উপযোগিতা ও বাজার-দাম সমান। একদিকের ব্যয় হইতে ১ সরাইয়া অন্যদিকে ব্যয় করিলে উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা বুঝিয়াও

অনেকক্ষেত্রে অন্যদিকে সরান সম্ভব হয় না ; কারণ সে দ্রব্যের দাম বেশী হইতে পারে এবং তাহার ক্ষুদ্র অংশীকরণ সম্ভব না-ও হইতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি সিগারেট হইতে যে তৃপ্তি পাইতেছে, একটি রেডিও-তে উহা অপেক্ষা অধিক তৃপ্তি আশা করিতেছে। কিন্তু সিগারেটের ব্যয় হইতে ১টি বা ২টি টাকা সরাইয়া লইয়া রেডিও কেনা চলে না। আবার রেডিও কিনিতে গেলে সিগারেট ছাড়াও আরও বহু দ্রব্য ক্রয় বাদ দিতে হয়, এবং তাহাতে তাহার মোট তৃপ্তি কমিয়া যায়। রেডিও এমন একটি অবিভাজ্য দ্রব্য যাহার অংশীকরণ বা বিভাজন সম্ভব নয়, তাই বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে, সম-প্রান্তিক উপযোগিতার অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব না-ও হইতে পারে।

(ঘ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যক্তির আয় হইতে সর্বোচ্চ তৃপ্তি পাইবার এই নীতি বাস্তবে কার্য্যকরী হয় না, কারণ দীর্ঘস্থায়ী দ্রব্য সমূহকে বহুদিন ধরিয়া ভোগ করিতে হয়, তাহার তৃপ্তি ঠিক সেই স্বল্পকালের মধ্যেই ফুরাইয়া যায় না।

ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্ব (Doctrine of Consumers Surplus) :

কোন দ্রব্যের জন্য ব্যক্তি যে দাম দিতে রাজী থাকে তাহাকে বলা হয় তাহার ব্যক্তিগত চাহিদা-দর (Individual Demand Price)। কিন্তু বাজারে ইহা হইতে অনেক কম দামে সেই দ্রব্যটি পাওয়া যাইতে পারে। দ্রব্যটি হইতে ব্যক্তি যে পরিমাণ উপযোগিতা পাইবে, সে সেই অনুযায়ী দাম দিতে প্রস্তুত হইবে। সুতরাং, ব্যক্তিগত চাহিদা-দর দ্রব্যটি হইতে কি পরিমাণ উপযোগিতা পাওয়া যায় তাহারই পরিমাপ। ব্যক্তি যে দাম দিতে রাজী থাকে সেই ব্যক্তিগত চাহিদাদর হইতে কমদামে চালু বাজার-দরে সে দ্রব্যটি পাইতে পারে। বাজার দরে না পাইলে সে উহার জন্য অধিক দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। বাজারে কম দাম থাকার দরুণ সে ব্যক্তিগত চাহিদা-দর হইতে যত কম দামে দ্রব্যটি পাইল তাহাই ভোগোদ্বৃত্ত।

ইহা হইল ব্যক্তিগত চাহিদা দাম ও বাজার-দামের পার্থক্য

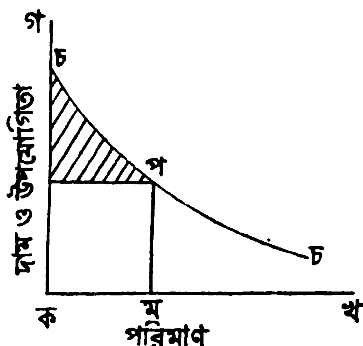
মনে করা যাউক যে, একব্যক্তি চারি কাপ চা-এর জন্য মোট ১৸৵০ দাম দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু সে হয়ত প্রতিকাপ চা ৵০ হিসাবে ৷৷০ দিয়া চারি কাপ চা ক্রয় করিল। যদি ৷৷০ তে না পাইত, তবে মোট ১৸৵০ দিতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং এই ১।৵০ তাহার উদ্বৃত্ত উপযোগিতা অথবা ভোগাদ্বৃত্ত। যদি ব্যক্তিগত

মোট উপযোগিতা—মোট অর্থ ব্যয়

চাহিদাদর বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ভোগোদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইবে, যদি ব্যক্তিগত চাহিদাদর কমিয়া যায়, তবে ভোগাদ্বৃত্তও কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, যদি বাজারদর বাড়িয়া যায়, তবে ভোগোদ্বৃত্ত কমে, এবং বাজার দর কমিয়া গেলে ভোগোদ্বৃত্ত বাড়িয়া থাকে।*

ভোগোদ্বৃত্তকে নিম্নঅঙ্কিত চিত্ররূপে প্রকাশ করা চলে।

কখ রেখা দ্রব্যের পরিমাণ এবং **কগ** রেখা দাম বা উপযোগিতার পরিমাপ-সূচক রেখা। **পম** দামে এক ব্যক্তি **কম** পরিমাণ ক্রয় করে এবং **পম** × **কম**



পরিমাণ দাম দেয়। কিন্তু তাহার মোট উপযোগিতা হইল **কচপম**। মোট উপযোগিতা হইতে দাম বাদ দিলে, চিহ্নিত স্থানের পরিমাণ হইল তাহার ভোগোদ্বৃত্ত।

এই ভোগোদ্বৃত্ত নির্ভর করে অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর। শিল্পের অগ্রগতি ও বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন-প্রসারের ফলে সমাজে প্রচুর দ্রব্য অতি অল্প ব্যয়ে উৎপন্ন হইতেছে এবং অতি অল্প দামে ভোগকারীদের নিকট উপস্থিত হইতেছে। অথচ তাহা হইতে ভোগকারীরা প্রভূত পরিমাণ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। অর্থনৈতিক পরিবেশ

* ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ, প্রধানতঃ রিকার্ডো দেখাইয়াছিলেন যে, সমাজে উৎপাদকের উদ্বৃত্তের (বা খাজনার) উদ্ভব হইতে পারে। নয়া-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ, প্রধানতঃ, মার্শাল দেখাইয়াছেন যে, এইরূপ উদ্বৃত্ত ভোগকার্য্যের ক্ষেত্রেও উদ্ভব হয় এবং ভোগকারীদের দ্বারা তাহা লাভ করা সম্ভব। প্রান্তিক জমিতে উৎপাদনের তুলনায় প্রান্তোর্ধ জমিতে যে অধিক উৎপাদন হয়, তাহাকে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত (বা খাজনা) বলা হয়। সেইরূপ প্রান্তিক ইউনিটের উপযোগিতার তুলনায় উহার পূর্ববর্তী প্রান্তোর্ধ ইউনিটসমূহ হইতে যে অধিক উপযোগিতালাভ হয়, তাহাকে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত (বা ভোগকারীর খাজনা) বলা চলে।

উন্নত হইলে ভোগোদ্বৃত্ত অধিক হয়, অনুন্নত দেশে (বা পরিবেশে) দ্রব্যাদির ব্যয় অধিক বলিয়া উদ্বৃত্ত অধিক হয় না।

সমালোচনা : এই তত্ত্বের বহুবিধ বিরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে।

(ক) অনেকে বলিয়া থাকেন যে, একটি দ্রব্যের বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতা থাকে। আয়ের পার্থক্য থাকিলে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা পৃথক হইয়া পড়ে, সুতরাং সকলে দ্রব্যটি হইতে কি পরিমাণ ভোগোদ্বৃত্ত পাইতেছে, তাহার পরিমাপ করা সম্ভব নহে। রুচির পার্থক্যের দরুণও বাজারের মোট ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, অনেকে বলেন যে এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য যত বেশী পরিমাণে ক্রয় করিতে থাকেন দ্রব্যটির পূর্বের ইউনিটসমূহের উপযোগিতা তাহার নিকট ক্রমাগত কমিয়া আসিতে থাকে। সুতরাং, প্রান্তিক ইউনিট ক্রয় করার সময়ে ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী ইউনিট সমূহের উপযোগিতা কমিয়া গিয়াছে তাই কোন ভোগোদ্বৃত্তের উদ্ভব হয় না।

(গ) ব্যক্তিগত চাহিদাদর সম্পূর্ণ অনুমানের উপর, প্রধানতঃ, কল্পনার উপর নির্ভরশীল। আমরা জানি না একটি দ্রব্য বাজারের চালু দরে না পাইলে উহার জন্য আমরা কি দাম দিতে রাজী আছি। বিশেষ করিয়া, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্ত অসীম ও অপরিমাপ-যোগ্য।

(ঘ) দ্রব্যের পরিবর্ত্ত সামগ্রী থাকিলে তাহার ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ করা যায় না, কারণ বাজার দর হইতে দাম একটু বাড়িলেই আমরা দ্রব্যটি ক্রয় না করিয়া পরিবর্ত্ত সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকি। সুতরাং বাজার দরে না পাইলে উহার জন্য কি দাম দিতে প্রস্তুত আছি, তাহা আমরা চিন্তা-ও করি না এবং সেই উপযোগিতার পরিমাপ-ও করি না।

(ঙ) অধ্যাপক নিকল্‌সন্ বলিয়াছেন যে, এই তত্ত্বটির কোনরূপ কার্য্যকারিতা নাই, ইহা সম্পূর্ণ আজগুবী। তাহার মতে, ১০০ পাউণ্ডের উপযোগিতা আসলে ১০০০ পাউণ্ডের উপযোগিতার সমান, ইহা বলিলে ব্যক্তি বা ধনবিজ্ঞান কাহারও কোন উপকার সাধিত হয় না—এই তত্ত্বটি ধনবিজ্ঞান হইতে তুলিয়া দেওয়া দরকার।

এইরূপ সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্ব সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নহে। এই তত্ত্বের দ্বারা অন্ততঃ

ধনবিজ্ঞান

আমরা এইটুকু জানিতে পারি যে, একটি দ্রব্যের দাম সেই দ্রব্যটি হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতার তুলনায় পৃথক হইতে পারে। উন্নত ও অনুন্নত দেশের বা পৃথক অর্থ নৈতিক পরিবেশের অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার মান তুলনা করার ব্যাপারেও ইহা আমাদের সাহায্য করে। একচেটিয়া দাম স্থির করার সময় একচেটিয়া ব্যবসাদার এমন ভাবে দাম স্থির করে যাহাতে ক্রেতাদের কোনরূপ ভোগোদ্বৃত্ত অবশিষ্ট না থাকে। করনীতির ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। দ্রব্যের উপর এরূপ ভাবে কর স্থাপন করা প্রয়োজন, যাহাতে ভোগকারীগণ কিছুটা উদ্বৃত্ত পাইতে পারে; অথবা যুদ্ধের সময়ে সেই উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রের হস্তে অধিক কর হিসাবে চলিয়া আইসে। মার্শালের অভিমতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করার ক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব সাহায্য করে।

ইহার তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত কার্য্যকারিতা

বর্তমান কালে অধ্যাপক হিক্স্ এই তত্ত্বটির নূতন সংজ্ঞা দিয়া নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক ব্যক্তি যে দাম দিয়া একটি দ্রব্য ক্রয় করিতেছে, বাজারে উহার দাম কমিয়া গেলে একই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে তাহার কম অর্থব্যয় হইবে, কিছু অর্থ বাঁচিয়া যাইবে। ক্রেতার মনে হইবে তাহার আর্থিক আয় যেন বাড়িয়া গেল। দ্রব্যের মূল্য-হ্রাসের ফলে (আয়-প্রভাবের কার্য্যকারিতার দরুণ) ক্রেতার হস্তে পূর্বের ন্যায় একই পরিমাণ দ্রব্যক্রয়ের পরেও যে উদ্বৃত্ত অর্থ রহিয়া গেল, তাহাকে ভোগোদ্বৃত্ত বলা উচিত, ইহাই অধ্যাপক হিক্সের নূতন ব্যাখ্যা।

হিক্সের নূতন ব্যাখ্যা

চাহিদা (Demand) ও চাহিদার নিয়ম (Law of Demand):

দ্রব্যসামগ্রী পাইবার আকাঙ্খা হইতেই চাহিদার উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু আকাঙ্খা চাহিদা নয়। যখন আকাঙ্খিত দ্রব্য ক্রয় করার জন্য অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ্য ও ইচ্ছা সেই আকাঙ্খার পিছনে থাকে, তখনই তাহাকে চাহিদা বলে। কোন দ্রব্যের চাহিদা বলিলে বাজারের চল্তি দামে সেই দ্রব্যটির জন্য কোন ব্যক্তির চাহিদা অথবা বাজারের সকল ব্যক্তির মিলিত মোট চাহিদাকে বুঝায়। সেই হেতু, চাহিদা, সর্বদাই কোন দামের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত।

চাহিদা কাহাকে বলে

অন্যান্য সকল বিষয় সমান থাকিলে, দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা

পরিবর্তিত হয়। দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা কমিয়া যায় এবং দাম কমিয়া গেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। চাহিদার উপর দামের এই প্রভাবকে দাম-প্রভাব (Price-Effect) বলা হয়। এই প্রভাবকে চাহিদার নিয়ম বলে। দাম-পরিবর্ত্তনের বিপরীত-মুখে চাহিদার পরিবর্তন হয়; দাম বাড়িলে চাহিদা কমে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে; দাম ও চাহিদার এই কার্য্যকারণ-সম্পর্ক চাহিদার নিয়ম হইতে জানা যায়।

দাম-প্রভাব বা চাহিদার নিয়ম

এই চাহিদার নিয়ম সঠিক ভাবে কার্য্যকরী হইতে গেলে কতগুলি অবস্থা স্থির আছে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। স্বীকার্য্য অবস্থাগুলির কোন একটিতে পরিবর্তন হইলেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, দাম-প্রভাব ঘটিবার সময়ে ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক আয়, রুচি ও অভ্যাস এবং পরিবর্ত-সামগ্রীর (Substitutes) মূল্য অপরিবর্তিত থাকিবে।

স্বীকার্য্য বিষয়সমূহ

চাহিদার নিয়ম বা দাম-প্রভাব দুইটি কারণ বা দুইটি অধীনস্থ প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। একটি হইল আয়-প্রভাব (Income-Effect), অপরটি পরিবর্ত-প্রভাব (Substitution-Effect)। মনে করা যাউক যে, চা এবং কফি উভয়ের দামই প্রতি পাউণ্ড ৪৲ এবং এই দামে এক ব্যক্তি প্রতি মাসে ৮ পাউণ্ড চা ও ৫ পাউণ্ড কফি ক্রয় করিতেছে। সুতরাং প্রতি মাসে ব্যক্তির ৩২৲ চা ক্রয় করিতে ব্যয় হইতেছে। যদি চা-এর দাম কমিয়া ৩৲ পাউণ্ড হয় তবে পূর্ব পরিমাণ চা ক্রয় করিতে তাহার ২৪৲ টাকা ব্যয় হইবে এবং ৮৲ বাঁচিয়া যাইবে। ব্যক্তির মনের ভাব এরূপ হইবে যেন তাহার মাহিনা মাসে ৮৲ বাড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং সে বেশী পরিমাণ ক্রয়ে প্রবৃত্ত হইবে। জিনিষের দাম বাড়িলে তাহার মনে হইবে যেন তাহার আয় কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং সে কম ক্রয় করিবে। ইহাকে আয়-প্রভাব (Income-effect) বলা হয়।

চাহিদার নিয়ম কেন ঘটে: আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত্ত-প্রভাব

আরও একটি প্রভাবের ফলে এই নিয়মটি ঘটে, তাহা হইল পরিবর্ত-প্রভাব (Substitution-Effect)। যদি চা-এর দাম কমিয়া প্রতি পাউণ্ড ৩৲ হয়, তাহা হইলে কফির তুলনায় চা সস্তা হইবার দরুণ ব্যক্তি কফি হইতে তাহার চাহিদা কিছুটা সরাইয়া লইয়া অধিক পরিমাণে চা ক্রয় করিবে। ঠিক সেইরূপ, চা-এর দাম বাড়িলে চা হইতে চাহিদা অপসারণ করিয়া অধিক

পরিমাণে কফি ক্রয়ে প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের মিলিত ফলে দাম বাড়িলে চাহিদা কমিবে এবং দাম কমিলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

উহাদের মিলিত প্রভাব বা মোট ফলাফল

আয়-প্রভাবের ফলাফল এবং পরিবর্ত-প্রভাবের ফলাফল নির্ভর করে প্রধানতঃ, দ্রব্যটির প্রকৃতির উপর। তাহা ছাড়াও, দাম যদি বেশী পরিমাণে কমিয়া যায় এবং আয়ের অধিক পরিমাণ যদি সেই দ্রব্যে ব্যয় হয়, তবে আয়-প্রভাবের ফল খুবই তীব্র হইবে। যদি দাম কম পরিমাণে হ্রাস পায় এবং আয়ের কম পরিমাণ সেই দ্রব্যে ব্যয় হয়, তবে আয়-প্রভাবের ফল তীব্র না হওয়ার সম্ভাবনা।

যে ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাব উভয়ই বিশেষ শক্তিশালী, সে ক্ষেত্রে দাম একটু কমিলে বিক্রয় অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং দাম একটু বাড়িলে বিক্রয় অধিক পরিমাণে কমিয়া যায়। যে ক্ষেত্রে এই প্রভাব দুইটি দুর্বল, সে ক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন খুব বেশী হয় না।

অন্যান্য সকল কিছু স্থির আছে ধরিয়া লইলেও, অর্থাৎ স্বীকার্য্য বিষয়গুলি অপরিবর্তিত আছে মনে করিয়া লইলেও, কয়েকটি ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কার্য্যকরী না-ও হইতে পারে।

(ক) কতকগুলি দ্রব্য এরূপ থাকিতে পারে যে তাহাদের নিজস্ব গুণের জন্য তাহাদের ক্রয় করা হয় না, অপরকে দেখাইয়া নিজের অর্থগৌরব প্রকাশ করা দ্রব্যক্রয়ের উদ্দেশ্য। ভেব্‌লেন্‌ এইরূপ ক্রয়কে প্রদর্শনীয়-ভোগ (Conspicuous Consumption) বলিয়াছেন। এই সকল দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হইলে উহার ব্যবহার আরও আকর্ষনীয় হয়, ফলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেও পারে।

(খ) দ্রব্যের দাম যদি খুবই কম থাকে, তাহা হইলে দাম আর একটু কমিলে আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাব বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী হয় না, চাহিদাও না বাড়িতে পারে। অথবা দাম যদি খুবই বেশী থাকে তাহা হইলেও উহাতে অল্প একটু পরিবর্তনের ফলে চাহিদায় বিশেষ পরিবর্তন না-ও হইতে পারে।

(গ) যদি দাম বৃদ্ধির ফলে ক্রেতাদের মনে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়, যে দাম আরও বাড়িয়া যাইবে তবে তাহারা মজুত করিবার জন্য চাহিদা বাড়াইয়া দিতে পারে, যেরূপ শেয়ার বাজারে ঘটিয়া থাকে, অথবা পূর্ব-পাকিস্তানে লবণ

সঙ্কটের সময় ঘটিয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায়। যদি দাম কমিবার ফলে ক্রেতাদের মনে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে দাম আরও কমিয়া যাইবে, তবে তাহারা চাহিদা না বাড়াইয়া অপেক্ষা করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কার্য্যকরী হয় না।

(ঘ) যদি কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া যায়, তাহা হইলে বিত্তশালী ক্রেতাগণ উহাকে 'নিকৃষ্ট' দ্রব্য মনে করিয়া ক্রয় না করিতে পারে, পরিবর্ত-সামগ্রী বা একটু বেশী দামী 'উৎকৃষ্ট' দ্রব্য ক্রয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে। (The case of 'inferior' goods)।

(ঙ) গিফেন্ একটি উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, আয়ারল্যাণ্ডে ১৯শ শতাব্দীতে লোকে এত দরিদ্র ছিল যে তাহারা তাহাদের আয়ের বৃহৎ অংশ আলুতে ব্যয় করিয়া অল্পাংশ মাংসে ব্যয় করিত। আলুর দাম বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা মাংসের ক্রয় কমাইয়া দিয়া প্রধান খাদ্য আলুর চাহিদা বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। চাহিদার এইরূপ পরিবর্তনকে গিফেন-প্রভাব (Giffen-Effect) বলা হয়।

ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা (Individual Demand Schedule) ও বাজার চাহিদা তালিকা (Market Demand Schedule):

দ্রব্যটির বিভিন্ন দামে কোন ব্যক্তি যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহার তালিকাকে ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা বলে। ব্যক্তির চাহিদা বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ হইবে এবং চাহিদার নিয়ম হইতে জানিতে পারা যায় যে, দাম বেশী হইলে চাহিদা কমিয়া যাইবে এবং দাম কমিলে চাহিদা অধিক হইবে। একটি তালিকার রূপে, বিভিন্ন দামে, ব্যক্তির চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণকে প্রকাশ করা হয়, ইহাকে ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা বলে। যেরূপ,

ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা

দাম (প্রতি পাউণ্ড)	চা-এর চাহিদা
৬৲	২ পাউণ্ড
৫৲	৩ পাউণ্ড
৪৲	৫ পাউণ্ড
৩৲	৮ পাউণ্ড
২৲	১২ পাউণ্ড

কোন বাজারে যত ক্রেতা আছে প্রত্যেকেরই মনে মোটামুটি একটি ব্যক্তিগত

চাহিদা তালিকা আছে। যদি বাজারের প্রতিনিধি-স্থানীয় একটি ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকাকে আমরা ক্রেতার সংখ্যা দিয়া গুণ (multipication) করি তাহা হইলে আমরা সেই দ্রব্যটির বাজার-চাহিদা-তালিকা পাইতে পারি। বিভিন্ন দামে বাজারের মোট ক্রেতাগণ মিলিয়া একত্রে সেই দ্রব্যের মোট যে সকল পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকে, তাহার তালিকাকে বাজার-চাহিদা-তালিকা বলা হয়। নিম্নরূপে ইহা প্রকাশ করা যায়:

বাজার চাহিদা তালিকা

দাম (প্রতি পাউণ্ড চা)	বাজারে মোট চা-এর চাহিদা
৬৲	১০০০ পাউণ্ড
৫৲	১৬০০ ,,
৪৲	৩০০০ ,,
৩৲	৪৫০০ ,,
২৲	১০০০০ ,,

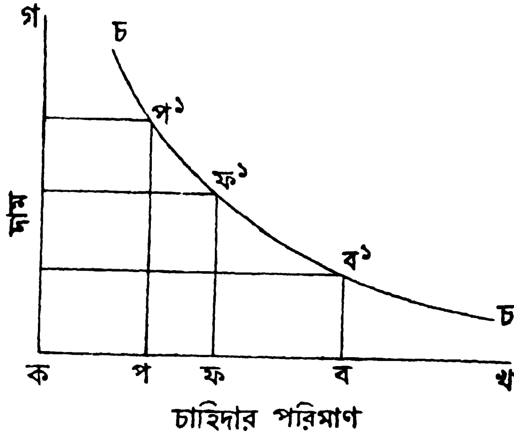
ব্যক্তিগত-চাহিদা-তালিকা হইতে বাজার-চাহিদা-তালিকা তৈয়ারীর বিশেষ অসুবিধা হইল এই যে প্রত্যেক ক্রেতার আয়, অভ্যাস ও রুচি অনুযায়ী ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা পৃথক। ইহাদের মধ্যে ঠিক প্রতিনিধি-স্থানীয় কোন তালিকা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত, যাহাকে ক্রেতার সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া বাজার-চাহিদা তালিকা পাওয়া যাইবে। তবে ফিসার বলিয়াছেন যে, বৃহৎ বাজারে হিসাব করিতে গেলে অতিরিক্ত ধনী বা অতিরিক্ত দরিদ্র, অথবা রুচি ও অভ্যাসের পার্থক্যের আতিশয্য পরস্পর খণ্ডন করে, সুতরাং মোটামুটি ভাবে প্রতিনিধি-স্থানীয় চাহিদা-তালিকা পাইতে বিশেষ কোন অসুবিধা নাই।

বাজার তালিকা গঠনের অসুবিধা

চাহিদা-তালিকাকে আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। পরবর্তী চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে:

কখ রেখা চাহিদার পরিমাণ এবং এবং **কগ** রেখা দামের পরিমাণ নির্ণয় সূচক। **পপ১** দামে **কপ** পরিমাণ; **ফফ১** দামে **কফ** পরিমাণ; এবং **বব১** দামে **কব** পরিমাণ দ্রব্যের মোট চাহিদা হইতেছে। চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী দাম কমিলে চাহিদার বৃদ্ধি হইতেছে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমিতেছে। চাহিদার রেখা তাই নিম্নাভিমুখী থাকে এবং ডাহিনে সরিয়া যায়।

চাহিদারেখা অঙ্কনের কয়েকটি অসুবিধা রহিয়াছে। সাধারণতঃ, চাহিদার রেখাকে একটি ধারাবাহিক (Continuous) রেখারূপে অঙ্কন করা হয় বটে, কিন্তু ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, দামে অতি অল্প পরিবর্তন হইলে চাহিদার পরিবর্তন



ঘটিবেই, এবং প্রত্যেকটি দ্রব্যেরই বিক্রয়োপযোগী একটি পৃথক দাম আছে। কিন্তু ইহা সব সময় স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। অনেক সময়ে দামে খুব অল্প পরিবর্তন হইলে চাহিদায় পরিবর্তন আসে না, এরূপ অবস্থায় চাহিদা রেখা বক্র ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। বিশ্লেষণের দিক হইতে বিচ্ছিন্ন ও বক্র চাহিদারেখা লইলে কোন পার্থক্য হয় না; কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য এবং তত্ত্বকে নিখুঁতভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন চাহিদারেখা গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে।

চাহিদা-তালিকা হইতে চাহিদা-রেখা অঙ্কনের অসুবিধা

আর একটি অসুবিধা হইল এই যে, প্রত্যেক দ্রব্যেরই বিভিন্ন ধরণ রহিয়াছে এবং বাস্তবে ইহাদের চাহিদা পৃথক্ হইতে পারে। যেরূপ চা-এর ক্ষেত্রে ব্রুকবণ্ড, লিপটন, টস, বা খোলা চা ইত্যাদির চাহিদা-তালিকা পৃথক হওয়া সম্ভব এবং ইহাদের চাহিদা-রেখাও পৃথক হওয়া উচিত।

সর্বাপেক্ষা গুরুতর অসুবিধা হইল এই যে, বাজারের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে কোন দ্রব্যের চাহিদারেখা অঙ্কন করা সম্ভব হয় না। কারণ বাজারে প্রচলিত দামের উঠানামার ব্যাপ্তি খুবই কম; ইহার উপরে ও নীচে পরিবর্তন খুবই কম

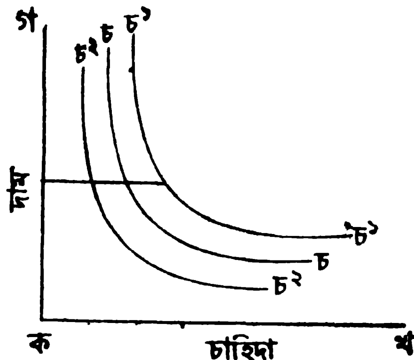
যাহার ফলে মোট চাহিদার সম্ভাব্য পরিবর্তন জানা শক্ত। কোন দ্রব্যের দাম ইচ্ছামত বাড়াইয়া বা কমাইয়া চাহিদার রেখা অঙ্কন করিয়া রাখা তাই সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশ্লেষণের দিক হইতে ঠিক সঠিক রেখাটি না হইলেও চলে, রেখার আকৃতি যথাযথ নিম্নাভিমুখী হইবে ইহা ধরিয়া লইয়া মোটামুটি আলোচনা চলিতে পাবে।

চাহিদায় পরিবর্তন (Change in Demand):

কোন কারণের ফলে যদি দ্রব্যটির দাম কমিয়া যায় তবে তাহার চাহিদায় পরিবর্তন হইবে, চাহিদা বাড়িয়া যাইবে; দাম বাড়িলে চাহিদা কমিবে। চাহিদার এরূপ পরিবর্তনকে অর্থাৎ দাম-পরিবর্তনের ফলে একই চাহিদা-রেখার উপরে ও নীচে চাহিদার পরিমাণের উঠানামাকে চাহিদায় পরিবর্তন বলা হয় না।

দাম স্থির থাকিয়া চাহিদায় উঠা-নামা

দাম একই থাকিয়া যদি মোট চাহিদা বাড়িয়া যায় অথবা মোট চাহিদা কমিয়া যায় তাহাকেই চাহিদায় পরিবর্তন বলা চলে। দাম স্থির অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধি হইলে চাহিদার রেখা দক্ষিণে সরিয়া যায় এবং চাহিদা কমিয়া গেলে ইহা বামে সরিয়া আইসে। নিম্নে রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে একই দামে চাহিদা বাড়িলে নতুন রেখা চ১ চ১



বর্দ্ধিত চাহিদা প্রকাশ করিতেছে; এবং একই দামে চাহিদা কমিলে নতুন রেখা চ২চ২ চাহিদার হ্রাস প্রকাশ করিতেছে।

চাহিদায় পরিবর্তনের কারণ (Causes of Changes in Demand):

দাম স্থির থাকিলেও, বিভিন্ন কারণে চাহিদার পরিবর্তন হয়।

প্রথমতঃ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট চাহিদা

বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা : জনসংখ্যা কমিয়া গেলে, যেমন যুদ্ধের ফলে, ক্রেতার সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় মোট চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতাদের রুচি, অভ্যাস বা চলতি ফ্যাশানের পরিবর্তন হইলে চাহিদায় পরিবর্তন আসিবে। পূর্বে প্রচলিত বহু দ্রব্যের আজকাল আর চাহিদা নাই কারণ, সমাজে ক্রেতাদের রুচি অভ্যাস ও ফ্যাশানের পরিবর্তন হইয়াছে এবং এই পরিবর্তনের ফলেই নূতন দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, ক্রেতাদের আর্থিক আয়ের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, তবে চাহিদা বাড়িয়া যায়, অপরপক্ষে, আর্থিক আয় কমিয়া গেলে চাহিদা কমিয়া যায়। অবশ্য 'নিকৃষ্ট দ্রব্যের' ক্ষেত্রে (Inferior goods) আর্থিক আয় বাড়িলে চাহিদা কমিবার সম্ভাবনা থাকে : যেমন আর্থিক আয় বাড়িলে লোকে বিড়ি বেশী না খাইয়া তাহার চাহিদাকে সিগারেটে সরাইয়া লইয়া যাইতে পারে।

চতুর্থতঃ, সমাজে কর্মসংস্থান যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কার্য্যকরী চাহিদা (Effective demand) বৃদ্ধি হয় এবং দ্রব্যাদির মোট চাহিদাও বাড়িয়া যাইতে থাকে ; আবার কর্মসংস্থান কম হইলে কার্যকরী চাহিদা কম থাকে এবং মোট চাহিদা কমিয়া যাইতে থাকে।

পঞ্চমতঃ, ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে আশাবাদী মনোভাব বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে কর্ম-সংস্থান ও উপাদানের নিয়োগ বাড়িয়া যায়, ফলে সমাজের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদার বৃদ্ধি হয়। অপর পক্ষে, নিরাশবাদী আবহাওয়ায় বিনিয়োগ কমিয়া যায়, কর্মসংস্থান ও উপাদানের নিয়োগ কমিয়া যায়, সমাজে মোট ব্যয় কমিবার ফলে চাহিদাও কমিয়া যায়।

ষষ্ঠতঃ, সাধারণতঃ ধনীশ্রেণীর ভোগ-প্রবণতা কম এবং দরিদ্রশ্রেণীর ভোগ-প্রবণতা বেশী। ধনীরা অধিক সঞ্চয় করে এবং সেই সঞ্চিত অর্থ সমাজে চাহিদা সৃষ্টি না করিতেও পারে (যদি তাহারা সেই সঞ্চয় বিনিয়োগ না করিয়া নগদ অর্থরূপে হাতে রাখিয়া দেয়)। যদি আয-বৈষম্য কমাইয়া ফেলা হয়, ধনীদের উপর কর বসাইয়া দরিদ্রশ্রেণীর হাতে অধিক অর্থ দেওয়া হয়, তবে তাহাদের ভোগ-প্রবণতা অধিক থাকায় সমাজে মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

সপ্তমতঃ, অন্যান্য দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হইলেও একটি দ্রব্যের চাহিদায় পরিবর্তন আসিতে পারে। ঘনিষ্ঠ-পরিবর্ত-সামগ্রীর (Close-Substitutes)

দাম কমিয়া গেলে কোন দ্রব্যের চাহিদা কমিতে পারে; ঘনিষ্ঠ-পরিবর্ত-সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইলে কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

দ্রব্যটির দামে পরিবর্তন না হইয়াও, উপরোক্ত কারণ সমূহের জন্য উহার চাহিদায় পরিবর্তন আসা সম্ভব।

একটি দ্রব্যের চাহিদা কিসের উপর নির্ভর করে (Factors on which Demand for a Commodity depends):

ষ্টিগ্‌লারের অভিমতে কোন ব্যক্তি একটি দ্রব্য কি পরিমাণ ক্রয় করিবে তাহা নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহের উপর:

(ক) দ্রব্যটির দাম। যদি দাম বৃদ্ধি পায় চাহিদা কমিবে, দাম কমিলে চাহিদা বাড়িয়া যাইবে।

(খ) ব্যক্তির আয়। আয় বৃদ্ধি হইলে চাহিদা বাড়ে, এবং আয় কমিলে চাহিদা কমে। আকস্মিক আয় বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বৃদ্ধি না হইলেও, আয় যদি স্থায়ী ভাবে বর্দ্ধিত হয়, তবে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটিবেই।

(গ) পরিবর্ত এবং অনুপূরক সামগ্রীর দাম। পরিবর্ত-সামগ্রীর দাম পরিবর্তনের অভিমুখে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে (চা-এর দাম কমিলে কফির-দামও কমিবে ইত্যাদি)। অনুপূরক সামগ্রীর দাম-পরিবর্তনের বিপরীত দিকে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে (কলমের-দাম কমিলে, কালির দাম বাড়িবে) ইত্যাদি।

(ঘ) ব্যক্তির রুচি ও পছন্দ। কোন ব্যক্তি কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ ক্রয় করিবে তাহা অবশ্যই তাহার রুচি ও পছন্দের উপর নির্ভরশীল।

চাহিদার সংকোচ-প্রসার ক্ষমতা:

চাহিদার নিয়ম হইতে ইহা জানা যায় যে দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে উহার চাহিদায় পরিবর্তন ঘটে, কারণ আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের মিলিত ফলে একটি দাম-প্রভাব সৃষ্টি হয়। যদি দাম-প্রভাব তীব্র হয়, তবে দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, যদি দাম-প্রভাব দুর্বল হয় তবে দামে পরিবর্তনের ফলে চাহিদায় পরিবর্তন কম হয়। কোন ক্ষেত্রে দাম অল্প একটু বাড়িলে বা কমিলে চাহিদা অনেক পরিমাণে কমে বা বাড়ে; কোন ক্ষেত্রে দাম অল্প একটু বাড়িলে বা কমিলে চাহিদা তাহার তুলনায় বেশী কমে না বা বেশী বাড়ে না।

দাম-প্রভাবের তীব্রতা

চাহিদার নিয়ম হইতে এই দুই পরিবর্তনের হার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। (দাম-পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে চাহিদার সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা বলা হয়।) ইহাকে দামের পরিবর্তন-জনিত চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা (Price-elasticity of Demand) বলা চলে।

সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা, দুই হইল পরিবর্তনের হারের অনুপাত

এই সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতাকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা চলে :

$$\text{সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা} = \frac{\text{চাহিদা পরিবর্তনের হার}}{\text{দাম পরিবর্তনের হার}}\text{।}$$

যে হারে দাম-পরিবর্তন হয়, যদি ঠিক সেই হারেই চাহিদায় পরিবর্তন ঘটে, তবে তাহাকে সমহার-সঙ্কোচপ্রসারক্ষম চাহিদা (Unit-elasticity of Demand) বলা হয়। দাম-পরিবর্তনের হারের তুলনায় যদি চাহিদায় অধিক হারে পরিবর্তন ঘটে, তাহাকে সঙ্কোচপ্রসারক্ষম চাহিদা (Elastic demand) বলা হয়। দাম-পরিবর্তনের হারের তুলনায় যদি চাহিদার পরিবর্তনের হার কম হয়; তবে তাহাকে সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন চাহিদা (Inelastic demand) বলা হয়। যেমন, শতকরা ৫% হারে দাম-পরিবর্তনের ফলে ঠিক যদি ৫% চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, তাহাকে সমহার-সঙ্কোচপ্রসারক্ষম চাহিদা বলা হইবে, এই দুই পরিবর্তনের অনুপাত একের সমান। যদি ৫% হারে দাম পরিবর্তনের ফলে ইহা হইতে অধিক, যেমন ৭% হারে চাহিদার পরিবর্তন হয়, তাহাকে সঙ্কোচপ্রসারক্ষম চাহিদা বলা হয়, দুই পরিবর্তনের হারের অনুপাত একের অধিক। অপরপক্ষে দামে ৫% পরিবর্তনের ফলে, ইহা হইতে কম, যেমন ৩% হারে পরিবর্তন ঘটিলে তাহাকে সঙ্কোচপ্রসারবিহীন চাহিদা বলা যাইতে পারে, দুই পরিবর্তনের হারের অনুপাত ১ হইতে কম।

পরিমাপ-পদ্ধতি (Methods of Measurement) :

দাম-প্রভাবের তীব্রতা বা চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতা পরিমাপ করার উপায় হইল দাম-পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যটির বিক্রয় হইতে বিক্রেতাদের মোট বিক্রয়-লব্ধ অর্থ বা মোট রেভিনিউ-র (Total Revenue) পরিমাণ কিরূপ ভাবে পরিবর্তিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করা। একটি নির্দিষ্ট দামে বাজারের সকল ক্রেতা মিলিয়া উহা ক্রয় করিবার জন্য যে মোট অর্থ ব্যয় (Total outlay) করেন এবং ওই দামে সকল বিক্রেতার মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থ,

ইহাকে মোট রেভিনিউ (Total revenue) বলে। দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদায় পরিবর্তন ঘটিলে তাহার ফলে উক্ত দ্রব্যটির জন্য বাজারে মোট রেভিনিউ-র পরিমাণেও পরিবর্তন হয়।

এই মোট রেভিনিউ-র পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া কোনো দ্রব্যের চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতা পরিমাপ করা চলে।

যেরূপ, ধরা যাউক যে,

দাম (প্রতি পাউণ্ড)	চাহিদা	মোট রেভিনিউ
৫৲	১০০০ পাউণ্ড	৫০০০৲
৪৲	১২৫০ ,,	৫০০০৲
২৲	২৫০০ ,,	৫০০০৲

এইক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের ফলে মোট রেভিনিউ-তে কোনরূপ পরিবর্তন হইল না, চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা সমহার বিশিষ্ট।

অপরপক্ষে, যদি ধরা যায় যে,

দাম (প্রতি পাউণ্ড)	চাহিদা	মোট রেভিনিউ
৫৲	১০০০ পাউণ্ড	৫০০০৲
৪৲	১৫০০ ,,	৬০০০৲
৩৲	২২০০ ,,	৬৬০০৲

এক্ষেত্রে দাম-পরিবর্তনের হার হইতে চাহিদা পরিবর্তনের হার বেশী। তাই দাম বৃদ্ধি হইলে চাহিদা অধিক হারে কমিয়া যায়, মোট রেভিনিউও কমে। দাম কমিয়া গেলে অধিক হারে চাহিদা বাড়িয়া যায়, মোট রেভিনিউ-ও বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার ক্ষম।

কিন্তু যদি এইরূপ ঘটে,

দাম (প্রতি পাউণ্ড)	চাহিদা	মোট রেভিনিউ
৫৲	১৪০০ পাউণ্ড	৭০০০৲
৪৲	১৫০০ ,,	৬০০০৲
৩৲	১৭০০ ,,	৫১০০৲

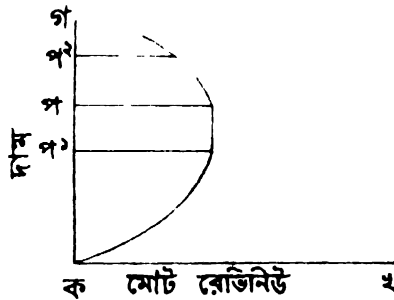
এস্থলে দাম-পরিবর্তনের হারের তুলনায় চাহিদা-পরিবর্তনের হার কম তাই

দাম বাড়িলে মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পায় এবং দাম কমিলে মোট রেভিনিউ কমিয়া যায়, এক্ষেত্রে চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন।*

পরবর্তী তিনটি রেখাচিত্রের সাহায্যে চাহিদার এই তিন প্রকার সঙ্কোচ-প্রসারক্ষমতা প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রথম চিত্রে চাহিদার সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা সমহারবিশিষ্ট, দামে পক্ষ পরিবর্তন হইলে চাহিদাতেও উহারই সমান, তথ পরিবর্তন হইয়াছে। দ্বিতীয়

(*) নিম্নের চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, দামের বিভিন্ন স্তরে দ্রব্যটির চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতায় তারতম্য হইতে পারে। দাম পরিবর্তনের ফলে মোট রেভিনিউতে পরিবর্তন কি ভাবে হয় তাহা নিম্নের চিত্রে দেখান হইতেছে।

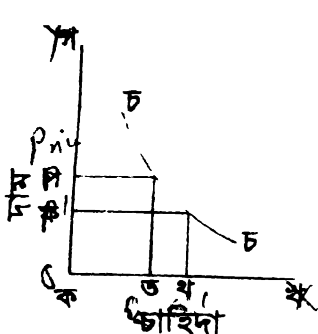


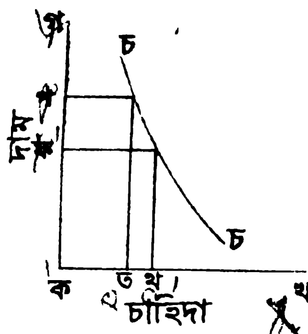
ক খ রেখা মোট রেভিনিউ-র এবং ক গ রেখা দামের পরিমাপ-সূচক। দ্রব্যটির দাম যখন প প২ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী-স্তরে পরিবর্তিত হইতেছে, তখন দেখা যায় যে, দাম বাড়িলে চাহিদা উহার তুলনায় অধিকহারে কমিয়া যায় সুতরাং মোট রেভিনিউ কমে; দাম কমিলে চাহিদা উহার তুলনায় অধিকহারে বৃদ্ধি পায়, সুতরাং মোট রেভিনিউ বাড়ে। এক্ষেত্রে চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারক্ষম।

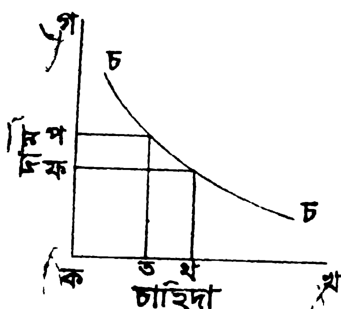
ক প১ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তীস্তরে দাম বাড়িলে চাহিদা উহার তুলনায় কমহারে হ্রাস পায়, মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পায়; দাম কমিলে চাহিদা উহার তুলনায় কমহারে বৃদ্ধি পায়, মোট রেভিনিউ কমিয়া যায়। এক্ষেত্রে চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারবিহীন।

প প১ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দাম বাড়িলে বা কমিলে চাহিদা সমানহারে কমে বা বাড়ে। মোট রেভিনিউ-তে কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ চাহিদা সমহারসঙ্কোচপ্রসার-ক্ষমতাবিশিষ্ট।

চিত্রে চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারবিহীন, দামে **পফ** পরিবর্তন হইলে চাহিদায় উহার কম **তথ** পরিবর্তন হইল। তৃতীয় চিত্রে, চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার কম। দামে







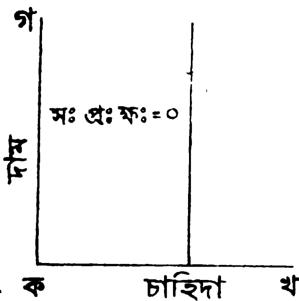
অল্প হারে যেমন **পফ** পরিবর্তন হইল চাহিদায় অধিক হারে যেমন **তথ** পরিবর্তন হইয়াছে।

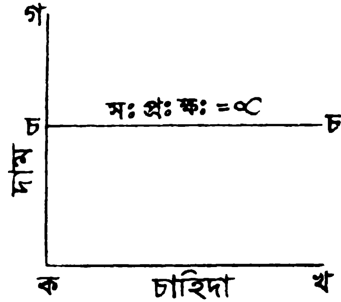
চাহিদা রেখার প্রত্যেক বিন্দুর সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা পৃথক, কারণ উহার ঢাল পৃথক

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, কোন দ্রব্যের চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা পৃথক হইতে পারে। দাম ৫৲ হইতে কমিয়া ৪৲ হইলে চাহিদা যেরূপ ভাবে পরিবর্তিত হইবে, দাম ৪৲ হইতে ৩৲ হইলে চাহিদার পরিমাণ সম্পূর্ণ অন্যহারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সুতরাং একই চাহিদার রেখার প্রতিটি বিন্দুর এক একটি নিজস্ব সঙ্কোচ প্রসার-ক্ষমতা আছে। ষ্টিগ্‌লার ইহাকে 'বিন্দুস্থ সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা' বলিয়াছেন (Point-elasticity)।

পূর্বোক্ত তিন প্রকার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা ছাড়াও ধনবিজ্ঞানীগণ বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য আরও দুই প্রকার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার কথা বলিয়াছেন। এরূপ ঘটিতে পারে যে, দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদায় কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিল না; এক্ষেত্রে সঙ্কোচ-প্রসারক্ষমতার মান শূন্য। এইরূপ অবস্থাকে সম্পূর্ণ সঙ্কোচপ্রসারবিহীন চাহিদা (Perfectly Inelastic Demand) বলা হয়। অপরপক্ষে, যদি দামের একটু পরিবর্তনের ফলেই চাহিদায় পরিবর্তনের কোন সীমা পরিসীমা থাকে না; দামের একটু পরিবর্তন চাহিদায় অনন্ত পরিবর্তন আনে, তাহা হইলে ইহার সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা অসীম (Infinitely elastic)। এইরূপ অবস্থাকে

সম্পূর্ণ সঙ্কোচ প্রসার বিহীন চাহিদা ও অসীম সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষম চাহিদা





অসীম সঙ্কোচপ্রসারক্ষম চাহিদা বলা চলে। উপরে ইহাদের চিত্ররূপ দেওয়া হইল।

সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা নির্দ্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Factors determining Elasticity of Demand)

এক] চাহিদার সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা নির্ভর করে বাজারে উহার কি পরিমাণ এবং কিরূপ পরিবর্ত সামগ্রী রহিয়াছে তাহার উপর। যদি পরিবর্ত-সামগ্রী ঘনিষ্ঠ ও সহজ লভ্য হয় তবে দ্রব্যটির চাহিদাও সঙ্কোচ প্রসার-ক্ষম হইবে। পরিবর্তসামগ্রী যতই ঘনিষ্ঠ প্রকৃতির হইবে, চাহিদা তত বেশী সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হইবে। মোটরের দাম বৃদ্ধি পাইলে, চাহিদা খুব বেশী না কমিতেও পারে, কারণ সাইকেল বা বাসকে মোটরের ঘনিষ্ঠ পরিবর্তসামগ্রী বলা চলে না। কিন্তু চা-এর গাড়ীর

১। পরিবর্ত-সামগ্রীর ঘনিষ্ঠতা

দাম বৃদ্ধি পাইলে ইহার চাহিদা অধিক পরিমাণে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা, কারণ কফি, কোকো বা দুধ সবই ইহার ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী। অপরপক্ষে, ঘনিষ্ঠ ও সহজলভ্য পরিবর্ত-সামগ্রী না থাকিলে চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন হওয়ার সম্ভাবনা।

দুই] যদি একটি দ্রব্যকে বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যে ব্যবহার করা হয়, তবে সাধারণতঃ তাহার চাহিদা সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষম হইবে। যেমন বিদ্যুৎ বহুবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, আলো জ্বালান, গরম করা, রান্না করা, গাড়ী ও যন্ত্র চালান ইত্যাদি। ইহার পরিবর্ত-সামগ্রী হইল, মোমবাতি, কয়লা, গ্যাস, পেট্রল, ব্যাটারি ইত্যাদি। এই সকল পরিবর্ত সামগ্রীর তুলনায় বিদ্যুৎ-এর দাম যদি কমিয়া যায়; তবে লোকে এই সকল দ্রব্য হইতে চাহিদা সরাইয়া লইয়া বিদ্যুৎ ব্যবহার সুরু করিবে, বিদ্যুৎ-এর চাহিদা অধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। অপর পক্ষে গমের চাহিদা সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন, কারণ প্রধানতঃ ইহা একটি মাত্র কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়। গমের দাম কমিলে শুধু খাওয়ার জন্যই গম আর একটু বেশী ক্রয় করিবে, সুতরাং বিক্রয় খুব বেশী বৃদ্ধি হইবে না।

২। বহু ব্যবহারে নিয়োগ করা হয় কি না

তিন] আবশ্যক-দ্রব্য সমূহের চাহিদা সাধারণতঃ সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন হইয়া থাকে, কারণ তাহাদের কোন ঘনিষ্ঠ ও উপযুক্ত পরিবর্ত সামগ্রী থাকে না। লবণ, চাল বা গম ইত্যাদির দাম বৃদ্ধি হইলে লোকে ক্রয় কমাইতে পারে না; আবার ইহাদের দাম একটু কমিলেই লোকে ইহা অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে সুরু করে না। ইহাদের পরিবর্ত-সামগ্রী খুবই কম, ভোগের ক্ষেত্রে ইহাদের বিশেষ-নির্দিষ্ট-ভোগ্য-দ্রব্য (Specific Consumption Goods) বলা চলে।

৩। আবশ্যক বা বিলাস দ্রব্য ৪। চাহিদা স্থগিত রাখা সম্ভব কি না ৫। ধনী বা গরীবদের দ্বারা প্রধানতঃ ব্যবহৃত

চার] বিলাস-সামগ্রীর চাহিদা সাধারণতঃ সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষম; কারণ তাহাদের ব্যবহার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা সম্ভব।

পাঁচ] ধনীরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করে তাহার চাহিদা সাধারণতঃ সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন, কারণ দাম একটু বাড়িলেই তাহারা ক্রয় কমাইয়া দে[illegible]; আবার দাম একটু কমিলেই তাহারা ক্রয় বাড়াইয়া দেয় না ([illegible] পূর্বের দামেই তাহাদের চাহিদা মেটান সম্ভব হইতেছিল)। তাহা ব্যতী[illegible] ইহা[illegible]

সামগ্রীর ঘনিষ্ঠ ও উপযুক্ত সামগ্রী প্রায়ই দেখা যায় ; সুতরাং ধনীদের নিকট না হইলেও দরিদ্রদের নিকট তাহাদের চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার-ক্ষম হয়।

ছয়] দ্রব্যটির চলিত দাম যদি অত্যন্ত কম থাকে, তাহা হইলে তাহার চাহিদা সাধারণতঃ সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন হয়, কারণ দাম আরও কমিলে চাহিদা বেশী বাড়ে না (বর্তমানে সকলের চাহিদাই প্রায় মিটিতেছে) এবং দাম একটু বাড়িলেও চাহিদা বেশী কমে না (কারণ জিনিষটি পরিবর্ত-সামগ্রীর তুলনায় তখনও সস্তা)। সেইরূপ যদি দ্রব্যের চলিত দাম খুব বেশী থাকে তাহা হইলে দামের একটু বৃদ্ধি বা একটু হ্রাস চাহিদাকে অধিক পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে না।

৬। দাম খুব বেশী কি খুব কম

সাত] ব্যক্তির মোট আয়ের অতি অল্প অংশ যদি দ্রব্যটি ক্রয়ের জন্য ব্যয় হয়, তবে সেই দ্রব্যের চাহিদা সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন হয় ; কারণ সেই দ্রব্য-মূল্যের অল্প উঠা-নামা ব্যক্তির চাহিদাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে না।

৭। আয়ের বেশী অংশ কি কম অংশ

দুইটি উপায়ে চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসারক্ষমতার উদ্ভব হয়। দ্রব্যের দাম কমিলে বর্তমান ক্রেতাগণ অধিক পরিমাণ ক্রয় করিবে এবং নূতন ব্যক্তিরাও সেই দ্রব্য ক্রয়ে প্রবৃত্ত হয়। যদি দ্রব্যটি স্থায়ী হয় তবে বর্তমান ক্রেতাগণ না কিনিতেও পারেন (যেমন বই-এর দাম কমিলেও লোকে একই বই পুনরায় কিনিবে না) নূতন ক্রেতার দ্বারাই বিক্রয় ও চাহিদা বৃদ্ধি সম্ভব। সাধারণতঃ সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতা নির্ভর করে দাম কমিলে সম্ভাব্য নূতন ক্রেতাদের চাহিদা সৃষ্টি হয় কিনা তাহার উপর ; প্রধানতঃ বর্তমান ক্রেতাদের অধিক ক্রয়ের উপর নহে।

কিভাবে উদ্ভব হয়—বর্তমান ক্রেতা ও নূতন ক্রেতা

চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতার উপর সময়ের প্রভাব (Demand Elasticity Through Time) :

ষ্টিগ্‌লার বলিতেছেন যে দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার উপর স্বল্পকালীন প্রভাব একরূপ হইলেও দীর্ঘকালীন প্রভাব অন্যরূপ হইতে পারে।

কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে, দীর্ঘকালীন সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতার তুলনায় স্বল্পকালীন সঙ্কোচ-প্রসারক্ষমতা অধিক। যেমন, একটি যন্ত্রের দাম কমিয়া

যাওয়ার ফলে উহার চাহিদা তখনই বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু যন্ত্র বিক্রয় হইয়া যাইবার পর সেই যন্ত্রের মেরামত ছাড়া দীর্ঘকালীন সময়ে অন্য কোন কাজ না থাকিতে পারে, ফলে উহার বিক্রয় অনেক কাল পরে কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। বর্তমানে দাম কমিবার ফলে চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় পরবর্তী কালের চাহিদা বৃদ্ধি অনেক কম হইবে।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, স্বল্পকালীন সঙ্কোচ-প্রসারক্ষমতার তুলনায় দীর্ঘকালীন সঙ্কোচ-প্রসারক্ষমতা অধিক। ষ্টিগ্‌লার ইহার তিনটি কারণ দেখাইয়াছেন :

(ক) যন্ত্র-জনিত কারণ : দাম কমিলেই প্রথমে চাহিদা বৃদ্ধি না হইতে পারে, কারণ যদি সহকারী ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজারে পাওয়া না যায়, তবে বিক্রয় বৃদ্ধি সম্ভব নয়। বিদ্যুৎ-এর দাম কমিলে উহার ব্যবহারোপযোগী আনুষঙ্গিক দ্রব্যসমূহ বাজারে পাওয়া গেলেই তবে বিদ্যুৎ-এর চাহিদা বৃদ্ধি হইবে। স্থায়ী দ্রব্য সমূহের দাম কমিলে, পুরাতন দ্রব্যগুলি ক্ষয় হইয়া বা ফুরাইয়া না গেলে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব হয়।

(খ) দ্রব্যের দাম কমিলে সঙ্গে সঙ্গেই চাহিদা বাড়ে না ; ক্রেতাদের মধ্যে তাহা প্রচারিত হওয়া চাই, পুরাতন ও সম্ভাব্য নূতন ক্রেতাদের মধ্যে সেই সংবাদ পৌঁছিবার সময় পর্য্যন্ত চাহিদার উপর প্রভাব না-ও আসিতে পারে।

(গ) দ্রব্যের দাম কমিলে লোকে উহা তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিবে এমন নহে। উহার সহকারী দ্রব্য ক্রয় করার ব্যবস্থা ছাড়াও, প্রত্যেকের নিজস্ব আয়-ব্যয়ের বাজেটের পুনর্বিচার ও পুনর্গঠন করিতে হইবে, ব্যক্তির ভোগের ধরণ (Consumption Patterns) বদ্‌লাইতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়।

সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতার প্রকার-ভেদ (Various Types of Elasticity)

এক] দামের পরিবর্তন-জনিত চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতা (Price Elasticity of Demand) :

দামের পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে দামের পরিবর্তন-জনিত চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতা বলা হয়। ইহা হইল চাহিদার রেখার প্রতিবিন্দুর সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতা।

দুই] আয়ের পরিবর্তন জনিত চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা (Income Elasticity of Demand) :

আয়ের পরিবর্তন হইলে চাহিদা পরিবর্তিত হয়। আয়ের পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে আয়ের পরিবর্তন-জনিত চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা বলা হয়। আয় বৃদ্ধি পাইলে সকল জিনিষের চাহিদা অধিক বৃদ্ধি পায় না, যেমন খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি ; কিন্তু বিলাস দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আয় কমিয়া গেলেও খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা খুব কমে না, কিন্তু বিলাস দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যায়। সুতরাং বলা যায় যে আয়ের পরিবর্তন জনিত খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন ; কিন্তু আয়ের পরিবর্তন জনিত বিলাস দ্রব্যের চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম।

তিন] বৃত্তখণ্ডের সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা (Arc Elasticity) :

আমরা জানি যে চাহিদার রেখার প্রতিবিন্দুর সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা পৃথক। চাহিদার রেখার উপর অবস্থিত দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দুর অন্তর্গত স্থানের চাহিদার গড় সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতাকে বৃত্তখণ্ডের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা (Arc Elasticity) বলে।

চার] পারস্পরিক সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা (Cross Elasticity) :

দুইটি পৃথক দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের হারের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধকে পারস্পরিক সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা বলা যায়। একটি দ্রব্যের দাম কমিয়া গেলে তাহার চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় পরিবর্ত সামগ্রীর চাহিদা কমিয়া যায় এবং অনুপূরক দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়। সুতরাং দ্রব্যটির দাম কমিবার ফলে পরিবর্ত সামগ্রীর দাম কমে এবং অনুপূরক দ্রব্যের দাম বাড়ে। দ্রব্যটির দাম বাড়িলে পরিবর্ত সামগ্রীর দাম বাড়ে এবং অনুপূরক দ্রব্যের দাম কমে। দ্রব্যটির দামের পরিবর্তনের হার ও পরিবর্ত দ্রব্যের বা অনুপূরক দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে পারস্পরিক সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা বলা চলে। যেমন,

$$\text{পারস্পরিক সঃ প্রঃ ক্ষঃ} = \frac{\text{খ এর চাহিদা পরিবর্তনের হার}}{\text{ক এর দাম পরিবর্তনের হার}}$$

এক্ষেত্রে 'খ' 'ক' এর অনুপূরক বা পরিবর্ত-সামগ্রী।

নিরপেক্ষ-রেখা (Indifference-Curve)

নয়া-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রচারিত চাহিদার নিয়ম উপযোগিতা-তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। জেভন্‌স্-এর ধারণা ছিল যে উপযোগিতাকে পরিমাণগত ভাবে, পরিমাপ করা (Quantitative measurement) সম্ভব। তাহা ছাড়া এই তত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা বদলায় না। দ্রব্যের পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পাইলে তাহা হইতে উপযোগিতা কত বৃদ্ধি হইল তাহা ব্যক্তি জানিতে পারে এবং সেই উপযোগিতা বুঝিয়া দাম দেয়—ইহাও এই তত্ত্ব ধরিয়া লয়। মার্শাল উপযোগিতা-ভিত্তিক চাহিদা বিশ্লেষণের সময়ে ধরিয়া লইয়াছিলেন, যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ে (যখন ব্যক্তির নিজের মনে ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা তৈরী হয়) কেবল একটি মাত্র দ্রব্যের কথাই চিন্তা করিতেছে; উহারই পরিবর্ত-সামগ্রী বা অনুপূরক সামগ্রী (Substitutes and complementary goods) যে বাজারে আছে, তাহা তাহার মনে সাময়িকভাবে স্থান পাইতেছে না।*

উপযোগিতা-ভিত্তিক বিশ্লেষণের ত্রুটি

আসলে কিন্তু কোন ব্যক্তি দ্রব্য-ক্রয়ের সময়ে শুধু সেই দ্রব্যটির সম্বন্ধে চিন্তা করে তাহা নহে, সে একই সঙ্গে সেই দ্রব্য উহার অনুপূরক দ্রব্য সমূহ এবং পরিবর্ত-দ্রব্য সমূহ সকল কিছু চিন্তা করে। বিভিন্ন দ্রব্যের সম্মিলনেই তাহার অভাব তৃপ্ত হয়। তাহার ব্যয় ক্ষমতা অনুযায়ী সকল দ্রব্যই কিছু কিছু পরিমাণে সে পাইতে চাহে। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময় একটি দ্রব্য একটু ছাড়িয়া দিয়া অন্য দ্রব্য বেশী কেনে, একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অপর দ্রব্য ক্রয় করে। বেশীর ভাগ দ্রব্যের ক্ষেত্রেই, এইটির বদলে ওইটি এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্যক্তির চাহিদা স্থির হয়।

ব্যক্তি একসঙ্গে দ্রব্য সম্মিলনের কথা চিন্তা করে

মনে করা যাক কোন ব্যক্তির সম্মুখে দুইটি দ্রব্য রহিয়াছে। সে উভয় দ্রব্যই বিভিন্ন পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে; এবং একটির পরিমাণ কমাইয়া উহার পরিবর্তে অপরটি বেশী ক্রয় করা সম্ভব। এই দুইটি দ্রব্যের পরিমাণের বিভিন্ন

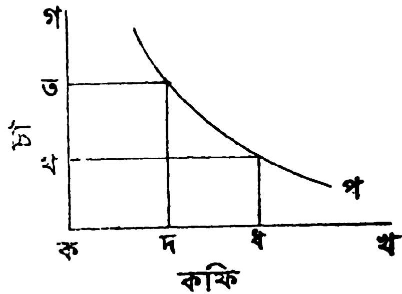
* ইহা স্থির বা নিশ্চল বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ।

সম্মিলন সম্বন্ধে তাহার পছন্দ সমান হইতে পারে। যেমন চা ও কফি দুইটি দ্রব্যের পরিমাণের বিভিন্ন সম্মিলন সম্বন্ধে ব্যক্তির পছন্দ সমান। উদাহরণ স্বরূপ :

২৪ পাউণ্ড চা	ও	২ পাউণ্ড কফি
২৩ পাউণ্ড চা	ও	৩ পাউণ্ড কফি
২২ পাউণ্ড চা	ও	৫ পাউণ্ড কফি
২১ পাউণ্ড চা	ও	৮ পাউণ্ড কফি

নিরপেক্ষ তালিকা ও নিরপেক্ষ রেখা

এই সম্মিলনের প্রত্যেকটিই ব্যক্তি সমান ভাবে পছন্দ করে। এই সকল সম্মিলন তাহার একটি বিশেষ পছন্দের মাত্রা (Scale of Preference) নির্দেশ করে। ইহার যে কোন সম্মিলন পাইলেই সে সমান খুশী, কোন্‌টা পাইতেছে তাহাতে সে নিরপেক্ষ। তাই ইহাকে নিরপেক্ষ তালিকা (Indifference Schedule) এবং ইহাকে রেখার সাহায্যে প্রকাশ করিলে তাহাকে নিরপেক্ষ রেখা (Indifference Curve) বলা হয়। নিম্নে চিত্ররূপ দেখান হইতেছে।

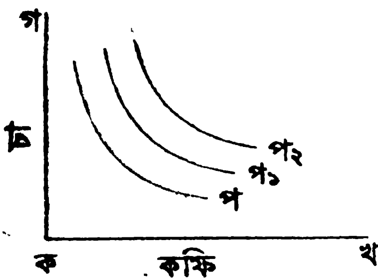


প হইল পছন্দ রেখা, কগ চা-এর পরিমাণ এবং কখ কফির পরিমাণ নির্দেশক। প রেখার প্রত্যেক বিন্দু চা ও কফির প্রতিটি সম্মিলন প্রকাশ করে। ব্যক্তি এই সকল সম্মিলনকে সমান ভাবে পছন্দ করে, ক ত পরিমাণ চা ও ক দ পরিমাণ কফি, অথবা ক ধ পরিমাণ চা ও ক ধ পরিমাণ কফি উভয় সম্মিলন সম্বন্ধেই তাহার সমান পছন্দ। প রেখার নিম্নাভিমুখিতা (downward slope) বা নিম্নাভিমুখী ঢাল নির্ভর করে প্রান্তিক পরিবর্ততার হারের উপর (Marginal rate of substitution)। প্রথমে অল্প কফি পাইয়া সে এক পাউণ্ড চা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু ইহার ফলে তাহার চা কমিয়া গেল এবং কফি বাড়িয়া গেল; সুতরাং চা এর প্রান্তিক তাৎপর্য্য (Marginal Significance) বাড়িতেছে, এবং কফির প্রান্তিক তাৎপর্য্য

প্রান্তিক পরিবর্ততার হার

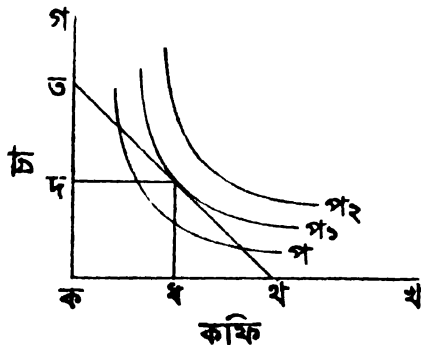
কমিতেছে। যতই চা এর বদলে কফি বেশী ব্যবহার করিতেছে, ততই চা ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছা কমিয়া যাইতেছে, ক্রমেই বেশী কফির বদলে ১ ইউনিট চা ছাড়িয়া দিতেছে। ইহাকে বলা হয় ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তিতা (Diminishing Marginal Substitutability)।

এইরূপ বহু পছন্দ-রেখা পর পর অঙ্কন করা যায়। নিম্নের চিত্রের প১ রেখা পূর্বের রেখার তুলনায় দুইটি দ্রব্যেরই অধিক পরিমাণে সম্মিলন প্রকাশ করে, প২ রেখা আরও অধিক পরিমাণের সম্মিলন দেখাইতেছে। ইহার কোনটি ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ সে কোন্ পছন্দ-রেখায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে তাহা নির্ভর করে ব্যক্তির আয়ের উপর।



আয় ও দাম রেখা

ধরা যাক, ব্যক্তি ২০৲ এই দুইটি দ্রব্যের জন্য ব্যয় করিবে। সে ২০ টাকার সবটাই চা ক্রয়ে অথবা সবটাই কফি ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে। সম্পূর্ণ ২০ টাকারই চা ক্রয় করিলে ব্যক্তি কত পরিমাণ চা পাইবে এবং সম্পূর্ণ ২০ টাকারই কফি ক্রয় করিলে সে কথ পরিমাণ চা পাইবে (নীচের চিত্রে দেখা যাইতেছে)। তথ বিন্দু যোগ করিলে যে তথ রেখা পাওয়া যায় তাহাকে দাম-রেখা (Price line) বলা চলে।



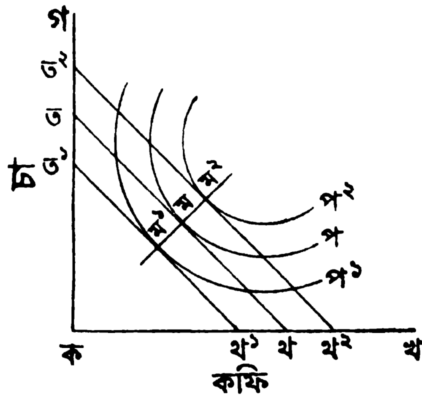
দিয়া চা ও কফির যত সম্মিলন ক্রয় করা সম্ভব তাহা সবই এই দাম-রেখায় দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। এই দাম-রেখা যে পছন্দ রেখাকে একটু স্পর্শ

করিতে পারিল, ব্যক্তি দ্রব্যের সেই সম্মিলন ক্রয়ের চেষ্টা করিবে, কারণ নীচের পছন্দ-রেখা হইতে উপরের পছন্দ-রেখায় সে অধিক পরিমাণে দুইটি দ্রব্যই পাইতে পারে।

ব্যক্তি প পছন্দ রেখার কোন দ্রব্য সম্মিলন ক্রয় করিবে না, দাম-রেখা প১ পছন্দ রেখায় ম বিন্দুতে মিশিয়াছে, সেই বিন্দুতে নির্দ্ধারিত দ্রব্য-সম্মিলন ক্রয় করিবে। কারণ প রেখাতে তাহার ক্ষতি, কিন্তু প২ রেখাতে উঠিবার মত অধিক ব্যয়-ক্ষমতা (অর্থাৎ উচ্চতর দাম-রেখা) তাহার নাই। অর্থাৎ ২০৲ ব্যয়ে সে ক্রয় করিবে কদ পরিমাণ চা ও কধ পরিমাণ কফি—এই সম্মিলনই তাহার নিকট সর্ববৃহৎ এবং সর্বোচ্চ হওয়া সম্ভব।

ব্যক্তির আয় যদি বাড়িয়া যায় তাহা হইলে সে উচ্চতর পছন্দ রেখায় উত্তীর্ণ হইতে পারে অর্থাৎ উভয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে; যদি আয় কমিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিম্নতর পছন্দ রেখায় নামিয়া আসিতে হইবে অর্থাৎ উভয় দ্রব্যই তাহাকে কম পরিমাণে ক্রয় করিতে হইবে। নীচে দেখা যাইতেছে, যে আয় বাড়িলে ত২থ২ তাহার দাম-রেখা হইবে এবং তাহা ম২ বিন্দুতে উর্দ্ধতর প২ পছন্দ রেখার সহিত মিলিত হইবে, ফলে দ্রব্য ক্রয় বৃদ্ধি পাইবে। যদি আয কমে, তাহা হইলে ত১থ১ তাহার দাম রেখা হইবে

চাহিদার উপর আয় পরিবর্তনের প্রভাব



এবং তাহা ম১ বিন্দুতে নিম্নতর প১ পছন্দ রেখার সহিত মিলিত হইবে, ফলে দ্রব্য ক্রয় কম হইবে। ম১, ম, ম২ বিন্দুগুলি যোগ করিলে জানা যায় যে,

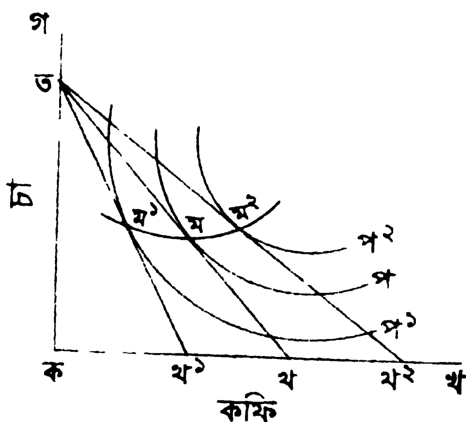
ব্যক্তির আয় বাড়িলে দ্রব্য ক্রয় বাড়ে, এবং আয় কমিলে দ্রব্য ক্রয় কমে। ম১, ম, ম২ রেখাকে আয়-ভোগ রেখা (Income-Cousumption Curve) বলা চলে।

দ্রব্য সমূহের দাম স্থির থাকিয়া যদি ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে তাহার ভোগ-বৃদ্ধি হইবে, তাহা এই রেখা হইতে আমরা বুঝিতে পারি।

দাম প্রভাব অর্থাৎ চাহিদার নিয়মের সৃষ্টি

যদি প্রতি পাউণ্ড কফির দাম কমিয়া যায় তাহা হইলে ব্যক্তি পূর্বের আয় দিয়া এখন বেশী পরিমাণ কফি ক্রয় করিতে পারে। পূর্বে সে কখ পরিমাণ ক্রয় করিতে পারিত কিন্তু এখন সে কখ১ পরিমাণ ক্রয় করিতে পারে, কফির দাম আরও কমিলে, সে কখ২, কখ৩ এইরূপ ক্রয় করিতে পারিবে। (নীচের চিত্রে উহা দেখা যাইতেছে)। কিন্তু চা-এর দাম স্থির থাকায় উহা সে পূর্বের পরিমাণই ক্রয় করিতে সক্ষম। তাই দাম-রেখা কখ অক্ষের ডান দিকে সরিয়া আসিতে থাকিবে (কফি বেশী ক্রয় করা সম্ভব হইতেছে, তাহা বুঝাইতেছে)।

এই চিত্রে তথ রেখার ঢাল (Slope) নির্ভর করে চা ও কফির পারস্পরিক দামের অনুপাতের উপর। তথ রেখাকে ব্যয়-ভূমিও (Outlay Contoure)



বলা হয়। কফির দাম যত বেশী কমিবে তথ রেখার ঢাল (Slope) তত বাড়িবে। ইহার ফলে ব্যক্তি উর্দ্ধতর পছন্দ-রেখায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে অর্থাৎ উভয় দ্রব্যই অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে পারিবে। ইহার দুইটি কারণ

আছে, প্রথমটি আয়-প্রভাব ; দ্বিতীয়টি পরিবর্ত-প্রভাব (তাহা পূর্বে 'চাহিদার নিয়ম' শীর্ষে বুঝান হইয়াছে।) ম১, ম ও ম২ বিন্দুগুলিকে যোগ দিলে আমরা জানিতে পারি যে দ্রব্যের দাম কমিলে উহার চাহিদা ব্যক্তির নিকট কিরূপ বাড়িতেছে, অর্থাৎ ম১, ম ও ম২ হইল ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা (Individual Demand Curve)।

বাজার-চাহিদা

এইরূপে বাজারের সকল ব্যক্তিরই আয় ও পছন্দ রেখার অবস্থান অনুযায়ী পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা পাওয়া যায়। বাজারের সকল ব্যক্তির চাহিদা-রেখাকে একত্র করিলে বাজার-চাহিদা রেখা (Market Demand Curve) প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

উপযোগিতা-তত্ত্ব হইতে কোথায় ইহার উন্নতি

এইরূপে নিরপেক্ষ রেখার সাহায্যে বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা চাহিদার পিছনে কোন শক্তি কাজ করে তাহা জানিতে পারি। উপযোগিতার পরিমাণগত পরিমাপ না করিয়া, দ্রব্য ক্রয়ের পিছনে তৃপ্তি আছে কি নাই তাহা আলোচনা না করিয়া ব্যক্তির চাহিদা রেখা নির্ণয় করিতে পারা যায়। তবুও এই তত্ত্বের কার্য্যকারিতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

এই বিশ্লেষণের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা

এই আলোচনার সময়ে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ব্যক্তি দুইটি দ্রব্য ক্রয়ের কথা চিন্তা করিতেছে, অপর কোন দ্রব্যের হিসাব তাহার মনে রেখাপাত করিতেছে না। ইহা বাস্তবে ঠিক নহে। দ্বি-আয়তনিক (Two dimensional) চিত্রের সাহায্যে আরও অধিক দ্রব্যের বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। হিক্‌স্ অবশ্য এই অসুবিধা দূর করার জন্য বলিরাছেন যে, যে সকল দ্রব্যের একই হারে দাম পরিবর্তন হয় এরূপ কতিপয় দ্রব্যের সমষ্টিকে একটি দ্রব্য ধরিয়া লইয়া বিশ্লেষণ করা চলিতে পারে।

ব্যক্তির নিরপেক্ষ-ক্ষেত্র (Indifference-Map) বিশ্লেষণের আরও অসুবিধা হইল এই যে, ব্যক্তিকে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে পছন্দ করিতে তো হয়ই, একই দ্রব্যের বিভিন্ন প্রকার বা ছাপ ও মার্কার মধ্যেও (যেমন শুধু সাবান বা তেল নহে ; লাক্স, হামাম মার্গো, ইত্যাদি) তাহাকে নির্বাচন করিতে হয়।

ইহাও বলা চলে যে এই তত্ত্ব, কিছুটা অন্যরূপে হইলেও, চাহিদার উপযোগিতা

তত্ত্বকে প্রায় সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছে। দ্রব্যসমূহের উপযোগিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন আছে বলিয়াই ব্যক্তি একটি দ্রব্য ছাড়িয়া কতটুকু অপর দ্রব্য পাইতে চাহে, তাহা হিসাব করে। মানুষ যে নিজের সুখের আশায় সর্বাধিক তৃপ্তি খোঁজে (সেই পুরানো হেডনবাদ) তাহা এই তত্ত্ব মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছে, পুরোনো মদ নূতন বোতলে ঢালা হইয়াছে মাত্র।

কিন্তু তাহা করিয়া বরং উপযোগিতা তত্ত্বের মধ্যে যে বিজ্ঞান-সম্মত প্রচেষ্টা ছিল, তাহাকেও নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। যে চাহিদার দ্বারা দাম নির্ধারণ হইবে, তাহার পিছনে এমন বিষয় থাকা উচিত যাহা দামের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না, যাহা দাম-নিরপেক্ষ। উপযোগিতা অন্ততঃ সেইরূপ একটি বিষয় ছিল, কারণ দ্রব্য হইতে তৃপ্তি দামের উপর নির্ভরশীল নহে, উহা মানসিক অনুভূতি। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা (Desire) বা পছন্দ (Preference) অনেকাংশে দাম-নির্ভর। সুতরাং দাম-নির্ভর বিষয়ের দ্বারা চাহিদা নিরূপণ করিয়া তাহা দ্বারাই দাম নির্দ্ধারণের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যে সরিষায় ভূতের প্রভাব আছে, তাহা দিয়া ভূতের প্রভাব তাড়ান চলে না। ইহাকেই একপ্রকার বৃত্তাকৃতি যুক্তি (Circular Reasoning) বলা চলে।

ভোগ প্রবণতা (Propensity to Consume):

মোট ভোগের পরিমাণ (Volume of consumption) নির্ভর করে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ভোগের পরিমাণের সমষ্টির উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি ভোগকার্য্যে যে পরিমাণ ব্যয় করে তাহা যোগ করিলে সামগ্রিক ভাবে সমগ্র সমাজের ভোগ পরিমাণ জানা যায়। ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভরশীল?

কেইন্‌সের মতে ইহা নির্ভর করে ব্যক্তির আয়ের উপর। দামের সঙ্গে চাহিদার যেরূপ কার্য্যকারণ সম্পর্ক আছে, ঠিক সেই রকম ব্যক্তির ভোগ তাহার আয়ের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ ও ভোগের পরিমাণের মধ্যে এইরূপ সম্পর্ককে কার্য্যকারণ সম্পর্ক (Functional relationship) বলা হয় অর্থাৎ ভোগরূপ কার্য্যের কারণ হইল আয়।* যদি ভ বলিতে আমরা ভোগ বুঝি এবং আ বলিলে আয় বোঝা যায়, তাহা হইলে ভ = ক (আ)

* কোন ব্যক্তির ভোগ-প্রবণতা বাস্তব ও মনোগত দুই জাতীয় বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বাস্তব বিষয়গুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হইল ব্যক্তির আয় ও দ্রব্যাদির দাম। দামে পরিবর্তন হইলে ভোগের

অর্থাৎ $c = f(y)$। আয় ও ভোগের মধ্যে কার্য্যকরণ সম্পর্কের প্রতীক এই ক-কে ভোগ-প্রবণতা বলা হয়। অর্থাৎ আয় এবং ভোগের যে অনুপাত তাহাকেই ভোগ-প্রবণতা বলে। যদি ১০০৲ আয়ের মধ্যে ৮০৲ ভোগে ব্যয় হয়, তাহা হইলে ভোগ প্রবণতা ·৮। যদি আয়ের সম্পূর্ণই ভোগে ব্যয় হয়, তাহা হইলে ভোগ প্রবণতা ১-এর সমান। এই ভোগ-প্রবণতাকে $\frac{ভ}{আ}$ অর্থাৎ $\left(\frac{c}{y}\right)$ রূপেও প্রকাশ করা চলে।

যদি আয় বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ব্যক্তির ভোগ বাড়িবে। কিন্তু যে পরিমা আয় বৃদ্ধি হইল তাহার সবটুকুই নূতন ভোগে ব্যয়িত হয় না, আয় বৃদ্ধির তুলনায় ভোগ বৃদ্ধি কম হয়।†

পরিমাণ পরিবর্তিত হইবেই। কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাউক যে, এই সময় দামে পরিবর্ত্তন হইতেছে না। এমতাবস্থায় যদি ব্যক্তির রুচি ও অভ্যাস বদলায় তাহা হইলে ভোগের পরিমাণ বদলাইবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ করের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে ভোগের পরিবর্তন হইয়া থাকে। যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ বদলাইলে ভোগে পরিবর্ত্তন আসে। ক্লাসিকাল লেখকগণের মতে সুদের হারে পরিবর্তন হইলে ভোগ পরিবর্তন হইবে। কিন্তু কীনসের মতে সুদের হারের সহিত ভোগের প্রত্যক্ষ ও আনুপাতিক সম্পর্ক নাই। এই সকল বাস্তব কারণ স্বল্পকালে পরিবর্তিত হয় না, ইহাই কীনসের অভিমত।

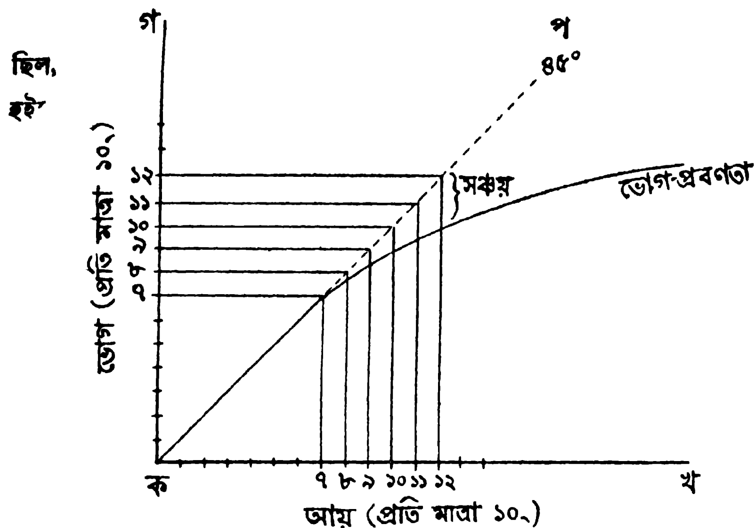
মনোগত বিষয়গুলিও স্বল্পকালে পরিবর্তিত হয় না। ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, ব্যক্তি বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কিসের উপর জোর দেয়, উহার দ্বারাই তাহার বর্তমান ভোগের পরিমাণ নির্ভর করিবে। ভবিষ্যতের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিলে তাহার বর্তমান ভোগের পরিমাণ কম হইবে, ভবিষ্যতের উপর কম গুরুত্ব প্রদান করিলে তাহার বর্তমান ভোগের পরিমাণ অধিক হইবে। কেইনস কিন্তু এই ভবিষ্যত ও বর্তমান সম্বন্ধে ব্যক্তির আগ্রহের তীব্রতা ছাড়াও, আরও বহু কারণ দেখাইয়াছেন। দম্ভ, অহংবোধ, কার্পণ্য, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ, অচিন্ত্যপূর্ব বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইবার ইচ্ছা, ইত্যাদি বহু কারণের দ্বারা ব্যক্তির বর্তমানের ভোগের পরিমাণ স্থির হয়। যে কারণের দ্বারাই ভোগের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হউক না কেন, খুব তাড়াতাড়ি এই সকল বিষয় বদলায় না। সুতরাং ভোগের পরিমাণ সমাজে মোটামুটি স্থির থাকে। একমাত্র আয় পরিবর্তিত হইলেই ভোগের পরিমাণে পরিবর্তন আসে।

† যদি প-কে অতি অল্প পরিবর্তনের প্রতীক ধরা যায়, তাহা হইলে বলা চলে যে, $\frac{প_ভ}{প_আ}$, অর্থাৎ আয়ের অতি অল্প পরিবর্তন ভোগেও পরিবর্তন আনিবে। কিন্তু ভোগে পরিবর্ত্তনের হার তুলনায় কম হইবে, সুতরাং $\frac{প_ভ}{প_আ}$ ধনাত্মক হইলেও উহা ১ হইতে কম। (আয়ের ও ভোগের বৃদ্ধির পরিমাণ সমান হইলে উহা ১ হইত, আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় ভোগের বৃদ্ধি অধিক হইলে উহা ১ হইতে বেশী হইত, আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় ভোগের বৃদ্ধি কম বলিয়া উহা ১ হইতে কম। অঙ্কের ভাষায় বলা যায় $১ > \frac{প_ভ}{প_আ} > 0$।

আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধির এই অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা (Marginal Propensity to Consume) বলে। রেখা চিত্রের সাহায্যে ইহা দেখান হইতেছে।

কখ রেখা আয়ের পরিমাণ এবং কগ রেখা ভোগের পরিমাণ দেখাইতেছে, ৭০৲ আয় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ আয় ভোগে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু তাহার পর আয়

ছিল,
হই



যত বৃদ্ধি পাইতেছে ভোগ তত বাড়িতেছে না। কপ রেখা ৪৫° কোণে অবস্থিত থাকায় ইহার প্রতি বিন্দুতে আয় ও ভোগ সমান। দেখা যাইতেছে যে, আয় ১০০৲ হইলে ভোগ ৯০৲ হইতেছে এবং ক্রমেই ভোগ প্রবণতা কমিতেছে।

ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে ভোগ-প্রবণতা তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে ধনী ও গরীবদের ভোগের ধরণে (Consumption pattern) প্রভূত পার্থক্য থাকে, তাহা আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি। ধনিকেরা তাহাদের আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয় করে, ইহার বাস্তব তাৎপর্য্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ধনবিজ্ঞানে এই তত্ত্বের গুরুত্ব

ধনিকেরা সেই সঞ্চয়ের দ্বারা পুনরায় অধিক আয় করিতে পারে এবং সেই বর্দ্ধিত আয়ের আরও কম অংশ ভোগে ব্যয় হওয়ায় তাহাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ আরও বেশী বৃদ্ধি পায়, সমাজের আয় বৈষম্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশে ভোগের পরিমাণ কমাইতে হইলে (যেমন যুদ্ধের সময়ে, বা দেশে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে

অথবা মুদ্রাস্ফীতির সময়ে) গরীবদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য্য করা উচিত। দেশে ভোগের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে ধনিকদের উপর অধিক হারে কর ধার্য্য করিয়া গরীবদের মধ্যে বণ্টন করি'া দেওয়া উচিত। এই সকল বিষয় আমরা ভোগ-প্রবণতা তত্ত্ব হইতেই জানিতে পারি।

অনুশীলনী

1. Do you consider the production of luxuries as economically wasteful and should be stopped ?

2. What is utility ? Distinguish between Total and Marginal utility. (B.com. '37)

3. State snd explain the Law of Demand.

4. Analyse the factors upon which changes in demand depends.

5. Illustrate the Law of Demand by a suitable schedule of Demand and Prices. Show how you can actually find out elasticity from this schedule. (B. A. '53)

6. Show that,

(*a*) The law of demand states a qualitative relation between the prices prevailing in a market and the amount demanded at each price ; and

(*b*) The elasticity of demand expresses a quantitative relation between the change in price and the corresponding change in the amount of demand. (B. A. '52)

7. What is Elasticity of Demand and how it can be measured ?

8. Discuss the law of substitution and show what are its various applications ?

9. How should a man spend his income over different items of his various needs, present as well as prospective ? (B. A. '50)

10. Show how consumers' surplus is related to individual demand price and market price and how it varies with variations of either. (B. A. '41, '48, '51)

Has it any theoretical or practical value ?

11. Write a note on indifference-curve analysis.

12. Discuss how consumption changes with change in income.

নবম পরিচ্ছেদ

যোগান ও উৎপাদন-ব্যয়

যোগান (Supply) :

একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট দামে কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে তাহাকে উহার যোগান বলা হয়।

যোগান কাহাকে বলে

অনেকে দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য করেন না, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। (ক) যাহা উৎপাদন হইল তাহার কিছু অংশ ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতারা মজুত করিয়া রাখিয়া দিতে পারে, সেক্ষেত্রে উৎপাদনের তুলনায় যোগান কম হইবে; অথবা তাহারা পূর্বের মজুত হইতে বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য একই সঙ্গে বাজারে ছাড়িয়া দিতে পারে, সেক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগান বেশী হইবে। (খ) তাহা ছাড়া, উৎপাদন হইলে তাহা বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিবেই তাহা নহে, কারণ উৎপাদক নিজের ভোগের জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু পরিমাণ রাখিয়া দিতে পারে। (গ) অনেক দ্রব্য আছে যাহা উৎপন্ন হইয়া বাজারে যোগান হইবার পূর্বেই কিছু পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়, যেমন শাকসব্জী, দুধ, মাছ ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে, উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগানের পরিমাণ কম।

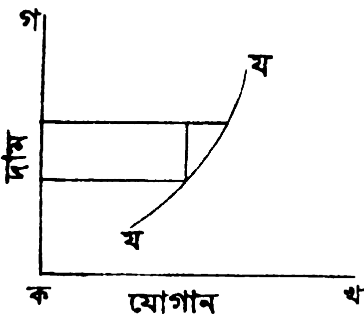
যোগানের নিয়ম (Law of Supply) :

দাম বৃদ্ধি পাইলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম কম হইলে যোগান কমিয়া যাইবে; দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের এইরূপ পরিবর্তনকে যোগানের নিয়ম বলা হয়।

এই যোগানের নিয়ম কার্য্যকরী হয় দুইটি কারণে : (ক) উৎপাদনের ব্যয় ও (খ) ফার্মের সংখ্যার পরিবর্তনের ফলে। (ক) দাম বাড়িলে বর্তমান

ফার্মগুলির ইউনিট-প্রতি বেশী মুনাফা হইতে থাকে, তাহারা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। যদি তাহারা ধরিয়া লয় যে দামের বৃদ্ধি অল্প দিন স্থায়ী হইবে, তবে স্থির মূলধনের পরিমাণ না বাড়াইয়া তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে; যদি দামের বৃদ্ধি অনেক দিন ধরিয়া চলে তবে তাহারা সকল উপাদান বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের-মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া, উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইউনিট-প্রতি ব্যয় দামের সমান না হয়, ততক্ষণ তাহারা উৎপাদনের পরিমাণ ও যোগান বাড়াইয়া চলে। (খ) দাম বাড়িলে সেই শিল্পে নূতন ফার্মের সংখ্যা বাড়িয়া যায়, দ্রব্যটির যোগান বৃদ্ধি পায়। মুনাফা বেশী থাকায় অন্য শিল্প হইতে চলিয়া আসিয়া ফার্মগুলি এই শিল্পে উৎপাদন সুরু করে। দাম কমিলে বহু ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে, যোগানের পরিমাণও কমিয়া যায়। যোগানের এই নিয়মকে নিম্নে অঙ্কিত রেখা চিত্রে প্রকাশ করা চলে:

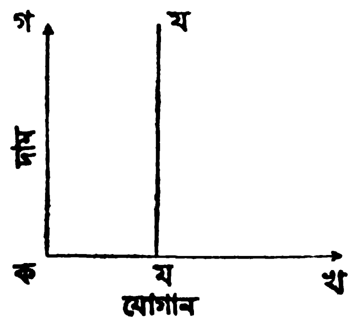
যোগানের নিয়ম কেন ঘটে



কগ রেখা দামের এবং কখ রেখা যোগানের পরিমাণ নির্দেশক; যয হইল যোগান রেখা। দাম বাড়িলে যোগান বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দাম কমিলে দেখা যায় যে, যোগান-ও কমিতেছে।

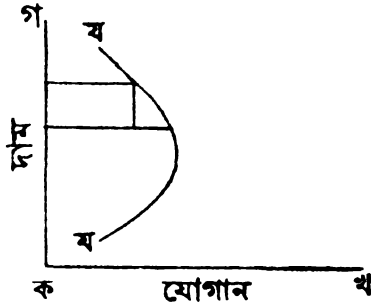
তবে অনেক ক্ষেত্রে এই যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

(ক) যে সকল দ্রব্যের যোগান একেবারেই সীমাবদ্ধ (যেমন রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি), তাহাদের ক্ষেত্রে, দাম বাড়িলে বা কমিলে যোগানের পরিবর্তন হইবে না। নীচের ছবিতে দেখা যাইতেছে যে যোগানের রেখা লম্বমুখী অক্ষের (vertical axis) সমান্তরাল, যোগানের নিয়ম কার্য্যকরী হইতেছে না। দাম কমিলে বা বাড়িলে যোগান সমানই থাকিতেছে।



(খ) অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বাড়িলে যোগান কমিয়া যায় এবং

দাম কমিলে যোগান বাড়ে। যেমন মজুরী বাড়িলে শ্রমিকেরা কম কাজ করিয়া বেশীক্ষণ বিশ্রাম উপভোগ করিতে চাহে, শ্রমের যোগান কমে। মজুরী কমিলে বেশী শ্রম করিয়া পূর্বের ন্যায় মোট মজুরী পাইবার চেষ্টা করে, শ্রমের যোগান বাড়িয়া যায়। মূলধনের ক্ষেত্রেও, সুদের হার বাড়িলে কম সঞ্চয় করিয়া মোট সুদ বেশী পাওয়ায় মূলধনের যোগান কমিয়া যায়; সুদের হার কমিলে মোট সুদের একই পরিমাণ পাইতে হইলে বেশী মূলধন খাটাইবার প্রয়োজন হয়, উহার যোগান বাড়িয়া যায়। মজুরী কমিলে পরিবারের অন্যান্য লোকের চাকুরী করার প্রয়োজন হওয়ায় তাহারাও শ্রম



করিতে আইসে, ফলে শ্রমের যোগান বাড়ে, মজুরী বাড়িলে তাহারা চাকুরী ছাড়িয়া দেয়, শ্রমের যোগান কমে; এইরূপ ঘটিতে পারে। উপরের ছবিতে দেখা যাইতেছে, কিভাবে দাম বাড়িলেও যোগান কমিতেছে, এবং দাম কমিলেও যোগান বাড়িতেছে। যোগানের নিয়ম এ ক্ষেত্রে কার্যকরী হইতেছে না।

যোগানের সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতা (Elasticity of Supply):

দামের পরিবর্তনের হার ও উহার ফলে যোগানের পরিবর্তনের হার—ইহাদের অনুপাতকে যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা বলে। যদি দাম-পরিবর্তনের ফলে যোগানের একই হারে পরিবর্তন হয়, তাহাকে সমহার-সঙ্কোচ প্রসার যোগান বলে; যদি দামের পরিবর্তনের ফলে তাহা অপেক্ষা যোগানে পরিবর্তনের হার কম হয়, তাহা হইলে তাহাকে সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন যোগান বলে।

যোগানের উপর দাম-প্রভাব

যোগানের সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতা বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। (ক) যে উৎপাদন-পদ্ধতি খুবই নমনীয় ধরণের, অর্থাৎ দাম পরিবর্তনের ফলে নূতন

অবস্থার সহিত বিনা কষ্টে অথবা খুবই কম ব্যয়ে খাপ খাওয়ান সম্ভব, সেক্ষেত্রে যোগান সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষম হইবে। বাজারে অধিক উপাদান পাওয়া সম্ভব হইলে, উৎপাদন-পদ্ধতি শীঘ্র পরিবর্তন করার যোগ্য হইলে, নূতন যন্ত্র স্থাপন এবং তাহা হইতে উৎপাদন সুরু করিতে কম সময় প্রয়োজন হইলে—দাম বাড়িবার ফলে যোগান অধিক হারে বাড়িতে পারে এবং দাম কমিলে যোগান অধিক হারে কমিতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদা সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষম হইবে।

যোগানের সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা নিরূপণকারী বিষয়সমূহ

(খ) দ্রব্যটি অস্থায়ী ধরণের হইলে (যেমন দুধ, মাছ ইত্যাদি) দাম কমিলেও যোগান বেশী কমিবে না, কারণ তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে, বাজার হইতে সরাইয়া গুদামে ফেলিয়া রাখা চলে না। এক্ষেত্রে যোগান সঙ্কোচপ্রসারবিহীন হইবার সম্ভাবনা। (গ) বিক্রেতা যদি অনেক বাজারে বিক্রয় করে, তাহা হইলে কোন বাজারে দাম কমিলে সে স্থান হইতে যোগান বেশী পরিমাণে কমাইয়া অন্য বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে। যদি দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলে অন্য বাজার হইতে মাল সরাইয়া সেই বাজারে যোগান বাড়াইয়া দিবে। এই রকম অবস্থায় যোগান সঙ্কোচপ্রসার-ক্ষম হইবে। (ঘ) যদি ফার্মটি বহু প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং একটি হইতে অপরটিতে অতি সহজে অপসারণ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও যোগান সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষম হইবে। (ঙ) দাম বাড়িলে যদি উৎপাদন বাড়ান হয়, তাহা হইলে ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় সাধারণতঃ বাড়িয়া যায়। কিন্তু দামের বৃদ্ধি কম হইলে (ধরা যাউক ॥০) উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রে বাড়াইয়া লাভ নাই, ইউনিট-প্রতি ব্যয় অধিক পরিমাণে (যেমন ৸০) বাড়িতে পারে। এরূপ অবস্থায় দাম বাড়িলেও যোগান বাড়িবে না, যোগান সঙ্কোচ-প্রসার বিহীন হইবে। (চ) যতক্ষণ পর্য্যন্ত যন্ত্রপাতির ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় উৎপাদন না পৌঁছায় ততক্ষণ যোগান সঙ্কোচপ্রসার-ক্ষম হইবে (দাম বাড়িলে যন্ত্রের ক্ষমতার সীমা পর্যন্ত সহজে উৎপাদন বাড়ান সম্ভবপর); উহার পরে যোগান সঙ্কোচপ্রসার-বিহীন হইতে পারে। (ছ) ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম চালু থাকিলে দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বাড়ান হইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া যায়, সুতরাং বিক্রেতারা যোগান খুবই বাড়াইতে থাকে। এক্ষেত্রে যোগান সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষম। কিন্তু দাম কমিলে যোগান কমান যায় না, কারণ তাহাতে ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া যায়, এক্ষেত্রে যোগান সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন।

আসল ব্যয় ও সুযোগ-ব্যয়ের তত্ত্ব (Theory of Real Cost and Opportunity Cost) :

ক্লাসিকাল ও নয়া-ক্লাসিকাল লেখকগণ উৎপাদন-ব্যয়কে দুইটি অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, আর্থিক-ব্যয় এবং আসল-ব্যয়। তাহারা দ্রব্যটি উৎপাদনে যে সকল মানবিক শ্রম ও শক্তির ক্ষয় হইয়াছে তাহাকেই আসল-ব্যয় বলিতেন। তাহাদের নিকট অর্থ ছিল শুধু পর্দা মাত্র—পর্দার অন্তরালে সমাজের প্রকৃত শক্তি সমূহের গতিবিধি চলে, ইহাই তাঁহারা মনে করিতেন। কত অর্থ ব্যয় হইল, তাহা ব্যবসার হিসাবের জন্য প্রয়োজন হইলেও, সমাজের দিক হইতে সম্পদ ও উপকরণের ক্ষয়ক্ষতি-ই প্রকৃত বিবেচ্য বিষয় ইহাই তাঁহাদের অভিমত। সম্পদ উৎপাদনকারী মৌলিক শক্তিগুলির কি পরিমাণ ক্ষয় হইল ; শ্রমিকদের পরিশ্রমের কষ্ট এবং মূলধন-সঞ্চয়ীদের ভোগ হইতে বিরত থাকার মানসিক বেদনা, এই সকলই দ্রব্যোৎপাদনের আসল-ব্যয়।

ক্লাসিকাল আসল ব্যয়ের তত্ত্ব

কিন্তু ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের আসল-ব্যয়েব এই ধারণা বাস্তবক্ষেত্রে সঠিকভাবে পরিমাপ-যোগ্য নহে। এন্‌জিনিয়ারের পরিশ্রমের কষ্ট আর মজুরের পরিশ্রমের দুঃখ ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিরাট ধনীর ভোগ হইতে বিরত থাকায় এবং অল্পবিত্তদের ভোগ না করিয়া সঞ্চয় করার বেদনাকে একই স্তরে ফেলা চলে না। ১০০৲ সঞ্চয় হইতে উভয়ে যদি বার্ষিক ৫৲ সুদ পায় তাহা হইলে দুইজনের মানসিক বেদনা একই পরিমাণ, ইহা ধরিয়া লওয়ার কোন যুক্তি নাই। তাহা ছাড়া ১০০৲ সঞ্চয়ের দরুণ ত্যাগ এবং ৫৲ মজুরীর জন্য পরিশ্রম, ইহাদের সমান বেদনাদায়ক বলা চলে না। কাজ যদি কম পরিশ্রম সাধ্য হয়, মজুরী তাহার ফলে কমিয়া যায় না। এই সকল বিভিন্ন প্রকার ত্যাগ ও পরিশ্রমকে পরিমাপ করার উপযোগী কোন সাধারণ মানদণ্ড থাকিতে পারে না, সুতরাং বাস্তবে মোট আসল ব্যয়ের হিসাব করা সম্ভব হয় না। এইরূপ মানসিক অনুভূতির ব্যাখ্যার দ্বারা কিছুতেই বোঝা যায় না যে, উৎপাদন-ব্যয় কিরূপে যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাজারে দাম স্থির করে।

আসল-ব্যয় তত্ত্বের সমালোচনা

আসল-ব্যয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার ধনবিজ্ঞানীগণ সুযোগ-ব্যয়ের

(Opportunity Cost) তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। যেহেতু মানুষের হাতে উৎপাদনের উপকরণ সীমাবদ্ধ ; সকল কিছু সে একই সঙ্গে উৎপাদন করিতে পারে না ; সেই জন্য কোন দ্রব্য উৎপাদনে উপকরণ নিযুক্ত হইলে অন্য অনেক দ্রব্যের উৎপাদন স্থগিত রাখিতে হয়। কোন দ্রব্য উৎপাদনের দরুণ যে সকল অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারিল না, সমাজ সেই সকল দ্রব্যের ভোগ ও ব্যবহাব হইতে বঞ্চিত হইল, সমাজের দিক হইতে তাহাই দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয়। জমিতে যদি ধান চাষ করা হয়, তাহা হইলে ওই জমিতে যে পাট বা গম বা অন্য কিছু উৎপন্ন হইতে পারিত, তাহা হইল না, উহারাই ধান্যোৎপাদনেব সুযোগ-ব্যয়। অ্যাডাম স্মিথ বলিযাছিলেন যে, এক শিকারী যদি একদিন সময়ের মধ্যে একটি হরিণ বা অথবা একটি বীবর শিকার করিতে পাবে, তাহা হইলে একটি হরিণের ব্যয় হইল একটি বীবর এবং একটি বীবরের ব্যয় হইল একটি হরিণ।

সুযোগ ব্যয় কাহাকে বলে

কোন দ্রব্যোৎপাদনের আর্থিক ব্যযেব হিসাব করিতে হইলে তাহাতে নিযুক্ত সকল উপাদানের আয় যোগ করিলে মোট ব্যয় পাওযা যায়। যে কোন উপাদানকে কোন উৎপাদনক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিযা অন্য ব্যবহারে নিয়োগ করিতে হইলে পূর্বের ব্যবহার হইতে একটু বেশী, অন্ততঃ পক্ষে সমান পরিমাণ অর্থ দিতে হইবে। ইহাকে কর্মান্তর-দাম বা বদ্‌লিব্যবহারজনিত দাম (Transfer-Price) বলা চলে। সম্ভাব্য অন্যান্য কাজ-কর্মে কোন শ্রমিক যাহা পাইতে পারিত, অন্ততঃ সেই মজুরীই হইবে তাহার বর্তমান কাজের দাম, অন্যান্য স্থানে যে সুদ পাইতে পারিত মূলধনের মালিক বর্তমান ক্ষেত্রে অন্ততঃ সেই সুদ-ই পাইবে। কোন ফার্মের উদ্যোক্তার মুনাফা অন্ততঃ সেই পরিমাণ হইবে যাহা অন্য ফার্মে গিয়া বেতনভুক্ পরিচালক হইয়া সে পাইতে পারিত। সুতরাং কোন দ্রব্যের ব্যয় অন্যান্য পরিবর্ত ব্যবহারে উপকরণগুলির সম্ভাব্য দামেব যোগফল।

কর্মান্তর-দাম বা বদ্‌লি ব্যবহার-জনিত দাম

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে কোন উপাদান যদি একটি মাত্র দ্রব্যের উৎপাদন কার্যেই ব্যবহার করা চলে, অপর কোন কার্যে উহার ব্যবহার সম্ভব না হয় অর্থাৎ যদি তাহা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট উপাদান (Specific Factor) হয় তাহা

হইলে তাহার সুযোগ-ব্যয় থাকিবে না। এই সকল উপাদানের ব্যবহারের জন্য যে দাম দিতে হয় ষ্টিগ্‌লার তাহাকে ব্যয়-হীন খরচা (Non-Cost outlays) বলিয়াছেন। এই সকল বিনির্দিষ্ট উপাদানের মালিকরা উপাদানের ব্যবহারের জন্য যাহা পাইয়া থাকেন তাহাকে তাই খাজনা বলা হয়। কেয়ার্ণক্রস্ বলিতেছেন যে, কোন উপাদানের আয়ের মধ্যে দুইটি ভাগ আছে—কর্মান্তর ব্যয় ও খাজনা। উপাদানটি যত অধিক পরিমাণে বিশেষ-নির্দিষ্ট হইবে ততই আয়ের মধ্যে খাজনার অংশ বেশী হইবে। যেহেতু উৎপাদন-সূত্র হইতে (পরিবর্তে অন্য উপাদান আনিয়া) তাহাকে বাদ দেওয়া চলে না, সেইজন্য তাহার মালিক সেই উপাদানের কর্মান্তর-ব্যয় না থাকিলেও অধিক দাম আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

ব্যয়-হীন খরচা

কেয়ার্ণক্রস্ মনে করেন যে, উপাদান সমূহের এক কাজ হইতে অন্য কাজে অথবা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যোগ দিবার সুবিধা বা চলনশীলতা (Mobility) যত বেশী থাকিবে, ততই তাহাদের কর্মান্তর ব্যয় কম হইবে। কারণ এক শিল্প হইতে সেই উপাদানকে অন্যত্র টানিয়া আনিতে খুব বেশী দাম দিতে হইবে না। চলনশীলতার বাধা যত বেশী, কর্মান্তর-দামও তত বেশী, পূর্বের আয় হইতে অনেক বেশী দাম দিতে রাজী না হইলে অন্যত্র বদ্‌লী হওয়ার অনিচ্ছা (disinclination) দূর হইবে না।

চলনশীলতা ও কর্মান্তর দাম

উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production):

উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ফার্মগুলি উপাদান বা উপকরণ ক্রয়ের জন্য যে সকল অর্থ খরচা করে (money outlay or expenses) তাহাদের যোগ করিলে মোট ব্যয় পাওয়া যায়। বাড়ী ঘরের, বা জমির জন্য খাজনা, শ্রমিকদের মাহিনা ইত্যাদি, কাঁচামালের দাম, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য অর্থ, ঋণ করিলে তাহার জন্য সুদ, বড় কর্মচারীদের বেতন, ব্যবসার অন্যান্য খরচা যেমন বিজ্ঞাপন ইত্যাদি, পরিচালনার জন্য স্বাভাবিক পাওনা (Normal earnings of management), রাষ্ট্রকে কর প্রদান ইত্যাদি মিলিয়া মোট ব্যয়ের হিসাব হয়। উদ্যোক্তা নিজে উৎপাদনে নিযুক্ত কোন উপাদানের মালিক হইলে এবং বাস্তবে

কি কি বিষয় লইয়া উৎপাদন ব্যয় গঠিত

সেই উপাদানের দাম দেওয়া না হইলেও উহার দাম হিসাব করিয়া মোট খরচার মধ্যে ধরিতে হয়। অন্যত্র যে দাম পাইতে পারিত, উদ্যোক্তার নিজস্ব উৎপাদনের উপর সেই দাম আরোপ করিয়া (Imputed Value) তাহাকে হিসাবের মধ্যে আনিতে হয়। সুতরাং বাস্তব-খরচা (actual expenses) এবং কার্যত খরচা (Virtual expenses) সব কিছু মিলিয়া মোট খরচা বা মোট ব্যয় পাওয়া যায়।

মনে রাখা দরকার যে, এই মোট ব্যয়ের মধ্যে পরিচালনার জন্য স্বাভাবিক পাওনা অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফাকে ধরা হয়।

উৎপন্ন দ্রব্য হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা রেভিনিউ যদি মোট ব্যয়ের সমান হয় তাহা হইলে বোঝা যাইবে যে, ফার্মটি ভারসাম্যের বিন্দুতে উৎপাদন ও বিক্রয় করিতেছে উহার উৎপাদন মাত্রা বাড়াইবার বা কমাইবার দিকে ঝোঁক থাকিবে না।

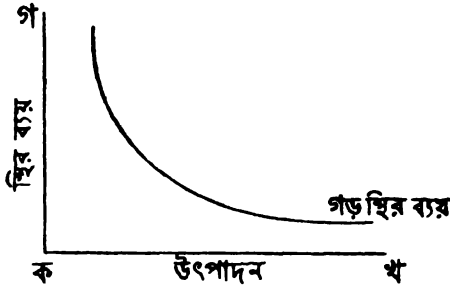
স্থির ব্যয় (Fixed or Supplementary Costs) ও পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable or Prime Costs):

যদি উৎপাদন স্থগিত থাকে তাহা হইলেও ফার্মটিকে যে সকল ব্যয় চালাইয়া যাইতে হয় (যেমন বাড়ীভাড়া ও রক্ষনাবেক্ষণের খরচা, বড় কর্মচারীদের বা দারোয়ানের মাহিনা, যন্ত্রপাতির ক্ষতিপূরণ ও ব্যয়, দীর্ঘকালীন ঋণের দরুণ সুদ) মোট ব্যয়ের সেই অংশকে স্থির ব্যয় বলে। উৎপাদনের পরিমাণ একটু বাড়াইলে বা কমাইলে যে সকল ব্যয়ে পরিবর্তন হয় (যেমন মজুরী, কাঁচামালের দরুণ খরচা, কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ বা শক্তির দরুণ খরচা), মোট ব্যয়ের সেই অংশকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে।

মনে রাখা দরকার যে ইহাদের মধ্যে সর্বদা-নির্দিষ্ট কোন পার্থক্য নাই। যদি চুক্তি করিয়া দীর্ঘকালের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মজুরী স্থির ব্যয়ে পরিণত হয়; যদি অত্যন্ত দীর্ঘকালীন হিসাব করা হয় তাহা হইলে প্রায় সকল ব্যয়ই (যন্ত্রপাতির দাম, উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মাহিনা ইত্যাদিও) পরিবর্তনীয় ব্যয়। দামের উপর স্থির ব্যয় বা পরিবর্তনীয় ব্যয় কে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা এই উৎপাদনের সময়-বিচার বা কাল-বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়।

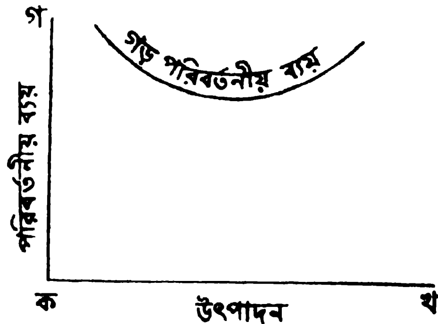
গড় স্থির ব্যয় এবং গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (Average Fixed Cost and Average Variable Cost) :

মোট স্থির ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে গড় স্থির ব্যয় পাওয়া যায়। উৎপাদন যত কম হইবে, গড স্থিরব্যয় তত বেশী। উৎপাদন যত বেশী হইবে, গড় স্থির ব্যয় তত কম, কারণ মোট স্থির ব্যয় অধিক সংখ্যক



ইউনিটের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক যে, মোট স্থির ব্যয ১০০৲। উৎপাদনেব পরিমাণ ৫ হইলে গড স্থির ব্যয় ২০৲, পরিমাণ বাড়িয়া ১০ হইলে গড় স্থির ব্যয় ১০৲; ২০ হইলে ৫৲; ৫০ হইলে ২৲; ২০০ হইলে ৷৷০ আনা।

মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে গড পবিবর্তনীয ব্যয পাওযা যায। উৎপাদন বাড়িতে থাকিলে এই গড



পরিবর্তনীয় ব্যয় প্রথমে কমে, কিন্তু তাহার পরে বাড়িতে থাকে। কারণ, কোন ফার্মের উৎপাদনের ক্ষমতার সীমা আছে, সেই সীমা পর্য্যন্ত ব্যয় সঙ্কোচ হয় এবং সেই সীমার পরে ব্যয়াধিক্য ঘটে; গড় পরিবর্তনীয়-ব্যয়ও বাড়িয়া যায়।

উপরের (১ম চিত্রে) গড় স্থির-ব্যয়ের রেখা এবং (২য় চিত্রে) গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের রেখা দেখা যাইতেছে। কখ রেখা উৎপাদনের পরিমাণের এবং কগ রেখা ব্যয়ের নির্দেশক। গড় স্থির-ব্যয় ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। গড় পরিবর্তনীয়-ব্যয় প্রথমে কমিয়া পরে পুনরায় বৃদ্ধি পাইতেছে।

গড় ব্যয় (Average Cost)

গড় স্থির-ব্যয় এবং গড়পরিবর্তনীয়-ব্যয় যোগ করিলে গড়-ব্যয় (Average cost) পাওয়া যায়; অথবা, মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দিয়া বিভক্ত করিলে তাহাকে ইউনিট পিছু ব্যয় বা গড় ব্যয় বলে।

উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে গড় স্থির-ব্যয় কমে এবং গড ব্যয়ও কমিতে থাকে। কিন্তু কিছুকাল পরে গড স্থির ব্যয় কমিলেও গড পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়িতে সুরু করে। প্রথমদিকে গডস্থির ব্যয় বেশী কমে, কিন্তু গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বেশী বাড়ে না, ফলে ইহাদের মিলিত ফলস্বরূপ গড ব্যয তখন কমিতে থাকে, অবশ্য পূর্বের ন্যায় দ্রুত হারে নহে। কিন্তু যখন গড পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বৃদ্ধি ক্রমেই গড় স্থির ব্যয়ের হ্রাস হইতে বেশী পরিমাণে হইতে থাকে, তখন গড় ব্যয় বাড়িতে সুরু করে।

প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost)

উৎপাদনের পরিমাণ এক ইউনিট বাড়াইলে মোট ব্যয় যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহাকে প্রান্তিকব্যয় (Marginal Cost) বলে। ইহা গড়ব্যয়ের কোন পরিবর্তন নহে, এক ইউনিট অধিক উৎপাদনের ফলে মোট ব্যয়ের বৃদ্ধিই হইল প্রান্তিক ব্যয়। কিন্তু এক ইউনিট উৎপাদন বাড়াইতে হইলে স্থির ব্যয় না বাড়াইলেও চলে; শুধু পরিবর্তনীয় ব্যয় (কাঁচামাল, শ্রম ইত্যাদি) বাড়াইযা এক ইউনিট অধিক উৎপাদন সম্ভব। সুতরাং এক ইউনিট বাড়াইতে হইলে পরিবর্তনীয় ব্যয় যতটুকু বাড়াইতে হয় তাহাকেই প্রান্তিক ব্যয বলা হয়।

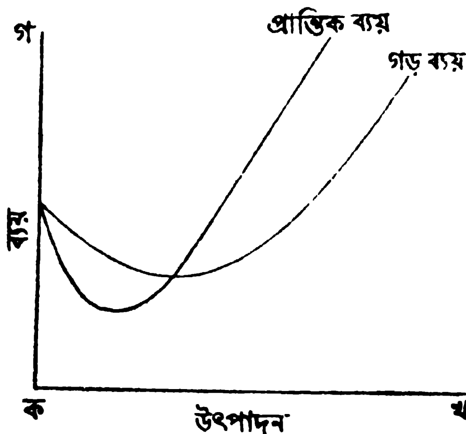
উৎপাদনের প্রথম দিকে শ্রমিকদের বা পরিচালকদের বা যন্ত্রের শক্তি অনেকাংশে অব্যবহৃত থাকিতে পারে, সুতরাং এক ইউনিট বেশী উৎপাদন করিতে নূতন পরিবর্তনীয় ব্যয় খুব কম হয়। কিন্তু ইহাদের শক্তির পূর্ণ ব্যবহারের পর এক ইউনিট উৎপাদন বাড়াইতে হইলে অধিক পরিবর্তনীয়

ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, ফলে প্রান্তিক ব্যয় সর্বদাই বাড়িতে থাকে (প্রথমে ধীর গতিতে, পরে দ্রুত গতিতে)।

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক (Relationship between Average Cost and Marginal Cost) ঃ

উৎপাদনবৃদ্ধি হইলে গডব্যয়ের মধ্যে গড়স্থির ব্যয় ক্রমাগত কমে। কিন্তু প্রথমে কমিলেও একটি স্তরের পর গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়িতে থাকে—ইহাদের মিলিত ফলে গড় ব্যয় প্রথমে কমে ও পরে বাড়ে। নীচে গড়ব্যয়ের রেখা প্রথমে নিম্নাভিমুখী তাহার পরে উর্দ্ধাভিমুখী। প্রতি ইউনিট উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে যখন পরিবর্তনীয় ব্যয় খুব বেশী প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় কম, তখন গড়ব্যয় কমে। কিন্তু তাহার পরে এক ইউনিট উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ক্রমেই অধিক পরিমাণে পরিবর্তনীয় ব্যয়ের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। পরিবর্তনীয় ব্যয়ের এই বৃদ্ধি মোট ব্যয়কে এরূপ পরিমাণে বাড়াইয়া দেয় যে, গড়ব্যয় বাড়িতে থাকে। যতই প্রান্তিক ব্যয় বাড়ে ততই গড় ব্যয়ও বাড়িয়া চলে।

সুতরাং বলা যায়, যখন প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের নীচে থাকে তখন উভয়েই



কমিতে থাকে, যখন প্রান্তিক ব্যয় উহার উর্দ্ধে থাকে তখন উভয়েই বাড়িতে থাকে। উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে, গড় ব্যয়ের সর্বাপেক্ষা নিম্ন-বিন্দুতে

উভয়ে মিলিত হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত উৎপাদন বাড়াইলে গড় ব্যয় কম, তাহার পর গড় ব্যয় বেশী। প্রান্তিক ব্যয় প্রথমে নিম্নে, কিন্তু মিলন বিন্দুর পরে উর্দ্ধে উঠিয়াছে। উভয় রেখাই একত্র সুরু হইয়াছে, কারণ খুব অল্পপরিমাণ উৎপাদনের গড ব্যয ও প্রান্তিক ব্যয় সমান থাকে।

স্বল্পকালীন ব্যয় (Short run Costs) :

উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের কিভাবে পরিবর্তন হয় তাহা বুঝিতে হইলে উৎপাদনের সময়-বিচার প্রয়োজন। অত্যল্পকাল (Extremely short-period) বলিতে ধনবিজ্ঞানে এমন সময় বোঝা যায়, যখন যোগান পরিবির্তনেব কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ব্যয় যাহা হইয়াছে, তাহাব পরিবর্তনের কথা উঠিতে পারে না। যখন ফার্মসমূহ মোটেই উৎপাদন বাড়াইবাব সময় পায় না, সেই সময়টুকুর নাম হইল অত্যল্পকাল। অত্যল্প কালের বিশ্লেষণে তাই উৎপাদন-ব্যয় পবিবর্তনের প্রশ্ন উঠে না এবং অত্যল্পকালীন দাম প্রধানতঃ চাহিদার উপর নির্ভরশীল।

অত্যল্প কাল : উৎপাদন ব্যয় স্থির থাকে

কিন্তু যখন স্বল্প-কালীন বিশ্লেষণ কবা হয়, তখন উৎপাদন-ব্যয়ে পবিবর্তন ঘটে। স্বল্পকাল বলিতে এমন সময় বুঝা হয় যখন ফার্মের স্থিব ব্যয়ে পরিবর্তন হয় না, কেবল পরিবর্তনীয় ব্যয বাডাইয়া উৎপাদন বাডাইবার চেষ্টা করা হয় বা কমাইয়া উৎপাদন কমাইবার চেষ্টা করা চলে। যন্ত্রের আকার, বাড়ী, ইত্যাদি নূতন কবিয়া বাড়াইবার সময় নাই ; শুধু কাঁচামাল শ্রমিক ইত্যাদি বাডাইয়া উৎপাদন বাডাইবার চেষ্টা করা সম্ভব। প্রত্যেক ফার্মই একটি বিশেষ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার উপযোগী ক্ষমতার কাঠামো বা বনিয়াদ লইয়া সুরু করে। কিন্তু প্রথমেই সে সকল যন্ত্রপাতি ইত্যাদির পূর্ণ ব্যবহার করে না, বাজারের অবস্থা অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায় বা কমায়। উৎপাদনের-মাত্রা স্থির রাখিয়া কোন পর্য্যন্ত উৎপাদন বাড়ান যায় এবং তাহার ফলে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ে কি ধরণের পরিবর্তন হয় তাহার বিশ্লেষণই হইল স্বল্পকালীন ব্যয়-বিশ্লেষণ।

স্বল্প কাল : স্থির ব্যয় স্থির থাকে

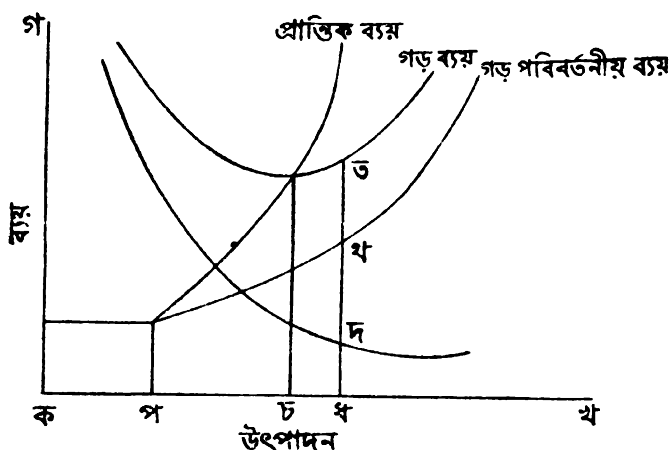
নীচের হিসাব হইতে স্বল্পকালীন উৎপাদন-ব্যয়ের বিভিন্ন বিভাগের গতি প্রকৃতি বুঝিতে [redacted]

(ভগ্নাংশ বাদ দিবার জন্য প্রায় কাছাকাছি পর্যন্ত হিসাব করা হইয়াছে)

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট স্থির ব্যয়	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়	গড় স্থির ব্যয়	গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়	গড় মোট ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়	গড় ও প্রান্তের সম্পর্ক
১	২০	১০	২০	১০	৩০	৩০	উভয়েই কমিতেছে ; প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের কম
২	২০	২০	১০	১০	২০	১০	
৩	২০	২৫	৬·৬	৮·৪	১৫	৫	
৪	২০	২৮	৫	৭	১২	৩	প্রান্তিক ব্যয় যখন গড় ব্যয় ছাড়াইয়া উপরে উঠিতেছে, তখন গড় ব্যয় সবচেয়ে কম
৫	২০	৩০	৪	৬	১০	২	
৬	২০	৫২	৩·৩	৮·৭	১২	২২	
৭	২০	৮৫	২·৮	১২·২	১৫	৩৩	উভয়েই বাড়িতেছে ; প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় হইতে বেশী
৮	২০	১৪০	২·৫	১৭·৫	২০	৫৫	
৯	২০	২৫০	২·২	২৭·৮	৩০	১১০	
১০	২০	৪৩০	২	৪৩	৪৫	১৮০	
একটি ইউনিট করিয়া বৃদ্ধি	স্বল্পকালীন হিসাব বলিয়া একই রহিয়াছে, দীর্ঘ-কালীন হিসাবে	৫ পর্যন্ত পরিবর্তনীয় ব্যয় অল্প বাড়াইলেচলিতেছে কিন্তু তাহার পর	প্রথমে (৫ পর্যন্ত) দ্রুত কমিতেছে তাহার পর ধীরে ধীরে কমিতেছে	প্রথমে (৫পর্যন্ত) কমিতেছে তাহার পর বাড়িতেছে এবং বৃদ্ধির হার	প্রথমে কমিতেছে (৫ পর্যন্ত), তাহার পর বাড়িতেছে, এবং বৃদ্ধির হার	প্রথমে কমিতেছে (৫ পর্যন্ত), তাহার পর বাড়িতেছে, এবং বৃদ্ধির হার	

এই সময়ে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ে কিরূপ পরিবর্তন হয় তাহা পূর্বের তালিকায় দেখান হইয়াছে। স্থির ব্যয় সমান থাকে (কারণ তাহা বদলাইবার সময় নাই ইহাই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে)। মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় অল্প বাড়াইলেই চলে, কিন্তু শ্রমিক বা যন্ত্র বা পরিচালকের শক্তির পূর্ণ ব্যবহার হওয়ায় পরে উৎপাদন বাড়াইতে হইলে তাহা অধিক পরিমাণে বাড়াইতে হয়। গড স্থির ব্যয় প্রথমে দ্রুত কমে, তাহার পর ধীরে ধীরে কমিযা আসে। গড পরিবর্তনীয় ব্যয় প্রথমে কমে, তাহার পর ক্রমেই দ্রুত বাড়িতে থাকে। ইহাদের মিলিত ফলে গড় ব্যয় প্রথমে কমে, তাহার পর বাড়ে, ক্রমশঃ দ্রুত বাড়িতে থাকে। প্রান্তিক ব্যয় প্রথমে কমে (তখন সে গড ব্যয়ের কম), তাহার পরে বাড়ে (তখন সে গড ব্যয়ের বেশী)। নিম্নের চিত্রে ইহাদের রেখা-রূপ দেখান হইতেছে।

কচ পর্য্যন্ত উৎপাদন করিলে গড ব্যয় কমে, উহাই গড ব্যযের সর্বনিম্ন বিন্দু। তাহার পরেও উৎপাদন বাডাইলে গড ব্যয বৃদ্ধি হয, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের



নিয়ম কার্য্যকরী হইতে সুরু করে (কারণ যন্ত্রপাতি ঘর বাড়ী ইত্যাদিকে স্থির উপাদান হিসাবে রাখা হইয়াছে)। গড়ব্যয়ের আকৃতি অনেকটা ইংরাজী U শব্দের মত বা 'পিরীচের' মত। যখন **কধ** উৎপাদন হইতেছে তখন গড় ব্যয়ের পরিমাপ হইল গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়+গড় স্থির ব্যয় ; অর্থাৎ **থধ**+**দধ**=**তধ**।

স্বল্পকালীন গড়ব্যয়ের রেখার রূপ বিভিন্ন শিল্পে এবং বিভিন্ন ফার্মে পৃথক হয়। যন্ত্রপাতির প্রকৃতি, উৎপাদনের মাত্রা, বিনির্দ্দিষ্ট উপাদান ব্যবহারের

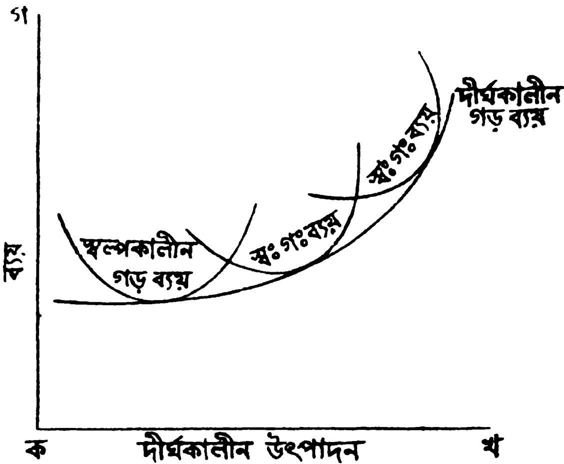
পরিমাণ, পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পরিমাণ ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। কখনও পিরীচের ন্যায়, কখনও U-র ন্যায়, কখনও বা ইহা V ন্যায় হইবে।

দীর্ঘকালীন ব্যয় (Long run Costs) ঃ

দীর্ঘকাল বলিতে ধনবিজ্ঞানে এমন সময় বোঝা হয় যাহার মধ্যে যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ী ইত্যাদি অর্থাৎ স্থিরব্যয়ে পরিবর্তন আনিয়া উৎপাদনের মাত্রা, বাড়ান বা কমান সম্ভব হয়। কি রূপে ফার্মসমূহ দীর্ঘকালীন অবস্থার সহিত উৎপাদনের সামঞ্জস্য সাধন করে ?

সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয়

যদি উৎপাদন বাড়াইতে হয়, তবে ফার্ম প্রথমে স্থিরব্যয় এবং উৎপাদনের মাত্রা না বাড়াইয়া স্বল্পকালীন উপায়ে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করে। ক্রমে গড়ব্যয়ের সর্বনিম্ন বিন্দু ছাড়াইয়া ব্যয় বাড়িয়া গেলে সে নূতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং নূতন মাত্রায় উৎপাদন সুরু করে। নূতন মাত্রায় গড় ব্যয়ের সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন পৌঁছিবার পরে তাহার গড় ব্যয় পুনরায় বাড়িতে থাকে ; সে আবার উৎপাদনের মাত্রা, যন্ত্রপাতির আকার ও পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। অর্থাৎ প্রতিটি উৎপাদন-মাত্রার সর্বনিম্ন ব্যয়ের বিন্দুগুলিকে যোগ করিলেই আমরা দেখিতে পাই, দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রূপ কি এবং কি ভাবে তাহা পরিবর্তিত হইতেছে। নিম্নে দেখা যাইতেছে,



U আকৃতির স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের নিম্নতম বিন্দুগুলি সংযুক্ত করিয়া দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখা পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক স্বল্পকালীন উৎপাদন-মাত্রা পার

হইয়া আসিয়া কার্মটিকে স্তরে স্তরে উৎপাদন বাড়াইতে হইয়াছে—ইহাদের মধ্য দিয়া তাহার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখা কিরূপে প্রবহমান তাহা আগের চিত্র হইতে বোঝা যায়।

U আকৃতির রেখা সমূহ স্বল্পকালীন গড ব্যয়ের রেখা—বিভিন্ন উৎপাদন মাত্রার বিভিন্ন গড় ব্যয়ের রেখার নিম্নতম বিন্দুসমূহ যুক্ত করিয়া দীর্ঘকালীন গড ব্যয়ের রেখা পাওয়া গিয়াছে। দীর্ঘকালীন রেখাটিকে স্বল্পকালীন রেখাগুলিব এনভেলাপ (বা খাম) বলে।

উৎপাদন-ব্যয়ে দীর্ঘকালীন পরিবর্তন : প্রতিদানের নিয়ম-সমূহ (Long run analysis of Cost-Changes : Laws of Returns) :

দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন-ব্যয়ে তিন প্রকাব পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে : (ক) (প্রান্তিক ও গড়) উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যাইতে পারে (খ) কমিযা যাইতে পাবে, অথবা (গ) স্থির থাকিতে পারে। (প্রান্তিক ও গড়) উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া গেলে ফার্মটিতে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে বলা চলে ; (প্রান্তিক ও গড) উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া গেলে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে বলা হয় ; উৎপাদন-ব্যয়ে কোনরূপ পরিবর্তন না হইলে সমহার-প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী হইতেছে বলা যায়।

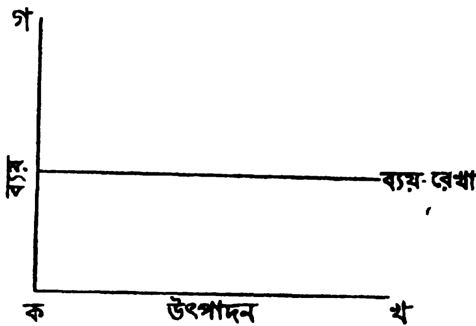
সমহার প্রতিদানের নিয়ম (Law of Constant Returns) :

একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে সকল উপাদানের প্রয়োগ বর্ধিত করা হইলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গড উৎপাদনব্যয় সমান থাকে, ইহাকে সমহার প্রতিদানের নিয়ম বলা হয়। উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির ফলে কোন দিকে ব্যয়সঙ্কোচ হয় ; অন্যদিকের ব্যয়বাহুল্য আবার সেই সুবিধা সমানভাবে কমাইয়া দেয়—এরূপ হইলে সমহার প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী হইতেছে বলা চলে। মার্শাল বলিয়াছেন যে, সকল ফার্মে কৃষি ও শিল্প উভয় প্রকার দ্রব্যই উৎপন্ন হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্য্যকরী হইতে পারে, কারণ শিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধিজনিত ব্যয়-সঙ্কোচ এবং কৃষিতে উৎপাদনবৃদ্ধিজনিত ব্যয়বাহুল্য উভয়ে মিলিয়া গড় ব্যয় সমান রাখিতে পারে।

কাহাকে বলে

এই নিয়ম কার্য্যকরী হইতে হইলে দুইটি অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে হয় : (ক) ফার্ম তাহার প্রয়োজন মত উপাদান পাইতে পারে এবং তাহার চাহিদা বাড়িলেও উপাদানের দামে পরিবর্তন হয় না (অর্থাৎ উপাদান বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা)। (খ) উপাদানসমূহ বহু পরিমাণে বিভাজ্য (Divisible)। সকল উপাদান ক্রমশঃ নির্দিষ্ট অনুপাতে বাড়াইতে হইলে উপাদানসমূহের মধ্যে অবিভাজ্যতা (Indivisibility) ধরিয়া লওয়া চলে না। এই দুইটি অবস্থা বাস্তবে থাকিলেই এই নিয়ম কার্য্যকরী

কি অবস্থায় উদ্ভব হয়



হইতে পারে। উৎপদেনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চালু থাকিলে দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের রেখা নিম্নরূপ হইবে।

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) :

যদিও দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে উৎপাদনে নিযুক্ত সকল উপাদানকেই পরিবর্ত্তনীয় (Variable) বলিয়া ধরা যাইতে পারে, তবুও বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন না কোন উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ, তাহার স্থলে অন্য উপাদানের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় বা একটি উপাদানের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সহিত অন্য উপাদান ক্রমাগত যুক্ত হইতে থাকিলে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়িতে থাকে, ফলে প্রান্তিক ও গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ইহাকে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম বা ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়ম বলা যায়।

কি অবস্থায় উদ্ভব হয়

ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Increasing Returns) :

উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যদি প্রান্তিক ও গড় ব্যয় ক্রমেই কমিয়া আসে তাহা

হইলে সে ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী আছে বলা হয়। নয়া-ক্লাসিকাল লেখকদের মতে শিল্প-জাতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রে এই নিয়মের কার্য্যকারিতা দেখা যায় এবং কৃষি-জাতীয় উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নীতি কার্য্যকরী হয়। আধুনিক ধন-বিজ্ঞানীগণ কৃষি ও শিল্প—এই দুই উৎপাদন ক্ষেত্রে দুইটি নিয়ম আছে, (Neo-classical dichotomy) তাহা মানেন না ; তাহাদের মতে ইহার একটি নিয়মের (পরিবর্ত্তনীয় অনুপাতের নিয়ম—চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) দুইটি অংশ মাত্র। যে মাত্রা পর্য্যন্ত কোন উপাদান দুষ্প্রাপ্য হইয়া না উঠে সেই মাত্রা পর্য্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইলে উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যাইতে পারে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী হয়। কিন্তু সেই সর্ব্বোন্নত স্তরের (Optimum) পর উৎপাদন আরও বাড়াইলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের প্রভাব সুরু হয়।

নয়া-ক্লাশিকাল দ্বৈত-স্থিতি

প্রধানতঃ, দুইটি কারণে, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় ঘটিতে পারে। উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইলে প্রভূত পরিমাণে ব্যয়-সঙ্কোচ হওয়া সম্ভব। যন্ত্র-জনিত, পরিচালন-জনিত, আর্থিক কারণে, ব্যবসা ও বানিজ্য সংক্রান্ত এবং ঝুঁকিবিভাগ-জনিত বিভিন্ন প্রকার আভ্যন্তরীন ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধার ফলে উৎপাদন ব্যয় কমিতে পারে। বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধাগুলি করায়ত্ত করিতে পারিলেও ইউনিট প্রতি ব্যয় কমিয়া যাইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উপাদান স্থির উপাদানে পরিণত না হয় এবং তাহার সহিত পরিবর্ত্তনীয় উপাদানের সম্মিলনে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা না হয় ততদিন পর্যন্ত সেই ফার্ম্ম ব্যয় সঙ্কোচের সুবিধা পাইবে, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের নিয়ম চালু থাকিবে।

কি কারণে এই নিয়ম কার্যকরী থাকে ১। মাত্রা বৃদ্ধি জনিত ব্যয় সঙ্কোচ ২। অবিভাজ্য উপাদানের নিয়োগের দরুণ ব্যয়সঙ্কোচ

দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে উপাদান-সূত্রের মধ্যে অবিভাজ্য উপাদানের (Indivisible factor) নিয়োগ করিতে হয়। অবিভাজ্য, বৃহদাকার, অনেক-শক্তিসম্পন্ন কোন উপাদান নিয়োগ করিলেই তৎক্ষনাৎ তাহার পূর্ণ ব্যবহার সুরু হইবে, তাহা নহে। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে একবার উহাকে নিয়োগ করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত উহার সাহায্যে উৎপাদন বাড়ান যায় ; এই অবিভাজ্য উপাদানের দাম ও চালাইবার খরচা অধিক পরিমাণ দ্রব্যের উপর বিভক্ত

হওয়ায় ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া আসে। মনে করা যাউক, ১০০৲ দিয়া একটি যন্ত্র স্থাপন করিয়া ৫টি দ্রব্য উৎপাদন হইতেছে, উৎপাদন বাড়াইতে হইলে (ধরা যাক, ১০০ পর্য্যন্ত) উহার আর নিয়োগের প্রয়োজন নাই। উৎপাদন যতই বৃদ্ধি পাইবে, ওই ১০০৲ বেশী দ্রব্যের উপর বিভক্ত হওয়ায় ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিবে।

কোন্ শিল্পে এই নিয়ম কখন কার্য্যকরী হইবে তাহা নির্ভর করে সেই শিল্প উৎপাদন পদ্ধতিতে কত পরিমাণ দুষ্প্রাপ্য উপাদান নিয়োগ করে, তাহার উপর। যত কম দুষ্প্রাপ্য উপাদান নিয়োগ করা হয় তত বেশী দিন এই ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী থাকিতে পারে। কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে জমি যেহেতু একেবারেই দুষ্প্রাপ্য (অর্থাৎ ইহার পরিমাণ প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ) সেই জন্য কৃষিতে শিল্পের তুলনায় বহু পূর্বেই এই নিয়মের প্রভাব স্থগিত হইয়া যায়, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম সুরু হয়। শিল্পে এক উপাদানের বদলে অন্য উপাদানের ব্যবহার (অর্থাৎ উপাদান-পরিবর্তিতা) কিছুটা চলিতে পারে, কিন্তু কৃষিতে জমি একটি বিনির্দিষ্ট উপাদান (Specific Factor); ইহাকে বাদ দিয়া কৃষি-উৎপাদনের সূত্র গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং ইহার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়মের প্রভাব শিল্পের তুলনায় অনেক পূর্বেই বন্ধ হইয়া যায়।

কোন্ ক্ষেত্রে কখন ও কেন এই নিয়মের প্রভাব সুরু হয়

অনুশীলনী

1. Explain the influences on the side of supply that determine Value and show that the term 'Cost of Production' bears more than one interpretation. (B. com '45)

2. Define overhead costs. Is it true that overhead costs are true costs only in the long period ? (B. com '53)

3. Examine the effect of increasing the volume of production on the cost of Production. (B. com '45, '49)

4. Explain the conditions which lead to the operation of the Law of Diminishing Returns. Is this law incompatible with economies of largescale production ? (B. com '51, '55).

5. Explain and illustrate what you mean by the law of diminishing and increasing returns. (B. A. '55)

দশম পরিচ্ছেদ

মূল্য-নিরূপণ

দাম-ব্যবস্থার তাৎপর্য্য (Siginificance of Pricing):

ধনবিজ্ঞানের প্রধান সমস্যা হইল দুষ্প্রাপ্য উপকরণের সাহায্যে মানুষের অভাব মেটান—এক কথায় বলিতে গেলে যোগানকে চাহিদা অনুযায়ী উহার সহিত মিলিত করা। দুষ্প্রাপ্য উপকরণকে বিভিন্ন ব্যবহারে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা এই বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় আলোচনা। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী যোগান পরিবর্তিত হইয়া উভয়ের সংযোগ সাধন ঘটে, তাহাকে দাম-ব্যবস্থা (Price-System) অথবা দাম-নিরূপণ (Price-determination) বলে, কারণ দামকে কেন্দ্র করিয়াই যোগান ও চাহিদা নিজেদের নির্দ্ধারণের চেষ্টা করে। দামের পরিবর্ত্তন হইলে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরিবর্তিত হইয়া নূতন অবস্থায় মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে। কোন দিকের আতিশয্য দাম-কে পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চাহে। ভোগকারী ও উৎপাদকগণ এই দাম-ব্যবস্থার মাধ্যমেই নিজস্বার্থে পরস্পরের সহিত মিলিত হন।

যোগান ও চাহিদার, উৎপাদন ও ভোগকার্য্যের সংযোগ সাধন।

কোনদ্রব্যের যোগান ও চাহিদাকে সমান অবস্থায় আনিবার এই কাজ করিতে গিয়া দাম অনেকখানি সামাজিক কার্য্য করিয়া ফেলে। একদিকে ইহা লোকের চাহিদা অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজন, পছন্দ, রুচি ইত্যাদি প্রকাশ করে; অপরদিকে দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা বা উৎপাদন করিতে কিরূপ ব্যয় হইল তাহাও জানাইয়া দেয়। দ্রব্যের উপযোগিতা ও তাহার জন্য কিরূপব্যয়—ইহা আমরা দাম-ব্যবস্থার মারফৎ জানিতে পারি। দ্রব্যের উপযোগিতা ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করাও দামের কার্য্য।

সমাজে প্রয়োজনের প্রকৃতি ও তাঁহা মিটাইবার ব্যয়ের স্বরূপ প্রকাশ করে

বাস্তবে এই সামঞ্জস্য নাও আসিতে পারে। দামের সাহায্যে সম্পূর্ণ ভাবে অভাবের প্রকৃতি ও তীব্রতা প্রকাশ না পাইতে পারে (দ্রব্যসামগ্রী সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবের জন্য), অথবা ব্যয় হইতে দাম অনেক পৃথক হইতে পারে (বাজারে একচেটিয়া ব্যবসা থাকার জন্য)। যে আদর্শ দাম নিখুঁতভাবে আমাদের অভাবের

বাস্তব জগতে কিন্তু সেই আদর্শ দাম না থাকিতেও পারে।

প্রকৃতি এবং তাহা মেটান-র জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বুঝাইয়া দেয়, বাজার-দাম তাহা হইতে পৃথক হইতে পারে।

আরও একটি দিক বিবেচনা করা যায়। নির্দিষ্ট পরিমান উৎপন্ন দ্রব্য কি ভাবে ভোগকারীদের মধ্যে বন্টিত হইবে, তাহা নির্ণয় করাও দাম-ব্যবস্থার কাজ। যাঁহারা দ্রব্যের জন্য অধিক দাম দিতে প্রস্তুত আছেন (ধরিয়া লওয়া হয় যে উহা হইতে তাহারা বেশী উপযোগিতা পাইতেছেন), তাঁহারা সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন, যাহারা সেই দাম দিতে পারেন না, তাহারা কম দামে অন্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া অবস্থা অনুযায়ী উপযোগিতা লাভের চেষ্টা করেন। উৎপাদনের উপাদানসমূহ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে, প্রতিযোগী বিভিন্ন শিল্পে তাহাদের নিয়োগ নির্ভর করে প্রত্যেকে কি দাম দিতে চাহিতেছে, তাহার উপর।

দাম ব্যবস্থাব মাধ্যমে দ্রব্য ও উপকরণের নিযোগবিন্যাস নির্ধারিত হয়

যে শিল্পের দ্রব্যের জন্য ভোগকারীরা বেশী দাম দিতে প্রস্তুত আছে, সেই শিল্পই উপাদানগুলি ক্রয়েব জন্য অধিক দাম দিতে রাজী হইবে, উপাদানসমূহও সেই শিল্পে নিযুক্ত হইবে। যে শিল্পেব দ্রব্যের জন্য ভোগকারীরা উপযুক্ত দাম দিতে প্রস্তুত নহে, তাহারা উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হইবে, কারণ উপাদানসমূহের জন্য তাহারা উপযুক্ত দাম দিতে পারিবে না। দাম ব্যবস্থার মাধ্যমেই দ্রব্য বা উপাদান ভোগকারীদের অভাব মিটাইবাব উদ্দেশ্যে ভোগকার্য্যে বা উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত থাকে।

কিন্তু তিনটি কারণে দাম ব্যবস্থার মারফৎ দ্রব্য ও উপকরণের নিখুঁত নিয়োগবিন্যাস না-ও ঘটিতে পারে। (ক) যাহারা অধিক দাম দিতে প্রস্তুত, তাহারাই দ্রব্যটি পায ; কিন্তু ধনী ও গরীব একই দাম দিলেও ইহাদের প্রাপ্ত উপযোগিতার তারতম্য থাকে। গরীব লোকের পক্ষে বেশী দাম দেওয়া প্রচুর ত্যাগের পরিচায়ক, ধনী লোকের পক্ষে একই অর্থব্যয়ে তুলনামূলক ভাবে ত্যাগ কম। সুতরাং সমান দাম দিলেও উপযোগিতার পার্থক্য হওয়া সম্ভব। (খ) ভোগকারীগণ না জানিয়া, অথবা ভুল জানিয়া এমন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে অথবা এমন দাম দিতে পারে, যাহা মোটেই দ্রব্যের মূল্যের সমান নয়। (গ) কোন দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে একচেটিয়ার প্রভাব থাকায় উৎপাদন সঙ্কুচিত থাকিতে পারে। দাম আদর্শাবস্থা হইতে বিচ্যুত হয়, দ্রব্যোৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম হইয়া পড়ে।

অপূর্ণ দাম-ব্যবস্থা

সীমাবদ্ধ উপকরণের নিয়োগে অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে, কোথাও প্রয়োজনের বেশী, কোথাও বা প্রয়োজনের কম উপকরণ নিয়োজিত হয়। উপকরণের নিয়োগ বিন্যাসের সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা (Optimum allocation of resources) বজায় থাকে না।

মূল্য ও দাম (Value and Price) ঃ

ধনবিজ্ঞানে মূল্য বলিতে সাধারণতঃ, বিভিন্ন দ্রব্যের পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের অনুপাতকে বুঝা যায়। যদি ১টি ঘোড়ার বিনিময়ে ৪টি গরু বা ৮টি ভেড়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঘোড়ার বিনিময়-মূল্য, হয় ৪টি গরু অথবা ৮টি ভেড়া বলিতে হইবে। অথবা বলা চলে যে, একটি গরুর বিনিময় মূল্য ১/৪টি ঘোড়ার সমান বা ২টি ভেড়ার সমান; ১টির ভেড়ার বিনিময় মূল্য ১/২টি গরু বা ১/৮টি ঘোড়ার সমান। বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাতকে বিনিময়-মূল্য (Exchange-value) বা মূল্য (Value) বলা হয়।

মূল্য হইল পারস্পরিক দ্রব্য বিনিময়ের অনুপাত

যখন সকল দ্রব্যের বিনিময় অর্থ নামে একটি দ্রব্যের সহিত হয় তখন প্রত্যেক দ্রব্যের বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে দ্রব্যটির দাম (Price) বলে। অর্থের হিসাবে রূপায়িত দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য হইল দাম। অর্থ-ভিত্তিক সমাজে (Money-economy) অর্থের হিসাবে সকল বিনিময় চলে। বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য পরিমাপের উদ্দেশ্যে অর্থ এই সমাজে মানদণ্ড (Standard of value) হিসাবে কাজ করে। সুতরাং এইরূপ সমাজে বিনিময়-মূল্য নির্দ্ধারণ আসলে অর্থের হিসাবে বিভিন্ন দ্রব্যের তুলনামূলক দাম নির্দ্ধারণ।

দাম হইল অর্থের মাধ্যমে বিনিময়-মূল্যের প্রকাশ

অর্থের দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য পরিমাপ করার প্রধান অসুবিধা হইল যে, ইহার নিজেরই মূল্যের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যদি ঘোড়ার, গরুর এবং ভেড়ার দাম একই সঙ্গে দ্বিগুন হইয়া যায়, তাহা হইলে অর্থের হিসাবে উহাদের দাম বাড়িয়াছে বলা হয়, কিন্তু পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত ঠিকই থাকে। অর্থাৎ দামের স্তরে পরিবর্ত্তন হইল, মূল্যের স্তর ঠিকই রহিল, কেবল অর্থের বিনিময় মূল্য কমিয়া গেল (কারণ অর্থের বিনিময়ে এখন কম দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে)। এই কারণে ক্লাসিকাল ও নয়া-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ দুইটিকে পৃথক

মূল্যতত্ত্ব ও দাম-তত্ত্ব পৃথক

ভাবে আলোচনা করিতেন : মূল্যতত্ত্ব (Theory of value) এবং অর্থ ও দামতত্ত্ব (Theory of Money & Prices)।

কিন্তু আজকাল ধনবিজ্ঞানীগণ এই দুই তত্ত্বকে পৃথক করেন না। অষ্ট্রীয়ান ও সুইডিশ মতবাদের প্রভাবে তাঁহারা বলেন, যে সমাজে অর্থের মাধ্যমেই দ্রব্য-বিনিময় হয়, সেখানে মূল্যকে সর্বদাই অর্থের সহিত দ্রব্য বিনিময়ের অনুপাত অর্থাৎ দাম হিসাবে ধরিতে হইবে। কেইন্‌স্‌ও বলিয়াছেন যে এইরূপ ক্লাশিকাল ধারণা (মূল্যতত্ত্ব এবং অর্থ ও দামতত্ত্ব) সম্পূর্ণ কৃত্রিম ; অর্থ কিভাবে মূল্যকে প্রভাবান্বিত করে, দ্রব্যসমূহের পারস্পরিক বিনিময় মূল্যের পরিবর্তন সাধন করে, তাহা জানিতে হইলে আজকাল অর্থকে বাদদিয়া মূল্যতত্ত্ব আলোচনায় লাভ নাই ; অর্থের ভিত্তিতে দাম-তত্ত্ব আলোচনাই বিধেয়।

ইহাদের পৃথক করা চলে না, কারণ অর্থের মূল্য-পরিবর্তন পারস্পরিক দ্রব্য বিনিময়ের অনুপাতকে বদলাইয়া দেয়

বাজার (Market) :

কোন ফার্মের পক্ষে উপাদান ক্রয়ের জন্য এবং উৎপন্নদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য উপাদানের মালিক ও ক্রেতা উভয় দলের সহিত সংযোগ সাধন করিতে হয়। আবার উপাদানের মালিক এবং ক্রেতা উভয় দলকেই বিক্রয় ও ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ফার্মগুলির সহিত দরকষাকষি বা লেনদেনের ব্যাপারে মিলিত হইতে হয়। ক্রয় বিক্রয়ের এই জটিল সম্পর্কজাল—ইহাকে ধনবিজ্ঞানে বাজার বলে। কোন দ্রব্যের বাজার নিয়মিত ও সংগঠিত কোন দ্রব্যের বাজার (যেমন পুরোনো বেহালার) অনিয়মিত ও অসংগঠিত।

ক্রয় ও বিক্রয়ের ঊর্ণনাভ

ব্যক্তি-উদ্যোগী অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগ-প্রধান (Private enterprise) সমাজে এই বাজারকে কেন্দ্র করিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে। বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন হয়, ব্যক্তির আয় এইরূপ বাজারে তাহার কার্যের বা অন্যান্য উপাদানের চাহিদার উপর নির্ভর করে। এক বিরাট অদৃশ্য শক্তি-রূপে এই বাজার সদাসর্বদা মানুষের জীবনকে, তাহার আয়, ব্যয় এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Markets) :

বাজারকে তিনটি বিষয় অনুযায়ী বিভক্ত করা যায়, (ক) স্থান, (খ) কাল, ও (গ) প্রতিযোগিতার রূপ।

স্থান অনুযায়ী, বিস্তৃতির দিক হইতে, দ্রব্যের বাজার, চারি প্রকার হইতে পারে ; স্থানীয়, আঞ্চলিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার।

কি কারণে কোন দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয়

বাজারের আয়তন কিরূপ হইবে তাহা প্রধানতঃ, সেই দ্রব্যটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ, সেই সকল দ্রব্যের বাজার খুবই বিস্তৃত হইবে (ক) যদি তাহার জন্য চাহিদা সর্বব্যাপী হয় (খ) যদি দূর হইতেই তাহাকে সহজ বেচাকেনা করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ নমুনা প্রেরণের বন্দোবস্ত এবং গুণঅনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে, (গ) যদি দ্রব্যটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং (ঘ) যদি আয়তনের তুলনায় অধিক মূল্যবান হয় (যেমন সোণা, রূপা ইত্যাদি)। বাজাবের আয়তন যত বড হইবে দামের হঠাৎ উঠানামার ঝুঁকি তত কম।

সময়ের দিক হইতে, বাজারকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, অত্যল্পকালীন, স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন। এই 'সময়' বলিতে ঘড়ির সময় বা ক্যালেণ্ডারের সময় বুঝিলে চলিবে না ; ইহা হইল ফার্মসমূহের কার্য্যোপযোগী সময় (Operational time)। যে সময়ের মধ্যে যোগান সম্পূর্ণ স্থির, উহাকে বাড়ান বা কমান সম্ভবপর নহে, তাহাকে অত্যল্পকালীন বাজার বলে ; যখন স্থিরব্যয় সমান রাখিয়া পরিবর্তনীয় ব্যয় কমাইয়া বা বাডাইয়া উৎপাদনের ও যোগানের পরিমাণ কমান ও বাডান সম্ভব তাহাকে স্বল্পকালীন বাজার বলে ; যখন উৎপাদন-মাত্রা বাডান বা কমান সম্ভব (স্থির ও পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়াইয়া বা কমাইয়া) তাহাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে।

ফার্মসমূহের কার্য্য-পরিধি পরিবর্তনের উপযোগী সময় অনুযায়ী বাজারের বিভাগ

কোন দ্রব্যের বাজার কিরূপ হইবে তাহা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। দাম কি পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং তাহা কতদিন পরিবর্তিত অবস্থায় থাকা সম্ভব, উপাদান সমূহ পাওয়া সম্ভব কি না, পরিচালকদের দ্রুত উৎপাদন কমান বা বাডানর উপযোগী যোগ্যতা আছে কি না, যন্ত্র-সম্পর্কীয় ব্যবস্থা কিরূপ, মাত্রা-জনিত ব্যয়সঙ্কোচ ও ব্যয়বাহুল্যের তুলনামূলক সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর বাজারের সময় নির্ধারিত হয়।

অত্যল্পকালীন বাজারে যে দাম থাকে তাহাকে বাজার-দর বা বাজার-দাম

(Market price) বলা হয় স্বল্পকালীন বাজারে যে দাম থাকে তাহাকে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (Short run Normal Price) বলে। দীর্ঘকালীন বাজারে যে দাম থাকে তাহাকে স্বাভাবিক দাম (Normal Price) বলা হয়।*

প্রতিযোগিতার রূপ ও বাজার ঃ

প্রতিযোগিতার তীব্রতা অনুযায়ী বাজারকে প্রধানতঃ তিন ধরণে বিভক্ত করা যায় ঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজার।

পূর্ণ বাজার ঃ

যে বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বহুসংখ্যক বিক্রেতা ফার্ম থাকে; নূতন ফার্ম যখন খুসী ক্রয়বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিতে পারে; সকল বিক্রেতা সম্পূর্ণ একই প্রকার দ্রব্য (Homogeneous product) বিক্রয় করে; এবং দ্রব্যটির জন্য বাজারে একটি দামই চালু থাকে, সেই বাজারকে পূর্ণবাজার বলা হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা বহু সংখ্যক থাকিলে কেহই ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণের বৃহৎ অংশ নিজের আয়ত্তে রাখিতে পারে না, ফলে তাহার একার কার্য্যের দরুণ দ্রব্যটির দাম প্রভাবান্বিত হয় না। বাজারে যে দাম চালু আছে ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে সেই দাম স্বীকার করিয়া ক্রয় বিক্রয়ের কাজ চালাইতে হয়। বিক্রেতা ওই দামেই অধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে, অধিক বিক্রয় করিতে হইলে তাহাকে দ্রব্যের দাম কমাইতে হয় না (দাম কমান তাহার একার পক্ষে সম্ভব-ও নয়)। নূতন ফার্মের ওই শিল্পে প্রবেশ করিবার পক্ষে কোন বাস্তব বা আইনগত বাধা নাই। প্রত্যেক বিক্রেতা সম্পূর্ণ সম প্রকার (Homogeneous) দ্রব্য বিক্রয় করে, ক্রেতাদের মনেও সকল দ্রব্যই সমজাতীয়। প্রত্যেক ক্রেতা জানে যে, সকল বিক্রেতা কি দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে এবং সকল বিক্রেতা জানে প্রত্যেক ক্রেতা কি দামে দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। অর্থাৎ কেহ বেশী দাম চাহিলে কোন ক্রেতাই তাহার নিকট যাইবে না, দাম একটু কমাইলে সকল ক্রেতাই তাহার নিকট যাইবে। দাম কমাইবার দরকার হয় না, কারণ বাজার

পূর্ণবাজার প্রতিষ্ঠা করার বিষয়সমূহ

* সময় অনুযায়ী তিন প্রকার দাম

দামেই সে যতখুসী বিক্রয় করিতে পারে। বলা হয় যে, বিক্রেতার দ্রব্যের জন্য চাহিদা সম্পূর্ণ সঙ্কোচপ্রসারক্ষম (perfectly elastic)।

অপূর্ণ বাজার :

(যখন কোন দ্রব্যের বাজারে ক্রেতা বা বিক্রেতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ, শিল্পে নূতন ফার্মের প্রবেশ-পথ বাধা-যুক্ত, প্রত্যেক বিক্রেতাই অন্যবিক্রেতার দ্রব্য হইতে একটু পৃথক দ্রব্য বিক্রয় করে এবং বাজারে ঐ দ্রব্যটির বিভিন্ন দাম চলিত থাকে, তখন তাহাকে অপূর্ণ বাজার (Imperfect Market) বলে)

কমসংখ্যক ক্রেতা বা বিক্রেতা থাকায় তাহারা প্রত্যেকেই বাজারের বৃহৎ অংশকে আয়ত্তে রাখে, ফলে তাহাদের কেহ ক্রয় বিক্রয় বাড়াইলে বা কমাইলে দামের উপর তাহার প্রভাব পড়ে। বেশী পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয় বা বেশী পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে দাম বাড়াইতে হয়। নূতন ফার্ম প্রবেশ করিবার পথ একেবারে উন্মুক্ত নহে, বিভিন্ন প্রকার বাধা থাকিতে পারে। বিক্রেতা সম্পূর্ণ একজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে না—ক্রেতাদের মনে 'ওই সকল দ্রব্য এক জাতীয় নহে', এরূপ ধারণা থাকে। বহু

কারণের ফলে অপূর্ণ বাজার সৃষ্টি হয়

কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে। (ক) যদি প্রত্যেকে নিজের দ্রব্যের ভিন্ন মার্কা ব্যবহার করে এবং একই দ্রব্যের বিভিন্ন দাম স্থির করিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা করে—ইহাকে দ্রব্য-পৃথকী করণ (Product-Differentiation) বলে। (খ) ক্রেতাদের পছন্দ যদি একই দ্রব্যের শুধুমাত্র রং বা আকৃতি অনুযায়ী পৃথক হয়। বিক্রেতা খাতির করে বা হাসিয়া কথা বলে, বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয় বা সুন্দর বাক্সে সুন্দর ফিতায় দ্রব্যটি বাঁধিয়া দেয়, ধার দেয় এবং সহসা ফেরৎ চাহে না, জন্মদিনে উপহার পাঠায়—এই বহু প্রকার কারণে ক্রেতা দাম বেশী হইলেও সেই বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে। ক্রেতা অন্য দ্রব্যের বা অন্য বিক্রেতার খবর রাখে না, অথবা একটু হাঁটিয়া গিয়া সস্তায় ক্রয় করিতে চাহে না, একই স্থান হইতে ক্রয় করাকে আভিজাত্য বলিয়া মনে করে, অথবা দোকানে বসিয়া দৈনিক পত্রিকা পড়ার সুযোগ পায়—এই সকল কারণে একই দ্রব্য বিভিন্ন দামে বিক্রয় হইতে পারে। এই রকম অবস্থায় বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতা-মূলক হইয়া পড়ে।

একচেটিয়া বাজার ঃ

(যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন বা বিক্রয় সম্পূর্ণ ভাবে একটি ফার্মের আয়ত্তে থাকে, তখন সেই দ্রব্যের বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলে) এই বাজারে নূতন ফার্মের প্রবেশের পথে বাধা থাকে। বিক্রেতা নিজেই দাম স্থির করিতে পারে। এবং নিজের নির্দিষ্ট দামে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিক্রয় করে। যদি সে বিক্রয় বাড়াইতে চাহে তবে ইউনিট-প্রতি দাম কমাইয়া বিক্রয় বাড়াইতে হয়।

পূর্ণ একচেটিয়া

বাস্তব জগতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই, পূর্ণ একচেটিয়া অধিকারও বিশেষ দেখা যায় না। প্রত্যেকটি শিল্পেই প্রায় কয়েকটি ফার্ম নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহাদের দ্রব্য সম্পূর্ণ একজাতীয় নহে, অথচ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী। ইহারা নিজেরা নিজেদের দ্রব্য অন্যের হইতে পৃথক, সর্বদা এইরূপ প্রচার করিয়া বাজারকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া নিজে কিছুটা একচেটিয়া সুবিধা লাভের চেষ্টা করে (যেমন ব্রুকবণ্ড, লিপটন, টস্ ইত্যাদি); উহাদের মধ্যে এইরূপ প্রতিযোগিতাকে একচেটিয়া-মূলক-প্রতিযোগিতা বলে (Monopolistic Competition)।

বাস্তব জগতে বাজারের চেহারা একচেটিয়া-মূলক প্রতিযোগিতা

রেভিনিউ (Revenue) ঃ

কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমানকে মোট আদায় বা মোট রেভিনিউ বলে। প্রতি ইউনিট দ্রব্যের দামকে দ্রব্য-বিক্রয়ের পরিমাণ দিয়া গুণ (multiplication) করিলে বিক্রেতা-ফার্মটির মোট রেভিনিউ জানা যায়। যেমন যদি ৮৲ প্রতি ইউনিটের দাম এবং ৫ ইউনিট বিক্রয় হয় তাহা হইলে ফার্মের মোট রেভিনিউ হইল ৪০ টাকা।

রেভিনিউ

মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণকে মোট বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে দ্রব্যপ্রতি রেভিনিউ বা গড় রেভিনিউ (Average Revenue) পাওয়া যায়। উপরোক্ত উদাহরণে ৪০৲ ÷ ৫ হইল গড় রেভিনিউ। সুতরাং বলা চলে যে, চাহিদা রেখার প্রতিটি বিন্দুই গড় রেভিনিউ নির্দ্দেশক।

গড় রেভিনিউ

একটি ইউনিট বেশী বিক্রয় করিয়া ফার্মের মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থ বা মোট রেভিনিউ যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহাকে প্রান্তিক রেভিনিউ (Marginal Revenue) বলে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার থাকিলে, অসংখ্য বিক্রেতা থাকার দরুণ কোন বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিমাণ কম বা বেশী হইলে তাহা দামকে প্রভাবান্বিত করে না, অর্থাৎ বাজারের চলিত দামেই বেশী পরিমাণ বিক্রয় করা চলে। এই রকম অবস্থায় চল্‌তি দামেই একইউনিট বেশী বিক্রয় করা সম্ভব। সুতরাং চল্‌তি দাম, প্রান্তিক রেভিনিউ ও গড় রেভিনিউ সমান। যেমন, ৬ ইউনিট বিক্রয় হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের বৃদ্ধির পরিমাণ হইল ৮৲, অর্থাৎ প্রান্তিক রেভিনিউ ৮৲, গড় রেভিনিউ ৮৲ (৪৮ ÷ ৬ = ৮৲), এবং বাজারদামও ৮৲। যদি দ্রব্যটির জন্য চাহিদা অসীম সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হয়,*(অর্থাৎ দাম মোটেই বাড়ান চলে না এবং অধিক বিক্রয়ের জন্য দাম কমাইবার প্রয়োজন নাই, চালু দামেই যে কোন পরিমাণ বিক্রয় সম্ভব) অর্থাৎ যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা চালু থাকে তাহা হইলে, প্রাঃ রেঃ = গঃ রেঃ = দাম।

প্রান্তিক রেভিনিউ ও দাম

বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না; অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া অবস্থাই মোটামুটি দেখা যায়। সুতরাং প্রত্যেক ফার্মই দ্রব্য-পৃথকীকরণ বা দ্রব্যের বাজারে এক একটি নিজস্ব ছোটখাট একচেটিয়া সৃষ্টি করিয়া ফেলিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় সে নির্দিষ্ট দামে চাহিদা অনুযায়ী বিক্রয় করিতেছে; বিক্রয় আরও বাড়াইতে হইলে দাম না কমাইলে চলিবে না। একটি ইউনিট বেশী বিক্রয় করিতে হইলে সকল ইউনিটেরই দাম কমাইতে হইবে। (কারণ চাহিদার নিয়ম হইতে জানা যায় যে কম দামেই বিক্রয় বাড়ে)। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক, ফার্মটি প্রতি ইউনিট ৮৲ দামে ৫ ইউনিট বিক্রয় করিতেছে, মোট রেভিনিউ ৪০৲। এই অবস্থায় ৬ ইউনিট বিক্রয় করিতে হইলে প্রতি ইউনিট দাম কমাইয়া ৭৷৷০ করিতে হইবে। দাম

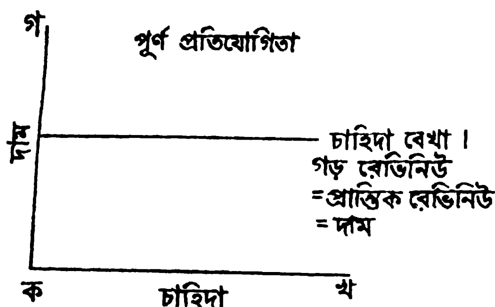
*পূর্ণ প্রতিযোগিতার কোন বিক্রেতা বিক্রয় করিতে গেলে দেখে যে তাহার নিকট চাহিদা অসীম সঙ্কোচ প্রসার ক্ষম, অর্থাৎ একটু দাম কমাইলে সে যতখুসী বিক্রয় করিতে পারিবে, দাম বাড়াইলে মোটেই বিক্রয় করিতে পারিবে না। কম দামে বাজারে ওই দ্রব্যের মোট চাহিদা বাড়ে বা বেশী দামে মোট চাহিদা কমে, ইহা ঠিকই; কিন্তু কোন ফার্ম বাজারের সমগ্র চাহিদা অপেক্ষা নিজদ্রব্যের জন্য পৃথক চাহিদার উপরই বেশী নজর রাখে এবং সেই অনুযায়ী উৎপাদন খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করে; ব্যক্তিগতভাবে বিক্রেতার দ্রব্যের জন্য পৃথক চাহিদার রূপ-ই ফার্মের গতিবিধি নির্ণয় করে।

শুধু ষষ্ঠ ইউনিটেরই কমিল না, পূর্ব্বের ৫ ইউনিটেরও কমিল। এক্ষেত্রে মোট রেভিনিউ হইল ৪৫৲, অর্থাৎ ৫৲ হইল প্রান্তিক রেভিনিউ। তাই দেখা যায় যে প্রান্তিক রেভিনিউ দাম হইতে কম। সুতরাং যে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই সেখানে প্রান্তিক রেভিনিউ দাম হইতে কম থাকিবে।

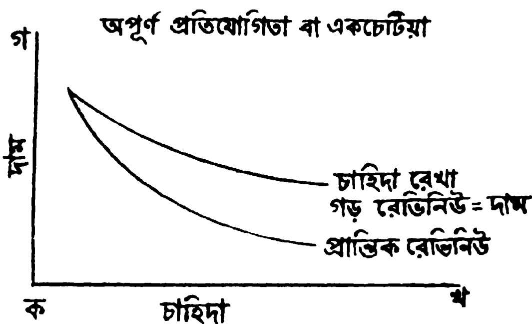
বিক্রয়ের পরিমাণ	মোট রেভিনিউ	গড় রেভিনিউ= (মোট রেভিনিউ ÷পরিমাণ)	প্রান্তিক রেভিনিউ= মোট রেভিনিউতে যোগ
১	১০	১০	১০
২	১৯	৯½	৯
৩	২৭	৯	৮
৪	৩৪	৮½	৭
৫	৪০	৮	৬
৬	৪৫	৭½	৫
৭	৪৯	৭	৪
৮	৫২	৬½	৩
৯	৫৪	৬	২
১০	৫৫	৫½	১

উপরের তালিকা হইতে মোট, গড় ও প্রান্তিক রেভিনিউর সম্পর্ক বুঝা যাইবে।

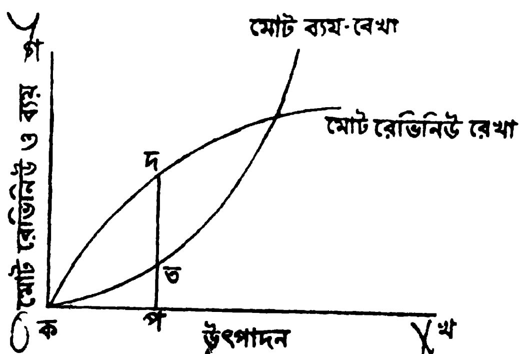
রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহাদের প্রকাশ করা যায় ;



ফার্মের মোট মুনাফা জানিতে হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ হইতে মোট ব্যয়কে বিয়োগ করিতে হয়, অর্থাৎ মোট মুনাফা = মোট



রেভিনিউ—মোট ব্যয়। নীচের ছবিতে দেখা যাইতেছে, ফার্মটির মুনাফা তখনই সবচেয়ে বেশী হইবে যখন মোট রেভিনিউ রেখা এবং মোট



ব্যয়রেখার দূরত্ব সবচেয়ে বেশী (অর্থাৎ উহাদের বিয়োগ ফল সর্বাপেক্ষা বেশী)।

ক প পরিমাণ উৎপন্ন হইলে মোট ব্যয় ত প কিন্তু মোট রেভিনিউ দ প ; সুতরাং ত দ মুনাফা। এই অবস্থায় পৌঁছিতে পারিলে ফার্ম্মটি ভারসাম্যের অবস্থায় আসিবে।

ফার্ম্মটির সর্বাধিক মুনাফা এবং ভারসাম্যের অবস্থা তখনই আসিতে পারে যে অবস্থায় প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয় সমান। উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে প্রান্তিক রেভিনিউ কমিবে এবং প্রান্তিক ব্যয় বাড়িবে। যে অবস্থায় তাহারা সমান সেই ভারসাম্যের বিন্দুতে ফার্ম্মটির মোট মুনাফার পরিমাণও সবচেয়ে বেশী।

ভারসাম্য (Equilibrium) ঃ

কোন বিষয়ের ভারসাম্য (Equilibrium) বলিলে বোঝা যায় যে, কোন পরিবর্তনের দিকে উহার ঝোঁক নাই, উহা সেই অবস্থায় স্থির থাকিতে চাহে। যদি বিষয়টির স্থিরতা না আসে, সর্বদাই অস্থিরতা থাকে, অন্য অবস্থায় যাইবার দিকে ঝোঁক থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ভারসাম্যবিহীনতা (Disequilibrium) বলা হয়। প্রত্যেক অর্থনৈতিক বিষয় (দাম, ফার্ম, শিল্প, ভোগকারী ইত্যাদি) কি অবস্থায় এইরূপ ভারসাম্যে পৌঁছাইতে পারে আধুনিক ধনবিজ্ঞানে সেই তত্ত্ব প্রধান আলোচ্য বিষয়। কি কি অবস্থা বর্তমান থাকিলে ভারসাম্যাবস্থা বজায় থাকিতে পারে, কি পদ্ধতিতে ভারসাম্যে পৌঁছে, এবং কি কারণে সেই অবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটে, সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে ইহাদের পর্য্যালোচনা আধুনিক ধনবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। যেমন, একটি নির্দ্দিষ্ট দামে কোন দ্রব্যের যোগান ও চাহিদা সমান হইলে, সেই শিল্পে ভারসাম্য আসিবে।

ভারসাম্যের অনুসন্ধান-ই আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী

ভারসাম্য আংশিক (Partial) বা সামগ্রিক (General) হইতে পারে। কেবলমাত্র একটি শিল্প, একটি ফার্ম, একটি দাম ইত্যাদির ভারসাম্য সম্বন্ধে পৃথক আলোচনাকে আংশিক ভারসাম্যের বিশ্লেষণ বলে। একটি দ্রব্যের দাম-নিরূপণ তত্ত্ব এই ধরণের আংশিক ভারসাম্যের বিশ্লেষণ ; অপর সকল দ্রব্যের দাম, চাহিদা, যোগান, ব্যয় ইত্যাদি স্থির আছে স্বীকার করিয়া মাত্র সেই দ্রব্যটির চাহিদা, যোগান, ব্যয় দাম ইত্যাদি পরিবর্তনীয় (Variable) বলিয়া লওয়া হয়। সামগ্রিক ভারসাম্যের বিশ্লেষণে সকল দাম, সকল দ্রব্যের পরিমাণ বা ব্যয় ইত্যাদি সব কিছুই

আংশিক ও সামগ্রিক

পরিবর্তনীয় ধরিয়া লইয়া, কিভাবে এবং কি অবস্থায় ভারসাম্যাবস্থা আসিতে পারে তাহার আলোচনা হয়।

যদি মাত্র একটি বিশেষ অবস্থাতে এবং নির্দিষ্ট বিন্দুতে ভারসাম্য আসা সম্ভব হয় তাহা হইলে তাহাকে অনন্য (Unique) ভারসাম্য বলে যদি বহু বিভিন্ন অবস্থাতে এবং বিভিন্ন বিন্দুতে ভারসাম্য বজায় থাকিতে পারে এরূপ হয়, তাহা হইলে তাহাকে বহুস্থ ভারসাম্য (Multiple) বলে।

অনন্য ও বিবিধ

ভারসাম্য আরও তিনপ্রকার হইতে পারে, স্থায়ী (Stable), অস্থায়ী (Unstable) ও নিরপেক্ষ (Neutral)। ভারসাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া যদি আবার পূর্বের অবস্থায় পুনরায় ভারসাম্য স্থাপিত হয়, তাহাকে স্থায়ী ভারসাম্য বলে। ভারসাম্য হইতে বিচ্যুত হইয়া যদি নতুন অবস্থায় নতুন বিন্দুতে ভারসাম্য স্থাপিত হয় তবে তাহাকে নিরপেক্ষ ভারসাম্য বলা হয়। কিন্তু যদি ভারসাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুতির ফলে কখনই আর ভারসাম্য স্থাপিত না হয়, তাহাকে অস্থায়ী ভারসাম্য বলে।

স্থায়ী, অস্থায়ী, ও নিরপেক্ষ

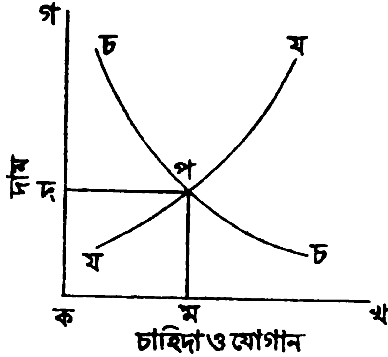
পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য (Equilibrium between Demand and Supply under Perfect Competition):

বিভিন্ন দামে দ্রব্যের চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণের তালিকাকে চাহিদা-তালিকা বলে; এবং বিভিন্ন দামে যোগানের বিভিন্ন পরিমাণের তালিকাকে যোগান-তালিকা বলে। চাহিদা ও যোগান তালিকাকে পাশাপাশি রাখিলে আমরা এমন একটি দাম পাইতে পারি, যে দামে চাহিদা ও যোগান সমান। সেই দামকে ভারসাম্যের দাম (Equilibrium Price) বলে এবং সেই অবস্থাকে ভারসাম্যাবস্থা বলে। যদি এই ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতি ঘটে তাহা হইলে, বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে, এমন শক্তিসমূহের কার্য্য সুরু হয় যাহাতে পূর্ব্বের অবস্থায় ভারসাম্য ফিরিয়া আইসে (অর্থাৎ ইহা স্থায়ী ভারসাম্য)।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের বিন্দুতে দাম নিরূপিত হইয়া থাকে

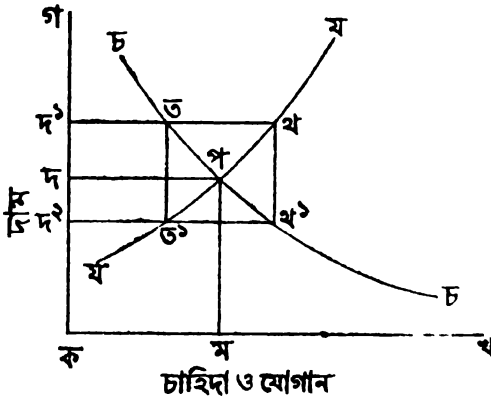
পরবর্তী রেখা চিত্রের সাহায্যে দেখান হইতেছে যে, চাহিদা ও যোগান রেখা

প বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে, প ম দামে ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে এবং এই দামে দ প পরিমাণ যোগান এবং ওই পরিমাণই চাহিদা হইতেছে।



যদি দ্রব্যের দাম ভারসাম্যের বিন্দুতে না থাকে, তাহা হইলে ভারসাম্যের বিচ্যুতির ফলে বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়া সুরু হয় এবং পুনরায় পূর্ব্বের ভারসাম্য ফিরিয়া আইসে। নিম্নের চিত্রে দেখা যায় যে, দাম যদি দ১ক হয়, তাহা হইলে সেই দামে চাহিদা হইবে দ১ত, কিন্তু যোগান হইবে বেশী, দ১থ। ত হইতে থ পরিমাণ দ্রব্য অবিক্রীত থাকার সম্ভাবনায় বিক্রেতাগণ দাম কমাইবে। ইহার ফলে চাহিদাও বাড়িতে থাকিবে এবং প বিন্দুতে আসিয়া পুনরায় যোগান

দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় সমতা-বিধান

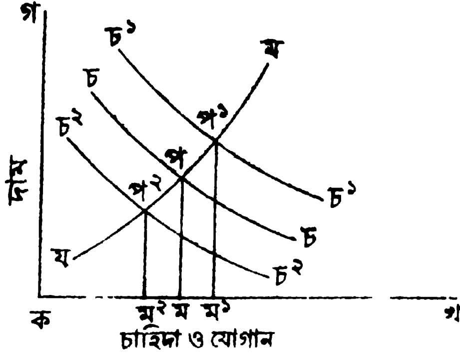


ও চাহিদা সমান হইবে। দাম যদি দ২ক হয় তাহা হইলে সেই দামে যোগান কম হইবে (দ২ত১), চাহিদা বেশী হইবে (দ২থ১) ; বহু ক্রেতা বেশী দাম দিতে

যোগান বাড়িবে এবং দাম বাড়িয়া পুনরায় প বিন্দুতে **প ম** দামে ভারসাম্য স্থাপিত হইবে।

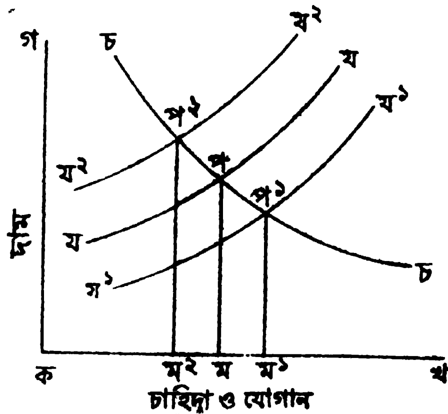
যদি চাহিদায় বা যোগানে পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলে দামের পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দামে ভারসাম্য স্থাপিত হইয়া থাকে।

যোগান স্থির অবস্থায় চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়ে, চাহিদা কমিলে দাম



কমে। **প ম** দামে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য ছিল; কিন্তু যদি চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া নূতন **চ১চ১** রেখার সৃষ্টি করে, তাহা হইলে দাম বাড়িয়া **প১ম১** দামে নূতন ভারসাম্য স্থাপিত হইবে। যদি চাহিদা কমিয়া নূতন **চ২ চ২** রেখা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে দাম কমিয়া

যোগানস্থির ও চাহিদায় পরিবর্ত্তন



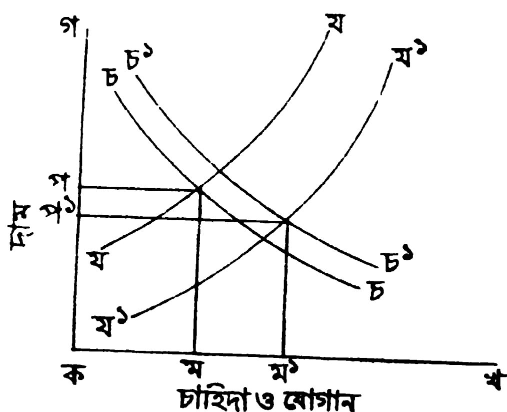
প২ ম২ দামে নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে।

চাহিদা স্থির অবস্থায় যোগান বাড়িলে দাম কমে, এবং যোগান কমিলে দাম বাড়ে। উপরের চিত্রে প ম দামে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য ছিল; কিন্তু যদি যোগান বৃদ্ধি পাইয়া নূতন য১ য১ রেখা সৃষ্টি করে তাহা হইলে দাম কমিয়া প১ ম১ দামে নূতন ভারসাম্য হইবে। যদি যোগান কমিয়া নূতন য২ য২ রেখা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে দাম বাড়িয়া প২ ম২ দামে নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে।

চাহিদাস্থির ও যোগানে পরিবর্তন

চাহিদা ও যোগানের একই সঙ্গে পরিবর্তন হইলে দামে-ও পরিবর্তন হইবে। উভয়ের বৃদ্ধি হইলে দামের উপর কি প্রভাব হইবে তাহা নির্ভর করিবে উহাদের বৃদ্ধির তুলনা মূলক পরিমাণের উপর। যদি চাহিদার বৃদ্ধির তুলনায় যোগানের বৃদ্ধি বেশী হয়, তাহা হইলে দাম কমিবে; যদি চাহিদার বৃদ্ধির তুলনায় যোগানের বৃদ্ধি কম হয়, তাহা হইলে দাম বাড়িবে। যদি চাহিদা ও যোগানে সমান বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িলেও দাম একই থাকিবে।

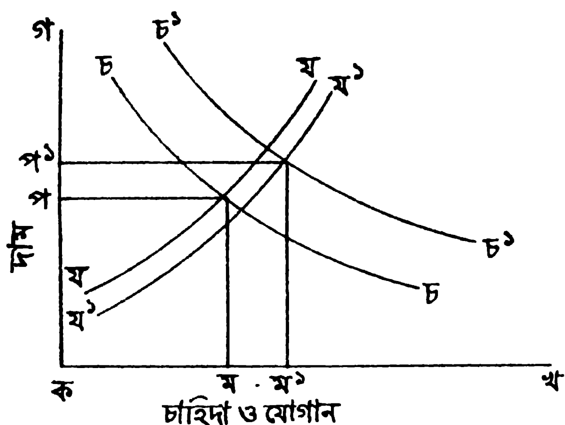
উভয়েরই একসঙ্গে পরিবর্তন



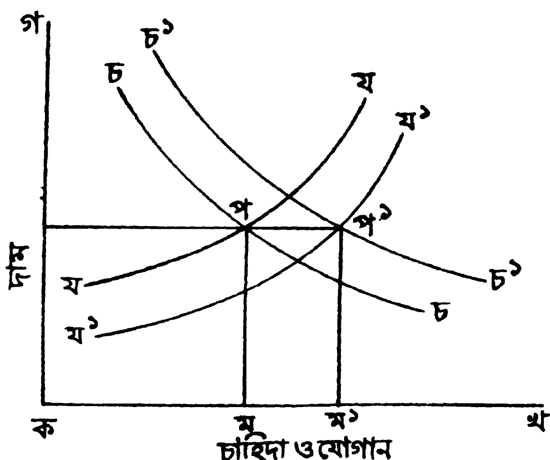
উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে যে চাহিদার বৃদ্ধির তুলনায় যোগানের বৃদ্ধি বেশী হওয়ায় দাম ক প হইতে কমিয়া ক প১ হইয়াছে।

পরের পৃষ্ঠায় (১ম চিত্রে) দেখা যাইতেছে যে যোগানের বৃদ্ধির তুলনায় চাহিদার বৃদ্ধি অধিক হইয়াছে, ফলে দাম ক প হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ক প২ হইয়াছে।

এই পৃষ্ঠার (২য় চিত্রে) চাহিদা ও যোগানের বৃদ্ধি সমান হওয়ায় ক্রয়



বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে, (ক ম হইতে ক ম১ হইয়াছে); দাম একই রহিয়াছে (মপ = ম১ প১)।



পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এইরূপে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের বিন্দুতে দাম নিরূপিত হয় এবং চাহিদা ও যোগানের পরিবর্ত্তনের ফলে দাম পরিবর্ত্তিত হয়। চাহিদায় এই পরিবর্ত্তন আসিতে পারে বহু কারণে—ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দের পরিবর্ত্তনের ফলে, অথবা তাহাদের আয় বা লোকসংখ্যা পরিবর্ত্তনের ফলে; যোগানের ক্ষেত্রে উপাদান সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং

উপাদান সমূহের তুলনামূলক দুষ্প্রাপ্যতার ফলে। চাহিদা ও যোগানের উভয়ের একই সঙ্গে বৃদ্ধি বা হ্রাস, অথবা কাহারও বৃদ্ধি এবং কাহারও হ্রাস তাহাদের ভারসাম্যের বিন্দু পরিবর্তিত করিয়া ভারসাম্যের দামে (Equilibrium Price) পরিবর্তন আনে।

কাল-অনুযায়ী বা সময়-অনুযায়ী বিশ্লেষণের গুরুত্ব (Importance of time-element in the analysis of Pricing):

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের বিন্দুতে দাম স্থির হয় এবং উহাদের পরিবর্তন হইলে দামের-ও পরিবর্তন ঘটে। চাহিদায় পরিবর্তন দামে পরিবর্তন আনিলে যোগান স্থির থাকে না, উহাতেও পরিবর্তন আসে। চাহিদায় একবার পরিবর্তন আসিলে তাহার ফলে যোগানে ক্রমে ক্রমে বহু প্রকার পরিবর্তন আসিতে পারে এবং পুনরায় চাহিদা-যোগানের ভারসাম্যে পৌঁছিবার পথে দামে বহু পরিবর্তন আনে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে তৎক্ষনাৎ দাম বৃদ্ধি পাইবে, কারণ সহসা যোগান বৃদ্ধি করা চলে না, আর নূতন যন্ত্রপাতির বন্দোবস্ত না করিয়া যোগান বাড়াইতে গেলে প্রান্তিক-ব্যয় বাড়িয়া যায়। কিন্তু যতই কাল অতিবাহিত হইবে ততই ফার্মগুলি নিজেদের পুনর্গঠন করিবার উপযোগী সময় পাইবে, প্রান্তিক ব্যয় কমাইয়া যোগান বাড়াইয়া ফেলিতে পারিবে। তাহা ছাড়া সেই শিল্পে নূতন ফার্ম্ম-ও প্রবেশ করিতে পারিবে, মোট যোগান-ও পরিবর্ত্তিত হওয়ার সুযোগ পাইবে।

যোগানের পরিবর্তন

চাহিদার পরিবর্তনই প্রথমে ভারসাম্য হইতে দাম-কে বিচ্যুত করে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে, সময় অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, যোগান সেই নূতন চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দামের পুনর্পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। যোগানের পরিবর্তনের পরিমাণ, প্রধানত:, সময়ের উপর নির্ভর করে। অধিক সময় পাইলে পরিবর্তন যথাযথ সঠিক হয়, অল্প সময় পাইলে চাহিদা অনুযায়ী ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব না-ও হইতে পারে। চাহিদার পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটিলে যোগান কোন্ পদ্ধতিতে এবং কিরূপ সাফল্যে সহিত চাহিদার সঙ্গে পুনর্মিলিত হইতে পারিবে তাহা নির্ভর করে সময়ের উপর; ফার্মগুলি নিজেদের পুনর্গঠনের জন্য কি পরিমাণ সময় পায়, তাহার

যোগানে পরিবর্তনের প্রকৃতি সময়ের উপর নির্ভরশীল

উপর। সুতরাং দাম-নিরূপণ তত্ত্বে কাল বা সময়-অনুযায়ী বিশ্লেষণের গুরুত্ব আছে।*

সময়-অনুযায়ী বিশ্লেষণের আরও তাৎপর্য্য আছে। দাম-নিরূপনে চাহিদা বা যোগান কে প্রধান শক্তি, কাহার প্রভাব অপরের তুলনায় অধিক, ইহা লইয়া ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে এককালে বিতর্কের অন্ত ছিলনা। একদিকে জেভন্স্ বলিতেন যে চাহিদা-ই একমাত্র শক্তি, অপর দিকে রিকার্ডো বলিতেন যে যোগানই প্রধান। মার্শাল সর্বপ্রথমে দাম-নিরূপণ তত্ত্বে সময়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেন যে, এই তর্ক সঠিক নহে, উভয়ের পারস্পরিক প্রভাবের ফলেই দাম নিরূপিত হইয়া থাকে। তবে স্বল্পকালীন দাম-নিরূপনে চাহিদার প্রভাব বেশী থাকে, দীর্ঘকালীন দাম-নিরূপনে যোগানের প্রভাব অধিক। কাঁচির এক দিক বেশী নড়িতেছে বলিয়া শুধু সেই দিকের কাযের প্রভাবেই কাটা হইতেছে তাহা নহে, অপর দিকের প্রভাবও প্রয়োজন। কাহার প্রভাব কখন বেশী ইহা বুঝিবার জন্যই সময় অনুযায়ী বিশ্লেষণ আবশ্যক।

দামের উপর চাহিদা ও যোগানের প্রভাব সময়ানুযায়ী পৃথক হয়

মার্শাল তাই চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে যোগানে পরিবর্তন হইয়া পুনরায় ভারসাম্যে পৌছিবার সময়কে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি সময়াংশে (Time-Period) দামনির্দ্ধারণে কোন শক্তির তুলনামূলক প্রভাব কিরূপ তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার কালের শ্রেণী-বিভাগ হইল: অত্যল্পকাল বা বাজার-সময় (Extremely Short-period or Market-period), স্বল্পকাল (Short-period), দীর্ঘকাল (Long-period)।†

(ক) অত্যল্পকাল বা বাজার-সময় :

একদিন বা কয়েকদিনের সময়কে মার্শাল অত্যল্পকাল বা বাজার-সময় বলিয়াছেন। ইহার আসল তাৎপর্য্য হইল যে, এই সময় এত ছোট হইতে হইবে যাহাতে চাহিদার পরিবর্তন হইলেও যোগানের পরিমাণ পরিবর্তিত হইতে

*মনে রাখিতে হইবে যে সময়ের বিশ্লেষণের ব্যাপারে একমাত্র যোগান পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্রেই সময়ের প্রভাব প্রধান আলোচ্য, চাহিদার ব্যাপারে নহে। কারণ, যোগানের পরিবর্ত্তনের ফলে কালক্রমে চাহিদায় পরিবর্ত্তন সৃষ্টি হয় না। ক্রেতাদের রুচি, অভ্যাস, আয়, সংখ্যা প্রভৃতি কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা যোগানের পরিবর্ত্তনের ফলে নহে।

† মার্শাল আরও একপ্রকার "যুগব্যাপী" সময়ের কথা বলিয়াছেন। দাম-নিরূপণ তত্ত্বে ওইরূপ সময়ের বিশ্লেষণ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু তাই এক্ষেত্রে আলোচিত হয় না।

প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ কোথায় মিলিত হইবে তাহা নির্ভর করে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতির উপর। চাহিদার দিকে একচেটিয়া ফার্ম লক্ষ্য রাখিবে যে, তাহার সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা কিরূপ। যদি চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারবিহীন হয় তাহা হইলে দাম বাড়াইলে বিক্রয় তত কমিবে না, মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পাইবে, প্রান্তিক রেভিনিউ বেশী হইবে; সে দাম বাড়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। যদি চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হয় তাহা হইলে দাম বাড়াইলে বিক্রয় ও মোট রেভিনিউ অধিক বাড়িবে না, বরং দাম কমাইলে রেভিনিউ বাড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং, সে দাম কম রাখিবার চেষ্টা করিবে।

সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা ও প্রতিদানের নিয়ম

যোগানের দিকেও তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে; দেখিতে হইবে যে, উৎপাদন বাড়াইলে প্রান্তিক ব্যয় কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। যদি ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী থাকে, তাহা হইলে উৎপাদন বাড়াইলে প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, সুতরাং দাম বেশী হইবার সম্ভাবনা। যদি ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী থাকে তাহা হইলে উৎপাদন বাড়াইলে প্রান্তিক ব্যয় কমিবে সুতরাং দাম কম হইবার সম্ভাবনা। যদি চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হয় অর্থাৎ দাম কমাইলে রেভিনিউ বৃদ্ধি পায় এবং ইহারই সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী থাকে তাহা হইলে দাম কম হইবে, কারণ তাহাতে বিক্রয়-ও বেশী এবং ব্যয়ও কম। এইরূপ অবস্থায় একচেটিয়া-দাম পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দাম হইতেও কম হইতে পারে।

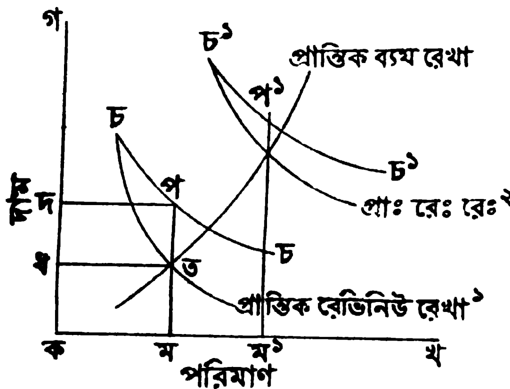
প্রতিদানের নিয়ম

পরবর্ত্তী চিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা গড় রেভিনিউ রেখা (বা চাহিদা রেখা) হইতে নিম্নে অবস্থিত। যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা প্রান্তিক রেভিনিউ রেখার সহিত মিলিত হইয়াছে সেই বিন্দুতে একচেটিয়া দাম স্থির হইয়াছে (পম)। ক ম হইল একচেটিয়া উৎপাদন। প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রান্তিক ব্যয়-রেখার ঊর্দ্ধাভিমুখী গতি তাহারই নির্দ্দেশক। তপদথ আয়তক্ষেত্র একচেটিয়া মুনাফার পরিমাণ।

এইরূপ অবস্থায় সেই বাজারে একচেটিয়া ব্যবসাদারের দ্রব্যের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দ্রব্যটির একই পরিমাণের জন্য ক্রেতারা বেশী দাম দিতে প্রস্তুত আছে। তাহার ফলে দ্রব্যটির চাহিদা রেখা

উপরে উঠিয়া যায় অর্থাৎ দক্ষিণে সরিয়া যায়। প্রান্তিক রেভিনিউ রেখাও উহার সহিত বৃদ্ধি পায়। প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত প্রান্তিক রেভিনিউ পূর্বের তুলনায় উর্দ্ধে মিলিত হয় এবং দাম বাড়িয়া যায়। যদি প্রান্তিক ব্যয় রেখা ক্রমাগত কমিতে থাকে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী হইতে থাকে, তাহা হইলে চাহিদা বৃদ্ধি হইলে অনেক ক্ষেত্রে দাম পূর্বাপেক্ষা কমিতেও পারে।

এক চেটিয়া দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলাফল



উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, নূতন চাহিদারেখা চ¹ চ¹ রেখা এবং নূতন প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা সৃষ্টি হওয়ায় দাম বৃদ্ধি পাইয়া প¹ ম¹ হইয়াছে।

একচেটিয়া অধিকারের সীমা (Limits to the Power of a Monopolist) :

যদিও একচেটিয়া ফার্ম্ম সর্বোচ্চ মুনাফা পাইবার চেষ্টা করে, তাহা সত্ত্বেও বাস্তবে অনেক বাধা বিপত্তি ও সীমার মধ্যে তাহাকে কাজ করিতে হয়। প্রথমতঃ, সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার ভয় সর্ব্বদাই আছে। যদি সে দাম অতিরিক্ত রাখে, তাহা হইলে নূতন ফার্ম্ম বাধা-নিষেধ না মানিয়া সেই শিল্পে প্রবেশ করিবে। দ্বিতীয়তঃ, সকল দ্রব্যেরই মোটামুটি পরিবর্ত্ত-সামগ্রী আছে ; কাহারও ঘনিষ্ঠ, কাহারও বা একটু দূরবর্ত্তী। যদি দাম অতিরিক্ত রাখে তাহা হইলে ক্রেতারা পরিবর্ত্ত-সামগ্রী ক্রয়ের দিকে ঝুঁকিবে, অন্য ফার্ম্মও পরিবর্ত্ত-সামগ্রী উৎপাদনের [illegible]। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য একচেটিয়া

সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা, ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী সামগ্রী, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ ও বিরুদ্ধ জনমত

ফার্ম্ম যথেচ্ছ এবং অধিক দাম নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। চতুর্থতঃ, যাহাতে জনমত তাহার বিরুদ্ধে না যায়, সে চেষ্টাও সর্বদা রাখিতে হইবে। প্রচুর বিজ্ঞাপন বা রাজনৈতিক জননেতাদের আয়ত্তে রাখিয়া তাহাকে ব্যবসা করিতে হইবে ; দামও অতিরিক্ত করিলে চলিবে না।

এই সকল কারণের জন্য মার্শাল বলিয়াছেন যে, একচেটিয়া ফার্ম্ম সকল সময়ে সর্ব্বোচ্চ মুনাফা আদায় করিতে পারে না, তাহারা এই সকল বিষয়ের সহিত আপোষ করিয়া যথাসম্ভব অবস্থানুযায়ী আপোষজনিত-মুনাফা লাভ করে (Compromise Benefit)।

দাম-স্বতন্ত্রতা (Price Discrimination) :

যখন কোন্ একচেটিয়া ফার্ম্ম বিভিন্ন ক্রেতাদের নিকট স্বতন্ত্র দামে একই দ্রব্য বিক্রয় করে, তখন তাহাকে দাম-স্বতন্ত্রতা বলে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ইহা সম্ভব হয় না, কারণ সেখানে ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রত্যেক ক্রেতা সকল বিক্রেতার দাম জানে, এবং ফলে একটি দ্রব্যের জন্য বাজারে একই দাম চালু থাকে। একমাত্র একচেটিয়ার ক্ষেত্রেই এরূপ দাম-স্বতন্ত্রতা সম্ভব, কারণ সে নিজেই দাম-নির্দ্ধারণ করিতে পারে।

দাম-স্বতন্ত্রতা তিন ভাবে সম্ভব। (ক) বিভিন্ন ক্রেতার মধ্যে দামের ব্যাপারে ব্যক্তিগত-স্বতন্ত্রীকরণ (Personal Discrimination) চলিতে পারে। যাহার আকাঙ্খা তীব্র অথবা ব্যয়ের শক্তি বেশী, তাহার নিকট অধিক দাম এবং যাহার আকাঙ্খা অথবা ব্যয়ের শক্তি অধিক নহে, তাহার নিকট তুলনামূলক ভাবে কম দাম ধার্য্য করা যাইতে পারে। সুলভ সংস্করণ, কাপড়ে বাঁধাই ও চামড়ার বাঁধাই রাজকীয় সংস্করণ—এইভাবে দ্রব্যের বিভাগ করিয়া একই দ্রব্যের দাম বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন রাখা হয় ; একই রেলভ্রমণ বিভিন্ন দামে বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট বিক্রয় করা হয়, দ্রব্যের গুণ ও উৎকর্ষের সামান্য উন্নতি করিয়া তাহা হইতে অনেক বেশী দাম আদায় করা হয়।

তিন প্রকার দামস্বতন্ত্রতা

(খ) বিভিন্ন অঞ্চলে একই দ্রব্য বিভিন্ন দামে বিক্রয় করা হয়। ধনীদের অঞ্চলে দ্রব্যের দাম একটু বেশী ; গরীবদের এলাকায় দাম একটু কম—এই ভাবে আঞ্চলিক স্বতন্ত্রীকরণ (Regional Discrimination) চলে। নিজের দেশে

বেশী দামে বিক্রয় করিয়া অন্য দেশে যদি একই দ্রব্য কম দামে বিক্রয় করা হয়, তাহাকে 'ডাম্পিং' (Dumping) বলে। এই ডাম্পিং আঞ্চলিক স্বতন্ত্রীকরণেরই এক বিশেষরূপ।

(গ) একই দ্রব্যের বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে দামের পার্থক্য করিলে (যেমন রান্নার কাজে, কলচালাইবার কাজে এবং আলো জ্বালিবার কাজে বিদ্যুৎ বিভিন্ন দামে বিক্রয় করা হয়) তাহাকে ব্যবহার-স্বতন্ত্রীকরণ (Use-Discrimination) বলে।

কি অবস্থায় উহা চালান সম্ভব

দাম-স্বতন্ত্রতা সফল ভাবে চালাইতে গেলে, পিগু বলিয়াছেন যে, দুইটি সর্ত্ত বজায় থাকা প্রয়োজন। কম-দামী বাজার (Low-price market) হইতে বেশী-দামী (High-price market) বাজারে দ্রব্যকে সরাইয়া লওয়া সম্ভব নয়—ইহাই প্রথম সর্ত্ত। যদি কম-দামে কেহ ক্রয় করিয়া অপরকে কিছু বেশী দামে বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে একচেটিয়া ফার্ম্মের পক্ষে অপরের নিকট অধিক দাম ধার্য্য করা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় সর্ত্ত হইল এই যে, বেশী-দামী বাজার হইতে চাহিদা সরাইয়া অল্প-দামী বাজারে লইয়া আসা যায় না। যদি কোন ডাক্তার ধনীর নিকট হইতে বেশী ফী (Fee) আদায় কবেন এবং গরীবের নিকট কম ফী নেন; তাহা হইলে কম ফী দিবার জন্য ধনী গরীব হইতে চাহে না। ডাম্পিং-এর সময়ে বিদেশের কম-দামী বাজার হইতে নিজের দেশে বেশী-দামে বাজারে দ্রব্যটি ফিরিয়া আসিয়া বিক্রীত হইতে পারে না; আমদানীশুল্ক ইত্যাদির দ্বারা দুই বাজারের পার্থক্য রক্ষিত হয়।

অধ্যাপক পিগু দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়াকে (Discriminating Monopoly) বা দাম-স্বতন্ত্রতাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যদি একচেটিয়া ব্যবসাদার প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে পৃথক দাম আদায় করিতে পারে, ব্যক্তির কোন ভোগোদ্বৃত্ত পাওয়া সম্ভব হয় না, এরূপ অবস্থাকে প্রথম পর্য্যায়ের দাম-স্বতন্ত্রতা বলে। মিসেস্ রবিন্‌সন্ বলেন যে, যদি ব্যক্তির নিকট হইতে দ্রব্যের প্রত্যেকটি ইউনিটের জন্য স্বতন্ত্র দাম আদায় করা সম্ভব হয় (অর্থাৎ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম বুঝিয়া আদায় করা চলে), তাহা হইলে কেহ কোন

ভোগোদ্বৃত্ত লাভ করিতে পারিবে না। যদি ক্রেতাগণ কিছুটা ভোগোদ্বৃত্ত লাভ করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের দাম-স্বতন্ত্রতা বলা হয়। কেহ কোন দ্রব্যের জন্য, ধরা যাউক, ১০০৲ দাম দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু আসলে তাহাকে ৮০৲ দিতে হইল, ২০৲ ভোগোদ্বৃত্ত সে লাভ করিতে পারিল। ইহাকে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের দাম-স্বতন্ত্রতা বলা চলে। যদি বিভিন্ন দাম স্থির করিয়া রাখা হয় এবং ক্রেতাগণ নিজেদের খুসী অনুযায়ী যে কোন দামে দ্রব্যটি ক্রয়ের সুবিধা পায়, তাহা হইলে তাহাকে তৃতীয় পর্য্যায়ের দাম-স্বতন্ত্রতা বলা হয়। যেমন সিনেমার টিকিটের হার বিভিন্ন রহিয়াছে, কোন ক্রেতা যে কোন দামের টিকিট ক্রয় করিতে পারে, উহা তাহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

তিন শ্রেণীর দাম-স্বতন্ত্রতা

দাম-স্বতন্ত্রতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দাম-সম্পন্ন প্রত্যেক বাজারে এরূপ দাম স্থির হয়, যাহাতে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান। শুধু তাহাই নহে, সকল বাজারের প্রান্তিক রেভিনিউ-ও সমান। সকল বাজারের প্রান্তিক রেভিনিউ সমান না হইলে যে বাজারে প্রান্তিক রেভিনিউ কম সে বাজার হইতে দ্রব্য সরাইয়া যে বাজারে প্রান্তিক রেভিনিউ বেশী সেই বাজারে বিক্রয় করা হইবে; ফলে উভয় বাজারের প্রান্তিক রেভিনিউ ক্রমে সমান হইয়া পড়িবে। প্রত্যেক বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পৃথক সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা অনুযায়ী দাম স্থির হইবে। যে বাজারে চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা কম, সে বাজারে কম দাম স্থির হইবে; যে বাজারের চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারবিহীন সেই বাজারে বেশী দাম ধার্য্য করা হইবে, প্রত্যেকটি পৃথক বাজারে স্বতন্ত্রদামে যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য স্থাপিত হইলে দাম-স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া ফার্ম্মও ভারসাম্যাবস্থায় উপনীত হইবে।

কি ভাবে প্রত্যেক বাজারে স্বতন্ত্র দাম স্থির হয়

এইরূপ দাম-স্বতন্ত্রতার ফলে যাহাদের নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করা হইতেছে তাহাদের কিছুটা ক্ষতি হইলেও যাহাদের নিকট কম দামে বিক্রয় করা হইতেছে তাহাদের সুবিধা হইবে। যদি ধনীদের নিকট হইতে বেশী দাম লওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদের ক্ষতির তুলনায় কম-দামে দ্রব্যটি পাওয়ার ফলে গরীবদের অধিক সুবিধা হইবে। সমাজের মোট কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে।

ফলাফল

কোন দ্রব্য কেবল গরীবদের নিকট কম দামে বিক্রয় করিলে উৎপাদন-ব্যয় পোষায় না—এইরূপ হইতে পারে। তখন দ্রব্যটির উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যদি ধনীদের নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে মোট ব্যয় পোষাইয়া যাইতে পারে, দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে, সকল ভোগকারীর ইহতে সুবিধা হয়। সুতরাং ভোগকারীদের পক্ষে দাম-স্বতন্ত্রতা অনেকক্ষেত্রে কল্যাণ-জনক বলা চলে।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Imperfect Competition)

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক বিক্রেতা থাকে ফলে কেহই দামের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বাজারের চালু দামে তাহারা দ্রব্যই বিক্রয় করে! একচেটিয়া ক্ষেত্রে একচেটিয়া ফার্ম একাই বিক্রেতা ও সমগ্র যোগানের নিয়ন্ত্রণ কর্তা, তাহার সিদ্ধান্তেই দাম নির্দ্ধারিত হয়।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে

কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা নিখুঁত একচেটিয়া উভয় অবস্থার বাজারের যে অবস্থা মধ্যবর্ত্তী থাকে তাহাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বলে। আধুনিক সমাজের প্রকৃত চেহারা পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা নিখুঁত একচেটিয়া নহে, তাহা হইল অপূর্ণ প্রতিযোগিতা। যখন বাজারের বহুসংখ্যক বিক্রেতা না থাকিয়া কয়েকজন বিক্রেতা থাকে ; অথবা বহুবিক্রেতা থাকিলেও সম্পূর্ণ একজাতীর দ্রব্য বিক্রয় করে না, আসল বা কাল্পনিক যেরূপেই হউক একটু পৃথকদ্রব্য বিক্রয় করে অর্থাৎ দ্রব্য-পৃথকীকরণ (Product differentiation) চালু থাকে : এবং বাজারে একই দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন দাম থাকিতে পারে, সে অবস্থাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বলে।

এই অবস্থাতে দেখা যায় যে একই শিল্পে অনেক ফার্ম আছে, প্রত্যেকেই নিজের দ্রব্যকে অন্যের দ্রব্য হইতে পৃথক বলিয়া দাবী করে, বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মারফৎ নিজের ফার্মকে কেন্দ্র করিয়া একদল মোটামুটি

একচেটিয়া-মূলক প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে

স্থায়ী ক্রেতার দল সৃষ্টি করিয়া ফেলে, যাহারা দাম একটু বাড়াইলেও তাহার দ্রব্য ক্রয় করা ছাড়িয়া দেয় না। এই ফার্মগুলি যদিও ছোট ছোট একচেটিয়া অধিকারে সমগ্র বাজার ছাইয়া ফেলে, তবুও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। অর্থাৎ বাজারে কিছুটা একচেটিয়া এবং কিছুটা প্রতি-

যোগিতার সম্মিলিত প্রভাব বাস্তবে দেখা যায়; এই অবস্থাকে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition) বলা চলে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাজারে অনেক ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকিলেও পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় না-ও থাকিতে পারে, বাস্তবে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারই সাধারণতঃ দেখা যায়। ইহার কারণ হইল, অনেক বিক্রেতা থাকিলেও তাহারা একই জাতীয় (Homogeneous) দ্রব্য বিক্রয় করে না, খুব দূরবর্তী পরিবর্ত-সামগ্রীও (Distant substitutes) বিক্রয় করে না। তাহাদের বিক্রীত দ্রব্য এক-জাতীয় নহে, তবে ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী। এই একচেটিয়া প্রতিযোগিরা প্রায়-কাছাকাছি জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে এবং ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা কম নহে। একই দ্রব্যের সামান্য অদল বদল করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন নাম দিয়া বা ভিন্ন মার্কা দিয়া ইহারা ক্রেতাদের নিজেদের দ্রব্যের দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করে। এই অবস্থাকে চেম্বারলেন 'এক-চেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা' বলিয়াছেন।

যদি এইরূপ অপূর্ণ প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে ফার্মের সংখ্যা কমিয়া মাত্র দুইটিতে দাঁড়ায় তাহা হইলে তাহাকে ডুয়োপলি (Duopoly) বলে (দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণ)। যদি এরূপ কয়েকটি ফার্ম মাত্র বাজারে থাকে (দুই হইতে বেশী কিন্তু বহু হইতে কম) তাহা হইলে তাহাকে অলিগোপলি (Oligopoly) বলে (কতিপয়-নিয়ন্ত্রণ)। এই অলিগোপলি আবার দুই প্রকারের হইতে পারে। বিশুদ্ধ অলিগোপলিতে (Pure Oligopoly) কয়েকটি ফার্ম একই জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে। আবার যদি ফার্মগুলি পৃথকীকৃত দ্রব্য (differentiated products) বিক্রয় করে তাহা হইলে তাহাকে পৃথকীকৃত অলিগোপলি (Differentiated oligopoly) বলা হয়।

নিম্নে বিভিন্ন ধরণের বাজারকে তালিকাবদ্ধ করা হইয়াছে।

ফার্ম্মের সংখ্যা	বাজারের অবস্থা	
	একজাতীয় দ্রব্য	পৃথকীকৃত দ্রব্য
বহু ফার্ম্ম	পূর্ণ প্রতিযোগিতা	একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা
কয়েকটি ফার্ম্ম	বিশুদ্ধ অলিগোপলি	পৃথকীকৃত অলিগোপলি
একটি ফার্ম্ম	একচেটিয়া	—

একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতায় দাম-নিরূপণ:

একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতায় ফার্ম এক একটি "পৃথক" দ্রব্য বিক্রয় করে। একই দ্রব্যের মধ্যে এই পৃথকীকরণ বহু কারণে সম্ভব: গুণ, মার্কা, ব্যবসার সুনাম ইত্যাদির দ্বারা ইহাদের পারস্পরিক পার্থক্যের পরিমাণে কম বেশী হইতে পারে। পৃথকীকৃত এইরূপ প্রতিটি 'দ্রব্যের' জন্যই একটি নিজস্ব চাহিদা আছে। যদি ফার্মটি বিক্রয় বাড়াইতে চাহে, তাহা হইলে তাহার দুইটি পথ আছে; চাহিদা বাড়ান অথবা দাম কমান। প্রথমে বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদির মারফৎ চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহাতে সফল না হইলে দাম-কমাইয়া বিক্রয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে।

দ্রব্যের দাম কমাইলে প্রান্তিক রেভিনিউ সর্বদাই দাম হইতে কম হইবে এবং এইরূপে ক্রমেই প্রান্তিক রেভিনিউ কমিয়া আসিতে চাহিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক রেভিনিউ ফার্মেব প্রান্তিক ব্যয়েব উর্দ্ধে, ততক্ষণ উৎপাদন ও বিক্রয় চালবে। যখন প্রান্তিক রেভিনিউ প্রান্তিক ব্যয়ের সমান, সেই অবস্থাতে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক। একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতাতে ইহাই ফার্মগুলিব ভার-সাম্যের বিন্দু।

বিক্রয়-জনিত ব্যয় (Selling Costs):

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চালু দামে সকল বিক্রেতা তাহাদের দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে, সুতরাং দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য যানবাহনের ব্যয় ইত্যাদি ছাড়া কোন বিশেষ জাতীয় ব্যয় কবিতে হয় না। কিন্তু একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতায় সেই দ্রব্যের চাহিদা বাডাইবার চেষ্টা করিতে হয় এবং চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টার অন্যতম উপায় হইল বিজ্ঞাপন এবং বিক্রয বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রচার।*

অর্থাৎ ফার্মের চাহিদা রেখাকে ডাহিনে সরাইয়া দেওয়া এবং উপরে উঠাইয়া দেওয়া বিজ্ঞাপন ও প্রচারের উদ্দেশ্য। দাম স্থির রাখিয়া বিক্রয়-জনিত ব্যয় করিয়া কিরূপ লাভ হইল, তাহা ওই দামে বিক্রয়ের বৃদ্ধি দ্বারা জানা যায়।

---

*ইহা ঠিক যে একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতার অবস্থায় বিক্রয় জনিত ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এই বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ফলেই একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। দ্রব্য-পৃথকীকরণ এই বিক্রয়জনিত ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম ফল।—কারণ ও কার্য্য উভয়ে উভয়কে প্রভাবান্বিত করে।

শিল্পের প্রকৃতি, বাজারে অন্যান্য প্রতিযোগী ফার্মের অবস্থিতি, ভবিষ্যত সম্ভাব্য ক্রেতাদের প্রকৃতি ইত্যাদি বুঝিয়া বিজ্ঞাপনের পিছনে ব্যয় করিতে হয়। যেমন, মুদীর দোকান, খুব বেশী হইলে, পাড়ার সিনেমাহলে বিজ্ঞাপন দিবে, কিন্তু বিদেশের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবে না।

বিজ্ঞাপন ও প্রচার ইত্যাদির দরুণ বিক্রয়-জনিত ব্যয়ের চাহিদার উপর প্রতিক্রিয়া হিসাব করা কঠিন। বিজ্ঞাপনের পিছনে ব্যয়ের ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করে ক্রেতার অভ্যাসেব উপব এবং তাহার মনে যুক্তি ও বিবেচনার প্রভাবের উপর। আজিকার বিজ্ঞাপনের প্রভাব বহু বছর পরে ফলপ্রসূ হইতে সুরু করিতে পাবে। যেমন, অষ্টিন মোটরেব বিজ্ঞাপন পডিয়া এক ব্যক্তি ঠিক করিল যে বর্ত্তমানে বাড়ী নির্মাণ করিবে না, গাড়ী কিনিবে। গৃহ নির্মাণ শিল্প হইতে তাহার চাহিদা সরিয়া আসিল, কিন্তু মোটর ক্রয়ের সময়ে সকল বিজ্ঞাপন দেখিতে গিয়া ফোর্ড গাড়ী ক্রয় করিয়া ফেলিল। এক্ষেত্রে, এক ফার্ম্মেব বিজ্ঞাপনের ফলে অন্য ফার্ম্ম লাভবান হইল।

বিক্রয়-জনিত ব্যযেব ফলাফল

আধুনিক কালে, চাহিদা বাড়াইবাব জন্য বিক্রযজনিত ব্যয না করিলেও ফার্মটির বর্ত্তমান চাহিদাটুকু রক্ষার উদ্দেশ্যে বিক্রযজনিত ব্যয না করিয়া চলে না। কোন পেট্রলবিক্রেতা প্রথমে বিনা দামে চাকায বাতাস যোগান দিতে সুরু করিযা প্রচুব ক্রেতা সংগ্রহ করিতে পাবে; কিন্তু কিছুদিন পবে সকলেই উহা সুরু কবায়, সকল ফার্মেব জন্য বাতাসের ব্যয সাধারণ ব্যযেব অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। এখন আর বিনা বাতাসের যোগান বন্ধ কোন ফার্মের পক্ষেই সম্ভব নহে।

সকল ফার্ম বিজ্ঞাপন ও প্রচাবের মারফৎ যদি অন্য শিল্প হইতে চাহিদা সরাইয়া আনিতে পারে তো ভালই। কিন্তু তাহা না হইলে প্রত্যেক ফার্মই অপর ফার্মের ক্রেতাদের নিজের দিকে লইয়া আসিবার উদ্দেশ্যে প্রচার করিলে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতামুলক বিজ্ঞাপন সুরু হইযা যায়। কোন ফার্মেরই বিশেষ উপকার হয় না, কেবল মাত্র ব্যয় বৃদ্ধি হয় এবং দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যায় ও মুনাফা কমে।

যদি সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্য জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রচার করা হয়, তবে সমাজের দিক হইতে এই বিক্রয়-জনিত ব্যয়ের সার্থকতা আছে।

কিন্তু যদি ভুল বুঝাইয়া, নিকৃষ্ট দ্রব্যকে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এই বিক্রয়-জনিত ব্যয় হয় তবে সমাজের পক্ষে তাহা অকল্যাণজনক।

চাহিদার রেখায় পরিবর্তন ইহার একমাত্র ফল নহে। বিজ্ঞাপন ও প্রচার-জনিত ব্যয় উৎপাদন ব্যয়ের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইউনিট প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ব্যয় ও যোগান রেখা-ও পরিবর্তিত হইয়া যায়। আধুনিক কালে বিক্রয়-জনিত ব্যয়ের হিসাব না করিয়া শুধুমাত্র উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতে দাম-নিরূপণ তত্ত্ব আলোচনা প্রায় সম্পূর্ণ অবাস্তব।

বিভিন্ন দ্রব্যের দাম কি ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত (How prices of goods are inter-related):

কোন দ্রব্যের দামে পরিবর্তনের প্রভাব শুধু সেই দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের উপরেই নিবদ্ধ থাকে না; সেই দ্রব্যটির সহিত চাহিদা ও যোগানের দিক দিয়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের উপরেও পড়ে। সুতরাং, কোন দ্রব্যের দামে পরিবর্তন হইলে অন্যান্য দ্রব্যের দামও পরিবর্তিত হইতে পারে। একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের সহিত এই সকল অন্যান্য দ্রব্যের দামের পরিবর্তন পাঁচ প্রকারে যুক্ত থাকিতে পারে বলিয়া মনে করা হয়।

এক] সংযুক্ত যোগান (Joint Supply):

অনেক দ্রব্য এরূপ আছে যাহারা একই উৎপাদন ধারায় উৎপন্ন হয়, যখন একটি দ্রব্য অপর প্রধান দ্রব্যটির (Main product) উপদ্রব্য (By product)। যেমন—ধান ও খড়, পশম ও মাংস, গ্যাস ও কোক ইত্যাদি। ইহাদের যুক্তোৎপন্ন (Joint product), সংযুক্ত-যোগান সামগ্রী বা যুক্তদ্রব্য বলা হয়।

যদি ইহাদের মধ্যে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অপর দ্রব্যটির উৎপাদনও বাড়িয়া যায়। কিন্তু তাহার জন্য চাহিদা একই থাকায় যোগান বৃদ্ধির ফলে তাহার দাম কমিয়া যায়। অপর পক্ষে, যদি একটি দ্রব্যের দাম কমে, তবে তাহার উৎপাদন কমাইলে অন্য দ্রব্যটির উৎপাদন ও যোগান কমিবে, এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে সংযুক্ত-যোগানের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে অপর দ্রব্যটির দাম বিপরীতাভিমুখী পরিবর্তিত হয়।

দুই] সংযুক্ত চাহিদা (Joint Demand) :

একই অভাব মিটাইবার জন্য কয়েকটি দ্রব্যের যখন একত্রে চাহিদা হয়, তখন সেই সকল দ্রব্যকে সংযুক্ত-চাহিদা দ্রব্য বলা হয়। এই সকল দ্রব্য একটি অপরটির অনুপূরক। অনুপূরক দ্রব্য সমূহের দামও পরস্পরের বিপরীতাভিমুখী। কলমের দাম কমিলে উহার চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কালির চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার দাম বাড়িবে। ইহাদের মধ্যে একটি দুষ্প্রাপ্যতর (Scarcer) হইয়া উঠিলে অন্যটির দাম কমিবার সম্ভাবনা, কারণ উহারও চাহিদা কমিয়া যাইবে।

তিন] মিশ্রিত যোগান (Composite Supply) :

একটি অভাব মিটাইতে পারে এইরূপ প্রতিযোগী বহু দ্রব্য থাকিতে পারে। ইহারা পরস্পরের প্রতিযোগী সামগ্রী, ইহাদের একটিকে অন্যের পরিবর্ত-দ্রব্যও বলা চলে। প্রতিযোগী সামগ্রীসমূহের দাম সাধারণতঃ একই দিকে পরিবর্তিত হয়। যেমন, চায়ের দাম বাড়িলে কফির চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। চা-এর দাম কমিলে, কফির চাহিদা কমিবার ফলে, উহারও দাম কমিয়া যাইতে পারে।

চার] মিশ্রিত চাহিদা (Composite Demand) :

যদি বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি দ্রব্যের চাহিদা হয় তাহা হইলে তাহাকে মিশ্রিত চাহিদা (Composite demand) বলা হয়। যেমন—বিদ্যুৎকে আলো জ্বালান, যন্ত্র চালান, বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে লোকে ক্রয় করে। এক ব্যবহারে উহার দাম বৃদ্ধি হইলে সকল ব্যবহারেই উহার দাম বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায়।

পাঁচ] উদ্ভূত চাহিদা (Derived Demand)

কোন দ্রব্যের চাহিদা অপর কোন দ্রব্যের চাহিদার ফলে উৎপন্ন হইলে এরূপ চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদা (Derived Demand) বলে। যেমন—শ্রমিকের চাহিদা উদ্ভূত হয় শ্রমিক যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন করে তাহাদের চাহিদা হইতে। এই সকল দ্রব্যের দাম নির্ভর করে তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের দামের উপর।

যুক্ত-যোগান সামগ্রীর বা সংযুক্ত ব্যয়-সামগ্রীর ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ (Pricing of joint cost goods)

একই উৎপাদন ধারায় উৎপন্ন দ্রব্য সমূহের দাম নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধা হইল যে প্রত্যেকটি দ্রব্যের পৃথক উৎপাদন ব্যয় জানা যায়না। অথচ দ্রব্যের দাম, দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে, উহার প্রান্তিক ও গড় ব্যয়ের সমান হইবে। দুই ধরণের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের দাম নিরূপণ তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে।

উৎপাদন ধারায় দুইটি দ্রব্য যে অনুপাতে পাওয়া যায় তাহাকে যদি পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব হয় তাহা হইলে একটির উৎপাদন স্থির রাখিয়া অপরটির উৎপাদন এক ইউনিট বাড়াইয়া দিয়া মোট ব্যয়ের বৃদ্ধি হিসাব করিয়া উহার প্রান্তিক ব্যয় নির্ণয় করা সম্ভব। এইভাবে উভয় দ্রব্যেরই প্রান্তিক ব্যয় নিরূপণ করা যায়। যেমন—৩০৲ টাকা ব্যয়ে ১০ মণ ধান ও ২ মণ খড় উৎপাদিত হইতেছে, উৎপাদন ধারাকে একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া যদি ৩২ টাকা মোট ব্যয়ে ১০ মণ ধান ও ৩ মণ খড় উৎপাদিত হয় তাহা হইলে বলা যায় প্রতি মণ খড়ের প্রান্তিক ব্যয় ২টাকা। এইরূপে খড়ের পরিমাণ সমান রাখিয়া ধানের উৎপাদন ১ মণ বাড়াইলে মোট উৎপাদন-ব্যয়ের বৃদ্ধিকে ধানের প্রান্তিক ব্যয় বলা চলে।

যখন অনুপাতে পরিবর্তন আনা সম্ভব

এইরূপে প্রান্তিক ব্যয় বাহির করিয়া উহাদের দাম নির্দ্ধারণ করা যায়। ফার্ম্মসমূহ এমন ভাবে উৎপাদন করে যাহাতে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রান্তিকব্যয় দামের সমান হয়; এবং একচেটিয়া বা একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রা..ন্তিক ব্যয় প্রান্তিক রেভিনিউর সমান হয়।

যদি বিভিন্ন দ্রব্যের অনুপাত পরিবর্ত্তন করা একেবারেই সম্ভব না হয় তাহা হইলে এমন ভাবে উভয় দ্রব্যের দাম স্থির হয় যাহাতে উভয় দ্রব্যই সম্পূর্ণ বিক্রয় হইয়া যাইতে পারে এবং উভয় দ্রব্যের দাম একত্রে মোট ব্যয়ের সমান হয়।

যদি অনুপাতে পরিবর্তন আনা সম্ভব না হয়

রেলের ভাড়া কিরূপে নির্দ্ধারিত হয় (How the railway rates are fixed)

রেলের ভাড়া নির্দ্ধারণের দুইটি সম্ভাব্য উপায় আছে—কার্য্যের ব্যয় নীতি (Cost of service principle) এবং কার্য্যের মূল্য নীতি (Value of

service principle) বিভিন্ন দ্রব্য বহনে রেল কোম্পানীর কিরূপ ব্যয় হয় তাহা পৃথক ভাবে হিসাব করা যায় না। তাই কার্য্যের ব্যয় নীতি অনুযায়ী ভাড়া স্থির করিলে সকল দ্রব্যের ভাড়া সমান হারে ধার্য্য করিতে হয়। কিন্ত তাহার ফলে যে সকল দ্রব্যের আয়তন বৃহৎ অথচ মূল্য কম তাহাদের অধিক ভাড়া দিতে হয়। যেমন—কয়লা, ইঁট, বাঁশ, লোহা ইত্যাদি।

রেলের ভাড়া তাই সাধারণতঃ কার্য্যের মূল্যনীতি অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হইয়া হইয়া থাকে। যে দ্রব্যের যেরূপ দাম দিবার ক্ষমতা তাহার নিকট হইতে সেইরূপ ভাড়া আদায় করা হয়। রেলের কার্য্যের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য প্রেরকের চাহিদার তীব্রতা অনুযায়ী ভাডা স্থির হয় অর্থাৎ এই ভাড়া ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগিতার সমান হইয়া থাকে। কার্য্যের মূল্য নীতিকে, অনেক সময়, ক্রেতা যেরূপ দিতে সক্ষম সেইরূপ আদায় করার (What the traffic will bear) নীতি বলা হয়।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে দাম নিরূপণ (Pricing under planned economy)

যে ধরণের সমাজে আমরা বাস করি তাহাকে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বলা হয়। এইরূপ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল প্রধানতঃ, প্রতিযোগিতার দ্বারা সকল দ্রব্যের দাম স্থির হওয়া। চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতে দাম স্থিব হয় এবং সেই দাম অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ এবং শিল্পে উপকরণের নিয়োগ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ সমাজে উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে এবং সকল ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সর্ব্বাধিক দামে নিজের দ্রব্য বিক্রয়ের চেষ্টা করে। দাম অনুযায়ী দ্রব্যোৎপাদন হয়; কম দাম পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে উৎপাদকগণ উৎপাদন করেন না।

প্রতিযোগিতা মূলক সমাজে দাম ও তাহাব তাৎপর্য্য

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই—অন্ততঃ উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না অথবা, ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিলেও তাহাদের ব্যবহারের গতি ও পরিমাণ কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয়। সমাজের উৎপাদন সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয়

পরিকল্পনা কমিশন গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন্ দ্রব্য কখন উৎপাদন হইবে, কোন উপকরণের সাহায্যে, কোন পদ্ধতিতে উৎপন্ন হইবে তাহা সবই কেন্দ্রীয় ভাবে স্থির হয়। দাম-ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজারের অদৃশ্য শক্তির তাড়নায় ব্যক্তির বা উপকরণের নিয়োগ স্থির হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজে ফার্মগুলি যেরূপ প্রান্তিক ব্যয়ের হিসাব করিয়া দাম নির্দ্ধারণ করে, সমাজতান্ত্রিক দেশের দ্রব্য সমূহের দাম এরূপ ব্যয়ের হিসাবে নির্দ্ধারিত হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরে দ্রব্যাদি কি ভাবে বণ্টন করা হইবে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেই একটি নীতি গ্রহণ করা হয় এবং সাধারণতঃ সেই অনুযায়ী দাম স্থির করা হয়।

পরিকল্পিত অর্থনীতির অসুবিধা

হায়েক্, মাইসেস্, পিয়ারসন্, প্রমুখধনবিজ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন যে, পরিকল্পিত বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও স্বেচ্ছাচারী ভাবে দাম স্থির করা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রতিযোগিতা এবং মুনাফার জন্য উৎপাদন—ইহারা বজায় থাকিলে সকল দ্রব্যের দাম তাহাদের ব্যয়ের সমান হইয়া নির্দ্ধারিত হয এবং উপকরণের নিয়োগ ও বিন্যাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবে হইয়া থাকে। যে সমাজে প্রতিযোগিতা ও মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন হয না, সেইরূপ অর্থনৈতিকভাবে পরিকল্পিত সমাজে দ্রব্যের দাম কিছুতেই একদিকে উপযোগিতা এবং অপরদিকে উৎপাদন-ব্যযের সমতা সাধন করিতে পারে না।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে আদর্শদাম থাকিতে পারে না

অপরপক্ষ অধ্যাপক ল্যাঙ্গে, টেলর্, ক্যাল্ডর্, মরিস ডব্, সুইজি প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীগণ দেখাইয়াছেন যে, ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা করিয়া পরিকল্পিত অর্থনীতিতে জনসাধারণের চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক ভাবে দাম স্থির করা সম্ভব। অধ্যাপক পিগুর অভিমতে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সঠিক দাম নির্দ্ধারণ সম্ভব হইলেও উহা এত জটিল ও সূক্ষ্ম চুল চেরা উন্নতস্তরের গণিতের সাহায্যে করা প্রয়োজন, যে তাহা বাস্তবে সম্ভবপর নহে।

অনুন্নত দেশ ও দাম নিরূপণ তত্ত্ব (Pricing theory and under-developed economy):

আধুনিক ধনবিজ্ঞানে যে দাম-নিরূপণ তত্ত্ব প্রচলিত আছে তাহার ধারণাসমূহ প্রধানতঃ শিল্পে-বাণিজ্যে উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো হইতে উদ্ভূত, এই তত্ত্ব সাধারণভাবে সেই সকল অর্থনৈতিক পরিবেশের ক্রিয়া প্রতি-

ক্রিয়া ও গতিধারা নির্দ্ধারণ করে। কিন্তু এই তত্ত্বের বহু ধারণা বাস্তবে অনুন্নত দেশ সমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না। অনুন্নত দেশে দ্রব্যাদির মূল্যায়ণ আধুনিক ধনবিজ্ঞানের দাম নিরূপণ তত্ত্বের বহু নীতি মানিয়া চলে না। চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দাম নিরূপণ হইবে ইহা ঠিকই, কিন্তু যে মনস্তত্ত্ব এবং অর্থনৈতিক সংগঠনের উপর ভিত্তি করিয়া যোগান ও চাহিদার মৌলিক নিয়মগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অনুন্নত দেশ সমূহে সেই মনস্তত্ত্ব ও অর্থ নৈতিক সংগঠন নাই! অবশ্য দ্রুত শিল্পায়ণ এবং দ্রব্য-বিনিময়-ভিত্তিক অর্থনীতি (Barter-economy) হইতে অর্থ-প্রধান অর্থনীতিতে (Money-economy) দ্রুত চলিয়া আসিবার ফলে সেইরূপ মনস্তত্ত্ব ও অর্থ নৈতিক সংগঠন ক্রমেই সৃষ্টি হইতেছে যাহাতে আধুনিক ধনবিজ্ঞানে গৃহীত চাহিদা ও যোগানের মৌলিক নিয়ম সমূহের দ্বারা অবস্থা-বিশ্লেষণ ক্রমেই সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে।

যোগান ও চাহিদার নিয়মগুলি অনুন্নত দেশে খাটে না

যেমন বলা চলে যে, যোগানের নিয়ম অনুন্নত দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে অনেকাংশে পৃথক। দাম বাড়িলে যোগান বাড়িবে ইহা সর্ব্বদা সত্য নহে। অনুন্নত দেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিযাছে যে, দামের হ্রাস বৃদ্ধি অনেক সময যোগানকে বিন্দুমাত্র প্রভাবান্বিত করে না বরং বৃষ্টির হ্রাস বৃদ্ধি অনুযায়ী অধিকাংশ কৃষি দ্রব্যের যোগান হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া অনুন্নত দেশ সমূহে প্রধানতঃ আত্মব্যবহার্য্য উৎপাদনেব প্রাধান্য। নিজের ব্যবহারের জন্যই দ্রব্যের অধিকাংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে, বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নহে। তাহা ছাড়া উৎপাদন মুনাফা-ভিত্তিক নহে, দেশের অধিকাংশ অর্থনৈতিক কাজকর্ম্ম চিরাচরিত প্রথা, ধর্ম্ম ও সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপাদান সমূহের অচলনশীলতা (Immobility) এই ধরণের অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য, ফলে বিভিন্ন কার্মে দ্রব্যের উৎ-পাদন ব্যয় এবং একই কার্য্যে নিযুক্ত উপাদানের দামে প্রভূত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির ধারণা এই প্রকাব দেশে খুবই অস্পষ্ট, কারণ যন্ত্র ও মূলধনের যোগান খুব কম। বিক্রেতারা বহু ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম সম্বন্ধে খোঁজ রাখেন না, ব্যক্তিদের ব্যবহার্য্য ভোগ্য দ্রব্যের ধরণও প্রায় সীমাবদ্ধ। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীন অর্থনীতি, জাতিগত শ্রম বিভাগ, চিরাচরিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট উৎপাদন ব্যয়, আধুনিক দাম-তত্ত্বের বাস্তব কার্য্যকারিতা অনুন্নত দেশসমূহে খুবই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

উদাহরণ

অনুশীলনী

1. Explain how price is determined under Perfect Competition. (B. A. 42, 45, 47, 49)

2. Distinguish between the market price and the normal price. Point out the dominant influences that determine them. (B. A. 51, B.com 42)

3. Discuss the problem of competitive price under decreasing Return (B. A. 46) and increasing Return. (B. A. '48)

4. Explain the importance of time element in the theory of value. (B. A. '37)

5. On what Principles does the monopolist fix the price of his products ? Can he charge any price he likes ? (B. A. 41, 44, 56 ; B. com. 42, 44)

6. Analyse the effects of an increase in demand for the product of a monopolist on his price and on his output. (B. com. '51)

7. What are the limits to the power of a monopolist to charge any price he likes ? Do you think that prices under monopoly must always be higher than under competition ? (B. com. '54)

8. Show how prices of goods are determined under joint demand and joint supply. (B A. '50 ; B. com. '43, '52)

9. State briefly :

(a) The relation between prices of competing goods.

(b) The relation between prices of complimentary goods.

(c) The relation between prices of joint cost goods. (B. A. '52)

10. Explain and illustrate the Principle of "what the traffic will bear." (B. com. '46)

একাদশ পরিচ্ছেদ

ফাট্‌কা ব্যবসা

ফাট্‌কা ব্যবসা কাহাকে বলে (What is Speculation)

ভবিষ্যতের দাম-পরিবর্তন পুর্বে অনুমান করিয়া সেই দাম-পরিবর্তন হইতে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের মারফৎ মুনাফা করার নাম নাম ফাট্‌কা ব্যবসা। যদি ফাট্‌কা ব্যবসায়ীর ধারণা হয় যে, ভবিষ্যতে দ্রব্যটির দাম কমিবে তাহা হইলে সে তাহার সকল মজুত দ্রব্য বর্তমানের চড়া দামে বিক্রয় করিয়া দিবে ; অপরপক্ষে যদি ভবিষ্যতে দ্রব্যটির দাম বাড়িবে এইরূপ ধারণা তাহার হয় তাহা হইলে বর্তমানের কম দামে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য মজুত করিবে। যদি দাম-পরিবর্তন সম্বন্ধে ফাট্‌কা ব্যবসায়ীর ধারণা সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে তাহার লাভ হইবে, ভুল প্রমাণিত হইলে তাহার লোকসান হইবে। যে দ্রব্যের দামপরিবর্তন লইয়া সে ব্যবসা করিতেছে সেই দ্রব্যটিকে বাস্তবে মজুত করিবার দরকারও তাহার হয়না। যদি তাহার ধারণা হয় যে ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে, তাহা হইলে সে বর্তমানের দরে উৎপাদকের সহিত ভবিষ্যতে যোগান পাইবার জন্য চুক্তি করিয়া রাখে, নিজের নিকট মাল মজুত রাখার প্রয়োজন হয়না। যদি ভবিষ্যতে দাম কমিবে এরূপ ধারণা তাহার হয় তাহা হইলে সে ঐ দ্রব্যের কোন ক্রেতাকে বর্তমানের বেশী দরে ভবিষ্যতে যোগান দিবে এইরূপ অগ্রিম চুক্তি করে। উভয়ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ দামের গতিবিধি সম্বন্ধে তাহার ধারণা সঠিক হইলে, সে দামের পরিবর্তন সঠিক আন্দাজ করিতে পারার দরুণ মুনাফা করিতে পারে।

দাম-পরিবর্ত্তনের ঝুঁকি লইয়া ব্যবসা

যখন কোন দ্রব্যের দাম কোন বাজারে কম থাকে এবং কোন বাজারে বেশী থাকে তখন ব্যবসায়ীরা কম দামী বাজার হইতে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া বেশী দামী বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করে। ইহাকে বলা হয় আরবিট্রেজ্ (Arbitrage)। ফাট্‌কা ব্যবসাও বিভিন্ন সময়ের মধ্যে একপ্রকারের আরবিট্রেজ্।

চাহিদা কিরূপ থাকিবে তাহা আন্দাজে ধরিয়া লইয়া বর্তমানে ফার্ম্মসমূহের

উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা হয়। আধুনিক কালে উৎপাদনধারা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে এবং তাহা সময় সাপেক্ষ। উৎপাদন সুরু ও উৎপাদন শেষের মধ্যে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়; ইতিমধ্যে চাহিদা পরিবর্তিত হইতে পারে, উৎপাদনের ব্যয়েও পরিবর্তন আসা অসম্ভব নহে। এমন অবস্থায় প্রায় সমস্ত উৎপাদন প্রচেষ্টা স্বভাবতঃ ঝুঁকি বহুল। ফাট্‌কা ব্যবসাদার উৎপাদন সুরু হইবার সময়েই উৎপাদকের সহিত দ্রব্য ক্রয়ের অথবা কাঁচামাল বিক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রিম চুক্তি করায় উৎপাদকের নিজস্ব ঝুঁকি অনেকটা কমিয়া যায়। ইহার ফলে সে অধিকতর মনোযোগের সহিত দ্রব্যের উৎপাদন চালাইতে পারে। এই ভাবে ঝুঁকি বহন করা আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাকে বিশেষত্বশীল কার্য্য বলিয়া (Specialized function) ধরা হইতেছে। শ্রম বিভাগ ও বিশেষায়ণের একটি ফলই হইল ঝুঁকি লইয়া ব্যবসা করা বা ফাট্‌কা ব্যবসা।

গতিশীল জগতের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ফাট্‌কা ব্যবসার ভিত্তি

ফাট্‌কা ব্যবসায়ের সহিত জুয়ার লেনদেনের (Gambling) পার্থক্য আছে। জুয়াড়ীগণ যে ধরণের বাজী ফেলে তাহা উৎপাদন কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এবং কোন অর্থনৈতিক উপকার উহার দ্বারা সাধিত হয় না। রাজস্থান ও মোহন বাগানের মধ্যে খেলায় কে জিতিবে এবং কে কয় গোলে জিতিবে তাহা লইয়া বাজী ধরায় সমাজের কোন অর্থনৈতিক উপকার হয় না, কারণ ইহা উৎপাদন ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। দাম পরিবর্তন যে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এবং সমাজের গতিশীলতার সহিত যে উঠা নামা জড়িত, সেই স্বাভাবিক পরিবর্তনের ঝুঁকি যে ব্যবসায়ে করা হয়, তাহা সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

জুয়া ও ফাট্‌কার পার্থক্য

সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই ফাট্‌কা ব্যবসা চালান সম্ভব নহে, কোন দ্রব্য লইয়া ফাট্‌কা ব্যবসা গড়িয়া উঠিবার পক্ষে উপযোগী কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তাহার থাকা প্রয়োজন। (ক) দ্রব্যটির জন্য বিপুল চাহিদা থাকিতে হইবে, তাহা না হইলে ভবিষ্যতে বিক্রয় করার অসুবিধা হইবে। এই চাহিদা নিয়মিত হওয়া দরকার, তাহা না হইলে উহার দামের পরিবর্তন লইয়া ব্যবসা করা চলে না। যেমন—তুলা, গম, ধান ইত্যাদি।

ফাট্‌কা-বাজার সৃষ্টির সর্তসমূহ

(খ) দ্রব্যটি সম্পূর্ণ এক জাতীয় হইতে হইবে (Standardised)। যদি দ্রব্যটির বহু রকম থাকে তাহা হইলে প্রতিটি রকমের বৈশিষ্ট্য ও মান নির্দিষ্ট থাকিতে হইবে।

(গ) দ্রব্যটি দেখিয়াই সহজে চিনিতে পারার উপযোগী হওয়া চাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রতীয়মানতা (Cognizability) থাকা চাই।

(ঘ) দ্রব্যটির যোগান যত অনিশ্চিত হইবে ও মানুষের আয়ত্বের বাহিরে থাকিবে ততই তাহার দাম-পরিবর্তন লইয়া ব্যবসা করার সুবিধা হইবে।

বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য এবং কোম্পানীর শেয়ার বা স্টক্‌সমূহ ফাট্‌কা ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সামগ্রী। কোম্পানীর শেয়ার হইতে ভবিষ্যতে কিরূপ লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে এবং কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ হইবে তাহার ভিত্তিতে উহার শেয়ারের দামের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি লইয়া ব্যবসা আধুনিক জগতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ফাট্‌কা বাজারের সংগঠন (Organisation of Speculative Markets):

দ্রব্যের দামের পরিবর্তন লইয়া যে ব্যবসা তাহা চলে দ্রব্যের ফাট্‌কা বাজারে (Produce-exchanges) আর শেয়ারের দামের পরিবর্তন লইয়া ফাট্‌কা ব্যবসা চলে শেয়ার বাজারে (Stock exchanges)।

শেয়ার বাজারে দুই জাতীয় লোক থাকে, মূল শেয়ার ব্যবসায়ী (Jobber) ও দালাল (Brokers)। মূল শেয়ারের ব্যবসায়ীরা শেয়ার লইয়া আসল ব্যবসা করে এবং শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় দাম মোটামুটিভাবে স্থির করে। সেই দাম লইয়া দালালরা জনসাধারণের নিকটে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের জন্য যায়। এই মূল শেয়ার ব্যবসায়ীরাই আসলে ফাট্‌কাদার (Speculator); দালালরা তাহাদের অনুচর মাত্র। ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণের উপর কমিশন পাইয়া কাজ করিয়া থাকে।

যদি ফাট্‌কা ব্যবসায়ীর ধারণা হয় যে ভবিষ্যতের দাম কমিয়া যাইবে তাহা হইলে বর্তমানের দরে ভবিষ্যতে যোগান দিবে এইরূপ অগ্রিম চুক্তি করিয়া লয় এবং ভবিষ্যতে দ্রব্যের দাম কমিলে তাহা কম দামে ক্রয় করিয়া পূর্বের দামে যোগান দিয়া লাভ করে। কিন্তু ভবিষ্যতে দাম না কমিলে তাহার লোকসান হইবে তাই সে লোকসানের সম্ভাবনা এড়াইতে চায়। এই উদ্দেশ্যে সে অপর ব্যবসায়ীর সহিত

ফাট্‌কা ব্যবসার পদ্ধতি

একই সময়ে অগ্রিম চুক্তির দ্বারা তাহার নিকট হইতে ভবিষ্যতে কম দামে দ্রব্য ক্রয় করিবার ব্যবস্থা বর্ত্তমানেই করিয়া রাখে। এইরূপে এক ঝুঁকির দ্বারা অন্য ঝুঁকি হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। ইহাকে ব্যবসায়ীদের চালু ভাষায় হজ্ করা (Hedging) বলে। যে ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে দাম কমিবে এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া বর্ত্তমানের দরে ভবিষ্যতে যোগান দিবে বলিয়া অগ্রিম চুক্তি করে অথবা বর্ত্তমানে অধিক বিক্রয়ের চেষ্টা করে, তাহাদের কার্য্যের ফলে দাম কমিয়া আসিতে চাহে এইজন্য তাহাদের মন্দীওয়ালা (Bears) বলা হয়। অপর পক্ষে যাহারা ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে এই আশায় বর্ত্তমানে দ্রব্য মজুত রাখে অথবা ভবিষ্যতে তখনকার দামে যোগান দিবে বলিয়া অগ্রিম চুক্তি করে, তাহারা তাহাদের কার্য্যের ফলে দাম বাড়াইয়া দেয়। তাহাদের তেজীওয়ালা (Bulls) বলে।

ফাট্‌কা ব্যবসায়ের উপকার (Benefits of Speculation).

এক] ফাট্‌কা ব্যবসায়ের ফলে উৎপাদকের ঝুঁকি কমিয়া যায় ; দ্রব্য বিক্রয় বা কাঁচামালের যোগান উভয় ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত থাকিয়া সে উৎপাদনে মনোনিয়োগ করিতে পারে। উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দামের তারতম্য কমিয়া আসে। দ্রব্যের বিভিন্ন ধরণ ও প্রকারের মধ্যে দামের সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

দুই] বিভিন্ন সময়ের মধ্যে দামের উঠানামার তীব্রতা কমাইয়া দেওয়া এইরূপ ফাট্‌কা ব্যবসার অন্যতম কার্য্য। ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে এইরূপ আশায় বর্ত্তমানে দ্রব্য মজুত রাখিয়া তাহারা বর্ত্তমানের যোগান কমাইয়া দেয় এবং ভবিষ্যতের যোগান বাড়াইয়া দেয়। ফলে বর্ত্তমানেই দাম বাড়িবার ঝোঁক দেখা দেয়, ভবিষ্যতেও যোগান বৃদ্ধির ফলে দাম ততটা বাড়িতে পারে না। বাজারে যদি অনেক ফাট্‌কাদার থাকে এবং প্রত্যেকেরই আন্দাজ যদি সঠিক হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দাম-পার্থক্য থাকে না কাহারও কোন লাভ হয় না। এইজন্য বলা হয় যে নিখুঁত ফাট্‌কা ব্যবসা নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করে, কিন্তু সমাজের উপকার করে।

তিন] ভবিষ্যতে যে দ্রব্যের দাম বাড়িতে পারে ফাট্‌কাদার বর্ত্তমানেই তাহা কিনিতে চাহে বলিয়া, উৎপাদকগণ উহার উৎপাদন এখনই সুরু করিয়া

দিতে পারে। ফাটকাদারদের মারফৎ উৎপাদকগণ ভবিষ্যৎ চাহিদার রূপ ও পরিমান সম্বন্ধে আভাস পায়।

চার] শেয়ার বাজারে ফাট্‌কা ব্যবসার উপকার হইল যে তাহা শিল্পে সঞ্চয়ের বিনিয়োগকে (investment) সাহায্য করে এবং দেশে মূলধন-গঠনে (Capital Formation) সহায়তা করে। জনসাধারণ তাহাদের সঞ্চয়কে কিরূপে বিভিন্ন শেয়ারে খাটাইবে তাহা তাহারা শেয়ার-বাজারে বিভিন্ন শেয়ারের দাম ও তাহার উঠানামা বুঝিয়া স্থির করে। যে শেয়ার হইতে ভবিষ্যতে লভ্যাংশের পরিমাণ বেশী আশা করা যায় এবং যে ফার্মের অবস্থা ভাল, ব্যবসাদাররা অধিক দামে সেই শেয়ার ক্রয়ে প্রবৃত্ত হয়। জনসাধারণও সেই শিল্পে অর্থ বিনিয়োগে অগ্রসর হয়।

পাঁচ] নূতন কোম্পানী গঠন করিতে হইলে যে মূলধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন তাহা শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের মারফৎ উঠান সম্ভবপর হয়। দেশে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের (Long-term investment) পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। বাজারে চলিত সুদের হারের সহিত মূলধন হইতে সম্ভাব্য মুনাফার হারের তুলনা করিযা জনসাধারণ এইরূপ বিনিযোগ করিয়া থাকেন। সাধারণ ভাবে, মূলধনের প্রান্তিক কার্য্যকারিতা (The marginal efficiencey of Capital, in general) যদি অধিক হয তাহা হইলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে এবং উহা কম হইলে বিনিয়োগ কম হইবে। বিভিন্ন প্রকার মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন হইতে সম্ভাব্য মুনাফার হার শেয়ার বাজার হইতেই জনসাধারণ জানিতে পারেন এবং সেই ভাবে তাহাদের অর্থ বিনিয়োগ করেন। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধে দীর্ঘকালীন আন্দাজ ও আশা-নিরাশা (Long-term expectations) ব্যবসায়ীদের মনের মধ্যে শেয়ার বাজারের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াই গড়িয়া উঠে।

ছয়] নূতন কোম্পানী ছাড়াও পুরাতন কোম্পানীগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় মূলধন শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রযের দ্বারা শেয়ার বাজারের মারফৎ তুলিতে পারে।

সাত] বিনিয়োগের তারল্যরূপ বা তরলতা (Liquidity) বজায় রাখিবার পক্ষে শেয়ার বাজার যথেষ্ট সহায়তা করে। যখন খুসী শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের সুবিধা থাকায় বিনিয়োগকারীর অর্থ দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিবার ভয় থাকে না।

ফাট্‌কা ব্যবসায়ের দোষত্রুটি (The evils of Speculation)

এক] সকল ফাট্‌কা ব্যবসাকেই প্রতিযোগিতামূলক ফাট্‌কাদারী (Competitive speculation) বলা চলে না। বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে আধুনিক কালে যাহা চলিতেছে তাহাকে লার্ণারের ভাষায় আক্রমণাত্মক ফাট্‌কাদারী (Aggressive Speculation) বা এক-চেটিয়া মূলক ফাট্‌কা ব্যবসা (Monopolistic Speculation) বলা চলে। ধনী ও শক্তিশালী ফাট্‌কাদারগণ একসঙ্গে অধিক ক্রয় বিক্রয় করিয়া বাজার দামকে পরিবর্তন করে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়ায়। দামের উঠানামার তীব্রতা কমাইবার পরিবর্তে এই ধরণের ফাট্‌কাদারী এই তীব্রতা আরও বাড়াইয়া দেয়; স্থান-কাল নির্বিশেষে দাম-পার্থক্য মুছিয়া ফেলিতে সহায়তা করে না।

আক্রমণাত্মক ফাট্‌কাদারী—দামের উঠানামার তীব্রতা বৃদ্ধি

দুই] ফাট্‌কাদারগণ প্রায়ই অসৎ হইয়া থাকে। বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালক বা কর্মচারীদের নিকট হইতে গোপন খবর সংগ্রহ করিয়া, বাজারে মিথ্যা গুজব ছড়াইয়া তাহারা শেয়ার বা দ্রব্যের দামের নিজ স্বার্থের উপযোগী কৃত্রিম পরিবর্তন ঘটায়। যেমন কোন প্রভাবশালী ফাট্‌কাদার যদি ভাবে যে, একটি কোম্পানী ভবিষ্যতে বেশী লভ্যাংশ দিবে এবং সেই শেয়ারের দাম ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইলে সে হঠাৎ প্রচার করিতে সুরু করে যে, ঐ কোম্পানীর অবস্থা খারাপ, আরও খারাপ হইবে, অবিলম্বে উহার শেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত। বহু প্রচারের মারফৎ সে চতুর্দিকে ইহা রটাইয়া দেয় যে সে নিজেও শেয়ার বিক্রয় করিতেছে। ইহার ফলে বাজারে সেই শেয়ারের দাম কমিয়া যাইবে এবং সেই ফাট্‌কাদার গোপনে এই শেয়ারগুলি কম দামে বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে, ভবিষ্যতে দাম বাড়িলে প্রচুর মুনাফা করিবে। এইরূপ দুর্নীতি, ভাঁওতা ও অপরকে ঠকান ফাট্‌কাদারদের প্রচলিত রীতি নীতি।

শেয়ার-বাজারে অন্যায় কাজকর্ম

অনেক সময় তাহারা কোন দ্রব্যের যোগানের বৃহৎ অংশ নিজেরা করায়ত্ত করিয়া ফেলে এবং অস্থায়ী একচেটিয়া অবস্থা সৃষ্টি করিয়া অতিরিক্ত লাভের চেষ্টা করে।

তিন] (ক) শেয়ার বাজারে অসৎ ফাট্‌কাদারী সমাজের বিপুল অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। কোন কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থানুযায়ী, তাহার

লভ্যাংশ দিবার ক্ষমতানুযায়ী এবং সেই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনুযায়ী ঐ শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ হওয়া উচিত। যে শিল্প হইতে সম্ভাব্য মুনাফার হার অধিক, বিনিয়োগ বেশী হওয়া দরকার কিন্তু কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা, গুজব, ও অসৎ প্রচারের সাহায্যে ফাট্‌কাদাররা এমন ফার্মের শেয়ারের দাম বাড়াইয়া রাখে যে দিকে সমাজের অর্থনৈতিক স্বার্থে বিনিয়োগ কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সমাজের স্বার্থে বিভিন্ন শিল্পের সম্ভাবনা অনুযায়ী মূলধনের প্রয়োগ ইহাদের কার্য্যের ফলে সম্ভবপর হয় না।

মূলধনের নিয়োগ সুবিন্যস্ত না-ও হইতে পারে

(খ) শেয়ার বাজারে এইরূপ অসৎ পদ্ধতিসমূহ প্রচলিত থাকিবার দরুণ দেশে মূলধন-গঠন (Capital Formation) ব্যাহত হয়। বিশেষতঃ, অনুন্নত দেশ সমূহে লোকের শিল্প বিনিয়োগে স্বভাবতঃই একটু দ্বিধা থাকে, শেয়ার বাজারের যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ভরসা কমিয়া যায়। ফলে শিল্পে মূলধন-বিনিয়োগ যথোপযুক্ত পরিমাণে হয় না। সমাজের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া, ব্যক্তিগত লাভালাভের ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্পে মূলধন প্রবাহিত হয়। কেইন্‌স্ বলিয়াছেন যে, শিল্প ও ব্যবসার প্রবহমান স্রোতের উপর বুদ্‌বুদের মতন হইলে ফাট্‌কাদারী কোন অনিষ্ট করিতে পারে না বটে কিন্তু যদি ফাট্‌কাদারীর ঘুর্নিতে শিল্পোদ্যোগ বুদ্‌বুদের ন্যায় নাচিতে থাকে এবং এক সময় হঠাৎ ফাটিয়া তলাইয়া যায়, তাহা হইলে অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়া উঠে। যখন কোন দেশের মূলধন-গঠন ভাডাটে নাচঘরের কাজকর্ম্মের ফলস্বরূপ হইয়া দাঁডায়, কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইবারই সম্ভাবনা।

মূলধন-গঠন ব্যাহত হইতে পারে

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের কারণ হিসাবে শেয়ার-বাজারের ফাট্‌কাদারী বহুলাংশে দায়ী, ইহাই কেইন্‌সের অভিমত। যদি অভিজ্ঞ ও সৎ ব্যক্তিগণ ভবিষ্যৎ দামের উঠানামা সম্বন্ধে সঠিক আন্দাজ করিতে পারেন তাহা হইলে দামের হ্রাস-বৃদ্ধির তীব্রতা কমিয়া সমাজের উপকার হয়। কিন্তু সেরূপ বুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তি খুব অল্প ফাট্‌কাদারেরই আছে। তাহারা সকলেই শেয়ারের স্বল্প-কালীন দাম পরিবর্তন হইতে মুনাফা চাহে কিন্তু শিল্পের দীর্ঘকালীন উন্নতি বা অবনতির সম্ভাবনা বিচার করিয়া বিনিয়োগ বা ঝুঁকি গ্রহণ করে না। স্বল্পকালীন দামের উঠানামাও তাহার নিজের বিবেচনা শক্তি প্রয়োগ না করিয়া বুঝিতে চাহে।

সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো-তে ব্যাপক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা আসে

সাধারণ ফাট্‌কাদারগণ প্রত্যেকেই ভাবিতে চেষ্টা করেন যে, দামের উঠানামা সম্বন্ধে সাধারণ ফাট্‌কাদারদের মধ্যে সাধারণ ধারণা কিরূপ। অনভিজ্ঞ একদল লোকের দলবদ্ধ মনস্তত্বের প্রভাবে (Mass-Psychology) শেয়ারের দাম স্থির হয় এবং সেই দলবদ্ধ জনমত বহু বিভিন্ন এবং অর্থনৈতিক কারণে পরিবর্তিত হওয়ায় শেয়ারের দামের উঠানামা তীব্র ও ব্যাপকভাবে ঘটিয়া থাকে। শিল্পের সম্ভাবনা চিন্তা না করিয়া যে সাধারণ ফাট্‌কাদারগণ সাধারণ ফাট্‌কাদারের গতিবিধি সম্পর্কে কিরূপ চিন্তা করিতেছেন তাহা আন্দাজ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। কেইন্‌স্ ইহাকে তৃতীয় স্তরের ফাট্‌কাদারী বলিয়াছেন (Speculation of the third degree).

অনুশীলনী

1. Explain carefully the possible beneficial and harmful results of the actions of speculation. (B. com. '51)

2. Discuss the nature and necessity of Speculation in modern Community. (B. com. 53)

3. Do you think that the modern productive organisation would suffer a great loss if all stock and produce-exchanges are closed down ? (B. com. 55)

4. Discuss the Economic Functions of Speculation. (B. A. '48)

5. Discuss the Functions of Stock Exchanges, Indicating, in particular, how they promote the investment of Capital. (B. A. 56)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বণ্টন বা উপাদানের দাম-নিরূপণ

বণ্টন কাহাকে বলে ? (What is Distribution ?) :

যে উপাদানসমূহের সাহায্যে উৎপাদন হইয়া থাকে, তাহারা উৎপাদন ধারায় তাহাদের কার্য্যনিয়োগ করিবার দরুণ দাম বা পারিশ্রমিক পায়। বিভিন্ন উপাদানের দামের নাম বিভিন্ন—জমি ব্যবহারের দাম খাজনা, শ্রমশক্তি ব্যবহারের দাম মজুরী, মূলধন ব্যবহারের দাম সুদ এবং পরিচালনা শক্তি ব্যবহারের দাম মুনাফা। উপাদান সমূহের মালিকদের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বিভক্ত হইয়া যায়, ইহাকে বণ্টন বলে। জাতির মোট উৎপাদন বা জাতীয় আয় কিরূপে বিভিন্ন উপাদানের মালিকের প্রাপ্য হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের মালিকানার দরুণ সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হয়, ধনবিজ্ঞানে উহাই বণ্টন নামে অভিহিত। উপাদান সমূহের দাম নির্দ্ধারণ তত্ত্ব সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম-নির্দ্ধারণ তত্ত্বেরই প্রয়োগ, উপাদান-বাজারে চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দাম-নিরূপণের পদ্ধতি মাত্র। ইহাকে কার্য্যগত বণ্টন (Functional Distribution) বলে।

কার্য্যগত বণ্টন

সমাজে সকল ব্যক্তিই কোন না কোন উপাদানের মালিক বলিয়া আয় করিতে পারে, তাই সকল ব্যক্তিরই আয় খাজনা, মজুরী, সুদ বা মুনাফা যে কোন আকারে হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির কিরূপ আয় হয় তাহা নির্ভর করে সে কতটা উপাদানের মালিক এবং সেই উপাদানের কি দাম তাহার উপর। দেশে ব্যক্তিগত আয়ের কাঠামো স্থির হয় সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন, উত্তরাধিকারী আইন, সমাজ ও রাষ্ট্র শক্তির বিন্যাসের উপর। ব্যক্তিগত আয়-বণ্টন (Personal Distribution) ইহাদের দ্বারা স্থির হয়।

ব্যক্তিগত বণ্টন

ধনবিজ্ঞানে বণ্টন বলিতে কার্য্যগত বণ্টন বুঝায়। বণ্টন-তত্ত্বের গুরুত্ব খুবই বেশী, কারণ দেশে সম্পদের বণ্টনের উপর অর্থনৈতিক কল্যাণ বহুলাংশে নির্ভর করে, শুধু উৎপাদনের উপর নহে।

প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্ব (Theory of Marginal Productivity) :

জাতীয় আয় সকল উপাদানের মধ্যে কিভাবে বিভক্ত হইয়া যায় তাহার সম্বন্ধে ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাদের মতে উপাদানের দাম নির্ভর করে প্রধানতঃ উহার চাহিদার উপর ; এবং উপাদানের চাহিদা নির্ভর করে সেই উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার উপর। প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা অধিক হইলে সেই উপাদানের দাম বেশী এবং প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা কম হইলে উহার দাম-ও কম।

উৎপাদন ধারায় সকল উপাদান নিযুক্ত আছে এবং তাহাদের সম্মিলিত কার্য্যের ফলে কিছু পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। যদি অপর সকল উপাদানকে মোট স্থির রাখিয়া কেবল একটি উপাদানের এক ইউনিট বাড়ান যায়, তাহা হইলে উৎপন্ন (Total Product) যতটুকু বৃদ্ধি হইবে তাহার দ্বারা সেই উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা পরিমাপ করা যায। যেহেতু অপর সকল উপাদানের পরিমাণে কোন পরিবর্তন হয় নাই, সেইজন্য মোট উৎপন্নের বৃদ্ধির সকল টুকুই বর্দ্ধিত উপাদানের নিয়োগের ফল, ইহা তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ। যদি সেই উৎপাদানটির এক ইউনিট অধিক নিয়োগের ফলে, অন্যান্য উপাদানের রদবদল অবশ্যম্ভাবী হইযা পড়ে এবং তাহাদের দরুণ ব্যয় কিছুটা বাড়ে তাহা হইলে বর্দ্ধিত উৎপাদনের পরিমাণ হইতে সেই ব্যয় বাদ দিতে হয। (যেমন একজন শ্রমিক অধিক নিয়োগের ফলে একটি কোদাল বা কাঁচামাল অধিক ক্রয় করিতে হইল)। প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ হইতে এই সকল অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদ দিলে উপাদানটির প্রান্তিক নীট উৎপাদন ক্ষমতা পাওয়া যায় (Marginal Net Productivity)।

যতই একটি উপাদান নিয়োগের পরিমাণ বাড়ান যায় ততই উহার প্রান্তিক নীট উৎপাদানক্ষমতা কমিয়া আসে, কারণ উপাদানের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার নিয়ম (Law of Diminishing Marginal Productivity of a factor) কার্য্যকরী হইতে থাকে। অন্যান্য সকল উপাদান যথা-সম্ভব স্থির রাখিয়া কেবল একটি উপাদান ক্রমাগত বৃদ্ধি করিবার ফলে মোট উৎপন্ন বৃদ্ধি পায় কিন্তু সে বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিয়া আসে। উপাদানটির প্রান্তিক

উৎপন্নের দাম (Value of the Marginal Product) যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই উপাদানের দাম হইতে বেশী থাকে, ততক্ষণ ফার্ম্মটি উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া চলে, উপাদানটির জন্য তাহার চাহিদা বজায় থাকে। কিন্তু যতই উপাদানটির নিয়োগ বাড়ান হয় ততই তাহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং এমন এক অবস্থায় পৌঁছে, যখন প্রান্তিক উৎপন্নের দাম সেই উপাদানের বর্ধিত ইউনিটটির দামের সমান হয়।

ফার্ম তাহার পরে আর উপাদানের চাহিদা ও নিয়োগ করিবে না, কারণ আরও উপাদান নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপন্নের দামের তুলনায় উপাদানের দাম বেশী দিতে হয়, ফার্মের লোকসান সুরু হইয়া যায়। সুতরাং দেখা যায় যে উপাদানের দাম কখনই তাহার প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার অধিক হইতে পারে না।*

দ্রব্যের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা হইলে যে দ্রব্য অধিক উৎপন্ন হইতেছে (অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপন্ন দ্রব্য) ফার্মটি তাহা বাজার দামে বিক্রয় করিতে পারে, উহা বিক্রয়েব জন্য দ্রব্যের দাম কমাইতে হয় না। প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ × দ্রব্যের ইউনিট প্রতি দাম, ইহাকে উৎপন্নের প্রান্তিক রেভিনিউ বলে (Marginal Revenue Product)।

যখন দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে বা একচেটিয়া-মূলক প্রতিযোগিতা থাকে, সেই অবস্থায় অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দ্রব্যের দাম কমাইতে হয়, সুতরাং প্রান্তিক রেভিনিউ ক্রমেই কমিতে থাকে। উপাদানের নিয়োগ সেই পর্য্যন্ত চলে, যখন এক ইউনিট উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক রেভিনিউ-র সমান।

এইভাবে উপাদান সমূহের দাম তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান হইয়া পড়ে। কিন্তু ফার্ম এই অবস্থায় পৌঁছিবার পরেও স্থির হয় না ; সে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণের ব্যবহারে রদবদল করে, বেশী দামী উপাদান নিয়োগ না করিয়া উহার পরিবর্তে কম দামী উপাদান নিয়োগ করিতে চাহে।

* যখন উপাদান-বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তখন ফার্মটি যতই উপাদান ক্রয় করুক না কেন উপাদানের দামে কোন পরিবর্তন হয় না। প্রতিযোগিতা-মূলক দামে উপাদান ক্রয় করিলে যতক্ষণ উহার প্রান্তিক উৎপন্নের দাম উহা হইতে অধিক থাকে, ততক্ষণ উপাদানের নিয়োগ চলে।

উপাদানের দাম ও প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা বিচার করিয়া ফার্মটি এক উপাদানের পরিবর্তে অপর উপাদান নিয়োগ করে। যখন প্রত্যেকটি উপাদানের দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাত সমান হয়, সেই পর্য্যন্ত এই উপাদান-পরিবর্ততা (Factorial Substitution) চলিতে থাকে। যেমন মনে করা যাক যে ক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা ৯০৲ এবং ইহার দাম ৩০৲; ইহাদের অনুপাত ৩ : ১। খ উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬০৲ এবং ইহার দামও ৩০৲, ইহাদের অনুপাত ২ : ১। ক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অধিক থাকায় বেশী পরিমাণ 'ক'-এর নিয়োগ হইতে থাকিবে। ফলে 'ক'-এর প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়া আসিতে থাকিবে এবং অবশেষে দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাত ২ : ১ হইবে। এরূপ অবস্থায আর উপাদান-পরিবর্ততা লাভজনক নহে। এই অবস্থাতেই ফার্মের মোট উৎপাদন সর্বাধিক। ভারসাম্যের অবস্থায় পৌঁছিলে প্রত্যেক উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপন্নের দামের সমান হইবে। এইরূপে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারাই উপাদানের দাম বা পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয।

সংক্ষেপে ইহাই হইল প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বিশ্লেষণে কয়েকটি বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে হয়। **প্রথমতঃ** এই তত্ত্ব ধরিয়া লয় যে, একটি উপাদানের সকল ইউনিট গুণ ও যোগ্যতার ব্যাপারে সমান—উহারা এক-জাতীয় (homogenous), এবং একের বদলে অন্যকে ব্যবহার করা চলে। **দ্বিতীয়তঃ**, ইহা ধরিয়া লয় যে সকল উপাদানই সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য কোন বৃহৎ বা অবিভাজ্য উপাদান (Indivisible factor) নাই। **তৃতীয়তঃ**, এই তত্ত্ব ধরিয়া লয় যে প্রত্যেকটি ফার্ম সর্বাধিক মুনাফা লাভের জন্য চেষ্টা করে এবং সেই ভাবে উপাদানের চাহিদা ও নিয়োগ করে।

সমালোচনা (Criticisms) :

(ক) সর্বশেষ উৎপন্ন দ্রব্য (Final product) কোন একটি উপাদানের নিজস্ব সৃষ্টি নয়, উহা সকল উপাদানের কার্য্যের মিলিত সৃষ্টি। সুতরাং কোন উপাদানের পৃথক প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা বাহির করা বাস্তবে সম্ভব নহে। টাউসিগ্, ডাভেনপোর্ট, আঁদ্রিয়াল্স, ইহারা এইরূপ সমালোচনা করিয়া থাকেন।

(খ) হবসন্ বলেন যে যন্ত্র ও কৌশল অনুযায়ী সাধারণতঃ উৎপাদন পদ্ধতি

নির্দিষ্ট থাকে ; উপাদানের এক ইউনিট কমান বা বাড়ান চলে না ; প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করা যায় না।

(গ) এই তত্ত্বের স্বীকার্য্য বিষয়গুলি (assumptions) সঠিক বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে না। একটি উপাদানের সকল ইউনিট গুণ ও যোগ্যতার ব্যাপারে এক-জাতীয় ইহা ঠিক নহে ; উৎপাদন ধারায় বহু বৃহৎ ও অবিভাজ্য উপাদান থাকে যাহার এক ইউনিট যোগ বা বিয়োগ সমগ্র উৎপাদনপদ্ধতিতে ও উপাদান সম্মিলনে পরিবর্ত্তন ঘটায় ; সকল ফার্ম সব সময়ে সর্বাধিক মুনাফা আয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না।

(ঘ) এই তত্ত্ব কেবলমাত্র উপাদানের চাহিদা কিরূপে স্থির হয় তাহা ব্যাখ্যার চেষ্টা করে, কিন্তু উপাদানের যোগান-ও যে তাহার দাম নির্ধারনে প্রভাব ফেলে তাহা এড়াইয়া যায়।

(ঙ) এই তত্ত্ব ধরিয়া লয় যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তব জগতে পূর্ণপ্রতিযোগিতা নাই, অপূর্ণ বা একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতাই সাধারণতঃ চলিতেছে। এইরূপ অবস্থায় কোন উপাদানের দাম বা পারিশ্রমিক প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় কম বা বেশী হইতে পারে।

(চ) অনেক সময় এই তত্ত্বের সাহায্যে বর্তমান আয়-বৈষম্য সমর্থনের চেষ্টা চলে। বলা হয় যে, প্রত্যেক উপাদানই তাহার উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী আয় করে ; সুতরাং সমাজে শোষণ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে ; ইহা ব্যক্তিগত আয় ও কার্য্যগত আয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। ব্যক্তিগত আয় নির্ভর করে উত্তরাধিকার বা অন্যান্য সামাজিক নিয়মের উপর (যেমন ধনিকের পুত্র ধনিক সমাজে সুপরিচিত বলিয়া উচ্চপদস্থ চাকুরী লাভ করে।)

উপাদানের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকিলে উপাদানের দাম কি ভাবে স্থির হয়—বণ্টন সম্বন্ধে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (How Factor-Price is determined under Perfect Factor Market or Demand and supply theory of Distribution.)

বণ্টন সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব, আধুনিক ধনবিজ্ঞানে, দাম-নির্ধারণ তত্ত্বেরই প্রয়োগ মাত্র। দ্রব্যের দামের ন্যায়, উপাদানের দামও উপাদান-বাজারে যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতের ফলে ভারসাম্যের বিন্দুতে

স্থির হইয়া থাকে। যেহেতু প্রত্যেক উপাদানের যোগান ও চাহিদার কারণ ও অবস্থা পৃথক, সেইজন্য খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা সম্পর্কে বহুবিধ তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে।

উপাদানের যোগান: দ্রব্যের ক্ষেত্রে যোগান নির্ভর করে উহার উৎপাদন-ব্যয়ের উপর। কিন্তু উপাদানের ক্ষেত্রে সেরূপ কোন উৎপাদন-ব্যয় (Production-cost) নাই। উপাদানের বাজারে উহার যোগান নির্ভর করে তাহার সুযোগ-ব্যয়ের (Opportunity Cost) উপর বা কর্মান্তর ব্যয়ের (Transfer Cost) উপর।

উপাদানের মালিক যাহাতে উপাদানকে উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজী হয় এইজন্য তাহাকে দাম দিতে হয়। যদি বেশী দাম দেওয়া হয় তাহা হইতে উপাদানের যোগান বাড়িবে, যদি কম দাম দেওয়া হয় তাহা হইলে উপাদানের যোগান কমিবে। উপযুক্ত পরিমাণ উপাদানের যোগান পাইতে হইলে যে দাম না দিলে চলিবে না, তাহাকে সেই উপাদানের নিম্নতম যোগান-দাম (Minimum Supply Price of a factor) বলা হয়।

এক উপাদানকে বহু শিল্পে নিয়োগ করা চলে। তাই উপাদানেব মালিক কোন্ ব্যবহারে উপাদান নিয়োগ করিলে সর্বাধিক দাম পাইবে, তাহা তুলনা করিয়া সেই দামে এবং সেই ব্যবহারে উপাদানকে নিযোগ করিবে। সুতরাং কোন উপাদানের নিম্নতম, যোগান দাম নির্ভর করে ওই উপাদানের সম্মুখে নিযুক্ত হইবার মত কিরূপ পরিবর্ত-ব্যবহাব (alternative uses) আছে এবং সেই সকল অন্যান্য ক্ষেত্রে ফার্মসমূহ কি দাম দিতে চাহিতেছে।

উপাদানের চাহিদা: কোন উপাদানের চাহিদা-দাম (Demand price) ইহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা স্থির হয়। উপাদানের একটি ইউনিট উৎপাদন-কার্য্যে নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয় তাহাকে উক্ত উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বলে। উপাদানের দাম হইতে উহার প্রান্তিক উৎপন্নের দাম বেশী থাকিলে উপাদানটির চাহিদা বাড়িতে থাকে এবং যখন উপাদানের দাম ও উহার প্রান্তিক উৎপন্নের দাম সমান হয়, সেই পর্য্যন্ত উপাদানটির চাহিদা ও নিয়োগ হয়, এই অবস্থায় মোট উৎপন্নের পরিমাণ সর্বাধিক।

এই ভাবে উপাদান-বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের বিন্দুতে উপাদানের দাম স্থির হয়। এই তত্ত্ব কয়েকটি বিষয় স্বীকার করিয়া বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়, যেমন, কোন উপাদানের সকল ইউনিট এক-জাতীয় এবং একটির পরিবর্ত্তে অপরটির ব্যবহার সম্পূর্ণ সম্ভব: প্রত্যেক উপাদানই সম্পূর্ণ বিভাজ্য এবং পরিবর্ত্তনীয় অনুপাতের নিয়ম উৎপাদন ক্ষেত্রে কার্য্যকরী আছে।

উপাদানের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে উপাদানের দাম কি ভাবে স্থির হয়—অপূর্ণ প্রতিযোগিতা মূলক অবস্থায় বণ্টন তত্ত্ব (How Factor Price is determined in Imperfect Factor-Market—Distribution under Imperfect Competition):

বাস্তবে দেখা যায় যে উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না এবং ইহার ফলে উপাদানের দাম যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতিযোগিতা জনিত ভারসাম্যের বিন্দুতে (Competitive equilibrium) স্থির না-ও হইতে পারে। উপাদানের বাজারে বহু কারণের ফলে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে। উহার ক্রয়ের দিকে, বা বিক্রয়ের দিকে অথবা উভয় দিকেই পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থাসমূহ অনুপস্থিত থাকিতে পারে।

যদি কোন বিশেষ ধরণের উপাদানের চাহিদা মাত্র একটি ফার্ম হইতেই হয়, তাহা হইলে সেই উপাদানের বাজারে একক-ক্রেতা (Monopsonist buyer) আছে বলা হয়। এইরূপ একক-ক্রেতা উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে কম পারিশ্রমিক দিয়া সর্বদাই শোষণ করিতে পারে। বেশী উপাদান নিয়োগ করিলে দাম বেশী দিতে হইতে পারে এই কারণে কম উপাদান নিয়োগ এবং কম উৎপাদন করিতেছে—একক ক্রেতার পক্ষে উহা-ও অসম্ভব নহে। এইরূপ শোষণ সম্ভবপর হয়, কারণ সেই উপাদান অন্যত্র নিযুক্ত হইতে চলিয়া যাইতেছে না অর্থাৎ উপাদানের চলনশীলতা (Mobility) কম। যতই উপাদানটির চলনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে, ততই তাহাকে নিজের ফার্মে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার জন্য অধিক পারিশ্রমিক দিতে হইবে। উপাদানের চলনশীলতা কমিয়া গেলে উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে পারিশ্রমিক-ও কমিয়া যাইবে, কারণ

ক্রয়ের দিকে: একক ক্রেতা, কতিপয় ক্রেতা; বিক্রয়ের দিকে: বিক্রেতার পছন্দ, একক বিক্রেতা; উভয় দিকে: দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া বা দ্বিপাক্ষিক অলিগোপলি

ফার্মটি জানে যে উপাদানের মালিকের স্থানান্তরে বা কর্মান্তরে চলিয়া যাইবার শক্তি, ইচ্ছা ও সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে।

একক ক্রেতা দাম-স্বতন্ত্রতার দ্বারা-ও শোষণ করিতে পারে। উপাদানের যে ইউনিট যে পারিশ্রমিকের কমে কাজ করিতে রাজী নহে, সেই নিম্নতম যোগান দামে উপাদান-কে নিয়োগ করিতে পারা একক-ক্রেতার পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব।

উপাদানের বাজারে যদি কতিপয়-ক্রেতা থাকে (Oligopsony) তাহা হইলে দাম কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে কতিপয়-ক্রেতাদের নিজেদের মধ্যে মধ্যে কতখানি একযোগে কাজ করার মনোভাব বা সমঝোতা (Collusion) আছে, তাহার উপব। পারস্পরিক সম্পূর্ণ সমঝোতা থাকিলে তাহারা প্রায় একক ক্রেতার ন্যায় কম দামে উপাদান ক্রয় করিতে পারিবে। নিজেদের মধ্যে একত্রে কাজের মনোভাব যত কম থাকিবে, তত বেশী দামে উপাদান ক্রয় করিতে হইতে পারে।

বিক্রয়ের দিকে
(ক) বিক্রেতার পছন্দ

বিক্রয়ের দিকে, উপাদানের বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হইবে যদি কোন ক্রেতা-কে বিক্রেতাগণ বিশেষ ভাবে পছন্দ করে এবং তাহার নিকট উপাদান বিক্রয় করিতে অধিক পরিমাণে ইচ্ছা প্রকাশ করে। (সুনাম, প্রতিষ্ঠা, সম্মান অথবা অধিক নিরাপত্তার আশায় অনেক লোকে যেমন কম মাহিনা-তেও সরকারী চাকুরী বেশী পছন্দ করে)। এইরূপ অবস্থায় সেই পছন্দশীল ক্রেতা বা ফার্ম কম দামে উপাদান ক্রয় করিতে পারে।

(খ) একক বিক্রেতা

বিক্রেতাগণ সংঘবদ্ধ হইয়া এরূপ সংগঠন স্থাপন করিতে পারে যে তাহা উপাদানের বিক্রয় নিজের আয়ত্তে রাখে এবং বিভিন্ন ক্রেতাদের উপর চাপ দিয়া অধিক দামে উপাদান বিক্রয় করিতে পারে। যেমন অনেক শিল্পে শুধু শ্রমিক-সংঘের মারফৎ-ই শ্রমিকের নিযোগ বা বিক্রয় হয়। এইরূপ অবস্থায় উহারা প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা হইতে অধিক দামে উপাদান বা শ্রম বিক্রয় করিতেছে এরূপ ঘটিতে পারে।

তবে, ইহা কেবল স্বল্পকালীন অবস্থায় সম্ভব। কারণ, দীর্ঘকালে সেই উপাদানের পরিবর্তে অপর উপাদানের নিয়োগ করার চেষ্টা হইবে বা একক বিক্রেতার ক্ষমতা ভাঙিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইবে অথবা একক বিক্রেতার সহিত

দরকষাকষি ও শক্তিপরীক্ষার জন্য ক্রেতাদের সংগঠন স্থাপিত হইয়া দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়ার (Bilateral Monopoly) প্রতিষ্ঠা হইবে।

দ্বি-পক্ষিক একচেটিয়া

দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়ার ক্ষেত্রেও উপাদানের দাম কি হইবে, তাহা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না, উহা ক্রেতা-সংঘের ও বিক্রেতা-সংঘের পারস্পরিক শক্তির উপর, উপাদান পদ্ধতিতে উপাদানটির প্রয়োজনীয়তার মাত্রার উপর এবং দ্রব্যের বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে। ক্রেতা-সংঘ যথা সম্ভব কম দাম রাখিতে চাহে, বিক্রেতা-সংঘ যথাসম্ভব বেশী দাম রাখিতে চেষ্টা করে।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও শোষণ

সুতরাং দেখা যাইতেছে, দ্রব্যের বাজারে বা উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে উপাদানের পারিশ্রমিক উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে কম হয়। এরূপ অবস্থায় মালিককে শোষণ (Exploitation) করা হইতেছে, মিসেস্ রবিনসন্ এরূপ বলিতে চাহেন। তাঁহার মতে সমাজে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিবার ফলেই এরূপ শোষণ করা সম্ভব হইতেছে।

কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন বলেন যে, সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন যোগ করিলে দেখা যায় যে উহা মোট উৎপন্ন হইতে অধিক, সুতরাং কোন উদ্বৃত্ত থাকে না যাহাকে আমরা শোষণ বলিতে পারি। সকল উপাদানকে তাহাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার পরে মোট উৎপন্নের কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলেই বলা চলে যে মালিক বা উদ্যোক্তা তাহা শোষণ করিতেছে। দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে সকল ফার্মই মাত্র স্বাভাবিক মুনাফাটুকু পাইতে পারে, যাহা না পাইলে সে ব্যবসা ছাড়িয়া দিবে। সেই স্বাভাবিক মুনাফা ব্যতীত কোন উদ্বৃত্ত লাভ তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে ইহা ঠিক যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় যে পারিশ্রমিক উপাদানের মালিক পাইতে পারিত, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় সে তাহা হইতে কম পায়, কারণ তাহার প্রান্তিক উৎপন্নকে কম দামে-ই বাজারে বিক্রয় করিতে হয়। প্রতিযোগিতার অপূর্ণতা যত দূর হইবে, উপাদান সমূহের পারিশ্রমিকও, সাধারণভাবে, তত বাড়িতে থাকিবে। সুতরাং উহা শোষণ নহে, বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার দরুণই প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে উপাদানের দাম কম হইয়া থাকে।

উপাদানের পারিশ্রমিকের উপর দীর্ঘকালীন প্রভাবসমূহ, বিশেষতঃ শ্রমের ক্ষেত্রে (Long-run influences on income of a factor, expecially Labour)

উৎপাদন ক্ষেত্রে অনেক উপাদান একত্রে কাজ করে এবং সেই কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক পায়। কোন উপাদানের পাওনা ও পারিশ্রমিক দীর্ঘকালে বিভিন্ন কারণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। শুধু শ্রমিকের ক্ষেত্রে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে, কি অবস্থায় এবং কোন্ বিষয়সমূহের প্রভাবে দীর্ঘকালে মজুরী বৃদ্ধি হইভে পারে।

উপাদানের ভবিষ্যত যোগান

প্রথমতঃ, শ্রম দুষ্প্রাপ্য উপাদানে পরিণত হইতে পারে অর্থাৎ উহার যোগান কমিয়া যাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় যে সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বাধিক আয়, সেই সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিক নিযুক্ত থাকিবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের যোগান কম হওয়ায় শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে (কারণ অধিক নিযোগ হইলে উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমেই কমিযা আসে), সুতরাং আয়-ও বাড়িবে। তবে যদি দেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সেই উপাদান অবশ্য প্রয়োজনীয় হয় তবে তাহা কম থাকায় মোট জাতীয় আয় কম হইবে, সকল উপাদানের আয়ই কমিয়া যাইবে।

অন্যান্য উপাদানের ভবিষ্যৎ যোগান

দ্বিতীয়তঃ, যদি জমি এবং মূলধনের যোগান বৃদ্ধি হয় অথবা বর্তমান যোগানকে আরও প্রগাঢ়ভাবে ব্যবহার করা সুরু হয় (একই জমিতে এক ফসলের স্থলে দুই বা তিন ফসল সুরু করা হয় বা একই যন্ত্রে একই দফা সময়ে দুই তিন চালান সুরু হয়) তাহা হইলে জমি ও মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা কমিয়া যায় এবং অধিক ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যায়। যে ক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা অধিক, সেই সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিক নিযুক্ত হয়, কারণ তাহারাই অধিক মজুরী দিয়া সীমাবদ্ধ শ্রমিকের যোগান হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় শ্রমিকের চাহিদা করে। মজুরীর হার বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ, যদি শ্রমিকগণ বেশী পরিমানে, দ্রুতভাবে বা দৈনিক অধিক সময়

পরিশ্রম সুরু করে, তাহা হইলে দেশে মোট শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়।

সংখ্যা সমান রাখিয়া কার্য্যের যোগান বৃদ্ধি

শ্রমের চাহিদা যদি সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হয় তাহা হইলে সমাজে মোট মজুরীর পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, শ্রমিকদের গড় মজুরীর হার-ও বাড়িবে। যদি শ্রমের যোগান সঙ্কোচ প্রসারবিহীন হয়, তবে যোগান কমিয়া গেলেই উহার দাম বা মজুরী বৃদ্ধি পাইবে।

চতুর্থতঃ, শ্রমিকদের শিক্ষা, দক্ষতা, ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। ফলে তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, মজুরীও বাড়িয়া যায়।

অন্য উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা

পঞ্চমতঃ, শ্রমিক ছাড়া অন্য উপাদানের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে পারে (যন্ত্রপাতি বা নূতন পদ্ধতি প্রচলনের দ্বারা); ফলে মোট উৎপন্ন বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং শ্রমিকগণ উহার ফলভোগ করিয়া অধিক মজুরী পাইতে পারেন।

ষষ্ঠতঃ, যদি কোন উপাদান একচেটিয়া অবস্থা স্থাপন করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আয় নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে।

আয়-বৈষম্য (Inequality of Incomes) :

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্থাপিত হইলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল দেশেই কম বেশী আয়-বৈষম্য দেখা যায়। মানুষ সকলেই সমান, ইহা ভগবানের চক্ষে বা আইনের চক্ষে সম্ভব হইলেও, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে আয় ও সম্পদের বিপুল বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক সমাজেই জনসংখ্যার একাংশ কায়ক্লেশে কোনমতে জীবনধারণের উপযোগী আয় করে এবং অপর অংশ আরাম ও বিলাস দ্রব্য ব্যবহারের উপযোগী অধিক আয় পাইয়া থাকে। জাতীয় আয়ের বণ্টন এমন কখনই হয় না যে সকল ব্যক্তির আয় সমান। এইরূপে সমাজে নিম্ন আয়-গোষ্ঠী (Low-income group) ও উচ্চ আয়-গোষ্ঠীর (High-income group) সৃষ্টি হয়। কোন দেশের জাতীয় আয়ের কত অংশ দেশের কত পরিমাণ জনসংখ্যার নিকট চলিয়া যাইতেছে তাহা অনুযায়ী বুঝিতে পারা যায় যে সেই দেশের আয়-বৈষম্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা কি পরিমাণ। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে লর্ড ষ্ট্যাম্প হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, যে সেখানকার আয়কারীদের ১·৩% অংশ মোট জাতীয় আয়ের ২৪·২% অংশ পাইয়া থাকে;

জাতীয় আয়ের বিভাগ ও আয়-বৈষম্যের প্রকৃতি

এবং আয়কারীদের ৭১·৩% অংশ জাতীয় আয়ের ২৯% অংশ মাত্র পাইয়া থাকে। আমেরিকার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জনসংখ্যার ৪০% অংশ জীবনধারণের স্তরের উপযোগী আয় করিতে পারে না ·৩০% অংশ মোটামুটি জীবনধারণের উপযোগী আয় করে এবং বাকী ৩০% অংশের আয় খুব বেশী। সর্বাপেক্ষা ধনী ১% অংশ মোট জাতীয় আয়ের ১৮% অংশ পাইয়া থাকে।

এইরূপ আয়-বৈষম্যের বহু কারণ আছে।

আয়-বৈষম্যের কারণ: যোগ্যতা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার ও পরিবেশ

প্রথমতঃ, বলা হয় যে, যাহারা অধিক যোগ্যতা-সম্পন্ন তাহাদের আয় অধিক, যাহাদের যোগ্যতা কম তাহাদের আয় স্বভাবতঃই কম। কিন্তু এই যুক্তি অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইলেও বাস্তবে দেখা যায় বহু অযোগ্য ব্যক্তি অধিক আয় লাভ করিতে পারিতেছে এবং বহু যোগ্য ব্যক্তি জীবন ধারণের উপযোগী আয় লাভ করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, অধিক আয়-লাভের সুযোগের ফলেই তাহাদের অধিক যোগ্যতা এবং অধিকতর আয়লাভের সুবিধা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আয়-বৈষম্য থাকার প্রধান একটি কারণ হইল সম্পত্তি ও সম্পদের (Property and wealth) উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত মালিকানার ফলেই সম্পদের সঞ্চয় এবং উহা হইতে অধিক আয় লাভ করা সম্ভবপর।

মনে রাখিতে হইবে যে সম্পদ ও সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকিলেও, আয় বৈষম্য থাকিতে পারে, যেমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আয়-বৈষম্য রহিয়াছে। ব্যক্তিগত মালিকানাহীন সমাজেই যোগ্যতার পার্থক্য অনুযায়ী আয়-পার্থক্য থাকা সম্ভব। ব্যক্তিগত মালিকানাযুক্ত সমাজে যোগ্যতার তুলনায় সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকানা-ই আয়-বৈষম্যের প্রধান কারণ; অধিক সম্পত্তির মালিক অন্য ব্যক্তির যোগ্যতা ও কর্মশক্তির উপর মালিকানা স্থাপন করিয়া অধিকতর আয়ের জন্য তাহাদের ব্যবহার করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, উত্তরাধিকার ব্যবস্থা এইরূপ আয়-বৈষম্যের অন্যতম কারণ। সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকের উত্তরাধিকারীগণ জীবনের সুরুতেই সমাজের অন্যান্য সকলের তুলনায় বহু সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা পাইয়া থাকে; ইহার ফলে প্রতিযোগীদের তুলনায় আয় ও উপার্জনের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রারম্ভিক সুবিধা থাকে।

চতুর্থতঃ অধিক আয়-গোষ্ঠীর লোকজন-ই অধিক আয়লাভের সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশ লাভ করে। সামাজিক সম্মান, সুপরিচিতি এবং সম্পদশালী ব্যক্তিদের মধ্যে আনাগোনা অন্যান্য সকলের তুলনায় তাহাদের অধিক আয় লাভের সুযোগ দেয়। মোটামুটি ভাবে তাই, বংশপরম্পরায়, ধনীরাই ধনী থাকে এবং গরীবগন গরীবই থাকে। সুতরাং বলা যায় আয়-বৈষম্যই অধিকতর আয়-বৈষম্যের কারণ।

আয়-বৈষম্যের ফলাফল: শ্রেণী সংগ্রাম, অভিজাততন্ত্র, সমাজ-দেহে অশান্তি, বিপ্লব উপকরণের অপ্রয়োজনীয় নিয়োগ, ইত্যাদি

আয়-বৈষম্যের প্রধান ফল হইল যে, ইহা সমাজ-দেহে একরূপ অশান্তি এবং সঙ্ঘর্ষের ভিত্তি রচনা করে; জাতি নিজেরই মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। বিপরীত স্বার্থযুক্ত যুধ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হইয়া থাকে, শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সঙ্ঘর্ষ সুরু হয়, শ্রেণীবিপ্লবই রাজনৈতিক কর্মাদর্শের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। শ্রেণী স্বার্থ রক্ষাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইয়া পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই আইন কানুন রচিত হয়; ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের ব্যাখ্যা শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরিচালিত হয়। দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন হইয়া পড়ে। অ্যারিষ্টোটল বলিয়াছেন যে চরম আয়-অসাম্যই সমাজ-বিপ্লবের মূলকারণ; মার্ক্স বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে সকল বিপ্লবের সময়েই শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ও সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ফিরাইয়া আনা বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে জড়িত থাকে।

ধনবিজ্ঞানীদের একাংশের অভিমতে আয়-বৈষম্যের ফলে সমাজ-সম্পদের অযৌক্তিক এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার হয়, সমাজের পক্ষে ইহা অপচয়মূলক বলা চলে। সমাজের কমসংখ্যক লোকের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপকরণ নিযুক্ত হয়, অধিকসংখ্যক ব্যক্তি জীবন ধারণের উপযোগী দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। তাহা ছাড়া, আয়-বৈষম্যের ফলে সামগ্রিক কল্যাণ-ও হ্রাস পাইয়া থাকে। ধনী যে ১০০৲ টাকা বিলাস দ্রব্যে ব্যয় করে তাহা গরীবের হাতে থাকিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হইতে পারিত, এবং ওই অর্থ হইতে উপযোগিতা অধিক পাওয়া যাইত। সুতরাং আয়-বৈষম্য কমাইলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণ (Total welfare) বৃদ্ধি পাইবে, ইহাই বলা হইয়া থাকে।

আয়-বৈষম্য দূর করা উচিত, অথবা উহার গভীরতা হ্রাস করা উচিত, ইহা লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সকল মানুষই সমান এবং সকল অসাম্য মানব জাতির অপমানকর ইহা যাঁহারা বলিতে চাহেন, তাহারা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপন এবং ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, এইরূপ বলপ্রয়োগের দ্বারা বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতে পারে ·এবং জাতীয় আয় হঠাৎ খুবই কমিয়া যাইতে পারে।

আয়-বৈষম্য দূর করা

অনেকে বলেন যে, আয়-বৈষম্য সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নহে, কারণ যোগ্যতার প্রভেদ থাকিবেই ; এবং সম্পূর্ণ দূর করা উচিত নহে, কারণ অধিক আয় লাভ করিবার সম্ভাবনা-ই যোগ্যতা-বৃদ্ধির প্রেরণাশক্তি হিসাবে কাজ করিবে। তাহাদের মতে, বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণের দ্বারা আয়-বৈষম্য কমাইয়া দেওয়া উচিত। ক্রমবর্ধমান হারে কর আরোপ, জনপ্রয়োজনীয় শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত করণ, উত্তরাধিকার কর, শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক বীমাব্যবস্থা প্রবর্তন, নিম্নতম মজুরীর হার নির্ধারণ, একচেটিয়া ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দ্বারা আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশে আয়-বৈষম্যের হার কমাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

বা উহা হ্রাস করা

অনুশীলনী

1. Discuss how National Income is distributed among the factors of Production.

2. How the Price of a Factor is determined ?

3. How far is it true to suggest that in the economic society in which we live "the poor are poor because they are bad and the rich are rich because they are good ?" (B. com. '48)

4. Discuss the causes, effects and remedies of economic inequalities.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

খাজনা

সংজ্ঞা (Definition of Economic Rent) :

সাধারণ ভাষায় জমির মালিকরা তাহাদের জমি অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার দরুণ বৎসরান্তে যে নিয়মিত শস্য বা অর্থ পাইয়া থাকে তাহাকে খাজনা বলে। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে বলা হইয়াছে যে, উন্নততর জমির মালিকরা তাহাদের জমিতে উৎপাদনব্যয়ের তুলনায় অধিক উৎপাদন হয় বলিয়া চাষীর নিকট হইতে খাজনা পাইয়া থাকে। আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রেই নহে, অপরাপর সকল উপাদানের মালিকরাও ভোগ করিয়া থাকেন। যে সকল উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ তাহাদের আয়ের মধ্যেই কিছুটা অংশ খাজনা। যে পারিশ্রমিক না পাইলে সেই উপাদান মোটেই কাজ করিতে রাজী হইবে না সেই নিম্নতম যোগান দাম হইতে সে যতটুকু বেশী পারিশ্রমিক পাইতেছে—সেই পার্থক্যটুকুকে বা উপাদানের আয়ের মধ্যে এইরূপ "উদ্বৃত্ত অংশকে" খাজনা বলা চলে। সকল উপাদানের আয়ের মধ্যেই, তাই, এই খাজনা-ভাব (rent-element) থাকিতে পারে। যেমন, কোন শ্রমিক ১॥০ টাকাতেই কাজ করিতে রাজী ছিল, ইহাই তাহার নিম্নতম যোগান দাম। কিন্তু (কোন কারণে) যদি মজুরী বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে সেও, ধরা যাউক, ২।০ মজুরী পাইতে লাগিল। এই ৸০ মজুরের আয়ের মধ্যে খাজনার বা খাজনাংশ রূপ। যদি ১॥০ টাকাতে যথেষ্ট মজুর পাওয়া যাইত তাহা হইলে মজুরী বাড়িত না, শ্রমিকের আয়ের মধ্যে খাজনা-ভাব থাকিত না। ১॥০ টাকাতে মজুরের যোগান সীমাবদ্ধ, সেইজন্য মজুরীর বৃদ্ধি হইতেছে এবং এই খাজনা-ভাবের সৃষ্টি হইতেছে।

আয়ের মধ্যে 'উদ্বৃত্ত অংশ', সীমাবদ্ধ যোগানের দরুণ যাহার সম্ভব হয়

যেহেতু জমির যোগান একেবারেই সীমাবদ্ধ সেইজন্য জমি হইতে জমির মালিকের আয়কে সম্পূর্ণরূপে খাজনা বলা চলে। আমাদের দেশের সাধারণ

তাহায় অথবা ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে খাজনা শুধু জমির মালিকের আয় বলিয়াই ধরা হয়, অন্যান্য উপাদানের আয়ের ক্ষেত্রে নহে। জমির মালিক তাহার জমি অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ায় যে খাজনা পায় তাহাকে মোট খাজনা (Gross Rent) বলে। যদি সে জমিতে নলকূপ বা টিউবওয়েল স্থাপন করে বা যদি কোন জমির উন্নতির জন্য বিশেষ ধরণের চেষ্টা করে তাহা হইলে এই সকল কার্য্যের দরুণ জমির মালিককে মূলধন ব্যয় করিতে হয়। মোট খাজনার মধ্যে এই মূলধনের দরুণ সুদ আদায় করা হয়। মোট খাজনা হইতে এই সুদের অংশ বাদ দিলে নীট বা নিখুঁত খাজনা অথবা অর্থনৈতিক খাজনা (Economic Rent) পাওয়া যায়।

মোট খাজনা ও নীট খাজনা

এই অর্থনৈতিক খাজনাকে অনেক সময় উদ্বৃত্ত (surplus) বলা হয়, কারণ জমিদার কোনরূপ পরিশ্রম বা চেষ্টা না করিয়াই এই আয় পাইয়া থাকে।

উদ্বৃত্ত

অ্যাডাম স্মিথ্ লিখিয়াছেন যে অন্যান্য সব মানুষের মত জমিদাররাও নিজেরা যাহা বপন করে নাই তাহার ফল লাভ করিতে খুবই ভালবাসে। উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় যত অধিক উৎপন্ন হয়, জমিদারগণ সেই উদ্বৃত্ত খাজনার আকারে লাভ করেন বলিয়াও অনেকে খাজনাকে উদ্বৃত্ত বলেন।

রিকার্ডীয় খাজনা তত্ত্ব (Ricardian theory of Rent):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অন্যতম ডেভিড রিকার্ডো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে খাজনা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আলোচনা করেন। তাহার মতে "খাজনা হইল ভূমির উৎপন্নের সেই অংশ যাহা জমির আদি ও অক্ষয় শক্তির দরুণ জমিদারকে দেওয়া হয়।" জমিতে উন্নতির জন্য মূলধন নিয়োগ করিলে জমিদার তাহা হইতে যে সুদ পায় তাহাকে খাজনা হইতে পৃথক করিবার জন্য রিকার্ডো এইরূপে অর্থনৈতিক খাজনার সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়াছিলেন।

কিরূপে এই খাজনা স্থির হয়? মনে করা যাক যে কোন দেশে বিভিন্নস্তরের উর্ব্বরতাশক্তি সম্পন্ন জমি আছে। জনসংখ্যা যখন কম তখন কেবল মাত্র সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি চাষের দ্বারা যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইবে তাহাতে সকলের খাদ্যের অভাব মিটিবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যোৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা হইল। জমির পরিমাণ না বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিলে শ্রম ও মূলধনের ক্রমশঃ অধিকতর নিয়োগের ফলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী হইতে সুরু করিবে, শস্যের ইউনিট-প্রতি ব্যয়-বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

রিকার্ডীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ

অথবা, উর্বরতম জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হওয়ায় কম উর্বর জমি ক্রমেই চাষ হইতে থাকিবে ; এইরূপে ক্রমাগত অনুর্বর জমিগুলির চাষ সুরু হইবে। কিন্তু উৎপাদন এমন এক স্তরে আসিয়া পড়িবে, যে স্তরের জমিতে উৎপাদন ব্যয় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সমান। সেই জমিকে প্রান্তিক জমি বলা হয়। সেই প্রান্তিক জমির উর্দ্ধে যে সকল জমিতে উৎপাদন-ব্যয় হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অধিক তাহাদের প্রান্তোর্ধ জমি (Intra-Marginal Land) বলা হয়। প্রান্তিক জমির নিম্নে যে সকল জমিতে উৎপাদন-ব্যয় হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কম তাহাদের প্রান্তনিম্ন জমি (Sub-marginal Land) বলা চলে। প্রান্তিক জমিতে উৎপাদনের তুলনায় একই ব্যয়ে প্রান্তোর্ধ প্রত্যেক স্তরের জমিতে যে উদ্বৃত্ত শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা সেই জমির খাজনা। কারণ, সীমাবদ্ধ জমি ব্যবহারের সুযোগ পাইবার জন্য চাষীরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে এই সকল উদ্বৃত্তটুকু জমিদারকে খাজনা হিসাবে দিতে বাধ্য হইবে। নিম্নে তালিকার সাহায্যে ইহা দেখান হইল :

	মোট ব্যয়	উৎপাদনের পরিমাণ	মণ প্রতি দাম	উৎপন্নের মোট দাম	উদ্বৃত্ত বা খাজনা
১ম স্তরের জমি	১০৲	৩০ মণ	২৲	৬০৲	৫০৲
২য় স্তরের জমি	১০৲	২০ মণ	২৲	৪০৲	৩০৲
৩য় স্তরের জমি	১০৲	১০ মণ	২৲	২০৲	১০৲
৪র্থ স্তরের জমি	১০৲	৫ মণ	২৲	১০৲	

দেখা যাইতেছে যে চতুর্থ স্তরের জমিতে ১০৲ ব্যয়ে মোট ১০৲ দামের শস্য উৎপাদন হইতেছে। ইহাতে প্রান্তিক জমি, ইহার কোন উদ্বৃত্ত নাই, সুতরাং ইহার ব্যবহারের জন্য কোন খাজনা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ইহার কোন খাজনা নাই। ইহার উর্ধে সকল জমির উদ্বৃত্তাংশ চাষীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে সম্পূর্ণই খাজনারূপে জমির মালিককে দিয়া দিতে হইবে। কিন্তু জমিদারকে না দিয়া চাষী নিজে লাভ করিলেও তাহা খাজনারই

নামান্তর—উৎপাদকের উদ্বৃত্ত (Producer's Surplus) বলিয়া তাহাকে অভিহিত করা হইবে। উন্নতস্তরের জমিসমূহে প্রান্তিক জমির তুলনায় যে পরিমাণ অধিক উৎপাদন হয় তাহাই উৎপাদকের উদ্বৃত্ত, ইহাকে পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত (Differential Surplus) বলা চলে।

রিকার্ডোর এই তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে, খাজনার পরিমাণ দামের উপর নির্ভর করে। দাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট দাম বাড়িবে, ফলে উদ্বৃত্তের মূল্য এবং খাজনা উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে। দাম কমিলে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট দাম কমিবে ফলে উদ্বৃত্তের মূল্য এবং খাজনা উভয়ই কমিবে। খাজনার কিন্তু দামের উপর প্রভাব নাই ; ইহা বাড়িলে বা কমিলে দামে পরিবর্তন হয় না। দাম বাড়িলে প্রান্তিক জমিতে উদ্বৃত্ত হইতে থাকিবে উহা তখন প্রান্তোর্ধ জমিতে পরিণত হইবে। যেমন, মণ প্রতি ৩৲ দাম হইলে চতুর্থস্তরের জমিতে ১০৲ ব্যয়ে ১৫৲ মূল্যের শস্য উৎপন্ন হইবে, উহাতে ৫৲ খাজনা হইয়া পড়িবে। সে অবস্থায় পঞ্চম বা ষষ্ঠস্তরের জমি প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইবে, প্রান্তনিম্ন জমিগুলি প্রান্তের দিকে সরিয়া আসিবে। দাম যদি কমে তাহা হইলে সকল প্রান্তোর্ধ জমির খাজনা কমিয়া যাইবে ; প্রান্তিক জমি আর প্রান্তিক থাকিবে না, উহা প্রান্তনিম্ন জমিতে পরিণত হইবে।

দাম ও চাষের প্রান্তিকতা

সমালোচনা ঃ আধুনিক ধনবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে রিকার্ডীয় খাজনা-তত্ত্বকে বহু প্রকার সমালোচনা করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, রিকার্ডো বলিয়াছেন যে "খাজনা হইল জমির উৎপন্নের সেই অংশ যাহা ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তির দরুণ জমিদারকে দেওয়া হয়।" কিন্তু আদি শক্তি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। মানুষ বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা অনুর্বর জমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করিতেছে রাসায়নিক ও কৃত্রিম সারে জমির শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং উহার শক্তিকে আদি শক্তি বলা চলে না। তাহা ছাড়া, আণবিক বিস্ফোরণ ও তেজস্ক্রিয় রশ্মির যুগে কোন কিছুকেই অক্ষয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে না। আবহাওয়া ও চাষের পদ্ধতিও জমির তথাকথিত আদি ও অক্ষয় শক্তিকে সর্বদাই হ্রাস-বৃদ্ধি করিতেছে।

১। ভূমির শক্তি ২। চাষের অনুক্রম ৩। দামের সহিত সম্পর্ক ৪। শুধু জমির নহে, অন্য উপাদানের ক্ষেত্রেও

দ্বিতীয়তঃ, যেমন ক্যারে ও রশ্চার বলিয়াছেন যে, বাস্তবে কৃষির প্রসার রিকার্ডো প্রদত্ত স্তর অনুযায়ী কখনই হয় না। প্রথমে প্রথমস্তর, তাহার পর দ্বিতীয় স্তর এইভাবে কখনই কৃষিকার্য্য করা হয় না। সুতরাং রিকার্ডোর তত্ত্বকে গ্রহন করা চলে না।

কিন্তু রিকার্ডোর তত্ত্ব এই চাষের অনুক্রমের (order of cultivation) উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল নহে। জমির উর্ব্বরতা বা জমির অবস্থান (situation) যে কোন ব্যাপারেই, যদি একখণ্ড অপর খণ্ডের উপর পার্থক্য-জনিত সুবিধা (differential advantage) পাইয়া থাকে, তাহা হইলেই খাজনার উদ্ভব হইবে।

তৃতীয়তঃ, রিকার্ডীয় খাজনা তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত যে, দামের হিসাবের সময়ে খাজনাকে উহার মধ্যে ধরা হয় না—বাস্তবে ইহা ঠিক নহে। চাষী অপরাপর ব্যয়ের ন্যায় খাজনাকেও ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লয় এবং দাম কষিবার সময়ে খাজনা ব্যয়ের মধ্যেই হিসাব হইয়া দামকে প্রভাবান্বিত করে।

চতুর্থতঃ, আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন না যে, খাজনা শুধু জমির আয়ের ক্ষেত্রেই সম্ভব ; তাহাদের মতে যে কোন দুষ্প্রাপ্য উপাদানের মালিকের আয়ের মধ্যে কিছুটা খাজনা-ভাব বা খাজনাংশ থাকে।

কেন খাজনার উদ্ভব হয় (Why rents arise ?)

খাজনার উদ্ভব হয় এইজন্য যে, জমির যোগান সীমাবদ্ধ। যদি উর্ব্বরতম জমির যোগান সম্পূর্ণরূপে সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হইত (Perfectly Elastic), অর্থাৎ যত প্রয়োজন তত পাওয়া যাইত তাহা হইলে খাজনার উদ্ভব হইত না। কিন্তু যেহেতু জমির যোগান সঙ্কোচপ্রসারবিহীন, সেইজন্য শস্যের চাহিদা বাড়িলে বা বা দাম বাড়িলে কম উর্ব্বরতা-সম্পন্ন জমিও চাষ হয়। এই অবস্থায় তাহাদের সহিত বেশী উর্ব্বরতা সম্পন্ন জমির উৎপাদনের পরিমাণে পার্থক্য থাকায় খাজনার উদ্ভব হইয়া থাকে। উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতা ও পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত ইহাই খাজনার উদ্ভবের কারণ।

যোগানের সীমাবদ্ধতা ও পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত

যদি সকল জমির উর্ব্বরতাশক্তি সমান হয় তাহা হইলেও খাজনার উদ্ভব হইবে। কারণ সকল জমি সমান সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত নহে। যে জমির অবস্থান সুবিধাজনক নহে, বাজার হইতে দূরে অবস্থিত, তাহাদের খাজনা কম

হইবে ; যে জমির অবস্থান বাজারের নিকট, অর্থাৎ যাহাদের পণ্য আদান প্রদানের ব্যয় কম, তাহাদের খাজনা অধিক হইবে। ইহাকে অবস্থানজনিত খাজনা (Situational Rent) বলে। যেমন, কোন জমি বাজারের নিকটে অবস্থিত হইলে ইহার শস্য বিক্রয়ের জন্য কোন ব্যয় হয় না, ধরা যাউক, সেই জমির খাজনা ৫৲। একই উর্ব্বরতা সম্পন্ন ও আয়তনের অপর একখণ্ড জমি বাজার হইতে এমন দূরে অবস্থিত যে তাহার শস্য বিক্রয়ের জন্য ২৲ ব্যয় হয়। এমতাবস্থায়, প্রথম খণ্ড জমির মালিক চাষীর নিকট হইতে যে খাজনা পাইয়া থাকে (৫৲), দ্বিতীয় খণ্ডের মালিক ততটা পাইবে না (৩৲ পাইবে), কারণ বাজার হইতে দূরে অবস্থিত জমির উৎপন্নের মোট ব্যয় বেশী (উৎপাদন ব্যয় + যানবাহনজনিত ব্যয়)। মোট ব্যয় হইতে উদ্বৃত্ত হইল খাজনা, তাই বাজারের নিকটে অবস্থিত জমিব খাজনা বেশী, দূরে অবস্থিত জমির খাজনা কম।

যদি সকল জমির উর্বরতা সমান হয় তাহা হইলে কি খাজনার উদ্ভব হইবে ?

যদি সকল জমির উর্বরতা শক্তি সমান হয় এবং তাহাদের অবস্থানও যদি সমান সুবিধাজনক হইয়া থাকে, তাহা হইলেও খাজনার উদ্ভব হইবে। জমির ব্যবহার বহু উদ্দেশ্যে হইতে পারে ; বহু প্রকার দ্রব্য ব্যবহারে জমির নিয়োগ সম্ভবপর। বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে (যেমন ধান, গম, ভুট্টা বা চা ইত্যাদিতে) জমির নিয়োগ সম্ভব। মনে করা যাউক যে, গম উৎপাদনে নিযুক্ত হইলে সেই জমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য মোট ব্যয়েব সমান, কোন উদ্বৃত্ত থাকে না এবং সেই হেতু কোন খাজনার উদ্ভব হয় না। সেই জমিতে চা উৎপন্ন হইলে মোট ব্যয়ের তুলনায় ৫৲ বেশী উৎপাদন হয়। জমির মালিক নিশ্চয়ই সেই জমি চা উৎপাদনে নিয়োগ করিবে, গম উৎপাদন নহে। গম, তুলা, বা ভুট্টা উৎপাদনকারী চাষীকে ওই জমির ব্যবহারের জন্য নিশ্চয়ই অন্ততঃ ৫৲ খাজনা দিতে হইবে। কারণ, তাহা না হইলে জমির মালিক চা-উৎপাদনকারী চাষীকে ওই জমি ব্যবহার করিতে দিবে; সে-ও মোট ব্যয় হইতে উদ্বৃত্ত ৫৲ খাজনা দিতে রাজী হইবে। অন্য দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হইলে জমিতে যে উদ্বৃত্ত হইতে পারিত, জমির খাজনা এক্ষেত্রে তাহা হইবে। পরিবর্ত্ত-ব্যবহারে নিযুক্ত হইলে জমির যাহা খাজনা হইত, তাহা না দিলে কোন বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে

উর্বরতা শক্তি ও অবস্থান সমান হইলেও খাজনার উদ্ভব হয়: খাজনা ও সুযোগ-ব্যয়

ব্যবহারের জন্য জমি ভাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। চা-উৎপাদনকারী যে পরিমাণ খাজনা দিতে চাহে অন্য শস্য উৎপাদনকারীকেও অবশ্যই অন্ততঃ সেই পরিমাণ খাজনা দিতেই হইবে। সুতরাং খাজনা নির্ভর করে বিভিন্ন ব্যবহারের নিয়োগ-জনিত তুলনামূলক উদ্বৃত্তের উপর। গৃহ নির্মাণ, গোচারণ,শস্য উৎপাদন প্রত্যেক ব্যবহারেই জমির খাজনা হইল অন্য ব্যবহারে নিয়োগকারী কিরূপ খাজনা দিতে প্রস্তুত আছে। এই বদ্‌লি-ব্যবহারের প্রান্তের (Margin of Transferenae) উপর জমির এক ব্যবহার হইতে অন্য ব্যবহারের নিয়োগ নির্ভর করে। বদ্‌লি ব্যবহারের (Transfer-use) দরুণ দাম ব্যয়েরই অন্তর্ভুক্ত।

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী হইবার ফলেও খাজনার উদ্ভব হয়। যখন একই জমিতে বারবার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বাড়ান হয়, তখন প্রত্যেক পরবর্ত্তী বারের শ্রম ও মূলধন নিয়োগ হইতে উৎপাদন-বৃদ্ধি ক্রমেই কম হইতে থাকে। অবশেষে এমন এক স্তরে পৌঁছায় যে, সেইবারের শ্রম ও মূলধনের দাম ইহাদের নিয়োগের ফলে বর্দ্ধিত উপাদানের দামের সমান। পূর্ববর্ত্তী-বারের শ্রম ও মূলধনের দামের তুলনায় তাহাদের নিয়োগ দ্বারা বর্দ্ধিত উৎপন্নের দাম অধিক ছিল; এই উদ্বৃত্তকে পূর্ব্ববর্ত্তী বারের শ্রম ও মূলধনের খাজনা মনে করা চলে। প্রগাঢ়-চাষের (Intensive) ফলে শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক দফার (Marginal Dose) তুলনায় পূর্ব্ববর্ত্তী বা প্রান্তোর্ধ দফার উৎপাদনকে (Intra-marginal Doses) খাজনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

প্রগাঢ়-চাষ, ও ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম ও খাজনা

খাজনা সংক্রান্ত আধুনিক তত্ত্ব (The Modern theory of Rent):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণের, বিশেষতঃ রিকার্ডোর মতে, খাজনা হইল একমাত্র জমি ব্যবহারের পারিশ্রমিক, উপাদান হিসাবে উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়ার দরুণ জমির মালিক এই খাজনা পাইয়া থাকে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের মতে শুধুমাত্র জমির ক্ষেত্রে নহে, অন্যান্য সকল উপাদানের পারিশ্রমিকের মধ্যেও খাজনার অংশ থাকিতে পারে। কোন উপাদান যে উদ্বৃত্ত আয় করে, তাহাকেই খাজনা বলা হয়।

প্রত্যেক উপাদানেরই যোগান-দাম আছে। কোন দামে যে নির্দ্দিষ্ট **পরিমাণ উপাদানের** যোগান হয়, সেই দামই ওই উপাদানের নিম্নতম যোগান-দাম, ওই দাম দিলেই একমাত্র সেই পরিমাণ যোগান হইবে, দাম হইতে কম দিলে সেই পরিমাণ যোগান আসিবে না।

উপাদানের নিম্নতম যোগান দামের তুলনায় প্রকৃত আয় যতটুকু বেশী সেই উদ্বৃত্ত-ই খাজনা

যেমন ১৲ মজুরী থাকিলে ৫০ জন শ্রমিকের যোগান হইতেছে, ইহা ৫০ জন শ্রমিকের যোগান-দাম। ইহার কম হইলে কেহ কাজ করিবে না, ইহা তাহাদের নিম্নতম মজুরী। কিন্তু শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের মজুরী ১৷৷০ হইল এবং এই দেড়টাকায় আরও ৬০ জন মজুর কাজ করিতে রাজী হইল, অর্থাৎ ১৷৷০ টাকায় মজুরের মোট যোগান ১১০ জন হইল। প্রতিযোগিতার দরুণ সকল মজুরকে সমান হারে মজুরী দিতে হইবে, সকলেই ১৷৷০ মজুরী পাইবে। এই ১১০ জনের মধ্যে পূর্ব্বের ৫০ জন ১৲ টাকাতেই কাজ করিতে রাজী ছিল, মজুরী বাড়িবার ফলে তাহারা প্রত্যেকে ৷৷০ করিয়া বেশী পাইতেছে। নিম্নতম যোগান দাম হইতে তাহারা বাজারে বেশী দাম পাইতেছে; সুতরাং পূর্ব্বের ৫০ জনের মজুরীর মধ্যে প্রত্যেকে ৷৷০ করিয়া উদ্বৃত্ত লাভ করিতেছে—ইহাই খাজনা। তাহাদের কাজে নিযুক্ত রাখিতে যে নিম্নতম দাম দেওয়া প্রয়োজন তাহা হইতে যে উদ্বৃত্ত আয় তাহারা পাইতেছে; তাহাকেই খাজনারূপে অভিহিত করা যায়।

কোন দামে উপাদানটির যোগান সম্পূর্ণ সঙ্কোচ প্রসারক্ষম নয় বলিয়াই খাজনার উদ্ভব হয়

যদি ১৲ তে শ্রমিকের যোগান সীমাবদ্ধ না হইত তাহা হইলে কিন্তু অধিক মজুরী দিবার প্রশ্ন উঠিত না। যেহেতু ১৲ তে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ (উপরোক্ত উদাহরণে ৫০ জন) শ্রমিকের যোগান হয়, সেইজন্য অধিক যোগান আনিবার জন্য দাম বাড়াইতে হয় এবং উদ্বৃত্ত আয়ের সৃষ্টি হয়। যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুণই খাজনার উদ্ভব হয়। নিম্নতম যোগান দাম হইতে বাজারে প্রকৃত পারিশ্রমিক যতটুকু বেশী তাহাই খাজনা।

নিম্নতম যোগান দামকে নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয় (Minimum necessary earnings) বলা চলে। যে আয় না হইলে উপাদানটির যোগান হইবে না, তাহাকে নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয় বলা চলে। উপাদানটি বহু

ব্যবহারে নিয়োজিত হইতে পারে। কোন দিকে উহাকে নিয়োগ করিতে হইলে অন্যান্য দিকে সে যাহা পাইতে পারে অর্থাৎ অন্যান্য দিক হইতে তাহার সম্ভাব্য আয়, অন্ততঃ সেইটুকু তাহাকে দিতেই হইবে। তাহা না দিলে তাহাকে সেই দিকে নিয়োগ করা সম্ভব হইবে না, যে দিকে অধিক আয় সেই দিকে নিযুক্ত হইবার জন্য চলিয়া যাইবে। ইহাই নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়। এই নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়কে পরিবর্ত্ত-আয় (Transfer-earnings) বা সুযোগ-আয় (Opportunity-earnings) বলা হয়। এই সুযোগ-আয়ের তুলনায় প্রকৃত-আয় (actual-earnings) যদি বেশী হয়, তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্তাংশকে খাজনা বলা চলে।

সুযোগ-আয় বা পরিবর্ত আয়ের তুলনায় যতটুকু অধিক

কেবলমাত্র যোগানের সীমাবদ্ধতার ফলেই যে খাজনার উদ্ভব হয় তাহা নহে। যদি উপাদানটির যোগান সীমাবদ্ধ হয় তাহা হইলে উহার অধিক ব্যবহার করিতে হইলে দাম বাড়াইতে হইবে কিন্তু দাম না বাড়াইয়া উহার পরিবর্ত্তে অন্য উপাদান (যাহার যোগান তখনও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই) ব্যবহারের চেষ্টা চলিবে। দাম বাড়িবার উপক্রম হইলেই উহার পরিমাণ কমাইয়া অথবা স্থির রাখিয়া অন্যান্য উপাদান নিয়োগের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা হইবে। এইরূপে উপাদান পরিবর্ত্ততা (Factorial Substitution) সুরু হইবে। কিন্তু যদি এরূপ কোন উপাদান থাকে যাহার যোগান তো সীমাবদ্ধ বটেই, উপরন্তু উহাকে পরিবর্জন করিয়া অন্য উপাদানের সাহায্যে কাজ চলে না এবং উৎপাদন কার্য্যে ওই উপাদান অবশ্য প্রয়োজনীয় তখন তাহাকে বেশী দাম দিয়াও উৎপাদনক্ষেত্রে রাখিতে হইবে। এইরূপ উপাদানকে বিশেষ-নির্দ্দিষ্ট উপাদান বলে (Specific Factor)। কোনো উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো উপাদানের বিশেষ-নির্দ্দিষ্টতা (Specificity) বেশী, কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে উহার বিশেষ-নির্দ্দিষ্টতা কম। যদি কোনো ফার্ম্ম ব্যয়ের তুলনায় বেশী আয় করে, তাহা হইলে সেই ফার্ম্মের উদ্বৃত্ত আয়টুকু এই বিশেষ নির্দ্দিষ্ট উপাদানের মালিক চাপ দিয়া আদায় করিয়া লইতে পারে। কৃষি ক্ষেত্রে তাই আমরা, নিখুঁত খাজনার রূপ দেখিতে পাই। কৃষি উৎপাদনে জমি হইল বিশেষ-নির্দ্দিষ্ট উপাদান; ইহাকে বাদ দিয়া বা ইহার পরিবর্ত্তে অন্য

উপাদানের বিশেষ-নির্দিষ্টতাই খাজনার উদ্ভবের কারণ, তাহা না হইলে "উদ্বৃত্ত" আয়ের সৃষ্টি হয় না,

উপাদানের দ্বারা শস্যোৎপাদন হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং জমির মালিক চাষীর নিকট হইতে সকল উদ্বৃত্তটুকুই খাজনা হিসাবে আদায় করিয়া লইতে পারে।

মজুরী, সুদ ও মুনাফার মধ্যে খাজনা-ভাব

সুতরাং, আধুনিক খাজনাতত্ত্ব গ্রহণ করিলে এবং উহার প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে কেবলমাত্র জমির ক্ষেত্রেই নহে, সকল উপাদানের আয়ের মধ্যেই খাজনা-ভাব (Rent-element) থাকিতে পারে যোগানের সীমাবদ্ধতা এবং পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত সকল উপাদানের ক্ষেত্রেই সম্ভব, সুতরাং তাহাদের সেইরূপ আয়কেও খাজনা বলা চলে।

মজুরীর মধ্যে খাজনাভাব বর্ত্তমান থাকে কারণ সকল শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদন-ক্ষমতা সমান নহে। যাহারা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন, দক্ষ বা উৎপাদনক্ষম, তাহাদের মজুরী অধিক। প্রান্তিক শ্রমিকের মজুরীর তুলনায় তাহারা যে অধিক মজুরী পাইয়া থাকেন তাহা পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত বলিয়া উহাকে খাজনা বলা চলে। এইরূপ উদ্বৃত্ত আয়কে, যোগ্যতার খাজনা (Rent of ability) বলা হয়।

সুদের মধ্যেও এইরূপ উদ্বৃত্তাংশ থাকিতে পারে। কোন ব্যক্তির সঞ্চয় অধিক বলিয়া, মনে করা যাউক, যে সে শতকরা ২% হারে টাকা ধার দিতে রাজী আছে। ইহাই তাহার নিকট নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়, যাহা পাইলে সে অর্থ বিনিয়োগ করিবে। কিন্তু সমাজে (২% হারে ঋণে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ অর্থের যোগান হইতেছে তাহা হইতে চাহিদা অধিক হওয়ায়) সুদের হার বেশী থাকিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় ধরা যাউক সুদের হার ৫% হইল। যে ব্যক্তি ২% হারে ধার দিতে রাজী ছিল সে-ও ৫% পাইবে ; সুতরাং তাহার আয় ৩% হারে উদ্বৃত্ত হইবে। নিম্নতম যোগান দাম হইতে বাজার-দাম বেশী বলিয়া এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইবে। এইরূপে সুদের মধ্যে খাজনা-ভাব থাকিতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উৎপাদনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে (Entrepreneur) পরিচালন-যোগ্যতার তারতম্য আছে। যে উদ্যোক্তার পরিচালন শক্তি এমনই যে সে কোনক্রমে স্বাভাবিক মুনাফাটুকু (Normal Profit) করিতে পারিতেছে তাহাকে প্রান্তিক উদ্যোক্তা (Marginal entrepreneur) এবং সেইরূপ যোগ্যতাকে প্রান্তিক যোগ্যতা (Marginal

ability) বলা হয়। অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ তাহার তুলনায় যে অধিকতর মুনাফা করিতে পারিতেছে তাহাদের সেই উদ্বৃত্তকে খাজনারূপে দেখা চলে। স্বাভাবিক পরিমাণ মুনাফা (Normal Profit) না পাইলে উদ্যোক্তাগণ সেই ব্যবসাতে থাকিবে না, সুতরাং সেই স্বাভাবিক পরিমাণ মুনাফাই তাঁহাদের নিম্নতম যোগান-দাম ; ওই ব্যবসা করিবার পক্ষে তাহাদের নিম্নতম প্রয়োজনীয়-আয়। ইহা হইতে যে অধিক মুনাফা তাহারা করিতে পারে (যোগ্যতা, হঠাৎ কোন সুযোগ বা একচেটিয়া স্থাপনের দ্বারা), সেই উদ্বৃত্তকে খাজনা বলা চলে।

প্রায়-খাজনা (Quasi-Rent) ঃ

রিকার্ডো ও ক্লাসিকাল লেখকগণের মতে শুধু জমি হইতে আয়কেই খাজনা বলা হয়, অপর উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা-ভাব নাই।

মার্শাল প্রমুখ নয়া-ক্লাসিকাল লেখকগণ খাজনা-তত্ত্বকে অগ্রসর করাইয়াছেন এবং মানুষের দ্বারা সৃষ্ট স্থায়ী মূলধনী দ্রব্য (যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) হইতে আয়ের ক্ষেত্রেও যে খাজনার উদ্ভব হইতে পারে তাহা বলিয়াছেন। মার্শালের মতে খাজনার উদ্ভব হয় যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুণ। যেহেতু উপাদানের যোগানকে প্রয়োজনানুযায়ী বাড়ান চলে না, সেইজন্য তাহার মালিক উদ্বৃত্ত আয় লাভ করিবার সুযোগ পায়। জমির যোগান প্রচুর হইলে, কোন সীমাবদ্ধতা না থাকিলে, ইহার মালিক চাষীর নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে পারিতনা, কোন উদ্বৃত্তের সৃষ্টিও হইত না।

যোগানের এই সীমাবদ্ধতা শুধু জমির ক্ষেত্রে নহে, মানুষের দ্বারা তৈয়ারী স্থায়ী মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে দেখা যায়। অন্তত: স্বল্পকালের মধ্যে উহার যোগান বাড়ান চলে না এবং তাহার ফলে উহার মালিক প্রচুর আয় করে, যে উদ্বৃত্ত আয়কে খাজনা বলা চলে। মার্শাল ইহাকে মাছধরার উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়াছেন।

মাছের দাম বাড়িলেই তৎক্ষণাৎ যোগান বাড়াইবার জন্য উহার উৎপাদনে নিযুক্ত নৌকা জাল ইত্যাদি (স্থায়ী মূলধনী দ্রব্য) সহসা বাড়ান চলে না। কারণ ওই সকল দ্রব্য মানুষের দ্বারা তৈয়ারী এবং তাহা প্রস্তুত করিতে সময় লাগে। যে সময়ের মধ্যে ওই যন্ত্রপাতির যোগান বৃদ্ধি পাইতেছে

উৎপাদনের পার্থক্য আরও বিস্তৃত হইতে থাকিবে; উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইবে এবং খাজনাও বাড়িবে।*

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের এই ধারণার কারণ ছিল এই যে তাহারা সমগ্র সমাজের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে খাজনাকে বিচার করিয়াছেন। তাহাদের বিচারে জমির কোন নিম্নতম যোগান দাম থাকিতে পারে না। যদি কোন খাজনা কাহাকেও দেওয়া না হয় তাহা হইলে জমির যোগান একেবারে থাকিবে না, তাহা নহে। সুতরাং জমির জন্য কোন আসল ব্যয় নাই। শ্রমিকের মজুরী না দিলে শ্রমের যোগান বন্ধ হইয়া যাইবে; সুদ না দিলে মূলধনের যোগান বন্ধ হইবে, মুনাফা না দিলে কেহ ব্যবসাতে নামিবে না। কিন্তু খাজনা ব্যয়ের উর্ধে, উহা শস্যের দামকে নির্ধারিত করে না, উহা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত।

ক্লাসিকাল ধারণা

কিন্তু এই সমস্যাকে দুই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ক্লাসিকাল এই ধারণা ঠিক নহে; খাজনা ব্যয়েরই অংশ এবং সেইহেতু ইহা দামকে প্রভাবিত করে। প্রথমতঃ, কোন ব্যবসায়ী বা কোন ফার্মের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে সে তাহার মোট ব্যয়ের মধ্যে খাজনাকে হিসাব করিয়া ধরিয়া লয় এবং শস্যের দাম নির্দ্ধারণের সময় মোট ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে খাজনাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। দ্রব্যটি তৈরী হইতে হইলে কাঁচামালের জন্য ব্যয়ের ন্যায় ওই খাজনার দরকার না-ও হইতে পারে, কিন্তু দাম নির্দ্ধারণের সময়ে উৎপাদক ওই খাজনাকে মোটব্যয়ের মধ্যে হিসাব করিয়াই দাম স্থির করে। খাজনা বেশী হইলে অধিক দাম স্থির করিতে হয়, খাজনা কম হইলে সে কম দামে বেচিতে পারে। তাহার মোট রেভিনিউ যদি মোট ব্যয়ের (উৎপাদনব্যয়+খাজনা) নাহয় তবে সে ব্যবসা দীর্ঘকাল ধরিয়া চালাইতে পারিবে না, অন্য ব্যবসা-তে চলিয়া যাইবে।

রিকার্ডীয় মতের সমালোচনা ১। ফার্মের দিক হইতে বিচার করিলে

দ্বিতীয়তঃ, কোন বিশেষ শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে খাজনাকে ব্যয় হিসাবে গণ্য করা উচিত। জমির বিভিন্ন ব্যবহার আছে,

* উর্বরতর জমির গড় ব্যয় কম। দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অনুর্বর জমি চাষ হওয়ায় উহাদের প্রান্তিক ব্যয় ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। উর্বরতর জমির কম গড় ব্যয় যতই বাড়িবে, খাজনা ততই বৃদ্ধি পাইবে।

বিভিন্ন দ্রব্যোৎপাদনে ইহাকে নিয়োগ করা চলে। চা-উৎপাদনে নিয়োগ করিলে সে জমিতে গম উৎপাদন হয় না, ধান্যোৎপাদনে নিয়োগ করিলে সেখানে মাছের চাষ বাদ দিতে হয়। এইভাবে বিভিন্ন দ্রব্যোৎপাদনে জমির চাহিদা হয়। কোন এক ব্যবহারে নিযুক্ত হইতে হইলে উহাকে কি দাম দিতে হইবে তাহা নির্ভর করে ওই জমি অন্য ব্যবহারে নিযুক্ত হইলে কি দাম দিতে হইত, তাহার উপর। চা-উৎপাদনে জমি খাটাইলে কি খাজনা হইত, তাহা নির্ভর করে ওই জমির জন্য গম, ধান, ইক্ষু ইত্যাদি উৎপাদনকারীগণ কি খাজনা দিতে প্রস্তুত আছে, তাহার উপর। জমির এই পরিবর্ত-দাম বা সুযোগ-দাম (Transfer-Price or opportunity-Price) সমগ্র শিল্পের দিক হইতে বিচার করিলে নিশ্চয়ই ব্যয়ের মধ্যে গণ্য হয়। যদি সুযোগ-দাম বৃদ্ধি পায় (অপর কোন ব্যবহারকারী বেশী দাম দিতে রাজী হয়) তাহা হইলে সকল দিকে নিয়োগের ক্ষেত্রেই উহার খাজনা বৃদ্ধি হইবে, কারণ জমির মালিক সেই বর্ধিত খাজনার কম কাহাকেও জমি ব্যবহারের সুবিধা দিবে না। এইরূপে খাজনা বৃদ্ধি পাইলে জমি হইতে উৎপন্ন সকল দ্রব্যের দামই বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং খাজনা দামের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

২। ফার্মের দিক হইতে বিচার করিলে

অর্থনৈতিক প্রগতি ও খাজনা (Economic Progress and Rent) :

রিকার্ডোর মতে ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের দরুণ জমির মালিককে যাহা দেওয়া হয় তাহাই খাজনা। সুতরাং চাষী যদি নিজে মূলধন ব্যয় করিয়া ভূমির উর্বরতা বা উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধি করিয়া তোলে তাহা হইলে ইহার দরুণ বর্দ্ধিত উৎপাদন খাজনার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কারণ সেই বৃদ্ধি ভূমির আদি শক্তির দরুণ নহে। সেই বর্ধিত উৎপন্নকে ভূমিতে নিযুক্ত মূলধনের সুদ হিসাবে দেখা উচিত, তাহাকে খাজনা বলা চলে না।

কিন্তু যদি কোন অর্থনৈতিক উন্নতি সাধারণভাবে সকল জমির উপর প্রভাব বিস্তার করে, যাহার ফলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বা উদ্বৃত্তের মূল্য বা মোট ব্যয় প্রভাবান্বিত হয়; তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই অর্থনৈতিক উন্নতি খাজনার পরিমাণে পরিবর্তন আনিবে। অর্থনৈতিক প্রগতি বলিলে আমরা বহুপ্রকার উন্নতি বুঝিতে পারি; বিশেষ ধরণের উন্নতি খাজনার উপর বিশেষ উপায়ে প্রভাব বিস্তার করে।

যদি নূতন যন্ত্রপাতি, নূতন সার বা নূতন উৎপাদন কৌশলের (Technique of Production) প্রবর্তন হয় তাহা হইলে খাজনার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। যদি সকল স্তরের জমির উপরই ইহার প্রভাব সমান হয়, তাহা হইলে সকল জমির উৎপাদন ক্ষমতাই বাড়িয়া যাইবে। শস্যের চাহিদা সমান থাকায় উহার দাম কমিবে। ফলে প্রান্তিক জমিতে উৎপন্ন শস্যের মোট দাম উহার মোট ব্যয় হইতে কম হইবে, সুতরাং উহা প্রান্তনিম্ন জমিতে পরিণত হইবে। চাষের প্রান্ত উপরে উঠিবে, প্রান্তোর্ধ জমিগুলির খাজনার পরিমাণ কমিয়া যাইবে, কেহ কেহ প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইবে, কোন উদ্বৃত্ত থাকিবে না। যদি এই উন্নতি কেবল মাত্র উন্নতস্তরের জমিকে আরও উন্নত করিয়া তোলে, তাহা হইলে শস্যের চাহিদা সমান থাকিলে, উহাদের অধিকতর উদ্বৃত্ত হওয়ায় খাজনা বৃদ্ধি হইবে। যদি এই উন্নতি কেবল মাত্র অনুর্বর জমিকে আরও উন্নত করিয়া তোলে তাহা হইলে চাষের প্রান্ত উপরে উঠিবে, উন্নতস্তরের জমির খাজনা কমিয়া যাইবে।

১। চাষের উন্নত পদ্ধতি, নূতন যন্ত্রপাতি, সার, বা নূতন কৌশল

অর্থনৈতিক উন্নতি যদি উন্নত ধরণের পরিবহন ব্যবস্থার রূপ ধারণ করিয়া আসে, অর্থাৎ যদি পরিবহন-ব্যয় কমিয়া যায় তাহা হইলে দূরে অবস্থিত জমির তুলনায় বাজারের নিকটে অবস্থিত জমিগুলির পার্থক্য-জনিত সুবিধা কমিয়া যাইবে। যদি আন্তর্জাতিক পরিবহন-ব্যয় কমিয়া যায়, তাহা হইলে বিদেশ হইতে শস্য আমদানী হইতে পারে। এমতাবস্থায় আমদানীকারী দেশে চাষের প্রান্ত উপরে উঠিবে এবং খাজনার হার কমিয়া যাইবে; রপ্তানীকারী দেশে চাষের প্রান্ত নামিয়া যাইবে, অনুর্বর জমিগুলিতে চাষ সুরু হইবে, খাজনার হার বাড়িয়া যাইবে।

২। আভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যয়ে বা আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যয় হ্রাসের ফল

দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শস্যের দাম বাড়িবে এবং খাজনা বাড়িয়া যাইবে। প্রান্তিক জমিগুলি প্রান্তোর্ধ জমিতে পরিণত হইবে, অনুর্বর জমিগুলি চাষ হইতে সুরু হইবে, চাষের প্রান্ত নামিয়া যাইবে। প্রগাঢ় চাষের ফলে আরও দ্রুত ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের কার্য্যকারিতা সুরু হইবে। কৃষি-উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় বাড়িয়া যাইবে।

৩। জনসংখ্যা বৃদ্ধি

দেশে আয়ের স্তর ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইলে খাজনার উপর কিরূপ প্রভাব হইবে? আয় বৃদ্ধি হইলে লোকে অধিক পরিমাণে খাদ্য শস্য ক্রয় করে, তাহা নহে; বিলাসদ্রব্য বা সৌখীন দ্রব্যাদির ক্রয় বাড়িয়া যায়। সুতরাং শস্যের চাহিদা খুব বাড়ে না, দামও খুব বৃদ্ধি হয় না, খাজনা-ও বিশেষ বাড়ে না। এইজন্য মজুরী, সুদ বা মুনাফার ন্যায় জমিদারের খাজনার হার খুব বেশী বৃদ্ধি হয় না।

৪। আয়স্তর ও জীবনযাত্রার মানে বৃদ্ধির ফল

দেখা যায় যে, বিভিন্ন ভাবে অর্থনৈতিক প্রগতি খাজনাকে বিভিন্ন পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে। একটি প্রভাব অপরটিকে খণ্ডন করিতে পারে। যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ খাজনা বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিল, কিন্তু পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে খাজনা কমিবার ঝোঁক আসিয়া পড়িল। উভয়ের মিলিত ফলে খাজনার কোনরূপ পরিবর্তন হইল না, এইরূপও ঘটিতে পারে। খাজনার উপর অর্থনৈতিক প্রগতির দীর্ঘকালীন প্রভাবের ফল তাই পূর্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ সঠিক পরিমাণে পরিমাপ করা যায় না।

মোট প্রভাব

খনি ও মৎস্য-চারণ ক্ষেত্রের খাজনা (Rents of Mines and Fisheries):

খনি ও মৎস্যচারণ ক্ষেত্রের খাজনা নির্দ্ধারণ বহু পরিমাণে জমির খাজনা নির্দ্ধারণের ন্যায়। উহারা প্রকৃতির দান এবং উহাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সকল খনি ও মৎস্যচারণ ক্ষেত্র সমান সম্পদ-সম্পন্ন নহে, কাহারও মজুত-সম্ভার বেশী; কাহারও বা কম। প্রান্তিক খনি অপেক্ষা, বা কম সম্পদযুক্ত খনির তুলনায় অধিক সম্পদ-যুক্ত খনি হইতে উৎপাদনে যে পার্থক্য জনিত উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে খাজনা বলা চলে। সেইভাবে ইহাদের খাজনা স্থির হয়।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে খনির ক্ষেত্রে চিরকাল ধরিয়া অবিরাম আয়ের স্রোত ভোগ করা যায় না, জমিতে সঠিক সার দিয়া, প্রায় চিরদিন ধরিয়া আয় সৃষ্টি করা চলে, কিন্তু খনির অভ্যন্তরে খনিজ সম্পদের মজুত সীমাবদ্ধ, আজ বা কাল উহা শেষ হইবেই। মজুত সম্পদ ফুরাইয়া আসিবে, খনির জীবনও শেষ হইবে, উহা সম্পদ-শূণ্য অকেজো জমিতে পরিণত হইবে। ক্লাসিকাল মতে ভূমির শক্তি যেরূপ অক্ষয়, খনির শক্তি অক্ষয় নহে। সুতরাং এই মজুত-সম্পদের ক্ষয়ের দরুণ, উহা ফুরাইয়া আসার ক্ষতিপূরণ হিসাবে, জমির দরুণ খাজনা

ছাড়াও প্রতি টন দ্রব্য পিছু আরও দাম খনিজ জমির মালিককে দিতে হয়। তাহাকে সেলামী (Royalty) বলে। সুতরাং খনির মালিক যাহা পায় তাহার মধ্যে খাজনা ও সেলামী দুইই থাকে।

সহরে জায়গার খাজনা (Urban Site Rent) ঃ

সহরে জায়গার খাজনা নির্ভর করে প্রধানতঃ অবস্থানজনিত সুবিধার (Situational Advantage) উপর। সহরের কোন্ অঞ্চলের অবস্থান জনিত সুবিধা কিরূপ, তাহা স্থির হয় উক্ত অঞ্চল কোন ব্যবহারে নিযুক্ত হইতেছে তাহা দ্বারা। যদি বসবাসের উদ্দেশ্যে উক্ত অঞ্চল অধিকতর সুবিধা জনক হয় (যেমন বালিগঞ্জে স্কুল, কলেজ, ট্রাম ডিপো, বাস ডিপো, রেল ষ্টেশন, বড় চওড়া রাস্তা, বাজার ও পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া ইত্যাদি সকল কিছুর সুবিধা), সে ক্ষেত্রে বসবাসের ব্যবহারে নিযুক্ত হইলে জমির খাজনা অধিক হইবে। অন্য ব্যবহারে সেই স্থানকে নিয়োগ করিতে হইলেও, অন্ততঃ, বসবাসের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইলে জায়গা হইতে যে খাজনা পাওয়া সম্ভব হইত, তাহা দিতেই হইবে।

১। বসবাসের সুবিধা

প্রধানতঃ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সেই অঞ্চল ব্যবহৃত হইলে তাহার খাজনা নির্ভর করে সেখানে কিরূপ ব্যবসার সুবিধা আছে তাহার উপর। যে অঞ্চলে কেনাকাটা করা একটু বিলাস, সৌখীনতা বা লোকচক্ষে সম্মানজনক, সেই অঞ্চলের দোকানদারগণ একটু বেশী দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং সেই অঞ্চলে ব্যবসার জায়গার খাজনা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া, যদি কম দামে কিন্তু অধিক পরিমাণে বিক্রয়ের সম্ভাবনা অধিক হয় তাহা হইলেও সেই অঞ্চলের খাজনা অধিক হইবে।

২। ব্যবসার সুবিধা (ক) বেশী দামে বিক্রয় বা (খ) বেশী পরিমাণে বিক্রয়

গ্রামের তুলনায় সহরের জমির খাজনা অধিক হইবার কারণ হইল যে সহরে সকল ব্যবহারের জন্যই জায়গার চাহিদা খুব বেশী এবং ইহার তুলনায় যোগান কম। বাসগৃহ, দোকানঘর, অফিস, পার্ক রাস্তা, সকল উদ্দেশ্যেই জমি ব্যবহারের জন্য চাহিদা তীব্র থাকে। সুতরাং কোন জায়গায় খাজনা নির্ভর করে অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীগণ উহার জন্য কি পরিবর্ত্ত-দাম দিতে প্রস্তুত আছে তাহার উপর।

গ্রাম ও সহরের খাজনা

বাড়ীর ভাড়া (Rent of Buildings) :

বাড়ীর ভাড়া নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর : (ক) যে জমির উপর বাড়ী অবস্থিত তাহার খাজনা, ও (খ) নির্মিত গৃহের দরুণ কিছু প্রদত্ত অর্থ।

বাড়ী তৈরীর জমির খাজনা নির্ভর করে প্রধানতঃ অবস্থান জনিত সুবিধার উপর। আর নির্ম্মিত গৃহের জন্য মালিককে কি পরিমাণ দিতে হইবে তাহা স্বল্পকালে প্রধানতঃ বাড়ীর চাহিদার উপর নির্ভরশীল, কারণ বাড়ীর যোগান স্বল্পকালে বাড়ান বা কমান যায় না। দীর্ঘকালে অবশ্য ভাড়া এমনই হইবে যাহাতে বাড়ীর জীর্ণদশায় উহার মোট উৎপাদনব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা উঠিয়া আসিতে পারে।

অনুপার্জিত মূল্য বৃদ্ধি (Unearned Increment) :

কোন কারণে যদি কোন অঞ্চলের জমির দাম খুব বাড়িয়া যায় (যেমন পার্ক বা সরোবর স্থাপন, শিল্প প্রতিষ্ঠা বা বড় রাস্তা তৈরী হওয়া) তাহা হইলে জমির মূল্যবৃদ্ধিকে অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি বলা চলে। যেহেতু মালিকের নিজস্ব কোন মূলধন ব্যয় বা পরিশ্রমের ফলে জমির মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই, তাই ইহা অনুপার্জিত। এই অনুপার্জিত অংশের উপর রাষ্ট্রের কর স্থাপন সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত, কারণ ইহাতে কাহারও সঞ্চয় বা কর্ম্মোদ্যমে আঘাত লাগিবে না।

কাহাকে বলে এবং কর-স্থাপনের যৌক্তিকতা

কিন্তু বলা হয়, যে যদি অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধির উপর কর স্থাপন যুক্তি যুক্ত হয়, তাহা হইলে যদি কোন কারণে (যেমন নিকটবর্ত্তী শিল্প উঠিয়া যাওয়ায়) সেই অঞ্চলের জমির মূল্য সহসা কমিয়া যায় তাহা হইলে উহার দরুণ যে অনুপার্জিত মূল্যহ্রাস (Unearned decrement) ঘটিবে, তাহার ক্ষতিপূরণের ভারও রাষ্ট্রের লওয়া উচিত।

অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধির উপর কর বসাইবার সর্বাপেক্ষা বাস্তব অসুবিধা হইল এই যে মূল্যবৃদ্ধির কতখানি উপার্জিত এবং কতখানি অনুপার্জিত তাহার হিসাব করা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব নয়।

খাজনা তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য্য (Social Implications of the theory of Rent) :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রিকার্ডো যখন তাহার খাজনা-তত্ত্ব প্রচার করেন তখন ইংলণ্ডের সমাজকাঠামোর শ্রেণীবিন্যাসে বিপুল পরিবর্ত্তন হইতেছিল। শিল্প

বিপ্লবের গতি তখন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে; নূতন ধনিকশ্রেণী ও পুরাতন জমি-কেন্দ্রিক অভিজাত সামন্তশ্রেণীর পরস্পর বিরোধী স্বার্থ-সংঘাতে ইংলণ্ডের সমাজ-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবধারায় ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ এবং দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ খাদ্যশস্যের দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, খাজনার হার খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সমাজের অধিকাংশের এই দুর্গতি হইতে জমিদারগণ মুনাফা করিতেছেন এই ধারণা দেশের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। নূতন বুর্জোয়াশ্রেণীর চিন্তানায়ক হিসাবে রিকার্ডো তাহার খাজনাতত্ত্বের সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে শস্যের দাম কমান-ই তখনকার একমাত্র সমস্যা, কারণ কম মজুরীতে শ্রমিক ব্যবহার করিতে না পারিলে শিল্পের প্রসার সম্ভব নয়। খাজনাতত্ত্বের দ্বারা তিনি ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে খাজনা হইল উৎপাদকের উদ্বৃত্ত, ইহা দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে; জমিদারগণ চাষীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সুযোগে এই উদ্বৃত্ত নিজেরা আত্মসাৎ করিতেছেন। ইহা তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ নহে, ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার নহে, প্রকৃতিদত্ত সম্পদের উপর মালিকানা-জনিত অপরের শ্রমোৎপাদিত সম্পদের শোষণ মাত্র।

কি পরিবেশে খাজনা-তত্ত্বের উদ্ভব

এই ধারণা চিন্তা জগতে এখনও বর্ত্তমান। হেনরি জর্জ তাহার প্রগতি ও দারিদ্র্য (Progress and Poverty) নামক পুস্তকে বলেন যে প্রগতির ফলে জমির মালিকদের আয় বৃদ্ধি হয় এবং অনুপার্জিত আয়ে তাঁহারা স্ফীত হন। তাঁহার মতে এই অনুপার্জিত আয় এবং প্রকৃতিদত্ত উদ্বৃত্ত সমাজেরই প্রাপ্য; কর বসাইয়া উহা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই উদ্বৃত্ত সমাজ-সম্পদের শোষণ মাত্র

খাজনার উপর কর বসান-র স্বপক্ষে আরও যুক্তি হইল যে, ইহা অনুপার্জিত বলিয়া ইহার উপর কর স্থাপিত হইলে কাহারও বিশেষ কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে না। ইহা না থাকিলেও জমির যোগান থাকিবে, জমি চাষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে না। সমাজে আয়-বৈষম্য কমিবে এবং পরশ্রম-নির্ভরশীল জমির মালিকগণ শ্রমের দ্বারা সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে আত্মনিয়োগ করিবেন।

সুতরাং কর বসান উচিত

খাজনার উপর কর বসান যুক্তিসঙ্গত এই ধারণার বিরুদ্ধে বলা হয় যে জমি

হইতে সকল আয়ই উদ্বৃত্ত নহে, উহার মধ্যে জমিদার যে মূলধন খাটাইয়া জমির উন্নতির চেষ্টা করিয়াছে, তাহার সুদ ও পুরস্কারও জড়িত আছে। তাহা ছাড়া যখন জমির মূল্য কমিয়া যায় তখন কি রাষ্ট্র জমির মালিকদের এই অনুপার্জিত মূল্যহ্রাসের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত আছে? সুতরাং রাষ্ট্রের কর বসাইবারও অধিকার নাই।

সমালোচনা

এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সকল খাজনার উপর কর বসান সঙ্গত নহে, কারণ উহার মধ্যে অর্থনৈতিক খাজনা বা নিখুঁত খাজনার পরিমাণ পৃথক করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কিন্তু যখন হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি বা খাজনা বৃদ্ধি হয়, সমাজের অন্য অংশের দুর্গতি হইতে যখন জমির মালিকরা লাভবান হইতে থাকেন সেই অবস্থায় সেই হঠাৎ-বর্দ্ধিত খাজনা বা জমির মূল্যের উপর কর বসান বাঞ্ছনীয়।

অনুশীলনী

1. "Rent is paid for the original and indestructible powers of the soil." Explain. (B.A. '42, '45)

2. How does the rent of land arise? Will there be any rent if all plots of land were equally fertile and equally favourably situated? (B.com '55)

3. What is Rent? Explain the relation between Rent and Economic Progress. (B. A. '55)

5. Discuss the relation between rent and the price of agricultural products. (B.com '39,' 49, '53)

6. "The rent of land is seen not as a thing by itself but as a leading species of large genus." Amplify. (B. com '42, '44)

7. Analyse the effects of increase of population on (a) wages and (b) Rent. (B.com. '48)

8. Discuss the Social implications of the theory of Rent. (B.com '41. '45, '50).

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মজুরী

আসল মজুরী ও আর্থিক মজুরী (Real wages and Money wages) :

উৎপাদন কার্য্যে সহায়তার জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে শ্রমিক যাহা পাইয়া থাকে, তাহাকে মজুরী বলে। মজুরীকে দুইভাবে দেখা চলে। নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের দরুণ উদ্যোক্তা শ্রমিককে পারিশ্রমিক হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ দেয় তাহাকে আর্থিক মজুরী বলা হয়। ওই কার্য্যের ফলে শ্রমিক যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী, সুযোগ সুবিধা ও আরাম আয় করে তাহাকে আসল মজুরী বলে।

আসল মজুরী কিসের উপর নির্ভর করে

আসল মজুরী নির্ভর করে বহু বিষয়ের উপর। প্রথমতঃ, আর্থিক মজুরী বেশী হইলে দ্রব্যসামগ্রী অধিক ক্রয় করা সম্ভব এবং আর্থিক মজুরী কম হইলে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সামর্থ্যও কম। সুতরাং আসল মজুরী প্রধানতঃ আর্থিক মজুরীর উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়তঃ, মজুরী হিসাবে যে অর্থ শ্রমিক লাভ করে, তাহার বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী সে ক্রয় করিতে পারিবে, তাহা স্থির হয় অর্থের ক্রয় ক্ষমতার দ্বারা। যদি অর্থের ক্রয় ক্ষমতা (Purchasing Power of Money) অধিক হয় (অর্থাৎ যখন দামস্তর কম), তাহা হইলে তাহার আসল মজুরী বেশী, যদি অর্থের ক্রয় ক্ষমতা কম হয় (অর্থাৎ যখন দামস্তর বেশী), তাহা হইলে তাহার আসল মজুরী কম। তৃতীয়তঃ, কার্য্যের অন্যান্য বহু প্রকার সুবিধা ও অসুবিধার উপর উহা নির্ভর করে। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরী ছাড়াও কিছু দ্রব্যসামগ্রী শ্রমিককে দেওয়া হয় (প্রধানতঃ, কৃষি মজুরের ক্ষেত্রে), তাহা আসল মজুরী হিসাবে গৃহীত হইবে। অনেকক্ষেত্রে কার্য্যে অবসর-বৃত্তি পাইবার সুবিধা আছে, অনেক ক্ষেত্রে তাহা নাই। অনেক চাকুরীতে বেশীক্ষণ কাজ করিতে হয়, অন্য ক্ষেত্রে অল্পক্ষণ কাজ করিবার সুযোগ আছে। বহুকার্য্যে জীবনীশক্তির দ্রুত হ্রাস হয়, সমাজের চক্ষে বহুকার্য্য হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন, এই সকল অসুবিধাও আসল মজুরীর

হিসাবে ধরিতে হয়। অনেকক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয়ের সুবিধা থাকে (যেমন হোটেলের পরিচালক বক্‌শিস্ পায়), অনেক ক্ষেত্রে চাকুরী রাখিবার জন্য মনিবকে নিয়মিত নজরাণা দিতে হয়। অনেক চাকুরীতে সারা বৎসর কাজ থাকে না, কয়েক মাস কর্ম-বিহীন অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হয় (যেমন চিনির কল), আবার অনেক চাকুরীতে সারা বৎসরই কাজ থাকে; অনেক ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে উপরি-সময় (overtime) হইতে অধিক আয় হয়। কোন চাকুরীতে মাহিনা কম, কিন্তু ঘুষের সম্ভাবনা বেশী। এই সকল সুযোগ ও সুবিধা-অসুবিধা সকল কিছু বিচার করিয়া শ্রমিকের আসল মজুরী বিচার করিতে হয়। মনে রাখা দরকার যে, শ্রমিকের প্রকৃত জীবন যাত্রার মান কেবলমাত্র তাহার আর্থিক মজুরীর উপর নির্ভর করে না, এই সকল আনুষঙ্গিক সুবিধা-অসুবিধা মিলিয়া তাহার আসল মজুরীর উপর নির্ভর করে।

মজুরী কি ভাবে নির্দ্ধারিত হয় (How wages are determined):

মজুরী নির্দ্ধারণ সম্পর্কে বহু তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ধনবিজ্ঞানের সুরু হইতেই বিভিন্ন ধনবিজ্ঞানী সমাজে মজুরীর স্তর (Level of wages) কি ভাবে নির্দ্ধারিত হয় তাহার সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

১। জীবনধারণ তত্ত্ব (The Subsistence Theory):

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী ফিজিয়োক্রাটগণ বলিতেন যে, দেশে স্বাভাবিক মজুরীর স্তর সর্বদা জীবনধারণের পক্ষে নিম্নতম স্তরে থাকে। কোন মতে জীবনধারণের পক্ষে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী শ্রমিকের না হইলেই চলে না, তাহা পাইতে পারে এই পরিমাণ অর্থ ই তাহার মজুরী হিসাবে স্থির হয়। শ্রমিকেরা দরকষাকষির ব্যাপারে দুর্বল বলিয়া জীবনধারণ স্তরের মজুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। জার্মানীর সমাজতন্ত্রবাদী ধনবিজ্ঞানী লাসালে এই তত্ত্বের অন্যতম প্রচারক ছিলেন এবং ইহাকে মজুরীর লৌহ-নিয়ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। রিকার্ডো এই তত্ত্বে মোটামুটি বিশ্বাস করিলেও বলিতেন যে স্থান কালের অবস্থা ও প্রথা অনুযায়ী মজুরীর হারে পার্থক্য থাকিতে পারে।

মজুরীর লৌহ-নিয়ম

তদানীন্তন সকল বিজ্ঞানীদের ধারণায় সকল বিষয় প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। সে নিয়ম অমোঘ, অব্যর্থ এবং মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। মজুরীর ক্ষেত্রেও এই নিয়ম সেইরূপ প্রভাবশীল বলিয়া ধারণা ছিল। কোন

মতে জীবনধারণের স্তর হইতে মজুরী নামিতে পারে না—ওই স্তর হইতে মজুরী কম হইলে শ্রমিকেরা বিবাহে বিরত থাকিবে, ভবিষ্যতে শ্রমিকের যোগান কমিবে এবং মজুরী জীবন ধারণের স্তর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। জীবনধারণের স্তর হইতে মজুরী উপরে উঠিতে পারে না, শ্রমিক অধিক বিবাহে বা অধিক সন্তানোৎপাদনে ব্যাপৃত হইবে, ভবিষ্যতে শ্রমিকের যোগান বাড়িবে এবং মজুরী জীবনধারণের স্তরে নামিয়া আসিবে। তাই মজুরী-নির্দ্ধারণের এই নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায়ই অমোঘ। ঘড়ির দোলকের (Pendulum) মত, কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইলে এমন শক্তিসমূহের ক্রিয়া সুরু হয় যে আপনা আপনি তাহা পুনরায় কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিতে চাহে, ভাবসাম্যের বিন্দুতে ফিরিয়া আসার ঝোঁক দেখা যায়।

এই নিয়মের সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে (ক) ইহা প্রধানতঃ ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, অন্ততঃ পৃথিবীর অধিকাংশে, ম্যালথুসীয় তত্ত্বের বিরোধী। (খ) এই তত্ত্ব শ্রমিকের যোগানকেই প্রধানতঃ প্রভাবশীল বলিয়া মনে করে, উহার জন্য চাহিদার প্রভাবকে মূলতঃ অস্বীকার করে। (গ) শ্রমিক সঙ্ঘ যে মজুরী নির্দ্ধারণে অনেকক্ষেত্রে কার্য্যকরী প্রভাব বিস্তার করে তাহা এই তত্ত্ব হইতে বোঝা যায় না। (ঘ) সমাজে বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন দক্ষতা-সম্পন্ন শ্রমিক আছে, তাহাদের মজুরীর মধ্যে পার্থক্য আছে, এই অবস্থা বিশ্লেষণে এই তত্ত্ব সাহায্য করিতে পারে না।

সমালোচনা

এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও মনে রাখা প্রয়োজন যে এই তত্ত্বের প্রভাব এক সময়ে ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশী ছিল। মার্ক্স ও সমাজতান্ত্রিকগণ প্রধানতঃ এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Theory of Surplus Value) বা শোষণ তত্ত্ব (Theory of Exploitation) নির্ণয় করিয়াছিলেন।*

২। মজুরী-ভাণ্ডার তত্ত্ব (Wages Fund Theory):

প্রাচীন ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের বিক্ষিপ্ত মতামত একত্র করিয়া জন ষ্টুয়ার্ট

*মার্ক্সের মতে জীবনধারণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অর্থাৎ মজুরীর পরিমাণ মূল্য উৎপাদন করিতে শ্রমিকের কার্য্যের মোট সময়ের একাংশ নিযুক্ত হয়, অপরাংশের কার্যের দ্বারা উৎপন্ন মূল্য মালিক আত্মসাৎ করে—ইহাকেই উদ্বৃত্ত মূল্য বলে।

মিল্ এই তত্ত্বকে রূপ দান করেন। তাহার মতে সমাজে মোট মূলধনের একটি অংশ মজুরী দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। ইহাকে মজুরী-ভাণ্ডার বলা চলে। মজুরীর স্তর অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিকের গড় মজুরী নির্ভর করে শ্রমিকের যোগানের উপর। শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পাইলে সেই ভাণ্ডার অধিক সংখ্যক শ্রমিকের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় মজুরী কমিয়া যায়। শ্রমিকের যোগান কম হইলে সেই ভাণ্ডার কম সংখ্যক শ্রমিকের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় শ্রমিক পিছু মজুরী বাড়িয়া যায়।

মজুরীর লৌহ-নিয়মে কোন মতেই মজুরীর স্তর ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না, কিন্তু এই তত্ত্ব অনুযায়ী মজুরীর হার বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। যদি শ্রমিক সংখ্যা কমে বা মজুরী-ভাণ্ডার বাড়ে, তাহা হইলে মজুরীর বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

এই তত্ত্বের বহুবিধ সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, মজুরী দেওয়ার জন্য দেশে কোন ভাণ্ডার নির্দিষ্ট আছে এইরূপ ধারণা সঠিক নয়। জাতীয় আয় হইতে সকল উপাদানই তাহাদের পারিশ্রমিক পায়, এই জাতীয় আয় কোনরূপ ভাণ্ডার নহে, ইহা স্রোতশীল ধারা। শ্রমিকরা তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতার সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের দ্বারা এই স্রোত সৃষ্টি করে এবং তাহা হইতেই উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী তাহাদের আয় সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্বের সাহায্যে মজুরীর পার্থক্য ব্যাখ্যা করা চলে না। তৃতীয়তঃ, এই তত্ত্ব অনুযায়ী ধরিয়া লইতে হয় যে সমাজে শ্রমিকের চাহিদা হয় মজুরী-ভাণ্ডারের পরিমাণ অনুযায়ী। সমাজে মোট সঞ্চরণশীল মূলধনের যে অংশ শ্রমিক নিয়োগে নিযুক্ত হয়, তাহাই মজুরী-ভাণ্ডার। কিন্তু দেশে শিল্প ও ব্যবসার প্রসার ও সঙ্কোচনের উপরেই শ্রমিকের চাহিদা নির্ভর করে, শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে, বিনিয়োগ কম হইলে চাহিদা কমে। সুতরাং, এই তত্ত্ব গ্রহণ করা চলে না।

সমালোচনা

এতদ্‌সত্ত্বেও এই তত্ত্বের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়; এই তত্ত্বেরই বিভিন্ন পরিবর্তিত রূপ টাউসিগ্, কেইন্‌স প্রভৃতি ধনবিজ্ঞানীর সমর্থন পাইয়া আসিতেছে। সঞ্চরণশীল মূলধনের মোট পরিমাণের দ্বারা সকল শ্রমিকগণের মোট আসল আয় নির্দ্ধারিত, ইহা বলা চলে: কারণ মূলধনের মালিকরাই তো শ্রমিককে মজুরী দেয় এবং উৎপাদনধারা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মজুরী দেওয়া হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্ত

কেইন্‌সের মতে মোট সঞ্চরণশীল মূলধনের সহিত মোট কার্যকরী মূলধন (অর্ধ-নির্মিত দ্রব্যাদি) যোগ করিয়া সেই সমষ্টি হইতে (Working Capital) সকল শ্রমিকের মজুরী দেওয়া হয়।

৩। জীবনযাত্রার মান ও মজুরী (Standard of Living and wages) :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই জীবনধারণ তত্ত্বের পরিবর্তে উহারই উন্নত সংস্করণ জীবনযাত্রার মান-সম্পর্কীয়-তত্ত্ব প্রচারিত হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরী নির্ভর করে তাহার জীবন যাত্রার মানের উপর। যে রূপ দ্রব্য সামগ্রী (আরাম, সুবিধা) ব্যবহারে শ্রমিক অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাই মোটামুটি শ্রমিকের জীবন যাত্রার মান স্থির করে এবং মজুরীর হারও সেই স্তর অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হয়। অভ্যস্ত জীবন যাত্রার মান বজায় রাখিতে যে মজুরীর প্রয়োজন তাহা হইতে কম হইলে শ্রমিকের যোগান কমিয়া যাইবে ; জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে যাহা প্রয়োজন মজুরী তাহা হইতে বেশী হইলে, শ্রমিকের যোগান বাড়িবে। সুতরাং জীবনযাত্রার মান-এর স্তরে দেশে মজুরীর স্তর নির্দ্ধারিত হইয়া পড়ে।

বাস্তব ক্ষেত্রে, দুই প্রকারে জীবন যাত্রার মান মজুরীর হার নির্দ্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান এমন একটি স্তব যাহার নীচে মজুরী নামিবার চেষ্টা করিলে শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহাকে বাধা দেয় এবং অন্ততঃ অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার চেষ্টা করে। মজুরীর নিম্নতম স্তর হিসাবে জীবনযাত্রার মানকে গ্রহণ করা চলে এবং সেই হেতু ইহা মজুরীর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, জীবন যাত্রার মানে বৃদ্ধি (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, আমোদপ্রমোদের সুবিধা ইত্যাদি) শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাকে বাড়াইয়া দেয়, ফলে মজুরী বাড়িতে পারে। নীচু জীবনযাত্রার মান উৎপাদন ক্ষমতাকে কমাইয়া দেয়, মজুরী কমিতে পারে।

জীবন যাত্রার মান কিরূপে মজুরীর উপর প্রভাব বিস্তার করে

কিন্তু জীবনযাত্রার মান সম্পূর্ণভাবে মজুরীর নির্দ্ধারক, ইহা ঠিক নহে। এই তত্ত্ব কেবল মাত্র শ্রমিকের যোগান কিরূপে নির্দ্ধারিত হয় তাহাই বিচার করিতে প্রয়াস পায়, বাজারে শ্রমিকের জন্য চাহিদাকে কোন গুরুত্ব দেয় না। শ্রমিকরা যে জীবনযাত্রার মানেই অভ্যস্ত থাকুক না কেন, কোন উৎপাদক শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার অধিক মজুরী দিতে

প্রস্তুত নহে। দ্বিতীয়তঃ, জীবনযাত্রার মান ও মজুরী পরস্পর নির্ভরশীল। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি হইলে মজুরী বৃদ্ধি হয় আবার মজুরী বৃদ্ধি হইলেও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। ইহাদের সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, একটি অন্যটির নির্দ্ধারক নহে (Not independent determinant)। তৃতীয়তঃ, দেখা যাইতেছে যে, মজুরীর হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু জীবন যাত্রার মান এই তত্ত্ব অনুযায়ী একটি অভ্যস্ত নির্দিষ্ট মান, তাহা বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এই সকল কারণে এই তত্ত্ব মজুরী-নির্দ্ধারনী তত্ত্ব হিসাবে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে।

সমালোচনা

৪। প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও মজুরী (Marginal Productivity and wages):

একটি দ্রব্যের দাম যেরূপ উহার প্রান্তিক উপযোগিতার সমান হয়, শ্রমিকের মজুরীও তাহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা স্থির হইয়া থাকে। শ্রমিকের যোগান এবং দ্রব্যের দাম স্থির থাকিলে কোন ফার্ম সেই পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করিবে যখন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা মজুরীর সমান।

সকল উপাদানের যোগান স্থির রাখিয়া একজন শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি হয় তাহাকে সেই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বলা হয়। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী হওয়ায় ক্রমশঃ অধিক শ্রমিক নিয়োগের ফলে ক্রমেই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়া আসে। যদি শ্রমিক নিয়োগ করিয়া দেখা যায় তাহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তাহার পারিশ্রমিক হইতে অধিক, তাহা হইলে সে নিযুক্ত হইবে এবং আরও শ্রমিকের চাহিদা হইবে। এইরূপে এমন পরিমাণ শ্রমিক-নিয়োগের স্তর আসিয়া পড়িবে যখন আরও অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে উৎপাদনক্ষমতার তুলনায় পারিশ্রমিক অধিক, সেই অবস্থায় অধিক শ্রমিক নিযুক্ত হইবে না।

প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা কাহাকে বলে

টাউসিগ্ বলিয়াছেন যে মজুরী প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হইতে কিছু কম হইবে। কারণ মালিক উৎপাদনধারা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্রমিককে অগ্রিম মজুরী দেয়, সুতরাং ইহার দরুণ কিছুটা সুদ সে কাটিয়া রাখিয়া তাহার পরই মজুরী দিবে। ইহাকে বাট্টা-যুক্ত প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব (Theory of discounted Marginal Product) বলা হয়।

বাট্টা-যুক্ত প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা

এই তত্ত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দ্রব্যের ও শ্রমিকের উভয়ের বাজারেই অবাধ প্রতিযোগিতা এবং শ্রমিকের পূর্ণ চলনশীলতা (Perfect Mobility) ধরিয়া লইয়া এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু বাস্তবজীবনে পূর্ণপ্রতিযোগিতা বা পূর্ণ চলনশীলতা কোনটিই নাই। দ্বিতীয়তঃ, এইতত্ত্ব ধরিয়া লয় যে, সকল শ্রমিক এক-জাতীয় এবং একের পরিবর্ত্তে অন্যকে সমানভাবে নিয়োগ করা সম্ভব। ইহাও ঠিক নহে। তৃতীয়তঃ, এই তত্ত্ব শুধু মাত্র চাহিদার দিকই প্রকাশ করে এবং যোগানের প্রভাব সম্বন্ধে কিছুই বলে না। সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবে উৎপাদনপদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবস্থা এমনই যে কোন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সঠিকভাবে হিসাব করা সম্ভবপর নহে।

৫। মজুরী নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theory of wages) :

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের মতে মজুরী হইল শ্রমের দাম এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকিলে অপরাপর সকল দামের ন্যায় ইহা শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের বিন্দুতে স্থির হয়।

শ্রমিকের চাহিদা

শ্রমিকের জন্য চাহিদার কারণ যে উহার উৎপাদন ক্ষমতা আছে। একজন শ্রমিক অধিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে তাহাই হইল শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা। যত অধিক শ্রমিক নিযুক্ত হইতে থাকিবে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত কমিয়া যাইবে। মজুরী শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হইবে, ইহা কখনই প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের অধিক হইবে না। বিভিন্ন মজুরীতে বিভিন্ন ফার্মে কি পরিমাণ শ্রমিকের চাহিদা আছে তাহা যোগ দিয়া বিভিন্ন মজুরীতে সমাজে মোট শ্রমিকের জন্য চাহিদা-তালিকা প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

শ্রমিকের যোগান

শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে উহার যোগান-দামের উপর। মজুরী বেশী হইলে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি হয়, মজুরী কম হইলে শ্রমিকের যোগান কমিয়া যায়। কোন দামে অর্থাৎ কোন মজুরীতে কি পরিমাণ শ্রমিকের যোগান হইল তাহা নির্ভর করে বিভিন্ন শ্রমিকের জীবন ধারণের মানের উপর। অনেক শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান নীচু বলিয়া কম মজুরীতে নিজের শ্রম যোগান দিতে অর্থাৎ কাজ করিতে রাজী হয়; অনেক শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উঁচু বলিয়া বেশী মজুরীতে নিজের শ্রম

যোগান দিতে অর্থাৎ কাজ করিতে রাজী হইবে। ইহা সাধারণ ভাবে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য।*

এইরূপে সমাজে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের তালিকা পাশাপাশি রাখিলে এমন একটি মজুরীর হার পাওয়া যায়, যে বিন্দুতে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগান সমান। সেই মজুরীকে মজুরীর ভারসাম্য-হার (Equilibrium rate of wages) বলা হয়। সেই মজুরীতে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান। যদি বাজারে মজুরী ইহা হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে অধিক শ্রমিক সেই মজুরীতে কাজ করিতে চাহে, কিন্তু বেশী মজুরীর দরুণ চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় তাহারা কাজ পাইবে না। এই অবস্থায় তাহারা নিজেদের দাম কমাইয়া দিবে, ফলে চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা কর্মে নিযুক্ত হইবে। যদি মজুরীর ভারসাম্য-হার হইতে বাজারে মজুরী কম হয় তাহা হইলে ফার্মসমূহ অধিক শ্রমিকের চাহিদা করিবে, শ্রমিকের যোগান কমিয়া যাইবে এবং মজুরী বাড়িয়া পুনরায় ভারসাম্যের বিন্দুতে স্থির হইবে।

ভারসাম্যের বিন্দু

শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে এইরূপে মজুরী নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকারই সম্ভাবনা। এমতাবস্থায় মজুরীর হার নির্ভর করে মালিক সংঘ ও শ্রমিক সংঘের মধ্যে দর কষাকষির (Collective bargaining) উপর। মজুরীর সর্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারিত হয় শ্রমিকের মোটামুটি জীবনযাত্রার মানের দ্বারা। যদি মালিক সংঘ তুলনায় শক্তিশালী হয়, তবে মজুরী নিম্নতম সীমায় বা উহার কাছাকাছি থাকে, যদি শ্রমিক-সংঘ শক্তিশালী হয়, তবে মজুরী সর্বোচ্চ সীমায় বা উহার কাছাকাছি থাকে।

*কিন্তু কোন বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ শ্রমিকের যোগান হইবে তাহা নির্ভর করে নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর:

প্রথমতঃ, শ্রমিকের সামনে পরিবর্ত্ত-ব্যবহারে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা কিরূপ, অর্থাৎ বিকল্প-ব্যবহারে মজুরীর হার কিরূপ;

দ্বিতীয়তঃ, বিকল্প চাকুরীতে যাইবার ব্যয় কিরূপ;

তৃতীয়তঃ, অন্য চাকুরীতে যাইবার প্রতিবন্ধক সমূহের শক্তি কিরূপ (যেমন আলস্য, কুসংস্কার, মোট শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বৃদ্ধ (ও বয়স্ক শ্রমিকের অনুপাত)।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও মজুরী (Imperfect Competition and wages) :

পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশেই শিল্প-সম্মিলন বা একচেটিয়া ব্যবসা সংগঠনের প্রসারের ফলে শ্রমের বাজারে আর বহু সংখ্যক ক্রেতা নাই ; সমগ্র বাজারের মধ্যে বহু উপ-বাজারের (Sub-market) সৃষ্টি হইয়াছে, প্রত্যেক ছোট ছোট উপবাজারে শ্রমের ক্রেতা হিসাবে একটি ফার্ম বা কয়েকটি ফার্ম মাত্র শ্রমের চাহিদা করে। দেখা যায় যে, শ্রমের যোগানের দিকেও আর বহু সংখ্যক শ্রমিক কাজ পাইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে তাহা নহে ; শক্তিশালী শ্রমিক সঙ্ঘের মারফৎ শ্রমের বিক্রয় ও যোগান চলে।

শ্রমের বাজারে সাধারণত: আজকাল তিন রকম অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমত:, একদিকে মালিক সঙ্ঘ, অপরদিকে শ্রমিকসঙ্ঘ—দুই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ দরকষাকষি (Collective bargaining) দ্বারা শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমিকের মজুরী স্থির হয়। এইরূপ দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া (Bilateral Monopoly) শ্রমের বাজারে থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত:, অসংখ্য শ্রমিক প্রতিযোগিতার দ্বারা শ্রম বিক্রয় করিতেছে, অথচ একটি ফার্ম বা একটি শিল্পসঙ্ঘ শ্রমের ক্রেতা ; এইরূপ একচেটিয়া ক্রেতা (Monopsony) থাকা সম্ভব। তৃতীয়ত:, কয়েকটি ফার্ম বা কয়েকটি শিল্পসঙ্ঘ ক্রেতা হিসাবে আছে এবং কয়েকটি শ্রমিকসঙ্ঘের সহিত তাহাদের দর কষাকষি হইতেছে, এমনও ঘটিতে পারে।*

দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া

প্রথম ক্ষেত্রে, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া অবস্থায় পারস্পরিক শক্তির দ্বারা মজুরীর হার স্থির হইবে। একচেটিয়া বিক্রেতার দ্বারা স্থিরীকৃত সর্বোচ্চ মজুরী এবং একচেটিয়া ক্রেতার দ্বারা স্থিরীকৃত সর্বনিম্ন মজুরী—ইহার মধ্যে যে কোন স্থানে মজুরী নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

একচেটিয়া ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যদি একচেটিয়া ~~ভারক~~ (Monopoly) এবং পারস্পরিক ~~ক্রেতা~~ প্রতিযোগী বহু বিক্রেতা থাকে, তাহা হইলে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় শ্রমিক যে মজুরী পাইতে পারিত তাহা হইতে কম পাইবে। যদি শ্রমিকদের চলনশীলতা (Mobility) না থাকে, তবে তাহারা কম দামেই ওই ফার্মে কাজ করিতে বাধ্য হইবে ; কিন্তু যদি তাহারা বিকল্প-চাকুরীতে বা পরিবর্ত্ত-শিল্পে চলিয়া যাইতে থাকে, তখন একচেটিয়া ক্রেতা বাধ্য হইয়া দাম বাড়াইবে।

---

*অর্থাৎ এক ক্রেতা + এক বিক্রেতা ; এক ক্রেতা + অনেক বিক্রেতা ; কয়েকটি ক্রেতা + কয়েকটি বিক্রেতা।

তৃতীয়ক্ষেত্রে, যদি কয়েকটি ক্রেতা ও কয়েকটি বিক্রেতা (অর্থাৎ কয়েকটি মালিক সঙ্ঘ ও কয়েকটি শ্রমিক সঙ্ঘ) থাকে তাহা হইলে উভয়দিকেই তাহাদের পারস্পরিক বোঝাবুঝি বা ঐক্যবদ্ধ নীতি নির্দ্ধারণের শক্তির দ্বারা মজুরী স্থির হইবে। যদি কয়েকটি ক্রেতা শ্রমিক ক্রয়ের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া সমনীতি অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহারা একচেটিয়া ক্রেতার মতন সুবিধা পাইবে, মজুরী কম রাখা সম্ভব হইবে। যদি ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারে তাহা হইলে একচেটিয়ার সুবিধা সম্পূর্ণ পাইবে না, মজুরী একটু বাড়াইতে হইতে পারে। কয়েকটি শ্রমিক-সঙ্ঘ যদি একযোগে একই নীতি অনুসরণ করে তাহা হইলে মজুরীর হার বাড়িবার সম্ভাবনা ; যদি পৃথক নীতি অনুসরণ করে তবে মজুরীর হার কমিবার সম্ভাবনা।

কয়েকটি ক্রেতা ও কয়েকটি বিক্রেতা

অন্যান্য সকল কিছু সমান থাকিলে (অর্থাৎ দ্রব্যের চাহিদা ও দাম, অন্যান্য উপাদানের দাম, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি), অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে মজুরী উপরোক্তভাবে প্রভাবান্বিত হইবে।

মজুরী পার্থক্য (Difference in wages) :

১। **বিভিন্ন চাকুরীর মধ্যে মজুরীর পার্থক্য** থাকিতে পারে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণের জন্য :

(ক) সাধারণভাবে যে, চাকুরী পছন্দসই তাহাতে শ্রমিকের যোগান বেশী এবং মজুরীর হার কম ; যে চাকুরী মোটেই পছন্দজনক নহে, সেখানে শ্রমিকের যোগান কম এবং মজুরীর হার বেশী।

(খ) যে চাকুরীতে বৎসরের সকল সময় কাজ থাকে না, সেখানে একটু বেশী মজুরী দিতে হয়, যেখানে নিয়মিত কাজ থাকে, সেক্ষেত্রে মজুরী কম হয়।

(গ) যে ধরণের চাকুরী তুলনামূলক ভাবে অন্য চাকুরীর তুলনায় লোকচক্ষে অধিকতর সম্মান-জনক, সেখানে সাধারণত শ্রমিকের যোগান বেশী, সুতরাং মজুরী কম ; যেমন শিক্ষক, অধ্যাপক ইত্যাদি।

যে চাকুরী পাইতে হইলে বহুদিন ধরিয়া এবং ব্যয়শীল শিক্ষার দরকার সাধারণতঃ সেক্ষেত্রে মজুরী বেশী হইয়া থাকে।

(ঙ) যে ধরণের কার্য্যে ভবিষ্যতে মাত্র কয়েক জনের পক্ষে প্রচুর আয়ের

সম্ভাবনা থাকে (যেমন, ওকালতি), সেখানে প্রচুর লোক বর্ত্তমানে ভিড় করে, ফলে একদিকে প্রচুর আয়, আর একদিকে কম আয় দেখিতে পাওয়া যায়।

(চ) সমাজে আরও বহু কারণে মজুরীর বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্পত্তি, আয়, পারিবারিক প্রতিষ্ঠা বা শিক্ষা—এই সকল কারণে সমাজ বহু অংশে বিভক্ত থাকে। এক এক অংশের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের এক এক ধরণের চাকুরী পাইবার সুবিধা থাকে। এক অংশের লোক অপর অংশে চাকুরী খুঁজিতে যায় না এবং ইহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। ইহাদের অপ্রতিযোগী শ্রমিকমণ্ডলী (Non-Comepeting groups of labour) বলা হয়। এক মণ্ডলী হইতে অন্য মণ্ডলীতে শ্রমিকদের যাওয়া-আসা নাই বলিলেই চলে। যেমন ঝাড়ুদারের কাজ অপছন্দজনক হইলেও সে অন্য কাজে সহজে আসিতে পারে না। কোন মণ্ডলীতে শ্রমিকের যোগান চাহিদার তুলনায় বেশী, তাই মজুরী কম: কোন মণ্ডলীতে শ্রমিকের যোগান চাহিদার তুলনায় কম, তাই মজুরী বেশী।

২। **বিভিন্ন দেশের মধ্যে** মজুরীর হারে পার্থক্য থাকে এই কারণে যে, কোন দেশে মজুরীব হার বেশী হইলে অপর স্থান হইতে মজুব আসিয়া প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। সকল দ্রব্যের মধ্যে মানুষ-ই স্থানান্তরের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অসুবিধাজনক। ভাষা, ধর্ম, আইন কানুন, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদির পার্থক্য থাকায় পৃথিবীর দেশসমূহের মধ্যে শ্রমিকের চলনশীলতা (Mobility) নাই বলিলেই চলে।

৩। **বিভিন্ন সময়ের মধ্যে** মজুরীর হারে পার্থক্য বহুকারণে ঘটে। দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা, জনসংখ্যা, মূলধন-নিয়োগ ইত্যাদিতে পরিবর্ত্তন হইলে মজুরী পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন কালে শ্রমিকের যোগান ও চাহিদায় পার্থক্য থাকে, তাই মজুরীর তারতম্য হয়।

শ্রমিকের অচলনশীলতা (Immobility of Labour):

এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে বা এক কাজ হইতে অন্য কাজে শ্রমিকদের যাতায়াতকে শ্রমিকের চলনশীলতা (Mobility) বলা হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় অভ্যস্ত অঞ্চল বা কার্য্য কিছুই শ্রমিকরা সহজে পরিত্যাগ করে না; ইহাকে শ্রমিকের অচলনশীলতা (Immobility) বলা যায়।

আঞ্চলিক বা ভৌগলিক অচলনশীলতা (Regional or Geographical Immobility) বহু কারণে সম্ভব। ভাষার, ধর্মের, আইনকানুন বা রীতিনীতির পার্থক্য থাকায় এক দেশ হইতে অন্যদেশে মজুরীর হার বেশী হইলেও শ্রমিকরা চলিয়া যায় না। এমনকি, এক দেশের মধ্যে কোন অঞ্চলের শিল্পসঙ্কট উপস্থিত হইলে অন্য অঞ্চলে শ্রমিকদের চলিয়া যাওয়ার ঝোঁক খুব দেখা যায় না। পারিবারিক কারণে, বেশী বয়সের দরুণ উৎসাহের অভাবে, অপরিচিত পরিবেশের আশঙ্কায় দেশে আঞ্চলিক চলনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভৌগলিক অচলনশীলতার কারণ ও ফলাফল

বিভিন্ন পেশার মধ্যে শ্রমিকের অচলনশীলতা (Occupational Immobility) অনেক কারণে সম্ভব। যেহেতু শ্রমিকরা পরিচিত পুরোণো অঞ্চল ছাড়িয়া যাইতে চাহে না সেইজন্য অন্য অঞ্চলে অন্য চাকরী থাকিলেও তাহারা সেই সুযোগ গ্রহণ না-করিতে পারে। একই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের চাকুরীর সুযোগ সাধারণ ভাবে কম থাকে। অনেক সময় উৎসাহের অভাবে অথবা প্রেরণার অভাবে তাহারা অন্য চাকুরীর চেষ্টা বা খোঁজ খবর করে না। অনেক সময়ে তাহারা অন্য চাকুরীতে যাইতে চাহে বটে, কিন্তু কোথায় কি সুযোগ আছে তাহার খবর না পাওয়ায় যাওয়া হইয়া উঠে না। কোন কার্য্যে নূতন ভাবে প্রবেশ করিতে গেলে ব্যয়-সাধ্য অথবা দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজন হয়; সকলে সরূপ অর্থ বা সময় ব্যয় করিতে পারে না বা পারিলেও রাজী হয় না; কোন একটি কার্য্যে বিশেষ অঞ্চলের লোক ছাড়া ঢুকিতে পারে না; (ইংলণ্ডে কয়েকমাস পূর্ব্বে ভারতীয়দের বাস-কণ্ডাক্টার হিসাবে নিয়োগের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইয়াছিল অথবা নিগ্রোদের ক্ষেত্রে যেরূপ হইয়া থাকে); কোন কার্য্যে বিশেষ ভাষাভাষী লোক ছাড়া নিয়োগ করা হয় না। সমাজ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং ভাবধারায় বিশেষ ধরণের কাঠিন্যের বা অনমনীয়তার (Rigidites) জন্য এইরূপ ঘটিয়া থাকে এবং শ্রমিকদের অচলনশীলতা সৃষ্টি হয়। ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্মের দরুণ পূর্ব্বে এইরূপ ঘটিত এবং এখনও বহু অঞ্চলে জীবিকার ক্ষেত্রে সামাজিক ও ধর্ম্মীয় রীতিনীতি প্রভাবশীল।

পেশাগত অচলনশীলতার কারণ ও ফলাফল

ভৌগলিক বা জীবিকার ক্ষেত্রে, যে কোন অচলনশীলতা-ই সাধারণতঃ বয়স্ক শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র। নূতন কার্য্যে যোগ দেওয়া তাহাদের পক্ষে শক্ত;

বহুদিনের অভ্যাস-জাত চলাফেরার পদ্ধতি, চিন্তা ও কাজের কৌশল তাহাদের প্রায় বিশেষ-নির্দ্দিষ্ট উপাদানের সামিল করিয়া তোলে। অন্য কার্য্যের জন্য নূতন শিক্ষালাভ, তরুণ পরিদর্শকের অধীনে কাজ করা বয়স্কদের নিকট বিরক্তিজনক; কম মজুরীতেও পুরাণো স্থানে বা পুরাণো কার্য্যে জীবন কাটান অধিকতর কাম্য। বয়স যত বেশী, বিকল্প স্থানে যাওয়া বা বিকল্প জীবিকা গ্রহণ করা তত অসুবিধাজনক। পরিবর্ত্তনের দায়িত্ব ও ভার তাই কম বয়সের শ্রমিকদের উপর আসিয়া পড়ে। নূতন পরিবেশের মোহে তাহারা সহজে আকৃষ্ট হয়, সহজেই স্থান বা জীবিকার পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে; তাহাদের চলনশীলতা অনেক বেশী। বয়স্ক শ্রমিকের পুরাণো সম্পত্তি তদারক করা বা বিক্রয় করা, নূতন স্থানে বাসের উপযোগী স্থান যোগাড় করা, পরিবারের সকলের যাহা কিছু ব্যবস্থা করা, অনেক কিছু ভাবিতে হয়, তরুণ শ্রমিকদের এত চিন্তা থাকে না। পরিবার সহ অন্য স্থানে যাইবার ব্যয়-ও চলনশীলতার বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং সমাজের মোট শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যত অধিক পরিমাণে তরুণ শ্রমিক থাকে, সেই সমাজের শ্রমিক শ্রেণী তত অধিক চলনশীল।

শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন বয়সের শ্রমিক-সংখ্যা ও স্বচলনশীলতা

স্ত্রী-শ্রমিকের মজুরী কম হইবার কারণ হইল জীবিকার ব্যাপারে অচলনশীলতা। কোন আইন কানুনের বাধা না থাকিলেও ইহা সকলেই জানে যে বহু ক্ষেত্রে স্ত্রী-শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না। কম পরিশ্রম করিতে পারে বা অধিক বিশ্রাম আদায় করে, এই সকল যুক্তিতে স্ত্রী শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না। অথবা করিলেও কম মজুরী দেওয়া হয়। তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের ক্ষেত্র বিশেষ ভাবে সঙ্কুচিত হওয়ায় সেই অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে স্ত্রী-শ্রমিকের যোগান বেশী হয়, তাহাদের মজুরীর হারও কম থাকে।*

স্ত্রী-শ্রমিকের মজুরীর হার কম কেন

চলনশীলতা বৃদ্ধির উপায় (Measures of increasing mobility):

কর্মবিনিময়-কেন্দ্র (Employment Exchange) স্থাপন করিয়া সকল শ্রমিককে অন্যান্য বিকল্প চাকুরীর সন্ধান দিলে চলনশীলতা বৃদ্ধি হইতে পারে।

* স্ত্রী শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা কম, স্ত্রী শ্রমিক-সঙ্ঘের সংগঠন দুর্ব্বল, অথবা তাহাদের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে চাকুরী সখের ব্যাপার, সময় কাটাইবার উপায় মাত্র এইরূপ যুক্তিতে-ও তাহাদের মজুরী কম হইয়া থাকে।

কোন চাকুরীর কি মাহিনা, কি সুবিধা বা অসুবিধা, যাতায়াতের ব্যয় কিরূপ, বিকল্প চাকুরীর অঞ্চলে বাসগৃহের ব্যবস্থা কি, এই সকল খবর কর্ম-বিনিময় কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকদের নিয়মিত সরবরাহ করিলে তাহাদের চলনশীলতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। যে সকল শ্রমিক অন্যস্থানে যাইতে চাহে, তাহাদের যানবাহনের সুব্যবস্থা করিলে বা ভাড়া কম লইলে অন্য স্থানে যাওয়া তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়। বেকার শ্রমিকদের বা ভীড়গ্রস্ত শিল্পের শ্রমিকদের বিশেষ কোন শিল্পে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিলে সুবিধা হয়। অল্পআয়কারী শ্রমিকদের শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করিলে তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইতে পারে এবং তাহারা সমাজের বিভিন্ন জীবিকাতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। তাহা না হইলে পারিবারিক জীবিকা গ্রহণ বা পিতার অনুকরণ করাই তাহাদের সম্মুখে একমাত্র পথ উন্মুক্ত থাকে।

উচ্চ মজুরী দেওয়ার সুবিধা (Economy of high wages) ঃ

সাধারণের মনে হইতে পারে যে উচ্চ মজুরী মালিকের পক্ষে ক্ষতিকর কারণ ইহাতে তাহার ব্যয়বৃদ্ধি হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় কম মজুরী দিলে মালিকের ব্যয়সঙ্কোচ না ঘটিতেও পারে। কম মজুরীর ফলে

মজুরী, দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা

শ্রমিক দক্ষতাও কম হইবার সম্ভাবনা, শ্রমিক পিছু উৎপাদনের পরিমাণও কম, সুতরাং ইউনিট প্রতি ব্যয় বেশী পড়িতে পারে। অপর পক্ষে মজুরী বেশী হইলে দক্ষতা বাড়ে, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, শ্রমিক প্রতি উৎপাদনের পরিমাণও বেশী হয়, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় কম পড়িবার সম্ভাবনা। মালিক সর্ব্বদা মজুরীর সহিত উৎপাদনের তুলনা করেন। মজুরীদেওয়ার জন্য সে যে অর্থ খাটান তাহার তুলনায় কি পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যাইতেছে মালিক তাহাই প্রধানতঃ হিসাব করে। ইহাকে মজুরী-ব্যয় (Wage-cost) বলে। মালিক কম মজুরী দিতে চাহে না, সে মজুরী-ব্যয় কম রাখিতে চাহে।

বেশী মজুরী থাকিলে কম মজুরী-ব্যয় (Wage-costs) হয়, ইহার কারণ অনেক। প্রথমতঃ, বেশী মজুরী জীবন যাত্রার মান ও উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ, অধিক মজুরী দিলে মালিক সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ শ্রমিকদের আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে; শ্রমের বাজারে দক্ষশ্রমিক ছাঁকিয়া

তুলিয়া লইতে পারে (to cream the labour-market)। তৃতীয়তঃ, বেশী মজুরীতে শ্রমিকরা কাজে উৎসাহ পায়, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি হয় ধর্মঘট বা তালাবন্ধের (lock-out) দ্বারা কাজের দিন লোকসান যায় না।

এই সকল কারণেই টাউসিগ বলিয়াছেন যে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ মালিক সেই যে শ্রমিকদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মজুরী দিতে চেষ্টা করে।

কোন বিশেষ শিল্পে মজুরী হার কিসের উপর নির্ভর করে (On what factors depend the rate of wages in a particular industry ?

দেশে মজুরীর সাধারণ স্তর (general level of wages) সকল শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নির্ভর করে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের উপর। উহা হইল দেশের সাধারণ মজুরীর স্তব।

কিন্তু দেশের মধ্যে কোন একটি বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে মজুরী কি হইবে তাহা তিনটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

প্রথমতঃ, কোন একটি শিল্পের প্রয়োজনীয় শ্রমিকের অর্থাৎ উক্ত শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের যোগান এবং মজুরী নির্ভর করিবে অন্যান্য শিল্প সেই শ্রমিকদের জন্য কি দাম দিতে প্রস্তুত আছে তাহার উপর। এই প্রতিযোগিতামূলক টানাটানির দরুণ (Competitive pulls) সেই শিল্পকে শ্রমিক পাইতে হইলে কি মজুরী দিতে হইবে তাহা মোটামুটি স্থির হইবে। অন্য শিল্প হইতে মজুর লইয়া আসার সম্ভাবনা বা তাহার শিল্প হইতে অন্য শিল্পে মজুর চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া সে মজুরীর হার স্থির করিবে। অর্থাৎ শ্রমিকেব চলনশীলতার উপবও এই প্রতিযোগিতামূলক দাম ও টানাটানি নির্ভর করিবে। এককথায় কোন শিল্পের তরফ হইতে শ্রমিকের জন্য একটি নির্দিষ্ট যোগান-দাম (Supply Price of labour to the industry) আছে।

প্রতিযোগিতামূলক আকর্ষণ

দ্বিতীয়তঃ, মালিকের চাহিদা-দাম-ও (demand-Price) সেই শিল্পের মজুরী নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করিবে। মালিকের এই চাহিদা-দাম প্রধানতঃ নির্ভর করে ওই শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের দামের উপর। স্বল্পকালে দ্রব্যের দামের উঠানামার সহিত মজুরী বাড়িবে, দ্রব্যের দাম কমিলে মজুরীও কমিবে। দীর্ঘকালে অবশ্য দ্রব্যের দাম কমিলে মজুরীও কমিবে। দীর্ঘকালে শ্রমিকরা

উৎপন্ন দ্রব্যের দাম

বিভিন্ন শিল্পের সুবিধা অসুবিধা জানিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় শিল্পে চলিয়া যাইতে চাহিবে, সুতরাং শ্রমিকদের যোগান-দাম (Supply Price of Labour) এক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাবশীল।

পারস্পরিক দর-কষাকষি

তৃতীয়তঃ, মালিক ও শ্রমিকের সংগঠনের পারস্পরিক দরকষাকষির প্রভাব (Bargaining influences) কোন বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে মজুরী নির্দ্ধারণে অন্যতম শক্তি। এই শক্তি পরীক্ষায় উর্দ্ধতম ও নিম্নতম সীমার অনির্দ্দিষ্ট পরিধির মধ্যে মজুরী স্থির হয়; শ্রমিকসঙ্ঘ মালিকের তালা-বন্ধকে ভয় করে এবং মালিক সঙ্ঘ-ও শ্রমিকদের ধর্মঘটকে ভয় করে।

ব্যবসার অবস্থার উপর পারস্পরিক শক্তি নির্ভরশীল

দুই পক্ষের যুদ্ধ কৌশল (Tactics) অনেকখানি নির্ভর করে ব্যবসার অবস্থার উপর। দেশে বেকারীর পরিমাণ বেশী থাকিলে শ্রমিকসঙ্ঘ একটু দুর্ব্বল হয়; কারণ তাহাদের অর্থ সম্পদ সেই সময় কম, শ্রমিকদের আনুগত্য একটু দৃঢ় কারণ তাহাদের হঠাৎ চাকুরী চলিয়া যাওয়ার বা ওই শিল্পে কোন কোন ফার্ম বন্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে।

যদি পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা থাকে, তাহা হইলে শ্রমের বাজার বিক্রেতাদের পক্ষে (Seller's Market); মালিকরাও শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইতে রাজী থাকে, কারণ উৎপাদন বন্ধ হইলে মুনাফা বন্ধ হইবে, ব্যবসা-সমৃদ্ধির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না।

সাধারণভাবে, পূর্ণ কর্মনিয়োগের সময় ব্যতীত মালিক-সঙ্ঘই অধিকতর শক্তিশালী থাকে; কারণ তাহারা সংখ্যায় অল্প, পরস্পরের সহিত একমত হওয়া সম্ভবপর এবং আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতার বলে তাহারা দরকষাকষিতে অগ্রসর হইতে পারে। তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা, প্রতিপত্তি, সহায়-সম্পদ এবং প্রচার যন্ত্রের কৌশলী ব্যবহারের নিকট শ্রম না বিক্রী হইলে জীবনধারণ চলিবে না এইরূপ শ্রমিকদের সংগঠন স্বভাবতঃই দুর্ব্বল।

মজুরীর উপর নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রচলনের প্রভাব ঃ

(Effects of inventions on wages)

কোন বিশেষ উৎপাদনপদ্ধতির অন্তর্গত কোন বিশেষ উপাদান-সূত্র বা উপাদান-সম্মিলন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় উহার মধ্যে শ্রমিক ও মূলধন

নিয়োগের একটি বিশেষ অনুপাত আছে। শ্রমিক প্রতি কিছু পরিমাণ মূলধন নিযুক্ত আছে। সাধারণ ভাবে বলা হয় শ্রমিক-প্রতি মূলধনের পরিমাণ যত বাড়িবে, উৎপাদন তত বৃদ্ধি পাইবে।

কোন যন্ত্রের প্রচলন হইলে তাহার দুইটি প্রভাব হইতে পারে; শ্রমিক পিছু মূলধন বাড়িয়া যাইতে পারে অর্থাৎ (উৎপাদন একই থাকিলে) শ্রমিক ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, অথবা শ্রমিক পিছু মূলধন কমিয়া যাইতে পারে অর্থাৎ (উৎপাদন একই থাকিলে) মূলধন ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সাধারণতঃ নূতন যন্ত্র হয় শ্রম-সঞ্চয়ী (Labour-Saving) অথবা মূলধন-সঞ্চয়ী (Capital-Saving) হইয়া থাকে।

শ্রম-সঞ্চয়ী আবিষ্কার ও মূলধন-সঞ্চয়ী আবিষ্কার

প্রথম ক্ষেত্রে, সেই শিল্পে শ্রমিকের চাহিদা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা, সুতরাং মজুরীও কমিতে পারে। কিন্তু ইহা স্বল্পকালীন সত্য; দীর্ঘকালে ওই যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে সমগ্র শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মেরামতের কেন্দ্র স্থাপনের ফলে বিভিন্ন দিকে মোট শ্রমিকের চাহিদার ফলে মজুরী না কমিয়া বাড়িয়া যাইতে পারে। তবে, সাময়িক ভাবে, কোন বিশেষ শিল্পে এবং সেই শিল্পে নিযুক্ত বিশেষ শ্রমিক-দলের চাহিদা ও মজুরী কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সেই শিল্পে মূলধনের চাহিদা কমিলে সুদের হার কমিতে পারে; জাতীয় বিভাজ্য আয়ের (National Dividend) অধিক অংশ শ্রমিকরা পাইতে পারে।

সাধারণতঃ, শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে পারিলেই শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য এমন যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রচলন হয় যাহাতে উৎপাদনে শ্রমিক সংখ্যা কম প্রয়োজন হয়।

শ্রমিক সঙ্ঘ (Trade Unions) :

চাকুরীর অবস্থা ও সর্ত্তাদি বজায় রাখা বা উন্নত করার উদ্দেশ্যে মাহিনা-ভোগী কর্মচারীদের স্থায়ী সংগঠন-কে শ্রমিক সঙ্ঘ বলা হয়।

শিল্প-প্রধান দেশসমূহে আজকাল শক্তিশালী শ্রমিক-সঙ্ঘ দেখা যায়। শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী, কারণ উপাদান হিসাবে শ্রমের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার দরুণ মালিকদের তুলনায় তাহারা দরকষাকষির ক্ষেত্রে খুবই দুর্ব্বল। যেমন, শ্রমিকদের কোন সঞ্চয় থাকে না, সর্ব্বদাই কাজ না করিলে

তাহাদের জীবন ধারণ সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, শ্রমশক্তি এমনই বিষয় যে উহাকে ব্যবহার না করিয়া সঞ্চয় করিবার উপায় নাই, যে দিন কাজ করা হইল না সেই দিনটি আর ফিরিয়া আসিবে না, সেই সময়টুকু হইতে আয় করিবার সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। শ্রমিকরা তুলনামূলকভাবে অশিক্ষিত এবং তাহার ফলে তাহাদের শোষিত হইবার সম্ভাবনা বেশী। আর মালিকগণ মোটামুটি সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে কাজ করে বলিয়া শ্রমিকদেরও সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে মালিক সঙ্ঘের সহিত দরকষাকষি করা সম্ভব নয়। শ্রমিকসঙ্ঘ দরকষাকষির দ্বারা মজুরী ও চাকুরীর সর্ত্তাদি উন্নত করিতে পারে।

শ্রমিক সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা

বহুভাবে শ্রমিক সঙ্ঘের সংগঠন স্থাপিত হয়। কোন বিশেষ শিল্পের অন্তর্গত সকল কার্য্যের শ্রমিকরা একত্র হইয়া শিল্পগত শ্রমিক সঙ্ঘ (Industrial Trade Unions) গঠিত করিতে পারে (যেমন ভারতীয় এনজিনিয়ারিং শ্রমিক ফেডারেশন)। অথবা, কোন বিশেষ মালিকের অধীনস্থ বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকেরা একত্র হইয়া মালিক-গত শ্রমিক সঙ্ঘ স্থাপন করিতে পারে (যেমন বিড়লা-কর্ম্মচারী সঙ্ঘ)। শিল্পগত মালিকগত বিভিন্ন শ্রমিক সঙ্ঘ আবার দেশের মধ্যে নিজেদের কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপন করে এবং এই কেন্দ্রীয় সংগঠনের মারফৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আইন কানুন প্রণয়নের ব্যাপারে রাষ্ট্রের উপর চাপ দিবার চেষ্টা করে।

সংগঠন

শ্রমিক সঙ্ঘের কার্য্যাবলীকে দুইভাগে ভাগ করা হয়, (ক) শ্রমিক-মঙ্গল সংক্রান্ত কাজকর্ম, অথবা, (খ) সংগ্রামী কাজকর্ম। প্রয়োজনের সময় বেকার শ্রমিকদের ভাতা দেওয়া, অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করা, শিক্ষার জন্য স্কুল বা কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, গৃহনির্ম্মাণ, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও মনকে শক্তিশালী ও কৃষ্টিসম্পন্ন করা, এই ধরনের কার্য্যকে শ্রমিক-মঙ্গল সংক্রান্ত কাজকর্ম বলে। মালিকের সহিত মজুরী বা চাকুরীর সর্ত্তাদি সংক্রান্ত আলোচনা, ধর্ম্মঘটের ব্যবস্থা, সর্ব্বদা মালিককে চাপের উপর রাখা—ইহাকে সংগ্রামী কাজকর্ম বলে।

শ্রমিক সঙ্ঘের সর্ব্বাপেক্ষা সুফল হইল যে ইহা শ্রমিকদের দরকষাকষির শক্তি (Bargaining Power) বাড়াইয়া দেয়, শ্রমিকসঙ্ঘ না থাকিলে মালিকরা প্রত্যেক শ্রমিকের অভাবের ও প্রয়োজনের সুযোগ লইয়া তাহাদের

উৎপাদনক্ষমতা হইতে অনেক কম মজুরী দিতে পারে। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস আসে এবং অসহায়-বোধ কাটিয়া গিয়া সম্মান ও অধিকার রক্ষার জন্য আত্মবোধ জাগ্রত হয়। শ্রমিক সঙ্ঘের মারফৎ-ই মালিক শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ জানিতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ও পারস্পরিক আপোষ করা শ্রমিক সঙ্ঘ আছে বলিয়াই সম্ভবপর হয়। শ্রমিক-মঙ্গল সংক্রান্ত কাজকর্ম শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতাকে বাড়াইয়া দিয়া মজুরী বৃদ্ধির সহায়তা করে।

শ্রমিক-সঙ্ঘের সুফল

শ্রমিক সঙ্ঘের কুফল হইল যে ইহা অনেক সময় অধিক শ্রমিক নিয়োগে বাধা দেয়। মালিকের সঙ্গে দরকষাকষি করিয়া অনেক সময় শ্রমিক-সঙ্ঘ এইরূপ নিয়ম করে যে তাহাদের মারফৎ শ্রমিক নিযোগ হইবে, সঙ্ঘের সভ্য ব্যতীত অপর কাহাকেও কর্মে নিযুক্ত করা চলিবে না। অধিক শ্রমিক নিযুক্ত হইলে বর্তমানে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় কমিয়া যাইতে পারে (উপবি-সময় হইতে যে আয় পাওয়া যাইত) এইজন্য তাহারা অধিক শ্রমিক নিয়োগে বাধা দেয়। সহরের রিক্সাচালক সঙ্ঘ যেমন অধিক রিক্সা চালাইবার লাইসেন্স দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বা বাজারের মৎস বিক্রেতাসঙ্ঘ যেমন অধিক মৎস বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া অপছন্দ করে। অনেকসময়, শ্রমিকসঙ্ঘ সাময়িক ছাঁটাই এড়াইবার উদ্দেশ্যে উন্নতধরণের নূতন যন্ত্রের প্রচলনে বাধা দেয়। অধিক মজুরী দাবী করিয়া তাহারা শিল্পে কর্ম-নিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, কারণ নূতন ফার্মসমূহ অধিক ব্যয় থাকায় উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয় না। ধর্মঘটের দ্বারা একদল শ্রমিকের কিছু মাহিনা বৃদ্ধি হইলেও সমাজের সম্পদ উৎপাদন ব্যাহত হয়, জাতীয়-আয় কমিয়া যায়।

শ্রমিক সঙ্ঘের কুফল

শ্রমিক সঙ্ঘ কি মজুরী বাড়াইতে পারে? কি অবস্থায় তাহা সম্ভব?
(Can Trade Unions raise wages and if under what circumstances?)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে শ্রমিকসঙ্ঘের পক্ষে মজুরী বাড়ান কখন সম্ভবপর নহে। কারণ তাঁহাদের অভিমতে, মজুরী সর্ব্বদা শ্রমিকের প্রান্তিক উপযোগিতার সমান থাকে। যদি মজুরী বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের দাম বাড়িবে এবং বিক্রয় কমিয়া যাইবে। ফলে মোট উৎপাদন কম হইবে, শ্রমিক

ছাঁটাই হইবে। অথবা জোর করিয়া মজুরী বৃদ্ধি করিলে মালিকের মুনাফা আর "স্বাভাবিক" স্তরে থাকিবে না, উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে, যে শিল্পে স্বাভাবিক মুনাফা পাওয়া সম্ভব, মালিক সেই শিল্পে নূতন ব্যবসা স্থাপনের চেষ্টা করিবে। যদি দেশের সকল মজুরী একসঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সকল দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়িবে, ফলে দেশের দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে—অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় সকল শ্রমিকেরই প্রকৃত মজুরী (Real wages) কমিয়া যাইবে। সুতরাং শ্রমিকসঙ্ঘ কিছুতেই, দীর্ঘকালে অন্ততঃ মজুরী বৃদ্ধি করিতে পারে না।

ক্লাসিকাল যুক্তি : কেন পারে না

কিন্তু মনে রাখা দরকার, শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাস্তব ক্ষেত্রে নাই এবং যন্ত্রপাতি ও তৎসংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে প্রায় সর্ব্বদাই শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে, মজুরী সম্বন্ধে পূর্ব্বেই চুক্তিতে আবদ্ধ থাকায় উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও শ্রমিক সেই অনুযায়ী বর্ধিত মজুরী না পাইতেও পারে। সুতরাং যে সকল শিল্পে মজুরীর হার শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা হইতে কম, সেই ক্ষেত্রে শ্রমিক সঙ্ঘের চাপে মজুরী বাড়িবার সুযোগ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, শ্রমিক-কল্যাণ কার্য্যের দরুণ শ্রমিকদের শিল্প সম্পর্কে শিক্ষাদীক্ষা, মনোভাব ও তাহাদের বাসগৃহ, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং ইহার দরুণ উৎপাদন ক্ষমতা-ও বাড়ে। কিন্তু উৎপাদনক্ষমতা বাড়িলেও তাহার মজুরী বাড়াইতে শ্রমিক সঙ্ঘের সংগ্রামী কার্য্যের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কারণ মালিক স্বেচ্ছায় মজুরী বাড়াইয়াছে, ইহার উদাহরণ বিরল।

আধুনিক যুক্তি : কেন পারে

কোন বিশেষ একদল শ্রমিক কি অবস্থায় মজুরী বাড়াইতে পারে? যেমন কারখানায় একদল বিদ্যুৎবিশারদ শ্রমিক আছে তাহারা মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করিতে প্রস্তুত হইতেছে। অন্যান্য শ্রমিকদল, যেমন মালবহনকারী শ্রমিক, যন্ত্রচালক শ্রমিক, কেরাণী শ্রমিক, ইহারা মজুরী বৃদ্ধির দাবী করিতেছে না। কি অবস্থায় বৈদ্যুতিক শ্রমিকদের মজুরী বাড়ান সম্ভব? মনে রাখা দরকার, মালিক কিছুতেই নিজের মুনাফা কাটিয়া শ্রমিকদের মজুরী দিতে রাজী হইবে না। প্রথমতঃ, ধর্মঘটী বৈদ্যুতিক শ্রমিকদের মনোবল ভাঙ্গিবার জন্য বাহির হইতে শ্রমিক আমদানীর চেষ্টা করিবে অথবা সঙ্ঘের নেতাদের ক্রয় করিয়া

শ্রমিক সংহতি ভাঙিবার চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য শ্রমিকদলের মজুরী কমাইয়া বা কাঁচামালের বিক্রেতাকে দাম কম দিয়া ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবী পূরণের চেষ্টা করিবে। তৃতীয়তঃ, উহা সম্ভব না হইলে ধর্মঘটী শ্রমিক দলের পরিবর্ত্তে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ চালাইবার চেষ্টা করিবে। যদি শ্রমিকদল বিশেষ নির্দ্দিষ্ট উপাদান (Specific Factor) হয়, তাহা হইলে এই পরিবর্ত্ততা সম্ভবপর হইবে না। অথাৎ ধর্মঘটী শ্রমিকদলের সাফল্য নির্ভর করিবে তাহাদের কার্য্যের পরিবর্ত্ততার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতার উপর (Elasticity of Substitution)।

কি অবস্থায় পারে

চতুর্থতঃ, তাহাদের পরিবর্ত্তে যে সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ চালাইবে, সেই সকল উপাদান সহজে পাওয়া যায় কি না অর্থাৎ পরিবর্ত্তন-উপাদান সমূহের যোগানের সঙ্কোচ প্রসারক্ষমতা কিরূপ (Elasticity of Supply of Substitutable of Factors) তাহাও বিচার করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা কিরূপ তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি মজুরী বৃদ্ধির দরুণ দাম বাড়িলে মালিকের মোট রেভিনিউ কমিয়া যায় (অর্থাৎ চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম), তাহা হইলে মজুরী বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। কিন্তু মজুরী বৃদ্ধির দরুণ দাম বাড়িলে যদি মালিকের মোট রেভিনিউ বাড়িয়া যায় (অর্থাৎ চাহিদা সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন), তাহা হইলে মজুরী বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং শ্রমিক দল মজুরী বৃদ্ধি করিতে পারে কিনা তাহা নির্ভর করে দ্রব্যটির চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতাব (Elasticity of Demand) উপর।

ধর্মঘটী শ্রমিক দলের মোট মজুরীর পরিমাণ যদি মোট ব্যয়ের তুলনায় খুব কম হয় তাহা হইলে মজুরী বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, কারণ ইহাতে দাম খুব অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে, দ্রব্যের চাহিদা ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইবার সম্ভাবনা বেশী।

বাস্তবক্ষেত্রে এই সকল কারণের দ্বারা শ্রমিক সঙ্ঘের মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনের সাফল্য সীমাবদ্ধ। অতিবিক্ত মজুরী দাবী করিলে পরিবর্ত্ততা ঘটিবেই ; শ্রমিকের পরিবর্ত্তে যন্ত্র নিয়োগ হইবে বা উক্ত দ্রব্যের পরিবর্তে কম দামী অন্য দ্রব্য বাজারে বিক্রয় সুরু হইবে। মার্শাল তাই বলিয়াছেন যে "কোন উপাদানের জুলুম বা উৎপীড়ন পরিবর্তনীতির প্রভাবে সংযত হইয়া থাকে।*

* The tyranny of a factor of Production is tempered by the Principle of substitution. —Marshall

শিল্প বিরোধ (Industrial Disputes) :

কোন ফার্ম্মের মালিকদের সহিত শ্রমিকদের বিরোধকে শিল্পবিরোধ বলে। যে সমাজে উৎপাদনের যন্ত্রপাতির উপর মালিকানার দরুণ একদল লোক অপর একদল লোককে নিয়োগ করিয়া মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন চালায়, সেই সমাজে এইরূপ শিল্প-বিরোধ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই শ্রমিক-মালিক বিরোধের পিছনে বহু কারণ বর্ত্তমান থাকে। চাকুরীর সর্ত্তাদি শ্রমিকদের পক্ষে সুবিধাজনক করাইবার জন্য, কাজের ঘণ্টা কমাইবার জন্য অথবা কারখানার মধ্যে শ্রমিকদের প্রতি ভাল ব্যবহারের জন্য দাবী জানাইয়া এই সকল শিল্প-বিরোধ সুরু হয়। কিন্তু অধিকাংশ শিল্প-বিরোধই ঘটিয়া থাকে মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে। অনেক সময় সহকর্ম্মীদের ছাঁটাইএর প্রতিবাদে বা রাজনৈতিক কারণে মতামত প্রকাশের জন্যও শিল্প-বিরোধ সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ, শিল্প বিরোধ শ্রমিকদের তরফ হইতেই সুরু হয়।

কি ও উহার কারণ

দেশের অবস্থা ছাড়িয়া দিলে বিরোধের পদ্ধতি নির্ভর করে উভয়পক্ষের সাংগঠনিক শক্তি ও প্রস্তুতির উপর, দাবীর পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর, ব্যবসার অবস্থা ও বিরোধ মিটাইবার পদ্ধতির উপর।

মালিকদের তরফ হইতে বিরোধের পদ্ধতি হইল প্রথমতঃ, সর্ব্বদা নিজের স্বপক্ষে জনমত প্রস্তুত করা। কি কি শ্রমিককল্যাণমূলক কাজ করিয়াছে, কবে কবে মাহিনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, অন্যান্য ফার্ম্মের কি মাহিনা ও সুযোগ-সুবিধা আছে, মুনাফা কত কম হইতেছে, ক্রেতাদের মধ্যে এই সকল প্রচার সর্বদাই করা হইয়া থাকে। অবশ্য এই প্রচারের ব্যয় দ্রব্যের বিক্রয়-নিহিত ব্যয়ের মধ্যে থাকায় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করে এবং ক্রেতাদের নিকট হইতেই তাহা আদায় হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, মালিকপক্ষ সরাসরি বিরোধে নামে কারখানায় তালাবন্ধ করিয়া (Lock-out)। মালিকদের চাপ দিবার উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য ফ্যাক্টরী বন্ধ করিয়া দেওয়া।

বিরোধের বিভিন্ন পদ্ধতি

শ্রমিকদের পক্ষ হইতে প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের হস্তক্ষেপ আশা করিয়া জনমত প্রস্তুতের চেষ্টা করা হয়, তবে জনমত-গঠনের উপায়গুলি ব্যয়সাধ্য বলিয়া প্রায়ই সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অনেক দেশে মালিকের দ্রব্য লোকে যাহাতে বয়কট করে সেই উদ্দেশ্যে প্রচার চালান হয়, বিক্রয় কমিয়া গেলে মালিক নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। তৃতীয়তঃ, যে ক্ষেত্রে আদালতের নিকট যাওয়া সম্ভব

সেখানে (যেমন শিল্প ট্রাইবুন্যাল ইত্যাদি) শ্রমিকরা দাবী পেশ করে, চতুর্থতঃ, এই সকল পদ্ধতির দ্বারা সাফল্য লাভ না করিলে শ্রমিকগণ তাহাদের সর্ব্বশেষ অস্ত্র ব্যবহার করে, স্বেচ্ছাকৃত ও দলবদ্ধভাবে কাজ হইতে বিরত থাকে; অর্থাৎ ধর্মঘট করে। উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায়, মুনাফা কমিয়া যায়, বাজারে মাল সরবরাহ করিতে না পারায় ক্রেতাদের নিকট বদ্‌নাম হয়, স্থির পুঁজির ব্যয় চালাইয়া যাইতে হয়। এই ভাবে মালিকের উপর চাপ দেওয়া হইয়া থাকে। এই ধর্মঘটের বহু প্রকার-ভেদ আছে। যদি মজুররা ফ্যাক্টরীর মধ্যে প্রবেশ করে অথচ কাজ না করে তবে তাহাকে অবস্থান-ধর্মঘট (Stay-in-Strike) বলে। বাহিরহইতে 'দালাল' (Black-legs) আসিয়া যাহাতে কাজ করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই চেষ্টা করা হয়। কেরাণী-শ্রমিকরা ধর্মঘট করিলে তাহাকে অনেক সময় কলম-ধর্মঘট (Pen-down Strike) বলে। অনেক সময় কাজের গতি শ্লথ করিয়া দেওয়া হয় (Go-slow policy), ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় ইউনিট-প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি হয়, তাহাতে মালিকের উপর চাপ পড়ে।

শিল্প-বিরোধের ফল

সমগ্র সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে শিল্পবিরোধ ক্ষতিকারক। মুনাফা কমিয়া যায়, মূলধনের ব্যবহার হয় না, উৎপাদন ও জাতীয় আয় কমিয়া যায়। দেশে সেই দ্রব্যের অভাব সৃষ্টি হয়, উহার দাম বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণের অসুবিধা হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নিরুদ্ধ উত্তেজনা (Tension) উৎপাদনে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

ধর্মঘটের অধিকার

এই সকল কুফল থাকার দরুণ অনেকে বলিয়া থাকেন, ধর্মঘট করিবার কোন অধিকার শ্রমিকদের নাই; মালিকের সহিত চুক্তি ভঙ্গ করার কোন অধিকার তাহাদের থাকিতে পারে না। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ইচ্ছা হইলে কাজ না করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে, কারণ সে শ্রমশক্তিকে লইয়া পণ্য হিসাবে খোলা বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছে, সে প্রাচীন আমলের ক্রীতদাস নহে। সকলে মিলিয়া মালিককে উপযুক্ত সময় দিয়া কাজ হইতে বিরত থাকা তাই বে-আইনী বা চুক্তি-ভঙ্গকারী কিছু ব্যাপার নহে। ইহা ছাড়া মালিকদের উপর চাপ দিবার কোন বিকল্প উপায় নাই, কারণ একমাত্র মুনাফা কমিবার ভয়েই তাহারা বিচলিত হইতে পারে।

তবে ইহা-ও ঠিক যে সর্বক্ষেত্রে এই অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ দেওয়া সমীচীন কি না তাহা বিচার্য্য। জন-প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহে (Public Utility Services), যেমন রেলপথ, বিদ্যুৎ বা জলসরবরাহ, সৈন্য, পুলিশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই অধিকারের প্রয়োগ সমাজ-জীবন ব্যাপকভাবে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিতে পারে। সুতরাং বিশেষ করিয়া এই সকল শিল্পের ক্ষেত্রে, শিল্পবিরোধ মীমাংসার সুষ্ঠু পদ্ধতি থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং যাহাতে ধর্মঘট করিতে না হয় সেরূপ দৃষ্টি রাখা দরকার।

সাধারণভাবে, শিল্প বিরোধ মীমাংসার দুইটি পদ্ধতি আছে। প্রথমতঃ, দুইপক্ষ পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চালাইয়া, উভয়েই উভয়ের দাবী কিছুটা ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের মধ্যে আপোস (Conciliation) করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যদি আপোস না হয় তাহা হইলে নিজেরা কোন তৃতীয় পক্ষকে মধ্যস্থ মানিয়া লইয়া তাহার নিকট শিল্প-বিরোধ সালিশীর ভার ছাড়িয়া দিতে পারে (Arbitration)। অনেক সময় বিবদমান দুই পক্ষ মধ্যস্থ সম্বন্ধে একমত হইতে না পারিলে, রাষ্ট্র মধ্যস্থ (Arbitrator) নিয়োগ করিয়া দিতে পারে। মধ্যস্থ তৃতীয় পক্ষ উভয়ের দাবী বিবেচনা করিয়া যে রায় দেয় তাহা মানিয়া লওয়া বা না-লওয়া যদি বিবদমান দুইপক্ষের ইচ্ছাধীন হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বেচ্ছাধীন সালিশী (Voluntary Arbitration) বলা হয়। যদি পূর্বেই দুইপক্ষ স্বীকার করিয়া লয় অথবা দেশে এইরূপ নিয়ম থাকে যে মধ্যস্থের রায় উভয়পক্ষকে মানিতেই হইবে, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্যতামূলক সালিশী (Compulsory Arbitration) বলা হয়।

মীমাংসার পদ্ধতি :
(ক) আপোষ,
(খ) স্বেচ্ছাধীন সালিশী
(গ) বাধ্যতামূলক সালিশী

শিল্প-বিরোধ ঘটিলে উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহের দ্বারা তাহার মীমাংসা সম্ভব। কিন্তু যাহাতে শিল্প বিরোধ না ঘটিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, বর্তমান শিল্প-পরিচালনা এবং মজুরী-ব্যবস্থা সংস্কার এবং দেশের মধ্যে শান্তির পক্ষে উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করা-ও প্রয়োজন।

শিল্পে শান্তি বজায় রাখার উপায়সমূহ

(ক) প্রত্যেক ফার্মে শ্রমিক ও পরিচালকদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কারখানা-সমিতি (Works Committees) স্থাপন করা উচিত। কোনো বিরোধের সম্ভাবনা বা সূত্রপাত দেখা দিলে পরস্পরের সম্মানজনক ভাবে সেই

সমিতি মীমাংসা করিয়া দিতে পারে বা মীমাংসার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া রাখিতে পারে।

(খ) সকলকে উচ্চমজুরী না দিয়া দক্ষতা অনুযায়ী যাহাতে মজুরী দেওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে মজুরী-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন। অথবা দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের সহিত মজুরীর হার কিরূপে পরিবর্তিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একটি নিম্নতম মজুরীর হার নির্দিষ্ট ধরিয়া লইয়া তাহার পরে দ্রব্যের দাম, মোট মুনাফা বা শ্রমিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাইলে তাহার অনুপাতে কোন নির্দিষ্ট হারে মজুরী বৃদ্ধি পাইবে এরূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে। ইহাকে স্লাইডিং-স্কেল (Sliding Scale) বলে।

(গ) অনেক দেশে আইনের সাহায্যে নিম্নতম মজুরীর হার বাঁধিয়া দেওয়া হয়; প্রত্যেক শিল্পে বিভিন্ন মজুরীর পরিমাণ নিম্নতম মজুরী বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

(ঘ) ফার্ম-পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিকদের সহযোগিতা গ্রহণ করা চলিতে পারে, যেমন শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে একজন বা দুইজনকে পরিচালনা-সভার সদস্য করিয়া লওয়া সম্ভব। কিন্তু শ্রমিকসদস্যগণ কেবল মজুরীর কথাই চিন্তা করিবেন, শিল্পের সমগ্র স্বার্থ বিবেচনা করিবেন না, মালিকদের মনে এইরূপ ভয় আছে। তাহা ছাড়া মুনাফা ও উৎপাদন-ব্যয় সম্বন্ধে গোপনীয় তথ্য তাঁহারা শ্রমিকদের জানিতে দিতে চাহেন না।

(ঙ) অনেকে বলেন, মজুরী ছাড়াও বাৎসরিক মুনাফার একটি অংশ নিয়মিত ভাবে শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। অনিয়মিত বোনাসকে মুনাফার ভাগ বলা চলে না। মালিকরা কিন্তু মুনাফার অংশ দেওয়ার বিরুদ্ধে। তাঁহাদের মতে যদি মুনাফার অংশ শ্রমিকদের পাইতে হয়, তাহা হইলে ক্ষতির অংশ বহন করিতেও শ্রমিকদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কিন্তু শ্রমিকরা ক্ষতির অংশ বহন করিতে কখনই রাজী নহে।

(চ) শ্রমিক-কল্যাণমূলক কাজকর্মের দ্বারা রাষ্ট্র ও মালিকরা শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে পারে, শিল্পবিরোধের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

(ছ) শ্রমিকদের চাকুরীর সর্তাদি এবং তাহাদের অধিকারসমূহ রক্ষণের জন্য রাষ্ট্র আইন করিয়া মালিকদের বাধ্য করিতে পারে।

(জ) শিল্পে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে রাষ্ট্র-শ্রমিক ও

মালিকদের বিভিন্ন কার্য্যে একত্রে যোগদান করা ও সহযোগিতার ভার বজায় রাখিয়া শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত করা সম্ভব; ইহাতে শিল্প বিরোধের সম্ভাবনা কমে।

নিম্নতম মজুরী নির্দ্ধারণ (Fixation of Minimum wages):

দরকষাকষির ক্ষমতা কম থাকায় অনেক সময়ে দেখা যায় যে শ্রমিক উপযুক্ত মজুরী পাইতেছে না, তাহাদের জীবনযাত্রার মান খুবই নামিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় রাষ্ট্র আইন করিয়া নিম্নতম মজুরীর হার বাঁধিয়া দিতে পারে।

মজুরী-নির্ধারণের বিপক্ষে যুক্তি-সমূহ

মজুরী-নির্দ্ধারণে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অনেক ধনবিজ্ঞানী বহু যুক্তি উপস্থাপিত করেন। তাহারা বলেন যে, (ক) যদি মজুরী প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান থাকে তাহা হইলে নিম্নতম মজুরী বাঁধিয়া দেওয়া শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপন্থী। কারণ নির্দ্ধারিত নিম্নতম মজুরী যদি প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হইতে অধিক হয় তাহা হইলে শ্রমিক ছাঁটাই হইবে; যদি উহারা সমান হয়, তাহা হইলে নিম্নতম মজুরী নির্দ্ধারণ অপ্রয়োজনীয়; যদি নির্দ্ধারিত নিম্নতম মজুরী কম হয় তাহা হইলে উহার ফলে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (খ) নিম্নতম মজুরীর হার একটু বেশী ধার্য্য করা হইলে ব্যয় ও দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হইবে, চাহিদা ও উৎপাদন কমিয়া যাইবে, মোট শ্রমিক-নিয়োগের পরিমাণ কম হইবে। (গ) শ্রমিকের যোগান বেশী থাকিলে যে কোন মজুরীতে শ্রমিক কাজ করিতে রাজী থাকে; সুতরাং এই নিয়ম বাস্তবে কার্য্যকরী করা সম্ভব নয়। (ঘ) মালিক ওই নিম্নতম সীমার উর্দ্ধে মজুরী দিতে চাহিবে না, আইনের সুযোগ লইয়া অধিক মুনাফা করিতে পারিবে। (ঙ) যাহারা অল্প মজুরীতে কাজ করিয়া কোনমতে বাঁচিয়া আছে, (ছোট ছেলে, বৃদ্ধ শ্রমিক বা স্ত্রী-শ্রমিক) তাহারা কাজ পাইবে না।

(চ) কি পরিমাণ মজুরীকে দেশের নিম্নতম মজুরী বলা চলে অথবা "উপযুক্ত মজুরী" (Fair wages) কি হইবে, তাহার নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কোন সঠিক ও বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড নাই। অনেক বলেন যে, অন্যান্য শিল্পে একটি মজুরের যাহা আয় করিতে পারা সম্ভব, তাহাই এই শিল্পে তাহার উপযুক্ত মজুরী হওয়া উচিত। কিন্তু এই যুক্তিতে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে অন্যান্য শিল্পে মজুরী উপযুক্ত স্তরে আছে। প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার হিসাব করারও বহু বাস্তব অসুবিধা আছে সুতরাং তাহার দ্বারা কিছু নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না,

দক্ষতার পার্থক্যের দরুণও একটি নির্দিষ্ট হার সকল শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। জীবন যাত্রার মান অনুযায়ী "উপযুক্ত" মজুরী স্থির হওয়া উচিত—এই যুক্তি চলে না, কারণ শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা কিরূপ, ইহা বিচার না করিয়া শুধু জীবনযাত্রার মানের সাহায্যে মজুরী নির্দ্ধারণ অবৈজ্ঞানিক।

যাহারা নিম্নতম মজুরীর হার নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন তাহারা এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে বলিয়া থাকেন যে, শ্রমের বাজারে মজুরীর হার সাধারণতঃ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হইতে কম থাকে। ইহাই বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, সুতরাং নিম্নতম মজুরীর হার বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

স্বপক্ষে যুক্তি সমূহ

ইহার ফলে সকল সময় ছাঁটাই হইবে তাহা নহে, কারণ ভোগকারীদের কাছে ব্যয়জনিত ভার কিছুটা ঠেলিয়া দেওয়া চলিবে। একচেটিয়া মূলক বাজারে বা একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে মুনাফা যথেষ্ট বেশী, সুতরাং মজুরী বৃদ্ধির সুযোগ আছে। আর জীবনযাত্রার মানকে মোটামুটি মানদণ্ড হিসাবে ধরিয়া মজুরী নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর।

অনুশীলনী

1. Discuss the marginal productivity theory of wages. (B. A. '40, '56 ; B. com. '42, '44, '47, '50)

2. Show how wages are determined by the demand for and supply of labour. (B. A. '47)

3. Examine the importance of standard of life in the theory of wages. How does that standard actually exert its influence on wages ? (B. com. '43, '46, '52)

4. Explain why wage-rates vary (a) in different occupations, (b) in different countries and, (c) at different times. (B. com. '41)

5. Can a Trade Union raise wages ? (B. com. '54)

6. Can you suggest a method by which society can avoid the present conflict between labour and capital ? (B. A. '49)

7. Write a short note on Co-partnership or Profit-sharing. (B. A. '44, '47)

8. Explain what is meant by the economy of high wages. (B. com. '54)

9. Discuss the influences that determine wages. Why are wages higher in the U. S. A. and lower in India ?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুদ

সুদ কাহাকে বলে ? (What is Interest ?) :

ঋণদানকারী তাহার ঋণ-পুঁজি (Loan-Capital) অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে যে অতিরিক্ত অর্থ পায় তাহাকে সুদ বলে। সুদ হইল ঋণ-পুঁজির দাম ; যে ঋণ করে সে ঋণদানকারীকে সুদ দিলে (অর্থাৎ দাম দিলে) ঋণ-পুঁজি ব্যবহার করিতে পারে। সুদকে শতকরা ও বাৎসরিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

এই ঋণ-পুঁজির ব্যবহার দুই প্রকারে সম্ভব : উৎপাদন কার্য্য এবং ভোগ-কার্য্য। ভোগকার্য্যে ঋণের পরিমাণ সমাজে মোট ঋণের অল্প অংশ, উৎপাদন কার্য্যে ব্যবহৃত ঋণ-পুঁজিই প্রধান অংশ, এবং সুদের হারের উঠানামার উপর অধিক প্রভাবশীল।

বাজারে যে সুদের হার প্রচলিত থাকে তাহাকে সাধারণতঃ মোট সুদের হার (Gross Rate of Interest) বলে। ইহার মধ্যে নীট সুদ ছাড়াও অনেক কিছু জড়িত থাকে। ঋণ-পুঁজির ব্যবহারের জন্য যাহা দিতে হয়, তাহাই প্রকৃত সুদ বা নীট সুদ। মোট সুদের মধ্যে ইহা ছাড়া (খ) ঋণের ঝুঁকি থাকার দরুণ ঋণদানকারীকে যে অর্থ দিতে হয়, তাহাও নিহিত থাকে। ঝুঁকি বেশী হইলে সুদের হার অধিক হইবে, ঝুঁকি কম হইলে সুদের হারও কম হইবে। মার্শালের মতে এই ঝুঁকি দুই ধরণের হইতে পারে : ব্যবসাগত ঝুঁকি ও ব্যক্তিগত ঝুঁকি (Trade risks & Personal risks)। কোন ব্যবসাতে ঝুঁকি কম, কোন ব্যবসাতে ঝুঁকি বেশী। তাহা ছাড়া, ঋণ-গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত দোষ বা অসৎ ইচ্ছা থাকিলে ঋণদাতা তাহার ঋণ-পুঁজি ফেরৎ না পাইতেও পারে। (গ) তাহা ছাড়া, ওই ঋণ ফেরৎ পাইবার দরুণ বহু হাঙ্গামা পোয়াইতে হইতে পারে এবং হিসাব রাখা, লোক পাঠান ইত্যাদি

মোট সুদ—নীট সুদ এবং ঝুঁকি ও শ্রমের দরুণ প্রদেয় অর্থ

কার্য্যের ব্যয়ের জন্য ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে কিছু বেশী আদায় করিতে পারে।

সুদের হারের বিভিন্নতা (Different rates of Interest) :

বিভিন্ন কার্য্যে ঋণ-পুঁজি নিয়োগ করিতে হইলে বিভিন্ন সুদ দিতে হইতে পারে ; বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও সুদের হারের পার্থক্য দেখা যায় ; বিভিন্ন দেশের মধ্যেও সুদের হারের তারতম্য থাকে।

বিভিন্ন কার্য্যের ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে মূলধনের অচলনশীলতা

এই সকল পার্থক্যের কারণ হইল প্রধানতঃ মূলধনের অপূর্ণ চলন-শীলতা (Imperfect mobility of Capital)। বিভিন্ন ঋণদাতা দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ, পুঁজির লগ্নী করিয়া থাকে। কেহ কেবল কৃষি-কার্য্যে ঋণ দেয কেহ বা শিল্পে ঋণ দেয় ; কেহ ব্যবসাতে ঋণ দেয়, কেহ বা ভোগ কার্য্যে ঋণ দান করে ; ঋণ-পুঁজি সাধারণতঃ, এক ব্যবহার হইতে আর এক ব্যবহারে নিয়োজিত হয না সুতরাং বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঋণের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে, সুদের হারেও পার্থক্য বজায় থাকে। বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে মূলধনের চলনশীলতা খুবই বেশী। উন্নত দেশসমূহে মূলধনের পরিমাণ বেশী থাকায় এবং মূলধন-বিনিয়োগের সুযোগ কম থাকায় সুদের হার কম থাকে ; অনুন্নত দেশসমূহে মূলধনের পরিমাণ কম থাকায় এবং বিনিয়োগের সুযোগ বেশী থাকায় সুদের হার বেশী থাকে। এক দেশ হইতে অপর দেশে মূলধনের অবাধ যাতায়াত না থাকায় বিভিন্ন দেশে সুদের হারে সমতা সাধন হয় না।

ঋণের প্রকৃতি

কোন ঋণ অধিক সময় যাবৎ ব্যবহারের জন্য গৃহীত হয় ; কোন ঋণ কম সময় ধরিয়া ব্যবহৃত হইবার জন্য লওয়া হয়। দীর্ঘকালীন ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার বেশী হইতে পারে, কারণ, ঋণদাতার অর্থ দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার আয়ত্তের বাহিরে থাকে। সময় যত বেশী হইবে ঋণদাতার পক্ষে সেই ঋণ ততই তারল্যহীন (Illiquid), সুদের হারও তত বেশী হইবে। যত কম সময়ের জন্য হইবে সুদের হার ততই কম হইতে পারে। স্বল্প-কালীন সুদের হার দীর্ঘকালীন সুদের হারের তুলনায় অনেক বেশী চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল ; দীর্ঘকালীন সুদের হার মোটামুটি ভাবে স্থির থাকে।

স্বল্পকালীন সুদের হার ব্যবসায় অবস্থায় পরিবর্তনের দরুণ হঠাৎ বেশী ওঠানামা করিয়া থাকে।

বিভিন্ন সুদের হারের মধ্যে তারতম্যের আর একটি কারণ হইল, সকল ঋণ-গ্রহীতা সমান ধরণের বন্ধক দিতে পারে না। বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য যেখানে বেশী, সুদ সেখানে কম; বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য যেক্ষেত্রে কম, সুদের হার সেখানে বেশী। বন্ধকী দ্রব্যের প্রকৃতির উপরেও সুদের হার নির্ভর করে। যদি বন্ধকী দ্রব্য এরূপ হয় যে, ইহাকে ক্টা প্র[illegible] জই এবং কম সময়ের মধ্যে অর্থে রূপান্তরিত করা চলে (অর্থাৎ [illegible] ল বা Liquid ধরণের হয়) তাহা হইলে সুদের হার কম থাকিবে। কিন্তু যদি কম সময়ে বন্ধকী দ্রব্যকে অর্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব না হয় (অর্থাৎ যদি বন্ধকী দ্রব্যের তারল্য বা Liquidity কম থাকে) তাহা হইলে সুদের হার বেশী থাকিবে। এই কারণে জমি-বন্ধক দিয়া ঋণ পাইতে হইলে অধিক সুদ দিতে হয়; কিন্তু সোনারূপা ইত্যাদি বন্ধক দিয়া কম সুদে ঋণ পাওয়া যায়।

বন্ধকের পরিমাণ ও প্রকৃতি

সুদ সম্পর্কীয় তত্ত্বসমূহ (Theories of Interest):

সুদের প্রকৃতি এবং ইহা কিভাবে নির্ধারিত হয় সেই সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব প্রচারিত আছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকল তত্ত্বই সুদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছে; সুদের হার নির্ধারণকারী প্রকৃত বিষয় সমূহের কোন না কোন একটির উপর জোর দিয়াছে। এই সকল তত্ত্ব কোনটা ভুল, কোনটা বা অর্ধ-সত্য। এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিয়া পৃথক পৃথক তত্ত্ব হইতে প্রকৃত বিষয় গ্রহণ করিয়া সঠিক তত্ত্ব নির্ণয় করা সম্ভব।

১। উৎপাদন-ক্ষমতা তত্ত্ব (Theory of Productivity):

প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের একদল (Physiocrats) মনে করিতেন যে জমির যেরূপ শস্য-উৎপাদনীশক্তি আছে, মূলধনের সেই রকম দ্রব্যোৎপাদনী শক্তি আছে। যেহেতু মূলধনের ফলে অধিক উৎপাদন হয়, অর্থাৎ মূলধন অধিক উৎপাদনক্ষম, সেইজন্য মূলধন ব্যবহারের দরুণ সুদ দিতে হয়। উৎপাদন পদ্ধতিতে যত মূলধন নিয়োগ করা হইবে, তাহার উৎপাদন ক্ষমতা ততই বৃদ্ধি পাইবে। ঋণ গ্রহণকারী সেই মূলধনকে

উৎপাদন ক্ষমতা

উৎপাদনে নিযুক্ত করে, ফলে দ্রব্যোৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, সুতরাং বর্দ্ধিত উৎপাদনের কিছু অংশ ঋণ-দাতাকে সুদ হিসাবে দিতে হয়।

আধুনিক কালে অনেক ধনবিজ্ঞানী এই তত্ত্বকে আরও অগ্রসর করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ক্রমাগত মূলধন নিয়োগ করিলে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়া আসে। ক্রমশঃ অধিক মূলধন নিয়োগে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিতে থাকে। উদ্যোক্তা ততক্ষণ পর্য্যন্ত মূলধন নিয়োগ করিতে থাকে, যখন এই মূলধন নিয়োগের ফলে বর্দ্ধিত উৎপন্ন চলন-মূল্য সেই মূলধনের দরুণ সুদের সমান হয়। এইভাবে সুদের হার, সমাজে সকল উদ্যোক্তার ক্ষেত্রেই, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার সমান হইবে।

প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা

এই তত্ত্বকে বহুভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা জানা যায় যে ঋণগ্রহীতা কেন সুদ দেয়, কিন্তু সুদের হার নির্ধারণ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। আর, সুদের হার কখনই মূলধনের উৎপাদনক্ষমতার অনুপাতে স্থির হয় না; কারণ বিভিন্ন ব্যবহারে মূলধনের উৎপাদনক্ষমতা পৃথক অথচ সুদের হার (নীট) সকল ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সমান। তাহা ছাড়া; ভোগ কার্য্যের জন্য ঋণ করিলেও সুদ দিতে হয়, অথবা রাষ্ট্র যদি যুদ্ধ চালাইবার উদ্দেশ্যে ঋণ করে তাহা হইলেও সুদ দিতে হয়। কোন ক্ষেত্রেই মূলধনের উৎপাদনক্ষমতার দরুণ সুদের হার নিধারণ হইতেছে না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সমালোচনা, এই তত্ত্ব হইল বৃত্তাকৃতি যুক্তি প্রদর্শন (Circular reasoning), এবং তাহা বিজ্ঞান-সম্মত নহে। মূলধনের মূল্য জানিতে পারিলে তাহা হইতে উহার উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করা সম্ভব এবং অধিক মূলধনের মূল্য ও তদ্দরুণ বর্দ্ধিত উৎপন্ন উভয়ের অনুপাতে সুদের হার নির্ণয় করা সম্ভব। যেমন ২০০৲ টাকার যন্ত্র নিয়োগ করিয়া ১০৲ উৎপাদন হইলে আমরা বলিতে পারি যে ১০০৲ টাকার মূলধন হইতে ৫৲ টাকা উৎপন্ন হইতেছে; সুতরাং সুদের হার ৫% হওয়া উচিত। কিন্তু মূলধনের দাম ২০০৲ স্থির হইল কি করিয়া? যন্ত্রটির বাৎসরিক উৎপন্নের মূল্যকে চলিত সুদের হারে মূলধনে রূপান্তরণের দ্বারাই মূলধনের দাম নির্ধারণ হয়। অর্থাৎ ১০৲ যদি ওই যন্ত্রদ্বারা উৎপন্নের মূল্য হয় এবং ৫% যদি চলতি সুদের হার হয় তাহা হইলে ওই যন্ত্রের মূলধনীকৃত মূল্য (Capitalised Value) ২০০৲। অর্থাৎ মূলধনের

সমালোচনা

মূল্য নির্ধারণের সময়েই আমরা সুদের হার ধরিয়া লইয়া হিসাব করিয়া ফেলি; উহাদ্বারাই পুনরায় সুদের হার নির্ণয় কিরূপে সম্ভব? সর্বোপরি বলা যায়, এই তত্ত্ব কেবল মাত্র মূলধনের চাহিদার দিকটি আলোচনা করে, কিন্তু মূলধনের যোগানের দিক সম্বন্ধে কোন আলোচনা করে না।

২। সংযম-তত্ত্ব (Abstinence Theory) বা অপেক্ষা-তত্ত্ব (Theory of waiting):

সুদ সম্পর্কে প্রাচীন তত্ত্বের মধ্যে সিনিয়র-এর (Senior) সংযম তত্ত্ব এক সময়ে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার মতে, মূলধন সৃষ্টি হয় সঞ্চয় হইতে এবং এই সঞ্চয়ের কারণ হইল ভোগ হইতে বিরত থাকা। লোকে তাহাদের আয়ের সম্পূর্ণ পরিমাণই ভোগে ব্যয় করিতে চায়, ভোগ হইতে বিরত থাকিতে চাহে না। যদি সে সঞ্চয় করে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে সে ভোগ হইতে সংযত রহিল। কিন্তু এই ভোগ-সংযম মনের দিক হইতে বেদনা-দায়ক, কষ্টকর। তাহার নিকট হইতে ঋণ পাইতে হইলে তাহার কষ্টের পুরস্কারস্বরূপ কিছু বেশী অর্থ না দিলে চলিবে না। সমাজে যদি সঞ্চয় ও মূলধনের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে সুদ-রূপ পুরস্কার সঞ্চয়ীকে দিতেই হইবে। ভোগ সংযমের পুরস্কার বা ক্ষতি পূরণই হইল সুদ।*

ভোগ সংযমের পুরস্কার

এই তত্ত্বকে বহুভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। ধনী ব্যক্তি সঞ্চয় না করিয়া পারেন না এবং তাঁহার সঞ্চয় কষ্টদায়ক বা বেদনাদায়ক, ইহা মোটেই বলা চলে না। মার্ক্স পরিহাস করিয়া ইহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "অদ্ভুত সাধু, শোকার্ত্ত মুখচ্ছবি-সম্পন্ন মধ্যযুগীয় বীর, সংযমী পুঁজির মালিক"।

এই সমালোচনার ফলে মার্শাল "সংযমের" পরিবর্তে "অপেক্ষা" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। যে সঞ্চয় করে সে ভবিষ্যতে ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানে ভোগ না করিয়া অপেক্ষা করে। ভবিষ্যতে অধিক ভোগের আশায় বর্ত্তমানের এই অপেক্ষা, সুতরাং সুদ না দিলে এই অপেক্ষা সে করিবে না; সমাজে প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের যোগান হইবে না। কৃষি, শিল্প বা ব্যবসা, সকল কার্যেই অপেক্ষা না করিলে ফল লাভ হয় না; মূলধনের সাহায্যে ফল লাভ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব হয়। সুতরাং

অপেক্ষার পুরস্কার

* খ্রীষ্টীয় মতে সকল প্রকার সংযমই পুণ্য কার্য্য, আর পুণ্যের পুরস্কার তো দেবতারা-ই দিয়া থাকেন।

সমাজে উৎপাদন চালাইতে গেলে যে প্রয়োজনীয় সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন হয়, সেই অপেক্ষা করিবার উপযুক্ত মূলধনের যোগান পাইতে হইলে সুদ দেওয়া প্রয়োজন। সুদের হার সেই পরিমাণ হইবে যাহাতে সমাজে সকল উৎপাদনের কার্য্যে 'অপেক্ষা' করার উপযোগী মূলধনের যোগান হইতে পারে।

এই তত্ত্ব কেবলমাত্র কেন মূলধনের যোগান হয়, তাহাই বর্ণনা করে, এই বর্ণনাও অসম্পূর্ণ। মূলধনের চাহিদা সম্বন্ধে ইহা কিছু বলে না এবং মূলধন যোগানের পিছনে অর্থাৎ সঞ্চয়ের পিছনে কেবলমাত্র 'অপেক্ষা' আছে, আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ তাহা স্বীকার করেন না।†

৩। সুদের অষ্ট্রীয়তত্ত্ব (Austrian Theory of Interest) :

অষ্ট্রীয় ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষ করিয়া বম্‌বোয়ার্ক, সুদের প্রকৃতি ও সুদের হার নির্ণয় সম্বন্ধে নিজস্ব তত্ত্ব প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সুদের উদ্ভব হয় এই জন্য যে, মানুষ বর্ত্তমান দ্রব্যাদি ভবিষ্যৎ দ্রব্যাদির তুলনায় অধিক পছন্দ করে। যেহেতু মানুষ ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণভাবে দেখিতে পায় না, সেই জন্য ভবিষ্যতের অভাবের তুলনায় বর্তমানের অভাব তাহার নিকট অধিকতর বেদনাদায়ক, এবং বর্তমানের অভাব সম্বন্ধে তাহার অনুভূতি তীব্রতর। তাই মানুষ বর্তমানের অভাব মোচনের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। বর্তমানে অভাব-মোচন হইতে বিরত থাকিলে ভবিষ্যতের বেশী অভাব মিটাইতে পারিবে, এইরূপ অধিক অর্থ বা সুদ তাহাকে দিলেই সে সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে, নচেৎ নহে।

বম্‌-বোয়ার্ক

অষ্ট্রীয় মতবাদী ধনবিজ্ঞানী ফিসারের মতে সুদ নির্ভর করে মানুষের সময়-পছন্দের উপর। বর্তমান-দ্রব্য ও ভবিষ্যত-দ্রব্যের মধ্যে বিনিময়ের দাম-ই হইল সুদ। একই পরিমাণ অথবা নির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ ভোগের তুলনায়, মানুষ সেই পরিমাণ ভোগ বর্ত্তমানেই বেশী পছন্দ করে। সুতরাং তাহাদের আয় তাহারা বর্তমানে ব্যয় করিবার জন্য অধীর। যদি আয় হইতে সঞ্চয় করাইতে হয়, তবে এই বর্ত্তমানে ব্যয় করার অধীরতা জয় করিতে হইবে; এবং সুদ দিলেই ব্যয়ের অধীরতা কমিবে, বর্তমান-ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া তাহারা সঞ্চয়

† কি বিষয়ের উপর সঞ্চয় ও মূলধন-যোগান নির্ভর করে তাহা পূর্বে (মূলধন-গঠন সংক্রান্ত আলোচনায় সময়ে) বলা হইয়াছে।

করিবে। অধীরতার মাত্রা (Degree of Impatience) নির্ভর করে ব্যক্তির আয়, বিভিন্ন সময়ে আয় কেমন হইবে, ভবিষ্যতে আয় ভোগ করিবার সম্ভাবনা কিরূপ এবং ব্যক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর। বর্ত্তমানে যাহাদের আয় বেশী, সকল অভাব মিটিতেছে, সে সুদ কম লইবে। বিভিন্ন সময়ের মধ্যে আয়কে বণ্টন করিলে তিন প্রকার অবস্থা হইতে পারে: (ক) সারা জীবন আয় সমান থাকিতে পারে, (খ) ভবিষ্যতে আয় বাড়িতে পারে, (গ) ভবিষ্যতে আয় কমিতে পারে। সারা জীবন আয় সমান থাকিলে, বর্ত্তমান-ভোগের অধীরতা সে কত সুদের হারে জয় করিবে তাহা নির্ভর করে তাহার আয়ের পরিমাণ এবং প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর। বয়সের সহিত ভবিষ্যতে ব্যক্তির আয় বাড়িবে, এইরূপ হইলে, সে বর্ত্তমানেই বেশী সুদ চাহিবে। ভবিষ্যতে আয় কমিবে, এইরূপ হইলে, সে কম সুদেই বর্ত্তমানে সঞ্চয় করিবে। সঞ্চয় ও সুদের হারের উপর ব্যক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভূত প্রভাব আছে, যেমন বিবেচক ব্যক্তি কম সুদেই বর্ত্তমানে সঞ্চয় করিয়া থাকে।

ফিসার

অষ্ট্রীয় তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে বলা চলে যে ইহারা সুদের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি সঠিক ধারণা দিতে পারিলেও কেন মূলধনের চাহিদা সৃষ্টি হয় তাহা মোটেই আলোচনা না করায় সুদ-নির্ধারণের সঠিক তত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না।

৪। সুদ-নির্ধারণের নয়া-ক্লাসিকাল তত্ত্ব বা চাহিদা-যোগানতত্ত্ব (Neo-Classical theory or Demand & Supply theory of Interest):

নয়া-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সুদ হইল ঋণ-পুঁজির দাম এবং অন্যান্য সকল দামের ন্যায় ইহাও ঋণ-পুঁজির চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারসাম্যের বিন্দুতে নির্ধারিত হয়। ভারসাম্যাবস্থায় নির্ধারিত সুদের হারে মোট মূলধন-বিনিয়োগের পরিমাণ এবং মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ সমান।

মূলধনের যোগান ও চাহিদা উভয়েই সুদের হারের দ্বারা স্থির হয়। ঋণ-পুঁজির যোগান নির্ভর করে সুদের হারের উপর। যদি সমাজে কোনসুদ না থাকে তাহা হইলেও কিছু সঞ্চয় হইবে। এমনকি ঋণাত্মক সুদ (Negative Interest) থাকিলেও অল্প কিছু সঞ্চয় হইবে। কিন্তু সমাজের প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ তাহাতে যোগান হইবে না; সুতরাং, ব্যক্তিদের

ইহা ঋণ-পুঁজির দাম: যোগান ও চাহিদার ভারসাম্যের বিন্দুতে স্থির হয়

নিকট হইতে অধিক সঞ্চয় টানিয়া আনিতে হইলে সুদের হার বাড়াইতে হইবে। এইরূপে দেখা যায়, সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়িবে।

মূলধনের চাহিদা হয়; (ক) যেহেতু ইহা উৎপাদন বাড়াইতে পারে। যত অধিক মূলধন নিযুক্ত হইবে, উৎপাদনপদ্ধতি ততই চক্রাকৃতি হইবে, উৎপাদনের শক্তিও তত বাড়িয়া যাইবে। (খ) উৎপাদন করিতে সময় প্রয়োজন হয়, উৎপাদন ও বিক্রয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মূলধনের দ্বারাই উৎপাদক উৎপাদন চালাইতে পারে। (গ) কোন দ্রব্যকে এক সময় হইতে অন্য সময়ে পাঠাইতে হইলে মূলধনের প্রয়োজন খুবই বেশী। যেমন কোন শস্য যখন উৎপন্ন হইল তাহার পরবর্ত্তী কয়েকমাস যাবৎ উহাকে মজুত করিয়া বিক্রয় করা প্রয়োজন, (যতদিন না আবার সেই শস্য উৎপন্ন হয়), মূলধনের সাহায্যেই ইহা সম্ভব। (ঘ) ভোগকারী ব্যক্তি বা রাষ্ট্র বর্ত্তমানের অভাবকে ভবিষ্যতের অভাবের তুলনায় তীব্রতর ভাবিলে ঋণ করিয়াও বর্ত্তমানের অভাব মিটাইয়া থাকে। এই সকল কারণে ঋণ-পুঁজির চাহিদা হইয়া থাকে। সুদের হার বাড়িলে ঋণ-পুঁজিব চাহিদা কমে, সুদের হার কমিলে ঋণ-পুঁজির চাহিদা বাড়ে।

কেন ঋণপুঁজির চাহিদা হয়

ঋণ-পুঁজির চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের বিন্দুতে সুদের হার নির্ধারিত হইবে।

কেইন্‌স্ এই নয়া-ক্লাসিকাল তত্ত্বকে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাব মতে সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়িবে বা সুদের হার কমিলে সঞ্চয় কমিবে—ইহাদের মধ্যে এরূপ কোন সরাসরি ও সমহার (Proportionate) সম্পর্ক নাই। বাজারে কোনরূপ সুদ না থাকিলেও কিছু পরিমাণ সঞ্চয় সমাজে হইতেই থাকিবে। বহুলোক আছেন যাঁহারা বর্ত্তমান সুদের হারের কথা চিন্তা না করিয়া সঞ্চয় করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ, ধনীদের সঞ্চয় কখনই সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। উপরন্ত, সমাজে মোট সঞ্চয়ের বৃহৎ অংশ যৌথ মূলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হইতে আসে; যাহারা সুদের হারের কথা চিন্তা না করিয়া অন্যান্য উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, কেইনস্ দেখাইতেছেন যে, সুদের হারের সহিত মোট সঞ্চয়ের সম্পর্ক নয়া-ক্লাসিকাল তত্ত্বের সম্পূর্ণ

কেইনস্ কর্তৃক সমালোচনা

বিপরীত। সুদের হার বাড়িলে সমাজের মোট বিনিয়োগ কমিবে, ফলে সঞ্চয়-ও কমিবে (নয়া ক্লাসিকাল তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হইবে)।

৫। কেইন্‌সীয় তারল্য-পছন্দ-তত্ত্ব (Keynesian theory of Liquidity-Preference) ঃ

কেইন্‌সের অভিমতে, সুদ হইল সম্পূর্ণভাবে অর্থ সংক্রান্ত ঘটনা—অর্থ ব্যবহারের দরুণ অর্থের মালিককে যাহা দিতে হয় তাহাকেই সুদ বলা হয়।

তারল্য কাহাকে বলে

অর্থ হইল সাধারণ ক্রয়শক্তি (general purchasing power), ইহাকে যখন খুসী যে কোন সম্পদে বা সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা চলে ; অর্থের এই প্রকৃতির নাম ইহার তারল্য (Liquidity)। সকল সম্পত্তির মধ্যে অর্থই হইল সর্বাপেক্ষা তরলতা-সম্পন্ন।

যে ঋণ-দাতা অর্থ ঋণ দেয় সে সাময়িকভাবে সাধারণ ক্রয়শক্তির উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারল্যের উপর অধিকার পরিত্যাগ করে। লোকে এই তরল নগদ অর্থ হস্তান্তর করিতে চাহে না বা অনিচ্ছুক থাকে, তাই ইহার জন্য কিছু দাম চায়। সুদ হইল "একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারল্যের উপর অধিকার না রাখিবার দরুণ পুরস্কার"। যদি সুদের হার বৃদ্ধি পায়, লোকের নগদ অর্থ তরল অবস্থায় ধরিয়া রাখিবার বাসনা কম হইবে ; তাঁহারা অধিক পরিমাণে ঋণ দান করিতে চাহিবে। অপর পক্ষে যদি সুদের হার কম থাকে তাহা হইলে লোকে অধিক পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে ; অর্থ খাটাইয়া আয়ের সম্ভাবনা কম থাকায় তাহারা কম ঋণ দান করিতে চাহিবে। সুতরাং, বিভিন্ন সুদের হারে সমাজের সকল ব্যক্তি একত্রে যে বিভিন্ন পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চাহে, তাহার একটি তালিকা আমরা প্রস্তুত করিতে পারি। নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চাওয়াকে নগদ-পছন্দ বা তারল্য-পছন্দ (Liquidity preference) বলা হয় এবং এই তালিকাকে নগদ-পছন্দের তালিকা বা অর্থের চাহিদা তালিকা বলা চলে। নগদ পছন্দের দরুণ যে পরিমাণ অর্থ লোকে হাতে রাখিতে চায় তাহাকে কেইন্‌স্ অর্থের চাহিদা বলিয়াছেন।

সুদ ও তারল্য

তিনটি অভিপ্রায়ে লোকের এই তারল্য-পছন্দ বা নগদ অর্থের চাহিদা সৃষ্টি-

হয় :—লেনদেনের অভিপ্রায় (Transactions motive) সাবধানতার, অভিপ্রায় (Precautionary motive), এবং ফাট্‌কা-নিয়োগের অভিপ্রায় (Speculative motive)। প্রথম ক্ষেত্রে, ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীরা নগদ অর্থ ধরিয়া রাখে আয় প্রাপ্তির বিভিন্ন সময়ের মধ্যে লেনদেনের কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে (যেমন—জানুয়ারীর ১লা মাহিনা পাইলে ফেব্রুয়ারির ১লা আবার মাহিনা পাওয়া পর্য্যন্ত সমগ্র জানুয়ারী মাসের লেনদেনের জন্য কিছু নগদ অর্থ হাতে রাখিতে হয়)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, আকস্মিক লেনদেন বা অচিন্ত্যপূর্ব (unforeseen) ব্যয়সমূহ নির্বাহের উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে হয়। তৃতীয় ক্ষেত্রে, অধিক মুনাফায় অর্থ খাটাইবার সম্ভাবনা ও সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীরা প্রচুর নগদ অর্থ হাতে রাখে। প্রথম দুইটি অভিপ্রায়ে রক্ষিত অর্থ সুদের হারেব উপর খুব বেশী নির্ভর করে না, কিন্তু ফাট্‌কা নিযোগের অভিপ্রায়ে রক্ষিত নগদ অর্থ সুদের হারের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ; সুদের হাব বাড়িলে এই অভিপ্রায়ে অর্থ হাতে রাখার ইচ্ছা কমিয়া যায়।

তারল্য-পছন্দের বিভিন্ন অভিপ্রায় সমূহ-অর্থের চাহিদার কারণ

সুদের হার কমিলে ভবিষ্যতে বেশী সুদে ফাট্‌কা ব্যবসায়ে নিযোগের আশায় বর্তমানে বেশী অর্থ হাতে ধরিয়া রাখে।

সমাজে মোট অর্থের যোগান নির্ভর করে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাব উপর। অর্থের চাহিদা-তালিকাকে অর্থের যোগানের সহিত একত্রে বিচার করিলে সুদের হার নির্ণয় করা যায়। সমাজে মোট অর্থের যোগান সমবেত ভাবে সমাজের সকল লোকের হাতে রহিয়াছে। সুদের হার যদি এইরূপ হয় যে অর্থের যোগানের তুলনায় অর্থের চাহিদা কম (অর্থাৎ, সকলে কম পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চায়), তাহা হইলে ঋণ-দান-যোগ্য অর্থের যোগান বেশী হইবে, ফলে সুদের হার কমিয়া আসিবে। অপর পক্ষে লোকের তারল্য-পছন্দ বাড়িয়া গেলে তাঁহারা যদি অর্থের যোগানের তুলনায় সকলে মিলিয়া অধিক পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে সমাজে ঋণ-দান-যোগ্য অর্থের যোগান কম পড়িবে, ফলে সুদের হার বাড়িয়া যাইবে। ভারসাম্যের অবস্থায় সুদের হার এইরূপ হইবে যাহাতে অর্থের জন্য চাহিদা (তারল্য-পছন্দ অনুযায়ী) এবং অর্থের যোগান সমান হয়।

অর্থের যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য

কেইন্‌সীয় তত্ত্বের সমালোচনায় বলা যায় যে ইহা সুদ ব্যাখ্যা করিবার ব্যাপারে কেবলমাত্র অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর জোর দেয়, কিন্তু সমাজের প্রকৃত অর্থনৈতিক শক্তি সমূহ, যেমন, মূলধনের যোগান ও চাহিদা সামগ্রিক ভাবে বিচার করে না। অর্থ বলিতে তিনি কি বুঝিতেছেন তাহা বিশেষ স্পষ্ট নহে।

সমালোচনা

বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মূলধনের চাহিদা হয় এবং সেই চাহিদা সুদকে প্রভাবান্বিত করে, কেইনসীয় সুদের তত্ত্বে এই বাস্তব সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা উদ্যোক্তাদের মূলধনের জন্য চাহিদাকে কিছুটা অন্তত: প্রভাবিত করে তাহাও স্বীকার করা হয় নাই।

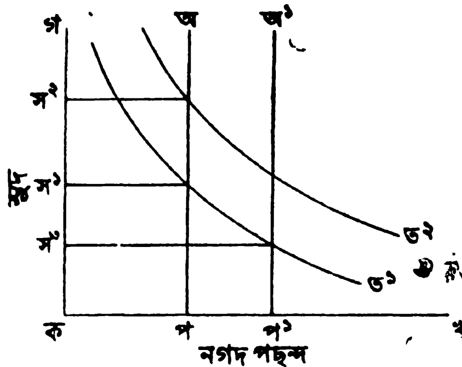
কেইন্‌সীয় তত্ত্বকে রেখাচিত্রে প্রকাশ (Graphcial representation of Keynesian theory) :

লোকে যাহা আয করে তাহা হইতে কিছু অংশ ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করিয়া অপর অংশ সঞ্চয় করে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাহাব সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে।

কিন্তু কি আকৃতিতে, কোন্ রূপে, সে তাহার সঞ্চিত অর্থ-কে রাখিবে? আয়-প্রদানকারী সম্পত্তি ক্রয় করিয়া (সরকারী ঋণ-পত্র, হুণ্ডি, অত্যল্প কালীন বিনিয়োগ ইত্যাদি) সে ঐ সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিতে পারে; অথবা নগদ অর্থ তরল অবস্থায়, কোথা-ও না খাটাইয়া ধরিয়া রাখিতে পারে। ইহাকে অর্থ-মজুত (Money hoarding) করা বলে। কেইন্‌স অর্থের চাহিদা, নগদ-পছন্দ, তারল্য-পছন্দ ইত্যাদির দ্বারা এই অর্থ মজুতের প্রবণতাকেই (Propensity to hoard) বুঝাইয়াছেন। অর্থকে নগদের রূপে হাতে রাখার বা তারল্য-পছন্দের গভীরতা স্থির করার সময়ে ব্যক্তি অর্থ-মজুত করার প্রান্তিক উপযোগিতার সহিত সুদ ছাড়িয়া দেওয়ার প্রান্তিক অনুপযোগিতাকে তুলনা করে। অর্থাৎ নগদ-পছন্দ হইল সুদের হারেরই কার্য্যফল (Liquidity-Preference is a function of the interest-rate) : সুদের হার কমিলে নগদ-পছন্দ বাড়ে (অর্থ-মজুত করিলে লোকসান কম), সুদের হার বাড়িলে নগদ-পছন্দ কমে (অর্থ-মজুত করিলে সুদ না-পাওয়ায় লোকসান বেশী)।

সুদের হারের সহিত নগদ-পছন্দের কারণগত সম্পর্ক (Functional relationship) চিত্রের সাহায্যে দেখান সম্ভব।

ক গ রেখা সুদের হারের এবং ক খ রেখা নগদ-পছন্দের পরিমাণের নির্দেশক। সুদের হার বাড়িলে নগদ-পছন্দ কমে এবং সুদের হার কমিলে নগদ-পছন্দ বাড়ে। ত১ হইল নগদ-পছন্দ বা তারল্য-পছন্দ রেখা। অ প রেখা



অর্থের পরিমাণ নির্দ্দেশক। অর্থের যোগান আর্থিক কর্ত্তৃপক্ষ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির কার্য্যের দ্বারা স্থির হয়, সুদের হারের উপর নির্ভর করে না, তাই উহা (সুদের হার সূচক রেখার (ক গ রেখার) সমান্তরাল। স১ ক সুদের হারে অর্থের চাহিদা ও যোগান সমান, ইহাই ভারসাম্যাবস্থার সুদের হার। যদি নগদ-পছন্দ বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ নূতন রেখা ত২ সৃষ্টি করে তাহা হইলে, সুদের হার বাড়িয়া কস২ হইবে। অপর পক্ষে যদি ত১ রেখা বা নগদ পছন্দ স্থির থাকে, কিন্তু অর্থের যোগান বাড়িয়া যায়, নূতন অ১ প১ রেখা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সুদের হার কমিয়া যাইবে, ক স৩ সুদ হইবে।

সুদের হারে পরিবর্ত্তনের কারণ (Causes of Changes in the Rate of Interest) :

চাহিদা যোগানে পরিবর্তন : নয়া-ক্লাসিকাল তত্ত্ব

নয়া-ক্লাসিকাল তত্ত্ব অনুযায়ী, সুদের হার পরিবর্তিত হয় যদি ঋণ পুঁজির চাহিদা বা যোগানের পরিবর্ত্তন আসে। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাতে বা লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতাতে পরিবর্ত্তন হইলেই সুদের হার পরিবর্ত্তিত হয়। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে, উৎপাদনে নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণের উপর, উৎপাদন কৌশল, নূতন যন্ত্রের প্রবর্তন এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উপর।

নূতন যন্ত্র প্রবর্ত্তনের ফলে মূলধনের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অধিক মূলধন প্রয়োজন হয়। মূলধনের চাহিদা ও সুদের হার বাড়িয়া যায়। অবশ্য যদি আবিষ্কারটি এমন ধরণের হয় যে তাহা উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে অর্থাৎ তাহা মূলধন-সঞ্চয়ী (Capital-Saving) হয় তাহা হইলে সুদের হার কমে।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সুদের হার ক্রমেই কমিয়া আসে, কারণ সমাজে মোট সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ে। অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে স্বল্পকালে হঠাৎ মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সুদের হার বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালে দেশে মূলধনের যোগান এত বাড়ে যে সাধারণতঃ সুদের হার কমিয়া যায়।

মূলধনের যোগানে পরিবর্ত্তন হয় যদি সঞ্চয়ের অভ্যাস, দূরদৃষ্টি এবং যে সমস্ত শক্তির উপর মূলধনের বৃদ্ধি নির্ভর করে তাহাতে পরিবর্ত্তন হয়। মূলধনের যোগানে পরিবর্ত্তন আসিলে সুদের হারেও পরিবর্তন আসে।

কেইন্‌সের মতে, সুদের হার নির্ভর করে তারল্য-পছন্দ এবং অর্থের যোগানের উপর, ইহার কোন একটিতে পরিবর্তন আসিলে সুদের হারও পরিবর্ত্তিত হয়। নয়া-ক্লাসিকালদের ন্যায় কেইন্‌সও বিশ্বাস করেন যে ভবিষ্যতে মূলধনের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ কমিয়া আসিবার ফলে (Vanishing investment opportunities) সুদের হার কমিয়া যাইবে। ইহাকেই মূলধনের অতি দীর্ঘকালীন জড়ত্ব (Secular stagnation of Capital) বলা চলে।

কেইন্‌সীয় তত্ত্ব

অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে কখনই এরূপ অবস্থা আসিতে পারে না যে সুদের হার শূন্যে পৌছিবে, অর্থাৎ বিনা সুদে ঋণ পাওয়া যাইবে। কারণ সমাজে ঋণ-পুঁজির প্রয়োজন সর্ব্বদাই থাকিবে, বরং নূতন আবিষ্কার, যন্ত্র প্রচলন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নিত্য অভিনব দ্রব্য উৎপাদনের দরুণ ঋণ-পুঁজির চাহিদা থাকিবেই। কেইন্‌সের মতে, একমাত্র আদিম অর্থনৈতিক কাঠামোতেই সুদ না থাকার কথা, কারণ সেই সমাজে নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন হয় না, লোকের সমগ্র আয় ভোগকার্য্যেই ব্যয়িত হয়। বর্তমান সমাজে সেইরূপ অবস্থা আসিবার

সুদ কখনও শূন্যে পৌছিবে কিনা

কোনই সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সুদ শূন্যে বিলীন হইবার সম্ভাবনা বাস্তবে দেখা যায় না।

সুদের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা (Necessity and Justification of Interest) :

ধনবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হইবার বহু পূর্ব্বে সুদের সাহায্যে সমাজে লেনদেন শুরু হইয়াছে এবং প্রাচীন দার্শনিকগণ ইহার তীব্র বিরোধিতা করিতেন। গ্রীক-দার্শনিক অ্যারিস্টোটলের অভিমতে ইহা ছিল "অস্বাভাবিক" (Unnatural) এবং প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ। বন্ধ্যা নারীর সন্তান যেরূপ স্বাভাবিক নহে, সেইরূপ কিছু ধাতু-মুদ্রা ঋণ দিয়া উহার অতিরিক্ত কিছু মুদ্রা গ্রহণ তাঁহার নিকট অস্বাভাবিক, সুতরাং ঘৃণ্য কাজ বলিয়া মনে করিতেন।*

মধ্যযুগের রোমান ক্যাথলিক বা মুসলমান ধর্ম্মমতও ইহার বিরুদ্ধে প্রচার করিত। তাহার কারণ ছিল এই যে, সেই সময় প্রায় সকল ঋণ ভোগ-কার্য্যের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইত এবং মহাজনগণ দেনাদারের উপর ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ অত্যাচার করিত।

সুদের যৌক্তিকতা

কিন্তু যখন হইতে ঋণ-পুঁজি উৎপাদন কার্য্যে, এবং মুনাফা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা সুরু হইল তখন হইতে ইহার প্রতি বিরোধিতা ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সাল্‌মাসিয়াস্ এবং লক্ বলিলেন যে, ঋণের উপর সুদ গ্রহণ করা চলে যদি ঋণ-গ্রহীতা ওই ঋণ হইতে অন্ততঃ সুদের সমান আয় করিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিজিয়োক্রাট-গণ মূলধনের উৎপাদনক্ষমতার কথা বলেন (যে অর্থে জমি উৎপাদনক্ষম), এবং সুদকে অর্থনৈতিক যুক্তির দ্বারা সমর্থনের প্রচেষ্টা করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্ক্স প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক ধনবিজ্ঞানীগণ দেখাইয়া দেন কিভাবে সমাজে পুঁজির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, পুঁজি-ভিত্তিক উৎপাদন শুরু হইয়াছে, সকল উপাদানের তুলনায় পুঁজি ও পুঁজির মালিক উৎপাদনক্ষেত্রে এবং সমাজে নিয়ন্ত্রণকারী স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার মতে, যে ব্যক্তি পুঁজি ঋণ হিসাবে লইয়া থাকে সে উহার ব্যবহারের জন্য দাম দিতেছে, সুদের এইরূপ পুঁজি-

* মনুসংহিতায় কুসীদজীবিদের বিশেষ নিন্দা করা হইয়াছে। বার্দ্ধুষিক-অর্থাৎ বৃদ্ধির দ্বারা (সুদ) যাহারা জীবন যাপন করে তাহারা নিন্দনীয়। ইহা অবশ্য ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। "কুসীদ" শব্দের অর্থ যে কুৎসিতভাবে জীবন যাপন করে।

ব্যাখ্যা নাবালক সুলভ এবং সুদ উদ্ভবের আসল কারণ এবং ইহার প্রকৃত রূপ ঢাকা দেওয়ার অপচেষ্টা। ঋণগ্রহীতা ওই ঋণ লইয়া অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি করে না, সে উহার দ্বারা শ্রমশক্তি ক্রয় করিয়া শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য (পুঁজির উপর মালিকানা থাকার দরুণ) আত্মসাৎ করে এবং সেই অপহৃত উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ-ই ঋণ পুঁজির মালিককে লুটের ভাগ হিসাবে সুদরূপে দেয়।

আয়ের উৎসরূপে সমর্থন যোগ্য নহে

সুদ-কে (ক) আয়ের উৎসরূপে বা (খ) ঋণের দাম হিসাবে দেখা যাইতে পারে। আয়ের উৎসরূপে দেখিলে ইহা সত্যই সমর্থন যোগ্য নহে, কারণ সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের এবং অলস পরশ্রমভোগী একদল ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টির প্রধান কারণ হইল সুদ হইতে আয়। কিন্তু যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় থাকিবে ততদিন ইহা থাকিবেই, অবশ্য রাষ্ট্র আইন করিয়া সুদের হার কমাইয়া দিতে পারে।

ঋণের দাম হিসাবে সুদের প্রয়োজনীয়তা

আর ঋণের দাম হিসাবে দেখিলে ইহাকে সমর্থন করিতেই হইবে। (ক) মূলধনের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় সুতরাং বর্ধিত উৎপাদনের অংশ মূলধনের মালিক কিছুটা পাওয়া মোটেই অযৌক্তিক নহে। (খ) সুদের ফলে সমাজে সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয় এবং মূলধন-গঠন সম্ভব হয়; তাহা না হইলে উৎপাদন-কার্য্যে মূলধনের নিয়োগ কমিয়া যাইবে এবং দেশে উৎপাদনের পরিমাণও কমিবে। (গ) দেশের মোট মূলধন কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইবে তাহা সুদের হারের উপরই নির্ভর করে। যে ক্ষেত্রে মূলধন নিযুক্ত হইলে তাহা অধিক উৎপাদনক্ষম, সেই ক্ষেত্রের উদ্যোক্তাগণ অধিকহারে সুদ দিতে রাজী হইবে; সুতরাং তাহারা মূলধনের যোগান পাইতে পারিবে, তাহাদের উৎপাদনের প্রসার হইবে। মোট মূলধন কিরূপে প্রতিযোগী ব্যবহারসমূহের মধ্যে নিযুক্ত হইবে তাহা নির্ভর করে সুদের হারের উপর। সুতরাং, সুদকে ছাড়া বর্তমান সমাজব্যবস্থা চলিতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুদের কার্য্য ও প্রয়োজন

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুদের স্থান কিরূপ? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপায় বা যন্ত্রপাতির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা নাই, তাহারা রাষ্ট্রের সম্পত্তি। সুতরাং ব্যক্তিগত ঋণদান বা ঋণগ্রহণ উৎপাদন কার্য্যে মূলধন নিয়োগের জন্য প্রয়োজন হয় না। তবে, ভোগ কার্য্যের জন্য ঋণ চলিতে পারে এবং যতদিন না পর্য্যন্ত দেশ যথেষ্ট উন্নত হয়, ততদিন এইরূপ ঋণ ও সুদ থাকা অসম্ভব নহে।

যদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিজে সকল মূলধন গঠন করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রথম দিকে অন্ততঃ তাহাকে বিদেশ হইতে বা দেশের লোকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় বিদেশী বা দেশী ঋণপুঁজির মালিককে সুদ না দিলে প্রয়োজনমত ঋণ না পাইবার কথা। তাই সুদ চলিত থাকিবে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র স্থির করার সময়ে চিন্তা করিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ ব্যবহারে নিযুক্ত করিলে মূলধনকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবে নিযুক্ত করা সম্ভব। যে ক্ষেত্রে নিয়োগের ফলে মূলধন হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক আয়সৃষ্টি হইবে সেই ক্ষেত্রেই উহার নিয়োগ হইবে, অর্থাৎ মূলধন হইতে সৃষ্ট সম্ভাব্য আয় বিবেচনা করা হইবে। ইহাকে সুদরূপে মনে করা চলে। সুতরাং প্রকাশ্যে না হইলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সুদ মূলধন নিয়োগের প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে কাজ করিবে।

অনুশীলনী

1. Examine the causes that determine the rate of interest. (B. A. '46, '49 ; B. com. '45)

2. Expound Keynes' theory of Interest. (B. A. '50, '56)

3. Discuss the statement that the rate of interest is determined by the demand for and the supply of money. (B. com. '56)

4. Discuss the nature of interest and explain the necessity of paying it. (B. A. '51 ; B. com. '52)

5. "Interest is paid for the same reason as all other payments are made, because a loan confers a service." —Elucidate. (B. com. '47).

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মুনাফা

মুনাফা কাহাকে বলে ? (What is Profit ?)

কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে মোট রেভিনিউ পাওয়া যায় তাহা হইতে সেই দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বা ক্রয়-মূল্য বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা-ই মুনাফা।

এই মুনাফা-কে মূলধনের অনুপাতে প্রকাশ করা হয় ; অর্থাৎ বৎসরের মোট মুনাফা উৎপাদনে নিযুক্ত মূলধনের হিসাবে শতকরা কতভাগ, এইভাবে মুনাফার হিসাব দেখান হয়। ১০০০৲ মূলধন নিযুক্ত থাকিলে এবং বৎসরে ৫০৲ মুনাফা হইলে, বলা হয় যে, মুনাফার হার ৫%। মুনাফাকে অনেক সময় ইউনিট-প্রতি মুনাফা হিসাবেও দেখা হয়। দ্রব্যের ইউনিট-প্রতি দাম হইতে ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাদ দিলে, ইউনিট-প্রতি মুনাফা পাওয়া যায়। অথবা, একবার উৎপাদন-ধারা শেষ হইলে মোট উৎপাদন ও মোট বিক্রয়ের ফলে কিরূপ মুনাফা রহিল, এইভাবে প্রত্যেকবারে উৎপাদন ধারার শেষে কিরূপ মুনাফা হইল (Profits per turnover) তাহা হিসাব করা যাইতে পারে। ইউনিট-প্রতি মুনাফাকে সেই বারে যত ইউনিট বিক্রয় হইল তাহা দিয়া গুণ করিলে ধারা-প্রতি (Per turnover) মুনাফার হিসাব পাওয়া সম্ভব।

তিন ভাবে মুনাফার হিসাব

মোট বিক্রয়-লব্ধ অর্থ বা মোট রেভিনিউ হইতে মোট ব্যয় বাদ দিয়া অবশিষ্টকে মোট মুনাফা (Gross Profit) বলা হয়, কারণ ইহার মধ্যে অনেক বিষয় থাকে যাহাকে ঠিক মুনাফা বলা চলে না। প্রথমতঃ, পরিচালনাজনিত পারিশ্রমিক (Earnings of Management) এই মোট মুনাফার মধ্যে জড়িত হইয়া থাকিতে পারে। কোন উদ্যোক্তা যদি নিজেই ফার্মটিকে পরিচালনা করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যান্য উপাদানের ন্যায় নির্দিষ্ট ও নিয়মিতভাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ না-ও করিতে পারেন ; মোট মুনাফাই তাহার আয়। কিন্তু এই মোট মুনাফার মধ্যে

তাহার পারিশ্রমিকও জড়িত আছে, খাঁটি মুনাফা (True or Pure Profit) বাহির করিতে হইলে এই পারিশ্রমিক বাদ দিতে হইবে। যদি নিজে কাজ না করিয়া উদ্যোক্তা অন্য পরিচালক নিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে যে পারিশ্রমিক তাহাকে দিতে হইত : অথবা নিজে অন্য কোন ফার্মে মাহিনা-ভোগী পরিচালকের কাজ করিলে যাহা পাইতে পারিতেন, সেই পারিশ্রমিককে মোট মুনাফা হইতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় উদ্যোক্তা নিজে যে মূলধন খাটাইয়াছেন তাহার দরুণ সুদ মোট মুনাফার সহিত জড়িত থাকে। নিজের ফার্মে না খাটাইয়া অন্য কোথাও ধার দিলে কি সুদ পাওয়া যাইত বা অন্য কোথাও হইতে ওই পরিমাণ অর্থ ঋণ করিয়া খাটাইলে কিরূপ সুদ দিতে হইত, তাহা হিসাব করিয়া মোট মুনাফা হইতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, উদ্যোক্তার নিজের জমি বা ঘরবাড়ী যদি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে সেই জমির সম্ভাব্য খাজনাও মোট মুনাফা হইতে বাদ দিতে হইবে। এই সকল বিষয় বাদ দিলেই খাঁটি বা নীট মুনাফা বাহির করা সম্ভব হইবে।

মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা

অন্যান্য ধরণের আয়ের সহিত (খাজনা, মজুরী ও সুদ) মুনাফার প্রকৃতি তিন কারণে পৃথক। প্রথমতঃ, মুনাফার পরিমাণ শূন্য হইতে পারে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ঋণাত্মক মুনাফা (Negative Profit) অর্থাৎ লোকসানও হইতে পারে। কিন্তু খাজনা, মজুরী বা সুদ কেহই শূন্য হইবে না ; বা হইলেও কখন ঋণাত্মক হইবে না (মালিককে মজুরী দিয়া শ্রমিক কখনই কাজ করিবে না)। দ্বিতীয়তঃ, মুনাফা কখনই অন্যান্য আয়ের মত চুক্তিবদ্ধ এবং নির্দিষ্ট (Contractual & certain) আয় নহে, পূর্ব হইতে স্থিরীকৃত হয় না ; ইহা অনির্দিষ্ট অবশিষ্ট (uncertain residue), ঘটনা প্রবাহে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অন্যান্য আয়ের সৃষ্টিকারী সকল উপাদানের দরুণ ব্যয় করিয়া, ভবিষ্যৎ চাহিদার পরিমাণ আন্দাজে ধরিয়া লইয়া, উদ্যোক্তা উৎপাদন করিয়া চলে। ভবিষ্যৎ-কে নিশ্চিত করিয়া দেখা যায় না বলিয়া ভবিষ্যতের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-মূল্যও অনিশ্চিত, অথচ বর্তমানের ব্যয় কিন্তু নির্দিষ্ট। ভবিষ্যৎ-দর্শন সঠিক হইলে মুনাফা হইবে, বে-ঠিক হইলে লোকসান হইবে। মুনাফা করিবার আশা সে সকল সময়েই রাখে, কিন্তু বাস্তবে ঘটনা-প্রবাহে তাহা দুরাশায় পর্য্যবসিত হইতে পারে, অথবা আশাতিরিক্ত পরিমাণে লাভ করিতে পারে।

অন্যান্য আয়ের সহিত মুনাফার প্রকৃতিগত পার্থক্য

নীট মুনাফা গঠনকারী বিষয়সমূহ (Elements in Net Profit) :

অনিশ্চয়তা-ই মুনাফার উৎস। অস্পষ্ট ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির সাহায্যে পরিবর্তনশীল জগতে ব্যবসা করিতে গেলে এই অনিশ্চয়তা অনিবার্য্য। সকল কিছুকে বাঁধা ধরা রুটিনের মধ্যে ফেলিতে পারিলে, অথবা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে ভবিষ্যতের গতিবিধি পূর্বে জানিতে পারিলে এই অনিশ্চয়তা থাকে না, কোন হঠাৎ-সুযোগ (Chance) গ্রহণের দরকার থাকে না, এবং মুনাফারও সৃষ্টি হয় না। কিন্তু বিক্রয়ের স্থান কাল হইতে বহুদূরে অবস্থিত উৎপাদন-কেন্দ্র চালাইতে হইলে এই অনিশ্চয়তার ঝুঁকি বহন করিতে হয়। যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা এই ঝুঁকি বহন না করিলে সমাজে উৎপাদনকে সংগঠন করিবে? মুনাফা হইল সেই ঝুঁকি-গ্রহণের পুরস্কার, অনিশ্চয়তা বহণের পারিশ্রমিক। মুনাফার সম্ভাবনা-ই যদি না থাকে, তাহা হইলে লোকসানের ঝুঁকি কেহ বহন করিবে না। সমাজে সকলেই মুনাফা করিতে পারিবে তাহা নহে, কাহারও মুনাফা হইবে, কাহারও বা লোকসান হইবে; কিন্তু লোকসানের ঝুঁকির তুলনায় মুনাফার সম্ভাবনা বেশী থাকা প্রয়োজন।

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার

সুতরাং উৎপাদন সুরুর পূর্বেই উদ্যোক্তা যেমন তাহার সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব করে, কিরূপ খাজনা, মজুরী ও সুদ দিতে হইবে তাহা কষিয়া দেখে, ঠিক সেইরকম সে উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া সম্ভাব্য মুনাফার কথা চিন্তা করে। সম্ভাব্য ব্যয়ের উপর কিরূপ মুনাফা রাখিয়া দ্রব্যের দাম ঠিক করিবে তাহাও স্থির করে। সুতরাং এই মুনাফা-ও ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাম-নির্দ্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে। দ্রব্যের দাম অন্ততঃ সেই পরিমাণ হওয়া দরকার যাহার মধ্যে তাহার প্রত্যাশিত মুনাফা জড়িত আছে, যে মুনাফাটুকু না পাইলে সে ব্যবসাতে নামিত না, উৎপাদন সুরু করিত না। এই পরিমাণ মুনাফাকে "স্বাভাবিক মুনাফা" (Normal profit) বলে, ইহা উৎপাদন-ব্যয়েরই অন্তর্গত।*

স্বাভাবিক মুনাফা ব্যয়েরই অন্তর্ভুক্ত

* "স্বাভাবিক মুনাফা" বলিতে মার্শাল কোন শিল্পের অন্তর্গত "প্রতিনিধি-স্থানীয় ফার্মের" মুনাফা-কে বুঝিয়াছেন। কোন শিল্পের উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকরী থাকিলে দীর্ঘকালে অনেক ফার্ম উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিতে পারে, কাহারও উৎপাদন-ব্যয় বেশী, কাহারও বা উৎপাদন-ব্যয় কম। কিন্তু সেই শিল্পের দ্রব্যের দাম দীর্ঘকালে শিল্পের "প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্মের" গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। এই ফার্ম যে মুনাফা করে, তাহা ফার্মের দীর্ঘকালীন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত,

বাস্তবে প্রাপ্ত মুনাফার মধ্যে এই "স্বাভাবিক মুনাফা" ছাড়া আরও অনেক বিষয় থাকিতে পারে। (খ) বাস্তবে প্রাপ্ত মুনাফা (Realised profit) সাফল্যের সহিত ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। ইহা একাংশে সুযোগ ও ভাগ্যের ব্যাপার, এবং অপরাংশে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি বহন না করার বা এড়াইবার মত বুদ্ধির দরুণ প্রাপ্ত, উদ্যোক্তার উদ্যোগ ও সংগঠনী শক্তি হইতে ইহার উদ্ভব। (গ) নূতন-প্রচলনের (Innovation) ফলে মুনাফা সম্ভব হয়। শুম্পিটার বলিয়াছেন যে, নূতন দ্রব্য, নূতন পদ্ধতি বা নূতন বাজার প্রচলন করিলে তাহা হইতে প্রথম-প্রচলনকারী উদ্যোক্তার যথেষ্ট মুনাফা হয়। তবে অন্যান্য উদ্যোক্তাগণ সেই নূতন-প্রচলন নিজেরা গ্রহণ করার পরে প্রথম-প্রচলনকারী উদ্যোক্তার ব্যয়ের পার্থক্য জনিত সুবিধা আর থাকে না। আবার তাহাকে নূতন-প্রচলনের চেষ্টা করিতে হয়। (ঘ) যদি কোন উদ্যোক্তা অবিরাম প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রতিযোগী দ্রব্যাদি হইতে পৃথক করিয়া নিজের দ্রব্যকে ক্রেতাদের নিকট আকর্ষণীয় করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে এইরূপ দ্রব্য-পৃথকীকরণের ফলে তাহার মুনাফা বেশী হইবে, কারণ সে একটু দাম বাড়াইয়া দিলেও ক্রেতারা তাহার দ্রব্যকে ছাড়িয়া যাইবে না। বাজারে একচেটিয়া বা একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার অবস্থা আনিয়া ফেলিতে পারিলে সেই অবস্থা হইতে বিশেষ মুনাফা লাভ করা সম্ভব। (ঙ) হঠাৎ-সুযোগের দরুণ মুনাফা আসিতে পারে। ফ্যাশন পরিবর্তন, যুদ্ধ বা মুদ্রাস্ফীতির দরুণ অনেক সময় সহসা দাম বৃদ্ধি হয় এবং উদ্যোক্তাগণ প্রচুর মুনাফা লাভ করিতে পারেন।

সম্ভাব্য মুনাফা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বাস্তবে প্রাপ্ত মুনাফার মধ্যে আরও অনেক বিষয় জড়িত থাকে

মুনাফা সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ (Theories of Profit) :

১। গতিশীলতা তত্ত্ব (Dynamic theory) : ক্লার্কের অভিমতে গতিবিহীন (static) সমাজে মুনাফার উদ্ভব হয় না, ইহা সমাজে পরিবর্তন

ইহাই "স্বাভাবিক মুনাফা"। এই মুনাফা লাভ করিতে থাকিলে সেই ফার্ম ভারসাম্যাবস্থায় রহিয়াছে বুঝিতে হইবে; তাহার প্রসারণের বা সঙ্কোচনের কোন ঝোঁক থাকে না। ইহাকেই তাই সর্বোন্নত ফার্মের মুনাফারূপেও গণ্য করা চলে।

মিসেস্ রবিন্‌সনের মতে, কোন শিল্পের "স্বাভাবিক মুনাফা" বলিলে বোঝা যায় যে, মুনাফার হার সমান পাইতে থাকিলে নূতন ফার্মের ওই শিল্পে প্রবেশের বা পুরাণো ফার্মের ওই শিল্প হইতে বাহির হইয়া আসার ঝোঁক থাকে না। স্বাভাবিক মুনাফা হইতে মুনাফা বেশী পাইলে নূতন ফার্ম ওই শিল্পে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পায়; স্বাভাবিক মুনাফা হইতে মুনাফা কম পাইলে পুরানো ফার্মসমূহ ক্রমে ওই শিল্প ছাড়িয়া যাইতে চায়।

হইতে উদ্ভূত হয়। যে সমাজে জনসংখ্যা, মূলধনের পরিমাণ, ফ্যাশান ও রুচি বা উৎপাদন পদ্ধতিতে সর্বদা পরিবর্তন হইতেছে তাহাকে গতিশীল (Dynamic) সমাজ বলা হয়। সে সমাজে এই সকল বিষয় পরিবর্ত্তিত হয় না বলিয়া ধরা হয়, তাহাকে গতিবিহীন (Static) সমাজ বলে। এই গতিবিহীন সমাজে চাহিদা ও যোগানে মৌলিক পরিবর্তন হয় না, তাই উদ্যোক্তা পরিচালনার পারিশ্রমিক ছাড়া আর কিছু আয় করিতে পারে না। গতিশীল সমাজেই চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অসামঞ্জস্য আসা সম্ভব, সুতরাং মুনাফার উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। মুনাফা লাভের জন্য উদ্যোক্তা নিজেই গতিশীলতা সৃষ্টি করে। নূতন যন্ত্র প্রবর্তন করিয়া বা নূতন দ্রব্য প্রচলন করিয়া সে মুনাফা লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুদিন পরেই অন্য উদ্যোক্তাগণ তাহার যন্ত্রের বা দ্রব্যের অনুকরণ সুরু করে, প্রতিযোগিতা সুরু হয়, মুনাফা কমিয়া যায়। শুমপিটারের নূতন-প্রচলন (Innovation) তত্ত্ব বহুলাংশে ইহারই অনুরূপ।

নূতন-প্রচলনের ফলস্বরূপ

এই তত্ত্বের সমালোচনায় বলা হয় যে সমাজ সর্বদাই গতিশীল, সুতরাং পূর্ব হইতেই উদ্যোক্তাগণ আসন্ন ও সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন থাকে; তাই পরিবর্ত্তন হইলেও তাহারা পূর্ব হইতে উহাকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করিয়াই রাখে। ফলে, সে গতিশীলতার দরুণ মুনাফা না পাইতেও পারে। যদি সকলেই ভবিষ্যতে পরিবর্তন হইবে বলিয়া আশা করেন অথচ পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে যাহারা পরিবর্তনে অবিশ্বাসী ছিলেন তাহারা পরিবর্তন না হওয়ার দরুণই মুনাফা লাভ করিতে পারিলেন, এইরূপ ঘটিতে পারে।

২। মুনাফার খাজনা-তত্ত্ব (Rent theory of Profit):

ওয়াকারের অভিমতে মুনাফার রূপ হইল উদ্বৃত্ত এবং ইহাকে তাই খাজনা বলা চলে। যে জমিতে কোন উদ্বৃত্ত হয় না তাহাকে যেমন প্রান্তিক জমি বলা হয়, সেইরূপ, যে উদ্যোক্তা শুধু পরিচালনার পারিশ্রমিক (Wages of Management) মাত্র লাভ করেন তিনি প্রান্তিক উদ্যোক্তা। কিন্তু যোগ্যতাশক্তির তারতম্য আছে, প্রান্তিক উদ্যোক্তার তুলনায় অধিকতর যোগ্যতা শক্তিসম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ (প্রান্তোর্ধ উদ্যোক্তা—Intramarginal Entrepreneurs) যে অধিক মুনাফা লাভ করিয়া থাকেন তাহাই যোগ্যতার খাজনা (Rent of ability)।

যোগ্যতা-শক্তির পার্থক্য-জনিত উদ্বৃত্ত

জমির ন্যায় যোগ্যতাশক্তির যোগানও সমাজে সীমাবদ্ধ, তাই ইহাকে খাজনা বলাই সঙ্গত।

মার্শাল মুনাফার খাজনা-তত্ত্বকে বিপুল সমালোচনা করিয়াছেন। (ক) উৎপাদনে নিযুক্ত সকল জমিতেই উদ্বৃত্ত আয় হয়, অথবা অন্ততঃ উৎপাদন-ব্যয়ের সমান মূল্যের উৎপাদন হয়। কিন্তু উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে অনেক উদ্যোক্তা আছেন, যাঁহারা মুনাফা করিতে পারেন না, লোকসানের ভার বহন করেন। ঋণাত্মক খাজনা নাই, কিন্তু ঋণাত্মক মুনাফা (Negative profit) বা ক্ষতি সমাজে থাকিতে পারে। (খ) তাহা ছাড়া, খাজনা-হীন জমির ন্যায় মুনাফা-হীন উদ্যোক্তা সমাজে দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না। (গ) উপরন্তু, এই তত্ত্বের সাহায্যে জানা যায় যে, কেন উদ্যোক্তাদের মধ্যে মুনাফার পার্থক্য থাকে, কিন্তু মুনাফার প্রকৃতি বা ইহার গঠনকারী বিষয়-সমূহ (Component Elements) সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

সমালোচনা

৬। মুনাফার ঝুঁকি-তত্ত্ব (Risk theory of Profit) :

'হলে' (Hawley) এই ঝুঁকি-তত্ত্বের প্রবর্তক। এই তত্ত্বানুযায়ী উদ্যোক্তা মুনাফা লাভ করেন কারণ তিনি ঝুঁকি বহন করেন। উৎপাদন ক্ষেত্রে হউক বা ব্যবসার ক্ষেত্রে হউক, বাজারের ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্বন্ধে আন্দাজ করিয়া তিনি দ্রব্যোৎপাদন বা দ্রব্য মজুত করিয়া থাকেন। মুনাফার সম্ভাবনা না থাকিলে এই ঝুঁকি কেহই গ্রহণ করিবেন না। তাই ঝুঁকি বহনের পুরস্কার স্বরূপ মুনাফা না দিলে সমাজে দ্রব্যোৎপাদন ও ব্যবসা চালাইবার মত উপযুক্ত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণের সম্ভাবনা নাই, সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

ঝুঁকি বহনের পুরস্কার

সকল শিল্পে ঝুঁকির পরিমাণ সমান নয়, তাই মুনাফাও সমান হইতে পারে না। একই শিল্পে বিভিন্ন উদ্যোক্তারা বিভিন্ন পরিমাণের ঝুঁকি বহন করেন। যে খুবই সাবধানী সে কম ঝুঁকি বহন করিয়া কম মুনাফাতেও কাজ করিবে। যে খুবই দুঃসাহসী এবং ভাগ্যান্বেষী, সে বেশী ঝুঁকি বহন করিয়া বেশী মুনাফার আশা করিবে। যাহারা স্বাভাবিক মুনাফা মাত্র পাইয়া থাকেন, সেই প্রান্তিক ঝুঁকি বহনকারীগণ ওই মুনাফা না পাইলে উৎপাদন বা ব্যবসাতে আসিবেন না। সমাজে ওই উৎপাদন বা ব্যবসার প্রয়োজন থাকিলে ওই মুনাফা তাহাদের দিতেই হইবে।

এই তত্ত্বের সমালোচনায় বলা চলে যে সকল প্রকার ঝুঁকির ফলেই মুনাফার উদ্ভব হয় না। যে সকল ঝুঁকি পূর্ব্ব হইতে জানা যায় এবং বোঝা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সর্তকতা অবলম্বন করায় তাহাদের প্রভাব নিস্ফল হইয়া পড়ে। অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ জানেন কেমন করিয়া ঝুঁকি কমাইতে হয় এবং মুনাফা বাড়াইতে হয়। সুতরাং, কার্ভার বলিয়াছেন, যে ঝুঁকি বহন না করার পুরস্কারই হইল মুনাফা, কম ঝুঁকি থাকিলেই তো বেশী মুনাফার সম্ভাবনা ঝুঁকি কমাইয়া ফেলিতে পারিলেই উদ্যোক্তা অধিক মুনাফা লাভ করিতে পারে। (খ) উদ্যোক্তা যে মুনাফা পান তাহার সম্পূর্ণটাই ঝুঁকি বহন করার পুরস্কার নয়। ওই মুনাফার মধ্যে তাহার যোগ্যতাশক্তির পারিশ্রমিক আছে, একচেটিয়া অবস্থা বা আধা-একচেটিয়া অবস্থা বা হঠাৎ সুযোগ হইতে উদ্ভূত অস্বাভাবিক মুনাফা-ও জড়িত থাকিতে পারে।

সমালোচনা

এই তত্ত্বের অনেকাংশ সঠিক বলিয়া ধরা উচিত, কারণ মুনাফা প্রধানতঃ ঝুঁকি বহনের পুরস্কার তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ঝুঁকি জানা যায় না, পূর্ব্ব হইতে যাহার বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়া যায় না, বীমা-দ্বারা যাহার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া রাখা যায় না সেইরূপ অনিশ্চয়তা (Uncertainty) সকল ব্যবসাতেই আছে। চাহিদার স্থান-কাল হইতে বহুদূরে অবস্থিত উৎপাদন-কেন্দ্রে উদ্যোক্তা উৎপাদন চালায়, গতিশীল সমাজের সম্ভাব্য সকল পরিবর্ত্তনের সঠিক হিসাব করিয়া ওঠা তাহার পক্ষে সম্ভব না-ও হইতে পারে। বিদেশী বাজারের অবস্থা, দেশে রুচি ও ফ্যাশনের অবস্থা, প্রতিযোগী-ফার্মে নূতন যন্ত্রপাতি প্রচলনের সম্ভাবনা সকল কিছুই বহুলাংশে অনিশ্চিত, তাহার সিদ্ধান্ত নির্ভুল না-ও হইতে পারে। কর্মচারী, উৎপাদন-পদ্ধতি, বিক্রয়-পদ্ধতি ইত্যাদির নির্বাচন সঠিক না হইলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে পারে। এই অনিশ্চয়তা-বহন না হইলে উৎপাদন চলিতে পারে না, অন্যান্য উপাদানের মতই উৎপাদন-পদ্ধতির সহিত ইহা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, উপাদান-সম্মিলনের অন্তর্ভুক্ত, ইহাকে উৎপাদনের উপাদান বলিলেও ভুল হয় না। বস্তুতঃ জমি, শ্রম ও মূলধনের ন্যায় ইহা উৎপাদনেরই উপাদান। অন্যান্য উপাদানের ন্যায় ইহারও যোগান-দাম (Supply-price) আছে; স্বাভাবিক মুনাফা আয় না হইলে উদ্যোক্তাগণ সমাজে অনিশ্চয়তা-বহন-রূপ কার্য্যের যোগান দিতে রাজী হইবে না।

অনিশ্চয়তা তত্ত্ব: অনিশ্চয়তা কি পৃথক উপাদান?

মনে রাখা দরকার যে, অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব মুনাফার সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারে না; অনিশ্চয়তা-বহন গুরুত্বপূর্ণ হইলেও আরও বহু কারণে উদ্যোক্তা মুনাফা লাভ করিয়া থাকেন দ্বিতীয়তঃ, অনিশ্চয়তা-বহন একান্তই মানসিক অনুভূতির স্তরে নিবদ্ধ; একই অনিশ্চয়তাকে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজেদের বহন করিবার ক্ষমতা অনুযায়ী ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিভিন্ন পরিমাণে অনুভব করে। তৃতীয়তঃ, ইহাও মনে রাখা দরকার সংগঠন ও পরিচালনা-কে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা চলে, কারণ তাহা উৎপাদনপদ্ধতিতে সুনির্দ্দিষ্ট সহায়তা করে। কিন্তু অনিশ্চয়তা-বহনের মানসিক অনুভূতিকে উপাদান বলিয়া গ্রহণ করা চলে না; আর কিছুটা অনিশ্চয়তা জমিদার, শ্রমিক, পুঁজির মালিক সকলেই বহন করে, উহা উদ্যোক্তা একাই করেন তাহা নহে।

সমালোচনা

মুনাফা শূন্যতা (Zero Profit) ঃ

ওয়াকারের মতে প্রকৃত মুনাফা হইল খাজনার ন্যায়, প্রান্তিক উদ্যোক্তার তুলনায় অধিক যোগ্যতা-শক্তির দরুণ পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত। দীর্ঘকালে এই পার্থক্য-জনিত মুনাফা থাকিতে পারে না, কারণ জমির পরিমাণ দীর্ঘকালেও সীমাবদ্ধ, কিন্তু উদ্যোগ-ক্ষমতা (Ablity of Entrepreneurship) দীর্ঘকালে সীমাবদ্ধ নহে। স্বল্প-কালে সাময়িকভাবে কোন উদ্যোক্তা এই মুনাফা লাভ করিতে থাকিলেও দীর্ঘকালে নূতন উদ্যোক্তাগণ সেই শিল্পে প্রবেশ করিবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্যের দাম কমিবে এবং সকলের মুনাফা কমিয়া অবশেষে কেহই কোন মুনাফা লাভ করিতে পারিবে না, কাহারও উদ্বৃত্ত-আয় হইবে না—কেবল পরিচালনার পারিশ্রমিক লাভ হইবে। মুনাফা কমিয়া শূন্যতে নামিয়া আসিবে।

দীর্ঘকালে মুনাফা শূন্যে পৌছিবে

বাস্তব জগত কিন্তু গতিবিহীন নহে, স্থির ও অচঞ্চল সমাজ বাস্তবে দেখিতে পাওয়া যায় না। জনসংখ্যা, রুচি ও ফ্যাশান, মূলধনী-দ্রব্য ও উৎপাদনপদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং এই গতিশীলতা (Dynamicity) চিরকালই থাকিবে বলিয়া মনে করা চলে। সুতরাং মুনাফা কখনই একেবারে শূন্যে পরিণত হইবার আশঙ্কা নাই। আর মার্শালীয় সংজ্ঞায় পরিচালনার পারিশ্রমিক হইল স্বাভাবিক মুনাফা; যাহা না দিলে সমাজে উৎপাদন ও ব্যবসা চলিতে পারে না।

কিন্তু অর্থ নৈতিক জগতের গতিশীলতার ফলে তাহা সম্ভব নহে

মুনাফা-সমতা (Equality of Profit) :

বিভিন্ন শিল্পে মুনাফার তারতম্য দেখা যায়। কোন শিল্পে মুনাফা খুবই বেশী কারণ সেখানে অনিশ্চয়তার পরিমাণ বেশী; কোন শিল্পে মুনাফা কম কারণ সেখানে অনিশ্চয়তা-ও কম। বেশী ঝুঁকিবহুল শিল্পে বেশী মুনাফা না থাকিলে উদ্যোক্তাগণ অগ্রসর হইবেন না তাই সমাজকে মুনাফা দিতে রাজী হইতে হইবে; কিন্তু কম ঝুঁকিবহুল ব্যবসা-তে কম মুনাফা পাইলেও উদ্যোক্তাগণ উৎপাদন বা ব্যবসা করিতে থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে মুনাফার সমতা থাকে না।

বিভিন্ন শিল্প ও একই শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন ফার্মে মুনাফার পার্থক্য

একই শিল্পের মধ্যেও স্বল্পকালে মুনাফাব সমতা না থাকিতে পারে, কারণ উদ্যোক্তাদের যোগ্যতা-শক্তির পার্থক্য আছে। দীর্ঘকালে অবশ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তার যোগান-বৃদ্ধির ফলে সকল ফার্মই সমানে মুনাফা লাভ করিতে পারে, মুনাফার তারতম্য নাও থাকিতে পারে (যদি বাজারে কোনরূপ অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে)।

যদি গতি-বিহীন সমাজ (Static Society) ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সেই সমাজে সকল শিল্প ও সকল ফার্মের মুনাফার হার সমানই হইবে। মুনাফার হারে পার্থক্য থাকিলে কম-মুনাফাজনক শিল্প হইতে উদ্যোক্তা চলিযা যাইবে, বেশী মুনাফাজনক শিল্পে উৎপাদন সুরু করিবে এবং ফলে অবশেষে উভয় ক্ষেত্রেই মুনাফাব হার সমান হইবে। এইরূপে সকল ক্ষেত্রেই মুনাফা সমান হইয়া পড়িবে।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে বাস্তব জগত পরিবর্তনবিহীন নহে, বরং দ্রুত পরিবর্তনশীল। অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের সদাচঞ্চল ঘাত প্রতিঘাতে বিভিন্ন শিল্পের ও ফার্মের দ্রব্যের দাম ও উৎপাদন-ব্যয় সর্বদাই পরিবর্তিত হইতেছে, মুনাফারও তারতম্য হইতেছে। সদা পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ সমাজে যে অসামঞ্জস্য (Maladjustment) আনে, তাহারই ফলে কখনই মুনাফার সমতা আসা সম্ভব নহে।

মুনাফার হিসাব (Calculation of Profit) :

একক-মালিকানা ব্যবসাতে বাৎসরিক মুনাফার হিসাব করা হয় সেই বৎসরে ফার্মের মোট রেভিনিউ হইতে মোট ব্যয় বিয়োগ করিয়া। কিন্তু এই ভাবে

ফার্মের মোট বা সামগ্রিক মুনাফা (Gross profit) পাওয়া যাইতে পারে। ইহার মধ্যে উদ্যোক্তার নিজের জমি, পুঁজি বা শ্রম নিজের ফার্মে নিয়োগ না করিয়া অন্য ফার্মের নিকট বিক্রয় করিলে বা অন্য ক্ষেত্রে নিয়োগ করিলে যে অর্থ পাইতে পারিত, তাহা সামগ্রিক মুনাফা হইতে বাদ দিয়া ফার্মের নীট মুনাফা হিসাব করা যায়। মার্শাল নীট মুনাফার মধ্যে উদ্যোক্তার নিজস্ব পুঁজি হইতে প্রাপ্ত সুদকেও যোগ করিতেন। কিন্তু আধুনিক লেখকগণ পরিচালনার পারিশ্রমিক বা উদ্যোক্তার নিজস্ব উপাদানসমূহ হইতে প্রাপ্ত আয়-কে বাদ দিয়া নীট মুনাফা হিসাব করিয়া থাকেন।

একক-মালিকানা ব্যবসাতে মুনাফার হিসাব

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের মতানুযায়ী মুনাফা হিসাব করার নীতি প্রধানতঃ যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানের মুনাফা-হিসাবের পদ্ধতি হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানে উদ্যোক্তাগণ অর্থাৎ শেযার ক্রেতাগণ নিজেরা দৈনন্দিন পরিচালনার কার্য্যে সাধারণতঃ যোগদান করেন না, বেতনভুক্ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হাতে ছাড়িয়া দেন। নিজেদের উপাদানসমূহ উৎপাদনে ব্যবহৃত হইলে তাহাদের জন্য তাঁহারা পৃথক দাম পাইযা থাকেন; উহা ফার্মের ব্যয়ের মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে। ডিবেঞ্চার-ক্রেতাদের সকল সুদ, সকল কর্মচারীর মাহিনা, শ্রমিকের মজুরী, জমি ও বাড়ীর মালিককে খাজনা, কাঁচামালের দাম ইত্যাদি সকল কিছু দিয়া ফার্মের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই মুনাফা বলা হয়। ইহাই নীট বা বিশুদ্ধ (Net or Pure) মুনাফা। এই মুনাফার সবটুকুই যে সর্বদা সকল শেয়ার ক্রেতাদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টিত হয়, তাহা নহে। রিজার্ভ তহবিলে মুনাফার কিছু অংশ মজুত করিয়া রাখা যাইতে পারে বা কিছু অংশ তৎক্ষণাৎ পুনরুৎপাদনে বর্ধিত পুঁজিরূপে নিযুক্ত করা যাইতে পারে (Plough back)। কিন্তু তাহা করিলেও উহাকে বাৎসরিক নীট মুনাফার মধ্যে গণ্য করা উচিত।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে মুনাফার হিসাব

অনেকের মতে, (যেমন অধ্যাপক বোল্ডিং) বৎসরের মধ্যে মূলধনী দ্রব্যের মূল্যে যে পরিবর্তন হয়, তাহাও ফার্মের মুনাফা হিসাব করার সময়ে গণ্য করা দরকার। বৎসরের প্রারম্ভে যেন নিজের সকল সম্পত্তি (assets) ফার্মটি ক্রয় করিয়া লইল, উহা তাহার দেনা বা ব্যয় হিসাবে ধরিতে হইবে। বৎসরের শেষে,

যেন ফার্মটি (তখনকার বাজার দামে) সকল সম্পত্তি (assets) নিজের নিকট হয় বিক্রয় করিল, উহার দাম তাহার পাওনার মধ্যে ধরিতে হইবে। তাহা হইলেই

মূলধনী দ্রব্যের মূল্য-পরিবর্তন ও মুনাফার হিসাব

বৎসরের মধ্যে মূলধনী দ্রব্যের মূল্যে পরিবর্তন হইলে তাহা মুনাফার হিসাবের মধ্যে গণনা হওয়া সম্ভবপর। যদি বৎসরের মধ্যে মূলধনী দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায় তাহা হইলে (ক্রয়-মূল্যের তুলনায় বিক্রয়-মূল্য কম—এইরূপ হিসাব হওয়ার দরুণ) ফার্মটির নীট মুনাফা কমিয়া যাইবে। বৎসরের মধ্যে মূলধনী দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইলে (ক্রয়মূল্যের তুলনায় বিক্রয়-মূল্য বেশী—এইরূপ হিসাব হওয়ার দরুণ) ফার্মের নীট মুনাফা বাড়িয়া যাইবে। ফার্ম কর্তৃক ক্রীত সকল উপাদানের দামের সহিত নিজের সকল সম্পত্তির (assets) ক্রয়-মূল্য যোগ করিয়া মোট ব্যয় হিসাব করা উচিত এবং ফার্মের দ্রব্য বিক্রয়ের সহিত নিজের সকল সম্পত্তির (assets) বিক্রয়-মূল্য যোগ করিয়া মোট পাওনা হিসাব করা দরকার। এইরূপে হিসাব করিয়া মোট পাওনা হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে ফার্মের মুনাফা বাহির করা সম্ভব।

অনুশীলনী

1. What are the Constituent elements of Profit ?
(B. A. '44, '46, '48)

2. How does Profit differ from other kinds of income ?

3. Distinguish between Normal Profits and Actual Profits. Show how expected Profits influence Production.
(B. A. '52)

4. Define Profits. How would you determine Profits in (a) one man business and (b) Joint stock company ?
(B. A. '48 ; B.com. '53)

5. Define Normal Profits and explain why it is included in-the Normal Cost of Production. (B. A. '54)

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অর্থ—ইহার প্রকৃতি ও কার্য

অর্থের উৎপত্তি ও ব্যবহারিক উপকারিতা (Origin and usefulness of Money).

প্রত্যেক দেশে সমাজ বিবর্তনের কোন এক স্তরে অর্থের আবিষ্কার ও চলন সুরু হইয়াছে। এমন এক সময় ছিল যখন ব্যক্তির নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করিত, দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে সে স্বাবলম্বী ছিল। সেই অবস্থায় বিনিময়ের প্রয়োজন হইত না এবং বিনিময়ের কোন মাধ্যম ব্যবহারের প্রয়োজনও ছিল না। ক্রমে সমাজে শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হইল, স্বাবলম্বিতা লুপ্ত হইয়া গেল, অন্যের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত নিজের উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি হইল, বহু প্রকার স্থূল ও অসুবিধাজনক দ্রব্যের সাহায্যে প্রথম যুগের বিনিময় চলিত, বর্তমানে উন্নত ধরণের মুদ্রা, কাগজীনোট, চেক, হুণ্ডি, বিনিময়-বিল বা বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে।

বার্টার কাহাকে বলে?

যখন হইতে গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ সুরু হইয়াছে তখন হইতেই এক গোষ্ঠীর বা এক ব্যক্তির দ্রব্যের সহিত অন্য গোষ্ঠী বা অন্য ব্যক্তির দ্রব্য বিনিময়ের সূচনা হইয়াছে। যখন পণ্যের সহিত পণ্য বিনিময় হইতেছে, বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থ যেখানে উপস্থিত নাই, সেই প্রকার দ্রব্য বিনিময়কে বলা হয় অর্থবিহীন পণ্যবিনিময় বা বার্টার (Barter)। এই বার্টার প্রথায় পণ্যের সহিত পণ্যের সরাসরি বিনিময় হইয়া থাকে।

কিন্তু এই প্রথার বহুপ্রকার অসুবিধা আছে। বিনিময়কারী ব্যক্তিদের অভাবগুলি পারস্পরিক ভাবে পরিপূরক হওয়া চাই। বস্ত্র উৎপাদনকারী তাঁতী বস্ত্রের বিনিময়ে যদি চাল পাইতে চায় তবে তাহাকে কেবলমাত্র একজন চাষীর নিকট গেলেই চলিবে না, এমন এক চাষী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহার ঠিক সেই পরিমাণ বিনিময়যোগ্য চাল আছে, এবং তাঁতী যে পরিমাণ ও যে প্রকারের বস্ত্র বিনিময় করিতে ইচ্ছুক চাষীরও ঠিক সেই পরিমাণ

বার্টারপ্রথার অসুবিধা

ও সেই প্রকার বস্ত্রের দরকার। এরূপ অবস্থায় বিনিময়ের গতিধারা নিয়মিত ভাবে চলিতে পারে না, যদি পারস্পরিক ভাবে পরিপূরক অভাবযুক্ত ব্যক্তি জুটিয়া যায় তবেই ইহা সম্ভব, সেই বিনিময়ের মধ্যে আকস্মিকতা আসিয়া যায়। দ্বিতীয় অসুবিধা হইল, পণ্যবিনিময় প্রথায় একটি দ্রব্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া বিক্রয় বা ক্রয় করার সুবিধা নাই। কেহ যদি জামার বিনিময়ে এক সের চাউল পাইতে চাহে, তবে কি সে জামাটিকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া একসের চাল পাইবে? এইরূপ বৃহৎ দ্রব্যের সহিত ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলি বিনিময়ের সুযোগ এই প্রথায় নাই। তৃতীয়তঃ, বার্টার প্রথায় প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত প্রত্যেকটি দ্রব্যের এইরূপ অসংখ্য বিনিময় মূল্যের হার উদ্ভূত হয়। সমাজে এইরূপ অসংখ্য বিনিময়ের অনুপাত থাকিলে বিনিময় কার্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। চতুর্থতঃ, অর্থ না থাকিলে সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থাকিতে পারে না, কারণ দ্রব্য সামগ্রী বেশীদিন সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে না। সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে সুবিধা অনুযায়ী ও ইচ্ছানুযায়ী বিনিয়োগ করাও চলে না।

পণ্য-বিনিময় প্রথার এই সকল অসুবিধার দরুণ বিনিময়ের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমের ব্যবহার সুরু হইয়াছে। অর্থ ব্যবহারের প্রথম যুগে যে জিনিষ সকলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সকলের নিকটই প্রয়োজনীয়, সকলেই যাহা পাইতে চাহে, যাহা বহন করা সুবিধাজনক এইরূপ কোন দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইতে সুরু করিয়াছিল। গো-ধন, কড়ি, হাতীর দাঁত, কাচ প্রভৃতি দ্রব্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ও বাহিরে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইলে ক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বিনিময়ের উপযোগী মাধ্যমরূপে ক্রমে প্রচলিত হইয়াছে। বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ভালভাবে কাজ করিতে হইলে সেই দ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকা দরকার।

সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিময়ের মাধ্যম হইবার গুণসমূহ

(১) **দ্রব্যটিকে বহন করার সুবিধা থাকা চাই।** বিনিময়ের মাধ্যমটি এমন হওয়া চাই যাহাতে ক্ষুদ্র আয়তন ও কম ওজনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মূল্য নিহিত থাকিতে পারে। তাহা হইলেই ইহা স্থানান্তরে বহন করা সুবিধাজনক হইতে পারে।

(২) বিনিময়ের মাধ্যমটি **দীর্ঘস্থায়ী** হওয়া চাই। কারণ, মূল্য ও ক্রয়শক্তি সঞ্চিত অবস্থায় অর্থের রূপে জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য সঞ্চয়

করিয়া রাখা হয়। ইহা অনবরত হস্তান্তরিত হইবে তাই সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় সেইরূপ হওয়া দরকার।

(৩) বস্তুটি **বিভাগ যোগ্য** হইবে যাহাতে উহাকে সমানভাবে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং উহাকে গলাইয়া উহার উপর শীলমোহর বা স্বাক্ষর মুদ্রণ করা সম্ভব।

(৪) বিনিময়ের মাধ্যমগুলি আকারে ও প্রকারে একই রকম হওয়া দরকার, **একজাতীয়তা** না থাকিলে লোকে উহা গ্রহণ করিতে চাহিবে না, উহার আদান প্রদানে বিঘ্ন ও বিলম্ব দেখা দিবে।

(৫) মাধ্যম-বস্তুটি এরূপ হওয়া দরকার যে সকলেই উহাকে **সহজে চিনিতে** পারে, বিনিময়ের কার্য যাহাতে ব্যাহত না হয়।

(৬) উক্ত বস্তুটির নিজস্ব মূল্য সাধারণ ভাবে মোটামুটি স্থির থাকা প্রয়োজন নতুবা বিনিময়ের অসুবিধা সৃষ্ট হইবে। যে মানদণ্ডের সাহায্যে অপরাপর পণ্য-সমূহের মূল্য পরিমাপ করা হইবে তাহার **নিজস্ব মূল্য সঠিক ও স্থির থাকা** প্রয়োজন। মূল্য পরিমাপের মাপকাঠি বা মানদণ্ড হইতে হইলে মাধ্যম-বস্তুটির নিজ-মূল্যের ঘন ঘন পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়।

আধুনিককালে দেখা গিয়াছে ধাতু দ্বারা নির্মিত মুদ্রার পরিবর্তে কাগজী নোটের প্রচলন অনেক সুবিধাজনক। বিনিময়ের মাধ্যমবস্তু হইবার সকল প্রকার গুণাবলী কাগজের আছে। কম মূল্যের বিনিময়ের কার্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য অল্পমূল্যের ধাতু নির্মিত মুদ্রাও রহিয়াছে, কারণ অল্পমূল্যের বিনিময়ের পরিমাণ খুবই বেশী, কাগজের হইলে অতি শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বিনিময়ের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করিবে।

অর্থের কার্য (Functions of Money)

বার্টার বা পণ্যবিনিময় প্রথার সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া পণ্য-বিনিময়ের গতিধারাকে অব্যাহত রাখা ও সহজ করা অর্থের প্রধান কাজ। বার্টার প্রথায় পারস্পরিক অভাব পরিপূরকতা না থাকিলে বিনিময় হইতে পারে না, অর্থের প্রচলন ঐরূপ আকস্মিকতা হইতে বিনিময় প্রথাকে মুক্তি দেয়। পণ্য বিনিময়ের ধারার মধ্যে এইরূপে অর্থ এক পণ্যের সহিত অপর পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করে।

মাধ্যম

দ্বিতীয়তঃ, অর্থ হইল মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড বা মূল্যের মাপ-কাঠি। যেরূপ, স্থানের পরিমাপের জন্য ফুট, গজ, মাইল; কালের পরিমাপের জন্য সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি; সেইরূপ সমাজে উৎপন্ন বিনিময়যোগ্য বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের পরিমাপের জন্য কোন সাধারণ মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন। অর্থের নামেই সকল দ্রব্যের মূল্যকে পরিমাপ করা হয়।

মানদণ্ড

তৃতীয়তঃ, সমাজে দেনাপাওনার হিসাব রাখার ব্যাপারে অর্থ মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে। সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সকল সময়ে নগদ অর্থের লেনদেন না-ও হইতে পারে বরং আধুনিককালে ক্রমশই ঋণের সাহায্যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলিতেছে। ঋণের পরিমাণ ও মূল্য সঠিক ভাবে স্থির রাখা অর্থের অন্যতম কার্য। যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য কোন ব্যক্তি বর্তমানে ঋণ গ্রহণ বা প্রদান করিতেছে ভবিষ্যতে সে সেই পরিমাণ মূল্যই ফেরৎ পাইবে বা ফেরৎ দিবে। অর্থই ঋণ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের ভিত্তি হওয়ার ফলে ঋণ লেনদেনের প্রচুর সুবিধা হইয়াছে। ঋণের বাজার সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থের ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ চলিতেছে; উৎপাদন ও যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকর্মের সুবিধা হইয়াছে। ভবিষ্যতের বাজার ও বর্তমানের বাজারের মধ্যে, দূরবর্তী স্থানের বাজার সমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। অর্থই হইল এই ঋণ লেনদেনের মাপকাঠি।

ঋণের মাপকাঠি

চতুর্থতঃ, মূল্যকে বিশেষ রূপে সঞ্চয় করিয়া রাখা অথবা মূল্যের সঞ্চিত রূপ হিসাবে কাজ করা অর্থের কার্য। ইহা হইল জমাট বাঁধা ক্রয়শক্তি; ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে ইহাকে জমাইয়া রাখিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি সে অপর কাহাকেও দিতে পারে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই ক্রয়শক্তির উপর অধিকার ছাড়িয়াও দিতে পারে। অন্য কোন আকৃতিতে এই সম্পত্তি বা ক্রয়শক্তি পরিবর্তিত করা যায়, রূপান্তরিত করা চলে, তাই অর্থকে বলা হয় তরল সম্পত্তি (Liquid asset)। সমাজে উৎপন্ন পণ্যের মূল্যসমূহ যেন অর্থের আকৃতিতে লোকের হাতে ক্রয় শক্তির আকারে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে—তাই অর্থ হইল মূল্যেরই সঞ্চিত রূপ।

মূল্যের সঞ্চিত রূপ

অর্থের তাৎপর্য (Significance of Money)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে অর্থসংক্রান্ত ঘটনাসমূহ সমাজের প্রকৃত ঘটনার রূপ ও গতি-প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; বিনিময় কার্যের প্রকৃত

গতিবিধি অর্থরূপ পর্দার অন্তরালে ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা তাই উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগ-কার্যের উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন, যোগান ও চাহিদার "প্রাকৃতিক" নিয়মসমূহ অর্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না, অর্থ এই সকল নিয়মের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ বা বিকৃত করিতে পারে না; অর্থনৈতিক আচরণ (economic behaviour) নির্ধারণকারী এই সকল মৌলিক নিয়মসমূহ আর্থিক বিষয়ের দ্বারা বিচলিত হয় না।

ক্লাসিকাল ধারণা

এইরূপ ধারণা থাকার মূল কারণ হইল তাঁহারা অর্থের নিজস্ব মূল্য স্বীকার করিতেন না। বলা চলে, তাঁহারা কার্যতঃ অর্থের মূল্যকে স্থির বা অপরিবর্তনশীল ধরিয়া লইতেন। অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা, সংক্ষেপে সমাজের সামগ্রিক দাম-স্তর স্থির ধরিয়া লইলে আর্থিক বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন থাকে না, অর্থের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিয়া পৃথকভাবে বিশেষ দ্রব্যের দাম বা ফার্ম ও শিল্পের ভারসাম্যাবস্থা বিশ্লেষণ সম্ভবপর।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থের মূল্য কখনই স্থির থাকে না, দাম-স্তর সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল ইহা ধরিয়া লইয়া আধুনিক কালের আর্থিক তত্ত্বসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থের মূল্য বা দাম-স্তরের ভারসাম্য যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ আর্থিক ভারসাম্যের (Monetary equilibrium) সর্ত-নিরূপণ বর্তমান যুগের আলোচনায় অন্যতম অংশ গ্রহণ করে। অর্থের মূল্যকে অস্থির ও চঞ্চল গণ্য করিয়াও তাহাকে স্থির ও অচঞ্চল রাখার প্রয়াস কিছুকাল পূর্বেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানে আর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য ছিল।

আধুনিক ধারণা

আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে গতিশীলতা আনিয়া দেওয়া ব্যাপক অর্থ-ব্যবহারের প্রধান ফল। বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু বন্ধন অর্থের অন্যতম কার্য এবং ইহারই ফলে সমাজের এই গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। ভবিষ্যতের দামস্তর বা অর্থের মূল্য সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান কালের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে। অর্থের ক্রয় ক্ষমতায় পরিবর্তন সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন, মোট কর্মনিয়োগ, মোট আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে পরিবর্তিত করিয়া সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সূচিত করিতে পারে। সমাজের বহু সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করে এই অর্থ

অর্থ ও সমাজ-দেহ

এবং আর্থিক নীতি ও কৌশল (Monetary policy) অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলের (Economic policy) অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিক ধন-বিজ্ঞানীগণ অর্থের মূল্য এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহেন যাহাতে সমাজে উৎপাদন, পূর্ণ কর্মসংস্থান বা অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

কিন্তু আর্থিক তত্ত্বালোচনা যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন; ইহা প্রধানতঃ স্বল্পকালীন বিশ্লেষণ, কারণ স্বল্পকালেই আর্থিক বিষয়সমূহের প্রভাব তীব্রভাবে অনুভব করা যায়, দাম-স্তর এবং আয়-স্তর বিশেষভাবে উঠানামা করে। সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (Economic growth) দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে আর্থিক তত্ত্বসমূহের গুরুত্ব অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অনেক কম; উহার আলোচনায় যন্ত্র-কৌশলগত (Technological) প্রতিষ্ঠানগত (Institutional) এবং কাঠামোগত (Structural) বিষয়ের পরিবর্তন প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও অর্থের ভূমিকা

ইহাও মনে রাখা দরকার যে আর্থিক পদ্ধতিসমূহ অন্যান্য অনার্থিক (non-monetary) পদ্ধতিসমূহের সাহায্য লাভ ব্যতীত কোন সময়েই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। শুধু আর্থিক ও কর-কৌশল (Monetary and fiscal policies) সমাজের সকল মৌলিক সমস্যার মূলোদ্‌ঘাটন ও সমাধান করিতে পারে না। রবার্টসন বলিয়াছেন, যে "সমাজের প্রকৃত অর্থনৈতিক আপদ (economic evils)—অপ্রচুর উৎপাদন এবং অসম বণ্টন, নিছক আর্থিক মলমের প্রয়োগে দূর হইবার নয়"। সুতরাং আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ যতই শুধু আর্থিক সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করুন না কেন, সমাজের মৌলিক ও প্রকৃত শক্তিসমূহের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে অর্থের বিশ্লেষণকে প্রধান স্থান দেওয়া চলে না।

অর্থের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Money) :—

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে যে সকল ধরণের অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, অর্থকে হিসাবী-অর্থ (Money of account) এবং প্রকৃত অর্থ (Actual money) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রকৃত অর্থ হইল, যে মুদ্রার বা কাগজী নোটের সাহায্যে সমাজে বিনিময়ের কাজকর্ম চলে, যেমন পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স অথবা আমাদের দেশে ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত টাকা বা কাগজী নোটের টাকা। হিসাবী অর্থ হইল যে নামে এক দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও বিনিময়ের লেনদেনের হিসাব রাখা হয়। সব দেশেই এক একটী নাম থাকে যাহার দ্বারা সমস্ত হিসাব পরিরক্ষিত হয়, যেমন বৃটেনে ষ্টার্লিং,

হিসাবী অর্থ ও বাস্তব অর্থ

আমেরিকায় ডলার, ফ্রান্সে ফ্রাঁঙ্ক, রাশিয়ার রুবল ইত্যাদি। হিসাবী-অর্থ হইল সেই দেশের অর্থের নাম বা উপাধি মাত্র, প্রকৃত অর্থ হইল যে বস্তুটি বিনিময়ের মাধ্যমরূপে হস্তান্তরিত হয়। নাম বা উপাধি ঠিক ও স্থির থাকিতে পারে, আসল অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। যেমন আমাদের দেশে টাকা এই নাম হিসাবী-অর্থরূপে বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, ১৯৪১ সালের পূর্বে প্রত্যেক প্রকৃত মুদ্রাতে ১৬০ গ্রেন রৌপ্য থাকিত কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত মুদ্রা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, ইহা নিকেলে প্রস্তুত বা কাগজী নোট।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত অর্থকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, ধাতব অর্থ (Commodity money) বা প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ (Representative money)। ধাতব অর্থ হইল যাহা ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত এবং যাহার উপরে লিখিত-মূল্য (Face-value) অন্তর্নিহিত ধাতুর (Intrinsic value) মূল্যের সমান। এই ধাতব অর্থ যেরূপ বিনিময়ের মাধ্যম তেমনই মূল্যের সঞ্চয়। কিন্তু প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হইলেও মূল্যের সঞ্চয় নহে। এই প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে যেমন (কাগজী নোট) আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বা ভাগ করা যাইতে পারে, রূপান্তর-যোগ্য (Convertible) বা রূপান্তরের অযোগ্য (Inconvertible)। যদি সেই কাগজী নোট বা প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে ধাতব অর্থে পরিবর্তিত করা যায় অর্থাৎ যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষ কাগজী নোটের পরিবর্তে দেশের জনসাধারণকে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য থাকেন, তবে সেই অর্থকে রূপান্তর-যোগ্য প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে, যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থের পরিবর্তে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য না থাকেন, তবে তাহাকে অপরিবর্তনীয় প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বলা হইবে।

ধাতব অর্থ ও প্রতি-নিধিত্বমূলক অর্থ

তৃতীয়তঃ, অর্থকে আইন-চালু অর্থ (Legal tender) এবং ঐচ্ছিক অর্থে (Optional money) বিভক্ত করা যাইতে পারে। আইন-চালু অর্থ হইল যাহার সাহায্যে যে কোনরূপ বিনিময় করা সম্ভব এবং সমাজের সকল ব্যক্তি ওই অর্থ দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে বাধ্য। আইন যাহাকে অর্থ বলিয়া স্বীকার করে এবং জনসাধারণকে অর্থ হিসাবে মানিয়া লইতে চাপ দেয়, যাহা কেহ অর্থ বলিয়া স্বীকার না করিলে তাহা আইন-বিরোধী কাজ হয়, তাহার নাম আইন-চালু মুদ্রা। ইহাকে প্রচলিত প্রধান অর্থও (Standard Money) বলা হয়। ইহা ব্যতীত সমাজে আর একরূপ অর্থের প্রচলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইল ঐচ্ছিক অর্থ। এই অর্থকে আমানতী-অর্থও বলা যাইতে পারে। বর্তমান সমাজে বেশীর ভাগ লেনদেন নগদ

আইন চালু অর্থ ও ঐচ্ছিক অর্থ

অর্থে হয় না, অন্ততঃ বেশীর ভাগ বৃহৎ লেন দেন প্রায়ই চেকের সাহায্যে হইয়া থাকে। লোকে ব্যাঙ্কে যে অর্থ আমানত রাখে তাহার ভিত্তিতে চেক কাটিয়া সে দেনা মিটায়। এইরূপে যে বিনিময় কার্য চলে তাহার মাধ্যম হইল চেক। আমানতকারীর উপর লোকের আস্থা আছে—এই জন্যই স্ব-ইচ্ছায় পাওনাদার চেক গ্রহণ করে, আইন তাহাকে জোর করিয়া চেক-গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না। তাই ইহার নাম ঐচ্ছিক অর্থ। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণের মধ্যে পারস্পারিক চেক আদান প্রদান হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের খাতাতেই হিসাব রক্ষিত হয়, সকল ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা কাগজে পত্রেই শেষ হইয়া যায়, ইহার দরুণ নগদ অর্থ প্রচলনের কোনরূপ প্রয়োজন হয় না। চেক যেহেতু বিনিময়ের মাধ্যম, সুতরাং ইহাও বিনিময় ক্ষেত্রে অর্থের ন্যায় কাজ করে।

গ্রেসামের নিয়মঃ ইংলণ্ডে টিউডার রাজবংশের স্বেচ্ছাচারী রাজবৃন্দ নিকৃষ্ট জাতীয় মুদ্রা বাজারে প্রচলন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথ রাণী হইয়া ওই নিকৃষ্ট ধরণের মুদ্রাগুলিকে অসম্মানজনক বিবেচনা করিয়া উৎকৃষ্ট ধরণের মুদ্রা প্রচলিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি যতই উৎকৃষ্ট মুদ্রা বাজারে ছড়ান না কেন, নিকৃষ্ট মুদ্রাগুলিই প্রচলিত হইতে লাগিল, উৎকৃষ্ট মুদ্রাসকল বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। রাণী বার বার চেষ্টা করিয়াও উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বাজারে প্রচলিত করিতে পারিলেন না, অবশেষে তাঁহার আর্থিক উপদেষ্টা টমাস গ্রেসামকে ইহার কারণ দর্শাইতে বলিলেন। গ্রেসাম এই ঘটনার যে কারণগুলি দর্শাইলেন, তাহাই পরে গ্রেসামের নিয়ম নামে পরিচিত হইল।

উৎপত্তি

গ্রেসামের নিয়ম হইল, কোন সমাজে যদি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জাতীয় অর্থ পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তবে নিকৃষ্ট অর্থ উৎকৃষ্ট অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে অপসারিত করিয়া দেয়। যদি গুণ বা মূল্যের দিক হইতে পৃথক একটি উৎকৃষ্ট ও একটি নিকৃষ্ট প্রকার অর্থ একই সঙ্গে আইন-চালু অর্থ হিসাবে বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে কিছুদিন পরে দেখা যাইবে যে উৎকৃষ্ট প্রকার অর্থ আর প্রচলন-ধারার মধ্যে নাই, নিকৃষ্ট প্রকার অর্থ-ই সমাজের সকলের মধ্যে হস্তান্তরিত হইতেছে। "যখন উভয়েই সীমাহীন ভাবে আইন-চালু, তখন নিকৃষ্ট-প্রকার অর্থ উৎকৃষ্ট-প্রকার অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে অপসারিত করিবে," সংক্ষেপে ইহাই হইল গ্রেসামের নিয়ম।

নিয়ম

এই নিয়মে অর্থের উৎকর্ষ বা নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিকৃষ্ট

অর্থ বলিতে অচল মুদ্রা বা অর্থ বুঝায় না। গুণ বা ধাতুগত মূল্যের দিক হইতে যাহার মূল্য অপরের তুলনায় কম, তাহাকেই তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে। যেমন যখন দেশে কেবলমাত্র স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত মুদ্রার প্রচলন থাকে তখন পুরাতন, ঘষা, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি তুলনামূলকভাবে নতুন, পরিমাণে বেশী ধাতুযুক্ত, এখন পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই সেরূপ উৎকৃষ্ট অর্থের তুলনায় নিকৃষ্ট। যখন ধাতব মুদ্রা এবং কাগজী নোট পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তখন যেহেতু কাগজী অর্থের বস্তুগত মূল্য কম, সেই হেতু তাহারা নিকৃষ্ট। যখন সমাজের আর্থিক কাঠামো দ্বি-ধাতুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন দুইটি ধাতু-মুদ্রার বাজার দর এবং সরকারী-দরের তারতম্য অনুযায়ী যাহার মূল্য কম তাহা নিকৃষ্ট।

কারণসমূহ

কি ভাবে এই নিকৃষ্ট-প্রকার অর্থ উৎকৃষ্ট প্রকার-অর্থকে বাজার হইতে অপসারিত করে? কি কারণে উৎকৃষ্ট অর্থ দেশের প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়? তিনটি কারণের সাহায্যে এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, স্বর্ণ বা রৌপ্যের ধাতু হিসাবে মুদ্রাতে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত আরও অনেক ধরণের অনার্থিক (non-monetary) ব্যবহার আছে। উৎকৃষ্ট ধরণের মুদ্রাগুলির ভিতর ধাতুর পরিমাণ বেশী থাকায় লোকে সেগুলি সর্বাপেক্ষা পূর্বে গলাইয়া ফেলিবে। দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী রপ্তানীকারীগণ মুদ্রার ভিতর ধাতুর পরিমাণ অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিবে; সুতরাং, যে সকল মুদ্রার মধ্যে ধাতুর পরিমাণ বেশী সেইগুলি, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অর্থগুলি দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ, ইহা লোকের স্বভাব যে তাহারা উৎকৃষ্ট প্রকার অর্থ যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের নিকট রাখিয়া দিবে, বিনিময় ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট প্রকার অর্থই প্রথমে চালাইবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং, উৎকৃষ্ট অর্থ লোকের জিম্মায় থাকিবে, প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, নিকৃষ্ট ধরণের অর্থ প্রচলিত হইতে থাকিবে।

এই নিয়ম যাহাতে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আধুনিক কালের আর্থিক কর্তৃপক্ষ সর্বদাই পুরাতন, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রা বা নোটকে বাজার হইতে অপসারিত করিয়া নতুন উৎকৃষ্ট ধরণের অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে ছাড়িয়া দেন।

সীমাবদ্ধতা

বাস্তবক্ষেত্রে দুইটি বিশেষ অবস্থায় এই নিয়ম কার্যকরী হইবে না। যদি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় প্রকার অর্থের মোট পরিমাণ, সমাজের বিনিময় কার্যে মাধ্যমের মোট প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় তবে এ নিয়ম কার্যকরী হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি নিকৃষ্ট অর্থ এতই নিকৃষ্ট হয় যে লোকে ইহা মোটেই গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না তবে বাধ্য হইয়াই উৎকৃষ্ট অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে চলিতে থাকিবে।

অনুশীলনী

1. What is Money? Discuss its chief functions. (B. A. '40)
2. Give an account of the different forms of currency. (B. com. '49)
3. Money has been classified in your text-book as follows:—
   (*i*) Standard Money
   (*ii*) Representative Money
   (*iii*) Credit Money :—(*a*) Token Money, (*b*) Government Notes, (*c*) Bank Notes.

   Explain and illustrate this classification. (B. A. '52)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ঋণব্যবস্থা ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

ঋণপ্রথা ও ঋণপত্র (Credit system and Credit Instrument) :

কোন দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি অর্থের লেনদেন হয় তবে তাহাকে নগদ লেনদেন (Cash Transaction) বলা হয়। যদি ক্রেতা দ্রব্য ক্রয়ের সময়েই দ্রব্যের মূল্য হিসাবে নগদ অর্থ দিতে রাজী না হয়, কিছুদিন পরে দিবে এইরূপ আশ্বাস দেয় এবং তাহার এই অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখিয়া বিক্রেতা যদি দ্রব্য বিক্রয় করে তবে তাহাকে ঋণভিত্তিক লেনদেন (Credit Transaction) বলা যাইতে পারে। এই ঋণভিত্তিক লেনদেনের মূল হইল আস্থা বা বিশ্বাস। ভবিষ্যতে ঋণ গ্রহীতার নগদ অর্থ দিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর ঋণ দাতার আস্থা ও বিশ্বাস এই প্রকার ঋণভিত্তিক লেনদেনের মূল কারণ।

ঋণপ্রথা

যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে সে ভবিষ্যতে নগদ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি সহ চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দেয়, এই সকল বিভিন্ন প্রকার চুক্তিপত্রকে ঋণ-পত্র (credit instruments) বলা হইয়া থাকে। সমাজে বিভিন্ন প্রকার ঋণ-পত্র প্রচলিত আছে। যেমন—কাগজী নোট, চেক, হুণ্ডি বা বিনিময়-বিল, ব্যাঁঙ্কের ড্রাফট্‌ ইত্যাদি। বর্তমানের বিপুল ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন ও জটিল সম্পর্ক জালে ঋণের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য।

ঋণপত্র

কি উদ্দেশ্যে ও কেমনভাবে এই ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে সেই অনুযায়ী ইহাকে ভোগোদ্দেশ্যী-ঋণ এবং উৎপাদনী-ঋণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যক্তির ভোগের জিনিষপত্র ক্রয়ের দরুণ যখন ঋণ গ্রহণ করা হয় তখন তাহা ভোগোদ্দেশ্যী-ঋণ এবং নতুন বা বর্ধিত উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত হইলে তাহাকে উৎপাদনী-ঋণ বলা চলে।

বহুপ্রকার ঋণপত্র

বহু প্রকারের ঋণপত্র বর্তমান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। (ক) প্রমিসরী নোট, (খ) চেক, (গ) বিনিময়-বিল, (ঘ) ব্যাঙ্কের ড্রাফ্‌ট্ প্রভৃতি। কোন নির্দিষ্ট তারিখে বা চাহিদা অনুযায়ী নগদ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ থাকিলে সেইরূপ ঋণপত্রকে প্রমিসরী নোট বলা হয়। পূর্বে কোন ব্যক্তি, কোন ব্যাঙ্ক বা সরকার এইরূপ প্রমিসরী নোট চালু করিতে পারিত। প্রমিসরী নোটের প্রচলনকারীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস থাকিলে এই সকল নোট সমূহ এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হইতে থাকে এবং ইহার সহায়তায় অর্থনৈতিক লেনদেন ঘটে। সাধারণভাবে, আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা গভর্ণমেণ্ট এইরূপ নোট চালাইবার অধিকার নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। (খ) ব্যাঙ্কে আমানতকারী ব্যক্তি কর্তৃক কাহাকেও অর্থপ্রদান করিবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ পত্রকে চেক বলা হয। এই চেক্ হস্তান্তরিত হইয়া অর্থনৈতিক লেনদেনে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করে। এই চেকের সহিত কাগজী নোটের পার্থক্য আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার কর্তৃক প্রচলিত নোটগুলি হইল আইন-চালু মুদ্রা, চেক কখনই আইন-চালু নহে; ইহা গ্রহণ করিতে কেহ আইনতঃ বাধ্য নহে। (গ) দ্রব্যের ক্রেতার উপরে দ্রব্যের বিক্রেতা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার নির্দেশ দিয়া যে পত্র দেন তাহাকে বিনিময়-বিল বলে। সাধারণতঃ ৩০ দিন, ৬০ দিন, বা ৯০ দিন পরে ক্রেতা বিক্রেতাকে এই অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দেয। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দ্রব্যের বিক্রেতা ঐ বিল ভাঙাইতে পারে অথবা বন্ধক দিয়া অর্থ পাইতে পারে। (ঘ) যখন কোন ব্যাঙ্ক নিজের অপর কোন শাখাকে বা অপর কোন ব্যাঙ্ককে কিছু অর্থ দিবার জন্য নির্দেশ দেয় তখন সেই নির্দেশ-নামাকে ব্যাঙ্কের ড্রাফ্‌ট্ বলে।

ঋণব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা: ঋণ ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল ইহার ফলে নগদ অর্থ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায়। প্রভূত পরিমাণ অর্থ বহনের ও লেনদেনের ঝুঁকি ও অসুবিধা থাকেনা। সমাজে ব্যবসা, বাণিজ্য ও

উৎপাদন সকল কিছু ঋণ প্রথার দ্বারা উপকৃত হয়; স্থান ও কালের মধ্যে সংযোগ-সেতু হিসাবে ঋণ প্রথা কার্য করে। ধাতু বা ধাতব অর্থের বদলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ঋণ পত্র দ্বারা লেনদেন অনেক সুবিধাজনক।

ঋণ-প্রথার বিশেষ বিপদ ও ত্রুটি হইল, ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা অধিক থাকে। ব্যাঙ্ক ঋণদানের পরিমাণ বাড়াইলে বা সরকার অধিক পরিমাণে প্রমিসরী নোটের প্রচলন করিলে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে। হট্রে বলেন যে, ব্যবসা সঙ্কট বা বাণিজ্য চক্র সৃষ্টিতে এই প্রকার ঋণ প্রথাই প্রধানতঃ দায়ী, ব্যাঙ্ক ঋণের সঙ্কোচ ও প্রসারই এইরূপ ব্যবসা চক্র ঘটাইয়া থাকে। ঋণপ্রথার ফলে সমাজে অনির্দিষ্টতা আসিয়া পড়ে; শেয়ার বাজারে বা দ্রব্যের বাজারে ফাটকা ব্যবসা সুরু হইতে পারে। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ট্রাষ্ট বা বৃহৎ একচেটিয়া ব্যবসা সংগঠন স্থাপিত হইতে পারে।

ব্যাঙ্ক: ঋণ লইয়া যে সংগঠনের ব্যবসা পরিচালিত হয় এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলা হয়। সমাজের ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ করা এবং সেই অর্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ঋণ হিসাবে খাটান, ইহাই ব্যাঙ্কের কার্য। সমাজে বহু প্রকার ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়; বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণদানের কার্যে বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক নিযুক্ত থাকে।

ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য হইল ব্যক্তিদের সঞ্চয় আমানতের আকারে একত্র সংগ্রহ করা। আমানত অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারেণ্ট বা চল্‌তি আমানত, সেভিংস বা সঞ্চয়ী-আমানত, স্থির-আমানত। কারেণ্ট আমানত হইতে ইচ্ছানুযায়ী অর্থ উঠান চলে, কিন্তু সেভিংস বা স্থির-আমানত হইতে অর্থ উঠাইবার বিবিধ বাধা-নিষেধ থাকে। আমানত হইল ব্যাঙ্কের ঋণ এবং ইহা ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব (Liability)। কারেণ্ট হিসাবে রক্ষিত অর্থকে চাহিদা-আমানত (Demand deposits) বলা চলে এবং অন্যান্য ধরণের আমানতকে কাল-আমানত (Time deposits) বলা চলে।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য কার্যে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক অর্থ ঋণদান করিয়া থাকে। সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতার নামে আমানত-হিসাব সৃষ্টি করিয়া ব্যাঙ্ক ঋণদান করে, এই সকল আমানতকে সৃষ্ট-আমানত (Created deposits) বলে।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজী নোট প্রচলন করে এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কও

চেকের সাহায্যে লেনদেনে সহায়তা করে সুতরাং বিনিময় ও প্রচলনের মাধ্যম হিসাবে অর্থ সৃষ্টি করা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার একটি কার্য বলা চলে।

চতুর্থতঃ, ব্যাঙ্কের বিবিধ প্রকার কার্য আছে। দলিল পত্র বা অলঙ্কার প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে লোকে ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ব্যক্তির হিসাবপত্র রক্ষা করে, বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করে, অথবা ব্যবসায়ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনেকক্ষেত্রে কার্য করিয়া থাকে।

দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ছাড়া শিল্প বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া ওঠা কোন দেশের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। অনুন্নত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অনুন্নতির কারণ বলা চলে। ব্যাঙ্ক প্রথার ফলে মূলধনের চলনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক সংযোগ ঘটাইয়া দেয়। যাহারা মজুত অর্থ ব্যবহার করিতে পারে না তাহাদের নিকট হইতে সেই অর্থ লইয়া আসিয়া উপযুক্ত বিনিয়োগকারীদের ব্যাঙ্ক সেই অর্থ ঋণ দিয়া সাহায্য করে। সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা সঞ্চয়-প্রবণতা বাড়িয়া যায়, বিনিয়োগের সুযোগ থাকায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা বিনিয়োগ করা হয় বলিয়া সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বৃদ্ধি পায় : অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়।

ব্যাঙ্কের ব্যালান্স সীট (Balance Sheet of a Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উদ্বর্ত্ত পত্র বা ব্যালান্স সীট (Balance sheet) বিশ্লেষণ করিলে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের রূপ প্রকৃতভাবে বোঝা যায়। যে সকল অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে, ব্যাঙ্ক সেই সকলের জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী ; ইহা তাহার দেনাসমূহ (liabilities)। যে সকল অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক খাটাইয়াছে, নিযুক্ত সেই সকল অর্থ ব্যাঙ্কের পাওনাসমূহ (assets)। দেনা ও পাওনার কাঠামো বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা, উহার কার্যাবলী ইত্যাদি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। সাধারণ ভাবে, দেনা ও পাওনার উভয়দিক সমান থাকে ; কারণ ব্যাঙ্কের সকল পাওনা বা অর্থনিয়োগ বা সম্পত্তি অন্যের নিকট হইতে গৃহীত অর্থের সাহায্যেই করা হয়। সাধারণতঃ, ব্যাঙ্কসমূহ যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গঠিত হয় ; সুতরাং শেয়ার বিক্রয় করিয়াই ইহার প্রাথমিক মূলধন সংগৃহীত হয়।

দেনা ও পাওনা

দেনার দিকে (ক) শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া গিয়াছে

তাহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। (খ) দ্বিতীয়তঃ, চলতি আমানত বা চাহিদা-আমানত। (গ) তৃতীয়তঃ, স্থায়ী আমানত সমূহ (ঘ) চতুর্থতঃ, সাবধানতার জন্য সকল ব্যাঙ্কই মুনাফার অংশদ্বারা রিজার্ভ তহবিল গড়িয়া তোলে। উহা শেয়ার ক্রেতাদের সম্পত্তি বলিয়া ব্যাঙ্কের দেনা হিসাবে ধরা হয়। (ঙ) পঞ্চমতঃ, অন্যান্য ব্যাঙ্ককে দেয় যে অর্থ বাকী রহিয়াছে অথবা ব্যাঙ্কের নিকট যে সকল বিল্ দেনা হিসাবে রহিয়াছে।

দেনার বিষয় সমূহ

পাওনা বা সম্পত্তির দিকে (ক) সর্ব প্রথমে ধরিতে হয় যে নগদ অর্থ ব্যাঙ্ক হাতে রাখিয়াছে, দৈনন্দিন লেনদেনের কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য যাহা ব্যাঙ্কের হাতে আছে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। (খ) অন্যান্য ব্যাঙ্কের যে পাওনা আছে অথবা অত্যন্ত স্বল্পকালীন বিনিয়োগসমূহ। (গ) তৃতীয়তঃ, সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক যে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে। (ঘ) ঋণ হিসাবে যে অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিয়াছে। (ঙ) পঞ্চমতঃ, ব্যাঙ্কের নিজস্ব ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র অথবা অন্যান্য সম্পত্তি সমূহ।

পাওনা বিষয়সমূহ

ব্যাঙ্কের এই ব্যালেন্স সীট বা দেনাপাওনার হিসাব পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্যাঙ্কের কাজকর্মের স্বরূপ জানিতে পারা যায়। কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থাও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক প্রথার নিয়মসমূহ সুচারু রূপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহাও বুঝা যায়। সাধারণতঃ, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-প্রথার তিনটি নীতি আছে, সাবধানতা, মুনাফালভ্যতা ও তরলতা। ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, জনসাধারণের আমানতী অর্থের কোন লোকসানের ভয় নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত বন্ধক পাইয়া তবেই অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত। মুনাফার দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। সর্বোপরি, বিনিয়োগ এইরূপ হওয়া প্রয়োজন যে; প্রয়োজন হইলেই অতি সত্বর উহাকে নগদ অর্থে রূপান্তরিত করা যায়। অর্থাৎ এরূপ সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা উচিত যাহাকে অতিদ্রুত নগদ অর্থে পরিণত করা চলে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপ্রথার তিননীতি

ব্যাঙ্ক কিরূপে ঋণ সৃষ্টি করে (How banks create credit)

আধুনিক ব্যাঙ্কের আমানত দুই প্রকারে সৃষ্টি হইতে পারে। প্রথমতঃ,

আমানতকারী কোন ব্যক্তি নগদ অর্থ লইয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে ব্যাঙ্ক তাহার নামে আমানতী-হিসাব (Deposit account) খুলিয়া দেয়; ইহাকে প্রকৃত আমানত (Actual deposit) বলে। দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতার নামে হিসাব খুলিয়া দেয়; সেই হিসাব হইতে ঋণের পরিমাণ পর্যন্ত অর্থ চেকের সাহায্যে তুলিয়া লইবার অনুমতি দেয়। ইহাকে সৃষ্ট আমানত (Created deposit) বলা হয়।

দুই প্রকার আমানত সৃষ্টি

প্রথম প্রকার বা প্রকৃত আমানত সৃষ্টি হয় আমানতকারী ব্যক্তির তাগিদে। দ্বিতীয় প্রকার বা সৃষ্ট-আমানত সৃষ্টির তাগিদ আসে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে। এইরূপে আমানত সৃষ্টি করিয়াই ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।

ব্যাঙ্ক কোথা হইতে ঋণ দেয়? যে নগদ অর্থ তাহার নিকট আমানত হিসাবে আসে, তাহার সম্পূর্ণ পরিমাণ সে ঋণ দিতে পারে না, কারণ আমানতকারী যদি অর্থ উঠাইয়া লইতে চায়, ব্যাঙ্ককে তাহা দিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক জানে যে সকল আমানত-কারীগণ একসঙ্গেই তাঁহাদের সকল আমানত উঠাইয়া লইতে চাহেন না, মোট নগদ আমানত সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যাঙ্কে না রাখিলেও দৈনন্দিন লেন-দেনের কার্য চালান যায়। সুতরাং নগদ-আমানতের কিছু অংশ, শতকরা কিছুভাগ নগদ অর্থ দৈনন্দিন লেনদেনের উদ্দেশ্যে রাখিয়া অধিকাংশ অর্থই ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। নগদ সঞ্চয়াংশের (Cash Reserve) পরিমাণ বেশী হইলে ব্যাঙ্ক কম ঋণ দিতে পারে, নগদ সঞ্চয়াংশের পরিমাণ কম হইলে ব্যাঙ্ক ঋণ বাড়াইতে পারে।

ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানতী অর্থের নির্দিষ্ট হার নিজেব হাতে নগদ জমা

ব্যাঙ্ক যখন আমানত সৃষ্টি করে তখন ঋণগ্রহীতার নামে আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কেব খাতায় হিসাব লিখিয়া রাখে এবং সেই হিসাব হইতে চেক কাটিয়া ঋণ-গ্রহণকারী ঋণ নেয়। সেই ঋণ পুনরায় নগদ আমানত হিসাবে, হয় ঋণপ্রদানকাবী ব্যাঙ্কে, অথবা অপর কোন ব্যাঙ্কে জমা হইয়া পড়ে এবং সেই নগদ অর্থের ভরসায় ব্যাঙ্ক পুনরায় ঋণবৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পায়। এইরূপে প্রতিবার ঋণপ্রদানের ফলে নূতন আমানত সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবার নূতন আমানত সৃষ্টির ফলে নূতন ঋণদান সম্ভব হয়। এইরূপে ব্যাঙ্কগুলি মিলিয়া সামগ্রিকভাবে তাহাদের মোট নগদ-আমানতের বহুগুণ বেশী মোট ঋণ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কর্তৃক ঋণার্থ সৃষ্টি

মনে করা যাউক 'ক' ব্যাঙ্ক কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে ১০০০্ টাকার নগদ আমানত পাইল। ধরা যাউক দেশে এইরূপ আইনসঙ্গত নিয়ম বা প্রথা চালু আছে যে ব্যাঙ্কে মোট নগদ আমানতের ১০% জমা রাখিতে হয়। এমতাবস্থায় 'ক' ব্যাঙ্ক নগদ আমানতের ১০% অর্থাৎ ১০০ টাকা জমা রাখিয়া অবশিষ্ট ৯০০্ কাহাকেও ঋণদান করিবে।

কিন্তু বর্তমান ব্যাঙ্কব্যবস্থাই এইরূপ যে ঘটনার স্রোত আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়া যায়। যাহারা ৯০০্ ঋণ পাইল তাহারা এই টাকা ব্যয় করার ফলে যাহাদের হাতে গিয়া ইহা নূতন আয়রূপে দেখা দিল তাহারা হয় 'ক' ব্যাঙ্কে বা অন্য কোন ব্যাঙ্কে জমা দিবে। মনে করা যাউক যে সেই ৯০০্ ব্যাঙ্ক 'খ'-তে নগদ-আমানতরূপে জমা পড়িল। ব্যাঙ্ক 'খ' ৯০০্ নগদ-আমানতের ১০%, অর্থাৎ ৯০্ জমা রাখিয়া ৮১০্ অপর কাহাকেও ঋণ হিসাবে দিয়া দিল। সেই ৮১০্ আবার ধরা যাউক ব্যাঙ্ক 'গ'-তে জমা পড়িল এবং ব্যাঙ্ক 'গ' ইহার ১০% অর্থাৎ ৮১্ জমা রাখিয়া ৭২৯্ নূতন ঋণ সৃষ্টি করিল। যতদিন পর্যন্ত না নগদ-আমানতের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়া এইরূপ পরিমাণে দাঁড়াইবে যে আর নূতন ঋণ সৃষ্টি করা সম্ভব নহে, ততদিন এইরূপে নূতন ঋণ সৃষ্টি চলিতে থাকিবে। এইক্ষেত্রে, ৯০০ টাকার প্রথম ঋণদানের ফলে সমগ্র সমাজে মোট ৯০০০ টাকার ঋণ সৃষ্টি হইবে। সুতরাং, ব্যাঙ্কগুলি একত্রে মিলিয়া এইরূপে সমাজে বিপুল পরিমাণে ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে এবং সমাজে মোট অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারে।

দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থা (Banking System) কর্তৃক ঋণসৃষ্টির ক্ষমতার কিন্তু সীমা আছে। সমাজে যদি ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যা কম হয় বা ব্যক্তিরা ঋণ গ্রহণ করিতে না চায়, তবে এই ঋণ সৃষ্টির স্রোত ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যাঙ্ক যদি বেশী নগদ অর্থ নিজের হাতে জমা রাখিয়া দেয়, তবে ভবিষ্যতে অন্য ব্যাঙ্কও নগদ-আমানত কম পাইবে এবং সমাজে মোট ঋণ সৃষ্টির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ, কোন ব্যক্তি যদি ঋণ গ্রহণ করিয়া কোন ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া নগদ অর্থ নিজের হাতে জমাইয়া রাখে, তবে তাহা ঋণসৃষ্টি করিতে পারে না। সর্বশেষে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির (খোলা বাজারে কার্যাদির) দ্বারা সমাজে নগদ অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দিলে মোট ঋণ সৃষ্টির পরিমাণ সঙ্কুচিত হইতে পারে।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কর্তৃক ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা

অর্থের বাজার (Money Market)

যে বাজারে ঋণ হিসাবে অর্থের লেনদেন হয় তাহাকে অর্থের বাজার বলা হয়।

অর্থের ক্রয় বিক্রয় ও অর্থের দাম

এই বাজারে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাগণ পরস্পরের সহিত ঋণের লেনদেন করেন। সাধারণতঃ, ব্যাঙ্কসমূহ ঋণের "বিক্রেতা", সুদ হইল ঋণের "দাম", এবং ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিগণ বা সংগঠন-সমূহ হইল ঋণের "ক্রেতা"। শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত দেশ সমূহে অর্থের বাজার খুবই সংগঠিত ; অনুন্নত দেশে অর্থের বাজারও অনুন্নত এবং অসংগঠিত।

অর্থের বাজারকে সময়ানুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় : অত্যল্পকালীন বাজার, স্বল্পকালীন বাজার বা দীর্ঘকালীন বাজার। বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্য সমাজে ঋণের চাহিদা ও যোগান হইতে পারে। যদি একদিন, কয়েকদিন বা মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য ঋণ দেওয়া হয় তবে তাহাকে তলব-ঋণের (Call-Loan Market) বাজার বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণভাবে এই তলব-ঋণের বাজারে ঋণ দেয়, এইরূপ ঋণকে তাহারা খুবই তরল-বিনিয়োগ (Liquid Investment) হিসাবে গণ্য করে কারণ প্রয়োজন হইলে এবং খুবই কম সময়ের মধ্যে এই ঋণ আদায় করিয়া নগদ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর। অনেক সময় যৌথমূলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ-ও মুনাফা বণ্টনের পূর্বে সেই মুনাফাকে কিছু-সময়ের জন্য এইরূপ তলব-ঋণের বাজারে খাটাইয়া লয়। এই বাজারে ঋণগ্রহীতা

বিভিন্ন প্রকার অর্থের বাজার: অত্যল্পকালীন

হইল (ইংলণ্ডে প্রধানতঃ) বিলের দালালগণ (Bill brokers) এবং (আমেরিকায় প্রধানতঃ) শেয়ারের দালালগণ (Share-brokers)। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিলের দালালগণ ঋণ গ্রহণ করিয়া বিল ক্রয় করে এবং উহা ফলপ্রসূ (Mature) হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া রাখার চেষ্টা করে। যে সুদে এই ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহার নাম তলব-হার (Call-rate)। সাধারণতঃ, ব্যাঙ্কগুলি এই প্রকার তলব-ঋণ পুনরনুমোদন (Renew) করে বটে কিন্তু নগদ অর্থের প্রয়োজন অধিক হইলেই তাহারা ইহা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চায়। তখন ঋণগ্রহীতাগণ যে কোন উপায়ে অন্য যে কোন স্থান হইতে এই অর্থ আনিয়া দেয়। প্রধানতঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই তাহারা ঋণ গ্রহণ করিয়া আনে। অর্থাৎ বিলের দালালগণকে বা ঋণগ্রহীতাগণকে "নিঙড়াইয়া" ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হয় বা অর্থ আদায় করিয়া লওয়া হয়। তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য হয় ; বলা হয় যে "বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির

হইয়াছে" ("to go into the bank")। আমেরিকায় প্রধানতঃ, শেয়ার বাজারের দালালরাই তলব-ঋণের বাজারে ঋণ করে; কারণ আমেরিকায় ফাট্‌কা বাজারে শেয়ার ক্রয়ের সময়ে মূল্যের ২৫% অংশ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হয়। অবশিষ্ট ৭৫% অংশ দিবার সময়ে ফাট্‌কা বাজারে শেয়ারের দালালগণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিতে আসে এবং ওই শেয়ারগুলিকেও অন্যান্য সম্পত্তির সহিত সহ-বন্ধকী (Colateral security) হিসাবে জমা রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক এইরূপ ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের জন্য যে সুদে তাহাদের ঋণ দেয় তাহাকে ঋণের তলব-হার (Call-rate) বলে। ফাট্‌কা বাজারের অবস্থা অনুযায়ী এই তলব-হারও উঠানামা করে। সাধারণতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, বাজারের তলব-হার নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।

স্বল্পকালীন ঋণের বাজার

কিছু বেশীদিনের, যেমন সাধারণতঃ ৩ মাসের জন্য স্বল্পকালীন ঋণ দেওয়া হয়। বিশেষ করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এইরূপ স্বল্পকালীন ঋণের বাজারে (Short period Loan Market) ঋণ দেয় এবং বিল ডিস্‌কাউন্ট করিয়া বা ব্যক্তিকে তাহার আমানতের পরিমাণের অধিক উঠাইবার সুযোগ দিয়া এই ঋণ প্রদান করা হয়। ব্যবসায়ীরা ছাড়াও কোন দেশের সরকার ট্রেজারী বিল ভাঙ্গাইয়া এই বাজার হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া থাকে।

দীর্ঘকালীন ঋণের বাজার

ইহা ব্যতীত দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারও দেশে থাকে। এই দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারে দেশে ব্যক্তিদের মূলধন সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়ের সংগ্রহীকরণ (accumulation) ও মূলধন-গঠন হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, শেয়ার বিক্রয় প্রতিষ্ঠান সমূহে সমাজে ব্যক্তির সঞ্চয়কে সংগ্রহ করিয়া শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগের উপযোগী মূলধনে রূপান্তরিত করে। বিভিন্ন কার্যে লগ্নীর জন্য সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ (Public bodies) বা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বাজারে ঋণের চাহিদা করে। শেয়ার বাজারে শেয়ারের ক্রয়বিক্রয়ের ফলে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ঘটে এবং মূলধনের হস্তান্তর হইয়া থাকে।

বিভিন্ন বিনিয়োগ-ক্ষেত্র অনুযায়ী অর্থের বাজারে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন

ঋণের বাজারেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণদানের জন্য পৃথক ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকে এবং সাধারণতঃ, বিশেষ ধরণের বাজারে ঋণদানের জন্য বিশেষ প্রকার প্রতিষ্ঠানই নিয়োজিত থাকে। যেমন, বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক আছে; বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শৈল্পিক ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের বাজারে ঋণদান করে।

সর্বোপরি, অর্থের বাজারের মধ্যমণি এবং পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের সকল প্রকার অর্থ সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিযন্ত্রণ করে; ঋণের বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। ঋণের দাম অর্থাৎ সুদের হার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও লক্ষ্য অনুযায়ী নির্ধারিত করার প্রয়াস পায়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আর্থিক নীতি পরিচালনা করা এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই কাজ। সমাজে অর্থের শুষ্কতা দেখা দিলে অর্থ ঢালিয়া দেওয়া এবং অর্থাধিক্য দেখা দিলে অর্থ ছাঁকিয়া তুলিয়া আনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই অন্যতম দায়িত্ব।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House):

অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে কোন বিশেষ অঞ্চলে ব্যাঙ্কসমূহ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গ্রাহক, সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্যে এক ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণ অন্য ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণের নিকট হইতে চেক পান এবং তাহাদের চেক দিয়া থাকেন। ফলে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কই অন্য ব্যাঙ্কের নিকট দেনাদার ও পাওনাদার হইয়া পড়ে। কোন ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওনা নগদ অর্থ লইয়া আসিল আবার সেই ব্যাঙ্ককেই নগদ অর্থ দিয়া দিল, এইরূপ পারস্পরিক নগদ লেনদেন অহেতুক পরিশ্রমসাধ্য ও অপব্যয়মূলক। সুতরাং, বিশেষ কোন স্থানে, একত্র হইয়া ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ পারস্পরিক দেনাপাওনার হিসাব করিয়া খাতায় পত্রে নিজেদের হিসাব মিলাইয়া লন; এই সংগঠনই ক্লিয়ারিং হাউস বলিয়া পরিচিত। সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অফিসে এই কার্য পরিচালিত হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত জমা হইতে সকল ব্যাঙ্কের হিসাব বাড়াইয়া বা কমাইয়া নিজেদের মধ্যে লেনদেন করে।

ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার প্রতিষ্ঠান

অনুশীলনী

1. Distinguish between Credit and Cash and explain how Credit affects an economy of cash. (B.Com. '49)

2. What are Credit Instruments? Discuss their utility. (B. A. '44, '45, '47, '49)

3. Discuss the various functions performed by a modern Bank. Indicate the benefits that the banks render to society. (B.Com. '40, B. A. '47, '50)

4. How and how far can a bank create credit? (B.Com. '45, '47)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থের মূল্য ও তাহার পরিমাপ

অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীই অর্থের মূল্য। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অর্থের বিনিময়ে অধিক দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, বলা হয়; দ্রব্যসামগ্রী পূর্বের তুলনায় কম পাওয়া গেলে অর্থের মূল্য হ্রাস হইয়াছে বলা চলে।

অর্থের মূল্য

অর্থের বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহা নির্ভর করে দামস্তরের (Price-level) উপর। দামস্তর উর্ধ্বাভিমুখী হইলে অর্থের মূল্য কমিয়া আসে; দামস্তর নিম্নাভিমুখী হইলে অর্থের মূল্য বাড়িয়া যায়।

কিছু সময়ের ব্যবধানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সমাজে কোন কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে, কোন কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া গিয়াছে—সকল দ্রব্যের দামে একই সঙ্গে বৃদ্ধি বা একই সঙ্গে হ্রাস সচরাচর দেখা যায় না। ইহাদের দামের বৃদ্ধি বা হ্রাসের হারেও তারতম্য থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড় (average) হয় উর্ধমুখী অথবা নিম্নগামী; সকল দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় ঝোঁক থাকে। সেই গড়ের নাম হইল দামস্তর। বিভিন্ন সময়ের দামস্তরগুলিকে পাশাপাশি সাজাইলে সূচক-সংখ্যা (Index-Number) পাওয়া যায়। কোন বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়কে, অপর কোন সময়ের একই দ্রব্য-সামগ্রীর দামের গড়ের সহিত তুলনা করা হইলে এই সূচক-সংখ্যা পাওয়া যায়। সূচক সংখ্যা গঠনের পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হইল।

দামস্তর

সূচক সংখ্যা

যে বৎসরের দামস্তরের সহিত অপর বৎসরের দামস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে তাহাকে বলা হয় মূলবৎসর (Base year)। সেই মূলবৎসরের সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি দামকে ১০০ হিসাবে ধরিতে হয়। তাহার পর, যে বৎসরের দামস্তরে পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে সেই বৎসরের পূর্বোক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া মূলবৎসরের দামসমূহের সহিত তুলনামূলক পরিবর্তন গণনা করিতে হয়; ১০০-র তুলনায় আনুপাতিক ভাবে তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হিসাব করা হয়। অবশেষে উভয়ের গাণিতিক গড় (Arithmetic

কিভাবে সূচক-সংখ্যা গঠন করিতে হয়

average) করিয়া পরবর্তীকালে দামস্তরে মূলবৎসরের তুলনায় কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। নিম্নের উদাহরণ হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

১৯৩৯ সাল (মূল-বৎসর)				১৯৪৭ সাল (হিসাবী বৎসর)		
চাল—প্রতি মণ ৪৲	=	১০০	... ...	১৬৲	=	৪০০
ডাল—প্রতি মণ ১০৲	=	১০০	... ...	২০৲	=	২০০
জুতা—প্রতি জোড়া ৫৲	=	১০০	... ...	৭৷৷০	=	১৫০
চা—প্রতি পাউণ্ড ৪৲	=	১০০	... ...	৩৲	=	৭৫
		৪০০ ÷ ৪ = ১০০				৮২৫ ÷ ৪ = ২০৬$\frac{১}{৪}$

উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে উপরিউক্ত কয়েকটি দ্রব্যের দামের সাহায্যে প্রস্তুত সূচক-সংখ্যাতে দামস্তর ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৭ সালে ১০৬$\frac{১}{৪}$ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থের সহিত বিনিময় হয় এরূপ যত অধিক দ্রব্যসামগ্রী লইয়া হিসাব করা হইবে, সেই সূচক-সংখ্যা তত সঠিক ভাবে অর্থের সাধারণ ক্রয়শক্তির (General purchasing power of money) পরিবর্তন পরিমাপ করিতে পারিবে।

কিন্তু সকল দ্রব্যকে সমান গুরুত্ব দিয়া এইরূপে হিসাব করিলে সেই সূচকসংখ্যা নির্ভুল হইতে পারে না, কারণ ভোগকারী ব্যক্তিগণ সকল দ্রব্যকে সমান গুরুত্ব দেয় না, সকল দ্রব্যের দামে পরিবর্তন তাহাদের জীবন যাত্রার মান, অর্থাৎ তাহাদের নিকট অর্থের ক্রয় ক্ষমতাতে পরিবর্তনের সঠিক পরিমাপ করিতে পারে না। সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে (Expenditure-structure) দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব অবহেলা করা চলে না। গণিতের হিসাব বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত না করিতেও পারে। সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অল্প পরিবর্তন সমাজের অল্পাংশ লোকের পক্ষে কম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অধিক পরিবর্তন অপেক্ষা বাস্তবক্ষেত্রে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ, অথচ গণিতের হিসাবে চালের দামের বৃদ্ধি চা-এর দামের হ্রাসের ফলে খণ্ডিত হইয়া যাইতে পারে, সূচক সংখ্যায় সে পরিবর্তন প্রতিফলিত না-ও হইতে পারে, অথচ এইরূপ পরিবর্তন নিশ্চয়ই অর্থের সাধারণ ক্রয়শক্তি, জীবনযাত্রার মান অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট অর্থের বাস্তব মূল্যে বিপুল পরিবর্তন আনিয়াছে।

বিভিন্ন দ্রব্যে যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা

এই অসুবিধা দূর করার জন্য গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা (weighted index number) গঠন করা হয়। মোট ব্যয়ের কত অংশ একটি দ্রব্যের পিছনে ব্যয়িত হয় তাহার হিসাব করিয়া ব্যয় কাঠামোতে প্রত্যেকটি দ্রব্য-সামগ্রীর গুরুত্ব অনুধাবন করা হয় এবং হিসাবী বৎসরের দামকে সেই পরিমাণ গুরুত্ব দিয়া গুণ (Multiplication) করিয়া সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করিলে তাহা অর্থের মূল্য পারিবর্তনের সঠিক চিত্র অঙ্কন করিতে পারে।

গুরুত্বশীল সূচকসংখ্যা

সূচকসংখ্যা গঠনের ও ব্যবহারের বহু বাস্তব (Practical) অসুবিধা এবং তত্ত্বগত (Theoretical) ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ, **মূলবৎসর নির্বাচনের অসুবিধা**। যে মূলবৎসরের দামস্তরের সহিত অন্যান্য বৎসরের দামস্তরের তুলনামূলক পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, সেই বৎসরটি স্বাভাবিক হওয়া চাই, সেই বৎসরে অর্থের মূল্যকে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা দরকার। কিন্তু যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর অবস্থার প্রায় সকল বৎসরই কমবেশী অস্বাভাবিক। তবে, এই অসুবিধা দূর করার জন্য অনেক সময় কয়েকবৎসরের দ্রব্য-সামগ্রীর দামের গড়কে মূলবৎসরের দাম হিসাবে গণনা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, **দ্রব্য সামগ্রী নির্বাচনের** অসুবিধা। যদি অর্থের সাধারণ ক্রয়ক্ষমতায় পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়, তাহা হইলে যত অধিক সংখ্যক দ্রব্যের দাম গ্রহণ করা হইবে, ততই সেই সূচক সংখ্যা সঠিক ও অধিক প্রতিনিধিত্বমূলক হইবে। যে উদ্দেশ্যে সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করা হইতেছে, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী দ্রব্য-সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে কলেজের ছাত্রদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রীর দাম হিসাব করিলে ভুল হইবে। তৃতীয়তঃ, **দাম নির্বাচনের অসুবিধা**। দ্রব্য-সামগ্রীর পাইকারী দাম জানিতে পারা সুবিধাজনক, এই কারণে অনেক সময় পাইকারী দামের সাহায্যে সূচক সংখ্যা গঠনের চেষ্টা করা হয়. কিন্তু বাস্তবপক্ষে জনসাধারণ খুচরা দামেই দ্রব্য ক্রয় করে, খুচরা দামের পরিবর্তনই তাহাদের নিকট অর্থের মূল্য বা ক্রয়শক্তির পরিবর্তন হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সকল দ্রব্যের খুচরা দাম সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে একই দ্রব্যের খুচরা দামে বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থতঃ, **গড় নির্ণয়ের** বহু পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করিলে কিছুটা তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চমতঃ, **গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা গঠনেও** বিশেষ

নির্মাণগত অসুবিধা সমূহঃ
মূলবৎসর দ্রব্যসামগ্রী ও দাম নির্বাচন
গড়নির্ণয় ও গুরুত্ব প্রদান

অসুবিধা দেখা দেয়। ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্য-সামগ্রীর **পারস্পরিক গুরুত্ব নির্ধারণ** বিশেষ সহজ নয়, প্রত্যেক পরিবারের ব্যয়-কাঠামো অন্য পরিবারের ব্যয়-কাঠামো হইতে পৃথক। বিভিন্ন পরিবর্ত-দ্রব্য বা অনুপূরক দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে বা নূতন দ্রব্য প্রচলনের ফলে ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যাদির পারস্পরিক গুরুত্বে সর্বদাই পরিবর্তন হইতেছে। দ্রব্যাদির গুরুত্ব সর্বদাই নূতনভাবে হিসাব করিয়া প্রত্যেকটি সূচক সংখ্যা গঠন করা খুবই পরিশ্রমসাধ্য ও জটিল ব্যাপার।

তত্ত্বগত আপত্তি সমূহ: একই দেশের বিভিন্ন আয়স্তর এবং একই আয়স্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে, এবং বিভিন্ন স্থানের মধ্যে, জীবন যাত্রার মানের তুলনা চলে না

বিভিন্ন ব্যবহারে সূচক সংখ্যা প্রয়োগের বহু তত্ত্বগত আপত্তি (Theoretical objections) দেখা দিতে পারে। প্রথমতঃ একই দেশের মধ্যে সকল লোক সকল প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে না; **আয়, অভ্যাস, রুচি ও পরিবেশের পার্থক্য** অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবারের ব্যয়-কাঠামো পৃথক থাকে, নির্দিষ্ট ধরণের কয়েকটি দ্রব্য সাধারণভাবে কোন বিশেষ পারিবারিক ব্যয়-কাঠামোর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। একই আয়-স্তরের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চল, পরিবেশ ও অভ্যাসের ফলে সকল পরিবার সমজাতীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার করে না। সুতরাং অর্থের সাধারণ ক্রয়শক্তি বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না; বস্তুতঃ অষ্ট্রীয় ধন-বিজ্ঞানীদের একাংশ সাধারণ দামস্তরের তত্ত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে চাহেন। দ্বিতীয়তঃ, **বিভিন্ন সময়ের মধ্যে** অর্থের মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা সূচক সংখ্যার সাহায্যে সঠিক ভাবে সম্ভব নহে। সময়ের পার্থক্যে লোকের ভোগ বা দ্রব্য-ব্যবহারের ধরণে বিপুল ও মৌলিক পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে। নূতন দ্রব্যাদির ব্যবহার সুরু হয়: বহু দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়; ব্যবহারিক জীবনে পুরাণো দ্রব্যের তাৎপর্যও পৃথক হইয়া পড়ে। দ্রব্যের দাম সমানই আছে, কিন্তু তাহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে, এরূপ ঘটিলে সূচক-সংখ্যায় পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু অর্থের মূল্যে বাস্তবপক্ষে নিশ্চয়ই পরিবর্তন হয়, জীবন-যাত্রার মান নির্ধারণে অর্থের বাস্তব-তাৎপর্য অন্যরূপ হয়। যেমন, পূর্বের ৷৷০ দামের সিগারেট বর্তমানে একই দাম থাকিলেও ইহা পূর্বাপেক্ষা ভাল বা মন্দ হইলে জীবনযাত্রার মান-স্তরে অর্থাৎ অর্থের মূল্যে পরিবর্তন আনে, কিন্তু সূচক-সংখ্যার গাণিতিক হিসাবে সেই পরিবর্তন ধরা পড়ে না, ইহাতে কোন পরিবর্তন আসে না। রবার্টসন তাই বলিয়াছেন যে আসনে উপবিষ্ট হইয়া গাড়ী-চড়া এবং আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় গাড়ী-চড়া, উভয় অবস্থাতে দাম এক দিলেও ভোগের দিক হইতে ইহারা কখনই এক বস্তু নহে।

তৃতীয়তঃ, **বিভিন্ন স্থানের মধ্যে** জীবন যাত্রার মান-স্তরে অর্থাৎ অর্থের মূল্যে তুলনামূলক পরিমাপ করাও তত্ত্বের দিক হইতে অযৌক্তিক। পরিবেশ, রুচি ও অভ্যাসের তারতম্য এত বিস্তৃত যে বিভিন্ন দেশে নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যের গুরুত্ব তুলনা করা চলে না, একই দামে ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত তৃপ্তির বিপুল পার্থক্য থাকে। কেইন্সের ভাষায় বলা যায় একই ধরণের ব্যক্তিদের তৃপ্তির তুলনামূলক পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; ফ্যারাও-র ক্রীতদাসের সহিত ফিফ্থ্ এভিনিউতে চলমান মোটর গাড়ীর; অথবা, একদিকে ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীর নিকট দামী জ্বালানি ও সস্তা বরফ, অপরদিকে, হোটেনটট্দের নিকট সস্তা জ্বালানি ও দামী বরফ—ইহাদের তৃপ্তির তুলনা করা চলে না।

এই সকল প্রয়োগগত ও তত্ত্বগত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অর্থের মূল্য বা সাধারণ ক্রয়শক্তির ধারণা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় তাহা বলা চলে না, অথবা স্চকসংখ্যা সঠিক না হইলেও প্রায় কাছাকাছি ও মোটামুটিভাবে তুলনামূলক বিচারে কিছুটা সাহায্য করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ের পার্থক্য যদি কম হয়, তবে ইহার সাহায্যে অর্থের মূল্য পরিবর্তন মোটামুটিভাবে পরিমাপ করা চলে, কারণ রুচি অভ্যাস এবং ব্যয়-কাঠামো স্বল্পকালে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং দীর্ঘকালে না হইলেও স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে স্চকসংখ্যার ব্যবহার চলিতে পারে।

সূচকসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা

বিভিন্ন প্রকার সূচকসংখ্যা (Different kinds of Index Number) :

যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে, সেইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট অর্থের মূল্য পৃথক অথবা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় বলিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যের স্চকসংখ্যা প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। অর্থ যে কেবলমাত্র ভোগ্যদ্রব্য বা সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য (Final Product) ক্রয় করে, তাহা নহে; বিভিন্ন উৎপাদন কার্যে নিয়োগের উপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয়েও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, অর্থের দ্বারা ক্রীত বিভিন্নদ্রব্যাদির গোষ্ঠী অনুযায়ী বিভিন্ন দামস্তর থাকিতে পারে; যেমন, পাইকারীদামস্তর (Wholesale Price level), রপ্তানী দামস্তর (Export Price level), মূলধনী দ্রব্যের দামস্তর (Capital-goods Price level) ইত্যাদি। বিভিন্ন স্চক সংখ্যার সাহায্যে এই সকল বিভিন্ন দামস্তরে পরিবর্তন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থের মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা চলে।

অনুশীলনী

1. How would you measure changes in the value of money ? (B.Com. '41, '48)

2. Examine the difficulties you have to face in constructing an Index number showing changes in the purchasing power of Money (B. Com. '51, '55)

3. What are Index Numbers ? Point out their usefulness. (B. A. '55)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থের মূল্যে পরিবর্তন

অর্থের মূল্য কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং কোন শক্তি সমূহের কার্যের ফলে অর্থের মূল্যে পরিবর্তন হয়, তাহার সম্বন্ধে দুই জাতীয় তত্ত্ব প্রচলিত আছে: পরিমাণতত্ত্ব এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ত্ব। পরিমাণতত্ত্ব আবার প্রধানতঃ দুই ধরণের: ফিসারীয় পরিমাণ তত্ত্ব এবং কেম্ব্রিজ তত্ত্ব।

ফিসারীয় পরিমাণ তত্ত্ব (Fishers' Quantity theory):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানী ফিসারের অভিমতে অর্থের মূল্য অপরাপর দ্রব্যের মূল্যের ন্যায় অর্থের যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করে। অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হয় অর্থের সহিত বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হইতে। অর্থের যোগান বলিলে বুঝায় মোট নগদ ও ব্যাঙ্ক ঋণ-এর পরিমাণকে উহাদের নিজস্ব প্রচলনবেগ (velocity of circulation) দ্বারা গুণফলের যোগসমষ্টি। ফিসার তাহার তত্ত্বকে যে সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইল,

অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগান

$$দ = \frac{অ \times প্র + অ' \times প্র'}{দ্র}$$

দ হইল দামস্তর, এবং দ্র হইল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির পরিমাণ যাহা অর্থের সহিত বিনিময় হয়। অ বলিতে আইনচালু মুদ্রার পরিমাণ এবং অ' বলিতে সমাজে ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ বোঝা যায়। প্র হইল আইনচালু মুদ্রাব প্রচলনবেগ এবং প্র' ঋণরূপ অর্থের প্রচলনবেগ। নির্দিষ্ট সময়ে একটি মুদ্রা অর্থনৈতিক কাজকর্মে কতবার এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তির নিকট সঞ্চালিত হয়, তাহাই উহার প্রচলন-বেগ। সমাজে আইন চালু অর্থের গড়ও প্রচলনবেগ দ্বারা ওইরূপ অর্থ ও ব্যাঙ্কঋণের গড় প্রচলনবেগ দ্বারা ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণকে গুণ করিলে অর্থের মোট যোগান পাওয়া যায়।

সমীকরণের ব্যাখ্যা

ফিসারের অভিমতে স্বল্পকালে দ্র, প্র, প্র' এবং অ ও অ' এর অনুপাত পরিবর্তিত হয় না। দ্র হইল অর্থের সহিত বিনিময়ীকৃত সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ; ইহা নির্ভর করে প্রধানতঃ জনসংখ্যা, ভোগের পদ্ধতি, উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতি, সমাজে অর্থবর্জিত পণ্যবিনিময়েব পরিমাণ, ইত্যাদির উপর। প্র এবং প্র' জনসাধারণের রীতিনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অ এবং অ' এর অনুপাত নির্ভর করে ব্যাঙ্কপরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম ও প্রচলিত রীতিনীতির উপর। এই সকল বিষয়সমূহ কেহই স্বল্পকালে বিশেষ পরিবর্তিত হয না। সুতরাং দামস্তর বা দ নির্ভর করে আইনচালু অর্থের পরিমাণ বা অ-এর উপর। অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলে দামস্তরে সরাসরি ও সমহারে পরিবর্তন হইয়া থাকে।

কেন অর্থের মূল্য পরিমাণের উপর নির্ভর করে

ফিসারীয় সমীকরণকে এইভাবেও প্রকাশ করা যায় যে দ, দ্র = অপ্র + অপ্র'। অর্থাৎ সমাজের মোট ক্রয়ে যে পরিমাণ অর্থ নিযুক্ত হইল ঠিক সমান পরিমাণ অর্থের সামগ্রীই বিক্রয় হইয়াছে, সমাজে মোট ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ সমান। অর্থের পরিমাণ এবং উহাব গড় প্রচলনবেগের গুণফল হইল মোট ক্রয়মূল্য, দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে যাহা ব্যয় করা হইয়াছে; দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ এবং গড় দামস্তরের গুণফল হইল দ্রব্যসামগ্রীর মোট বিক্রয় মূল্য। অর্থের পরিমাণ যদি ২০০ ধরা হয়, গড় প্রচলন বেগ যদি ৩ হয়, সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ যদি ১০০ হয়, তাহা হইলে দামস্তর হইবে ৬ $\left(\text{কারণ } \frac{\text{অপ্র}}{\text{দ্র}} = \text{দ অর্থাৎ } \frac{২০০ \times ৩}{১০০} = ৬\right)$ যদি অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪০০ হয়, তাহা হইলে দামস্তরও ১২ হইবে; অর্থের পরিমাণ ১০০ হইলে দামস্তরও অর্ধেক অর্থাৎ ৩

উদাহরণ

হইবে। অর্থের পরিমাণ সমান থাকিয়া যদি দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, দামস্তর কমিবে; যদি দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হ্রাস পায় তাহা হইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে।

সমালোচনা

অর্থের মূল্যের পরিমাণতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রধান সমালোচনা যে ইহা ধরিয়া লয় সমাজে অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে সরাসরি ও সমানুপাতে অর্থের মূল্যে পরিবর্তন আসিবে। অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলে অন্যান্য শক্তিসমূহ প্রভাবান্বিত হয় না, ইহা স্বীকার করিয়া এই তত্ত্ব আলোচিত হয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে এরূপ কখনই ঘটেনা যে অন্যান্য শক্তিসমূহ স্থির ও নিশ্চল। কারণ অর্থের পরিমাণে (অ-তে) পরিবর্তন আসিলে অবশ্যই প্রচলনবেগ (প্র) এবং দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে (দ্র) পরিবর্তন হয়। অ' সর্বদা অ-এর নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করিয়া চলে, তাহাও ঠিক নহে। সুতরাং, দামস্তরে পরিবর্তন কেবলমাত্র অর্থের পরিমাণে পরিবর্তনের ফল নহে, এক বিষয়ের পরিবর্তন অন্যান্য সকল বিষয়কে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহাদেরও পরিবর্তন আনিয়া ফেলে।

সমীকরণ গঠনকারী বিষয়গুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ও পারস্পরিক প্রভাবশীল

ফিসারীয় সমীকরণ প্রকৃতপক্ষে অভেদ (Identity) মাত্র। দেশে মোট ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ সমান, সমীকরণ হইতে শুধু ইহাই জানা যায়; কিন্তু কি ভাবে, কোন্ পথে, কোন্ শক্তিসমূহের পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতের ফলে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন দামস্তরে পরিবর্তন আনে, তাহা এই সমীকরণ বা তত্ত্বের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। আর্থিক সমস্যা বিশ্লেষণে মূল কার্য হইল সমস্যাটিকে গতিশীলভাবে আলোচনা করা, অর্থের ও দ্রব্যের স্রোতকে যুক্ত করিয়া অভেদ বা নিশ্চল সমীকরণ দাঁড় করান নহে।

কার্যকারণের ধারা প্রকাশ করে না

অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন বিভিন্ন দ্রব্যের দাম-কে সমানভাবে পরিবর্তিত করে না; বিভিন্ন দ্রব্যের দামে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন হারে পরিবর্তন আনে। দামস্তরে বা বিভিন্ন দ্রব্যের গড় দামে পরিবর্তন এইরূপ পৃথক পৃথক দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের সমষ্টিগত ফলাফল। অর্থের পরিমাণে পরিবর্তনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে কোন বিশেষ দ্রব্যের দামে পরিবর্তন দামস্তরে পরিবর্তনের তুলনায় বহু অধিক হয়। অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন প্রত্যেকটি দ্রব্যের দামে কিভাবে এবং কিরূপ পরিবর্তন আনিতেছে, তাহা এই তত্ত্ব হইতে জানা যায় না।

আপেক্ষিক দামে পরিবর্তন ও উহাতে তারতম্য ব্যাখ্যা করিতে পারে না

ইহাও মনে রাখা দরকার যে এই তত্ত্ব ধরিয়া লয় যে স্বল্পকালে প্র অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ সমাজে পূর্ণ কর্ম নিয়োগ বর্তমান আছে, অনিযুক্ত উপকরণ সমাজে নাই। সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকিলেই সেই বিশেষ স্তরে ইহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে (সুদের হার কমিয়া) দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে এবং দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, দামস্তর প্রথমেই প্রভাবান্বিত না হওয়ারই সম্ভাবনা। সুতরাং এই তত্ত্ব সকল স্তরেই কার্যকরী নহে।

পূর্ণকর্মসংস্থান ধরিয়া লইলে এই তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য বটে, কিন্তু অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে নহে

বিভিন্ন দেশের আর্থিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বাণিজ্য চক্রের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির শীর্ষে যখন হঠাৎ ব্যবসাবনতি সুরু হয়, দামস্তর তখন হঠাৎ কমিয়া যায়, কিন্তু সমাজে অর্থের পরিমাণ বেশীই থাকে। অর্থের পরিমাণ খুবই বেশী রহিয়াছে, কিন্তু সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া দামস্তরে বৃদ্ধি হইতেছে না, ইহাও ধনবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা। সুতরাং দেখা যায় যে বাণিজ্যচক্র বিশ্লেষণ বা দামস্তরে সহসা উত্থান পতন অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না।

বাণিজ্যচক্র ব্যাখ্যা করিতে পারে না

সর্বশেষে ইহা মনে রাখা দরকার যে অর্থমূল্যের পরিবর্তন বা অর্থের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন সঠিকভাবে বুঝিতে গেলে দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে শিল্পসংক্রান্ত, ব্যবসাসংক্রান্ত, শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি, অর্ধনির্মিত এবং অপূর্ণনির্মিত ইত্যাদি সকল প্রকার জিনিষ অর্থের সহিত বিনিময় হইতেছে বলিয়াই তাহাদের হিসাব করিতে হইবে, ইহা ঠিক নহে। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে বহু দ্রব্য আছে যাহাদের অর্থের ক্রয়শক্তি বা অর্থমূল্য নির্ধারণে হিসাব না করাই বাঞ্ছনীয়; সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী মিলিয়া এইরূপ নগদ লেনদেন-স্তরমান (Cash-Transactions Standard) আর্থিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ উপযোগী নহে; ব্যক্তির জীবন যাত্রার মান পর্যালোচনার উপযোগী অর্থের বাস্তব ক্রয়শক্তি ইহাদ্বারা জানা যায় না। শুধু তাহাই নহে, জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময়ে সর্বশেষ স্তরের সম্পূর্ণোৎপন্ন (Final Product) দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যকেই ধরা হয়; কিন্তু ফিসারীয় দ্রব্যসামগ্রীর (দ্র) মূল্য (অথাৎ দদ্র অর্ধ অপূর্ণ নির্মিত প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রীকে হিসাবে ধরায় ইহা জাতীয় আয়কে পরিমাপ করে না, ফলে কর্মনিয়োগের স্তর বা আয়স্তরের

বাস্তব ক্ষেত্রে ফিসারীয় লেনদেনের স্তরমান অর্থের মূল্য প্রকাশ করিতে পারে না

নির্ধারণও এইরূপ 'জগাখিচুড়ি দামস্তরের' (Hotch-potch price-level) দ্বারা সম্ভব হয় না।

কেম্ব্রিজ সমীকরণ (Cambridge Equation):

কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষতঃ মার্শাল, অর্থমূল্যের পরিমাণ তত্ত্বের ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। ফিসারীয় সমীকরণে অর্থের চাহিদা বলিলে বোঝা যায় অর্থের সহিত বিনিময় যোগ্য সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর স্রোতধারা, বিনিময়-যোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণের দ্বারা অর্থের চাহিদা স্থির হয়। কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্যই চাহিদা সৃষ্টি হয় না, সুতরাং সেইরূপে হিসাব করার প্রয়োজনও নাই। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কিছু পরিমাণ অর্থ দ্রব্যাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ধরিয়া রাখিতে চান বা হাতে জমাইয়া রাখিতে চান। অর্থাৎ মোট দ্রব্যসামগ্রীর বা আসল আয়ের (Real Income) কিছু অংশ ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে অর্থের চাহিদা করে: অর্থের জন্য সকল ব্যক্তির এইরূপ চাহিদা যোগ করিলে সমাজে অর্থের মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

মনে করা যাক দেশে ১০০ খানা কাপড় সমাজের মোট আসল আয় (Real Income)। ইহার কিছু অংশ, ধরা যাক্ $\frac{৪}{৫}$ অংশ হিসাবে ৮০ খানা কাপড় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনিময় হইবে। সমাজের যত অর্থ আছে, তাহা দিয়া ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে সকলে মিলিয়া ৮০ খানা কাপড় ক্রয় করিতে চায়, সুতরাং সকল অর্থ এই ৮০ খানা কাপড় ক্রয়েই ব্যয়িত হইবে। যদি দেশে অর্থের যোগান ৪০০ টাকা হয় তাহা হইলে প্রত্যেকটি কাপড় ক্রয় করিতে ৫ টাকা ব্যয় হইল, প্রত্যেকটি কাপড়ের গড় দামস্তর হইল ৫। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে দামস্তর বৃদ্ধি হইবে, কারণ সেই বর্ধিত অর্থও ৮০টি কাপড় ক্রয়ের উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইবে। অর্থের পরিমাণ কমিলে দামস্তরও কমিবে।

কেম্ব্রিজ তত্ত্বকে সমীকরণ বা ফর্মুলার আকারে নিম্নলিখিতভাবে লেখা যায়।

আ হইল সমাজের আসল আয় (১০০); নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল আয়ের যে আনুপাতিক অংশ লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং যাহার জন্য তাঁহারা অর্থের চাহিদা করে তাহা হইল চ ($\frac{৪}{৫}$); অর্থের পরিমাণ হইল অ (৪০০)। তাহা হইলে

অ পরিমাণ অর্থ দিয়া তাহারা চ আ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহে; অর্থের মূল্য হইল অর্থের বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায় অর্থাৎ $\frac{\text{চ আ}}{\text{অ}}$।

অর্থের মূল্যের বিপরীত হইল দামস্তর, সুতরাং উপরোক্ত সমীকরণকে উল্টাইয়া স্থাপন করিলে দামস্তর বা দা পাওয়া যায়; অর্থাৎ দা$=\frac{\text{অ}}{\text{চ আ}}$।

এই তত্ত্ব ও সমীকরণের আরও অনেকরূপ প্রচারিত হইয়াছিল; কেইন্‌স, পিগু সকলেই কোন না কোন বিষয়ের উপর জোর দিয়া নিজ নিজ সমীকরণ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিসারীয় পরিমাণতত্ত্ব বা কেম্ব্রিজ পরিমাণতত্ত্বে কোন মৌলিক প্রভেদ নাই; ফিসারীয় পরিমাণ তত্ত্বের সমালোচনাসমূহ কেম্ব্রিজ পরিমাণ-তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফিসারীয় তত্ত্বে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, অর্থের সহিত বিনিময় করা হইল এইরূপ সকল দ্রব্য সামগ্রীর গড় দামস্তর বা অর্থের মূল্য বাহির করার চেষ্টা করা হইয়াছে; রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল 'উড্ডীয়মান' অর্থের মূল্য (Value of "Money on the wing")। কেম্ব্রিজ তত্ত্বে, নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতের লেন দেনের জন্য হাতে জমা রাখা অর্থের মূল্য বাহির করার চেষ্টা হইয়াছে; রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল 'উপবিষ্ট' অর্থের মূল্য (Value of "Money Sitting")।

অর্থের পরিমাণ ও অর্থের মূল্য (Quantity of Money and the Value of Money).

কেইন্‌সের অভিমতে অর্থের পরিমাণ দামস্তরকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করে না, বহুপ্রকার বিষয় ও শক্তিকে প্রভাবান্বিত করিয়া পরোক্ষভাবে দামস্তরের উঠানামা নিয়ন্ত্রণ করে এবং অর্থের মূল্যে পরিবর্তন আনে। অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিয়া অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে, সুদের হার কমিয়া যায়। সুদের হার কমিলে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, অনিযুক্ত উপাদানসমূহ ক্রমে নিয়োজিত হইতে থাকে। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে তাই কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই দামস্তর বৃদ্ধি পায় না। যতদিন পর্যন্ত সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর না আসে ততদিন দামস্তর বৃদ্ধি না পাইবারই সম্ভাবনা। পূর্ণ কর্মসংস্থানের পরেও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে উপাদানসমূহের দাম বাড়িতে থাকে, ফলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি হয় এবং দামস্তর বাড়িয়া যায়। সমাজে অপূর্ণ কর্মনিয়োগ থাকিলে

• কিভাবে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন দামস্তরে পরিবর্তন আনে

অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কর্মনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, পূর্ণ কর্মনিয়োগের পরে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে দামস্তর বৃদ্ধি পায়।*

দামস্তরে স্বল্পকালীন পরিবর্তন আনয়নকারী বিষয় সমূহ—(Factors bringing Short Period changes in the Price level).

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলে দামস্তরে পরিবর্তন আসে। অর্থের পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বাড়ে, অর্থের পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে; ইহাদের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক।

সঞ্চয়ে পরিবর্তন হইলে

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে দামস্তরে পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক আয় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চিত অংশ যোগ করিয়া সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি এককভাবে পূর্বাপেক্ষা নিজের আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে সমাজের মোট সঞ্চয় বৃদ্ধি হয় না। ব্যক্তির অধিক সঞ্চয়ের ফলে নিশ্চয়ই কোন না কোন দ্রব্যের বিক্রেতার আয় কমিয়া যাইবে, ফলে তাহার সঞ্চয় কমিবে। সুতরাং ইহাতে সমাজের মোট সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হইবে না। কোন ব্যক্তির ব্যয় বৃদ্ধি হইলে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি হয়, কোন ব্যক্তির ব্যয় কমিলে, অন্যান্য ব্যক্তির আয় কমিয়া যায়।

অর্থের পরিমাণ বাড়িলে সুদের হার কমে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া দ্রব্যসামগ্রীর, উপকরণ প্রভৃতির জন্য কার্যকরী চাহিদা বাড়ে; কিন্তু অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি ও কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি ঠিক নির্দিষ্ট একই হারে ঘটে, ইহা স্বীকার্য বিষয় হিসাবে ধরিয়া লওয়া যায় না। প্রথমত, অর্থের পরিমাণ কিরূপ বাড়াইলে, সুদের হার কতখানি কমিবে, এবং দ্বিতীয়ত, সুদের হার কতখানি কমিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি বা কার্যকরী চাহিদার কিরূপ বৃদ্ধি হইবে, ইহাদের কোন নিশ্চয়তা নাই। যেমন প্রথমক্ষেত্রে, অর্থের পরিমাণ বাড়াইলে লেনদেনের অভিপ্রায়ে নগদ তরল অর্থ লোকে পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে রাখিতে পারে, বা দামস্তর বাড়িবে এই ধারণায় ফাটকা লগ্নীর অভিপ্রায়েও পূর্বাপেক্ষা অধিক নগদ অর্থ হাতে রাখিতে পারে। ফলে সুদের হার কমিল না বা খুবই অল্প কমিল (যাহাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইল না), এরূপ ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে মোট আয় ও কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ কত বৃদ্ধি হইল তাহা নির্ভর করিবে গুণকের আয়তনের উপর, অর্থাৎ, বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে নূতন বর্ধিত আয়ের কি অংশ ধনিক ও গরীব শ্রেণীর হাতে গেল, তাহার উপর।

সুতরাং অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধি হইলেই কার্যকরী চাহিদা বাড়িয়া উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইয়া সমাজ পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরে পৌঁছিয়া যাইবে—পথ এত সরল নহে। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি ও আয়ের পরিমাণবৃদ্ধির সম্পর্ক জটিল—অন্তত, পরিমাণগত ভবিষ্যৎবাণী করা চলে না। অর্থের পরিমাণবৃদ্ধির ফল নির্ভর করে: (ক) নগদ পছন্দের উপর ইহার প্রভাব, (খ) গুণকের আয়তন এবং (গ) মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার উপর ইহার প্রভাব—সঠিকভাবে ইহাদের কাহারও সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই পরিমাণগত পরিমাপ করা চলে না।

কিন্তু সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় নির্ভর করে মোট জাতীয় আয় ও গড সঞ্চয়-প্রবণতার (Propensity to consume) উপর। দেশে গড সঞ্চয়-প্রবণতা বাড়িয়া গেলে, অর্থাৎ আয়েব সহিত সঞ্চয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পাইলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। পূর্বাপেক্ষা মোট আর্থিক আয়ের কম অংশ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে, ভোগ্য দ্রব্যের দামস্তর কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, সঞ্চয়-প্রবণতা কমিয়া গেলে মোট আর্থিক আযের অধিক অংশ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হওযায়, উহাদের দামস্তর বাডিবার ঝোঁক দেখা দিবে।

বিনিয়োগে পরিবর্তন হইলে

বিনিয়োগ বলিলে বুঝা যায় নূতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থ লগ্নী করা। সমাজ অপূর্ণ কর্মনিযোগের স্তরে থাকিলে বিনিযোগ বৃদ্ধি হইলে অনিযুক্ত উপাদান-সমূহের নিযোগ বাডিতে থাকে। নূতন কার্যে নিযুক্ত এই সকল উপাদান সমূহেব মালিকদের আর্থিক আয বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা ভোগদ্রব্য ক্রয়ে অধিক ব্যয় কবিতে থাকায় দ্রব্য সামগ্রীব চাহিদা, উৎপাদনের পবিমাণ, উপাদানের নিয়োগ, আর্থিক আয় ক্রমেই বাডিতে থাকে। কোন কোন উপাদানেব পরিমাণ দেশে কম থাকিলে তাহাদের পূর্ণ নিয়োগ ঘটিবে, দাম বাডিতে থাকিবে, উৎপাদনেব ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, দামস্তবও ক্রমে বাডিযা যাইবে। পূর্ণ নিযোগেব স্তবে সমাজ পৌঁছিলে বিনিযোগ বৃদ্ধিব ফলে দামস্তব বাডে। দেশে বিনিযোগ কমিলে ইহাব বিপরীত ফলাফল হইবে। উপাদান-সমূহের নিযোগ কম হইবে, তাহাদের আর্থিক আয় কমিয়া যাইবে, দ্রব্য সামগ্রীব উপব মোটব্যয় কমিতে থাকিবে, দামস্তব হ্রাস পাইতে থাকিবে।

বিনিয়োগে পবিবর্তনই প্রধান

সুতবাং দেখা যায়, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঞ্চয়-প্রবণতা ও বিনিযোগের পবিমাণের উপর দামস্তর নির্ভব কবে। কিন্তু সাধাবণভাবে দেখা যায়, সঞ্চয়-প্রবণতা মোটামুটিভাবে স্থাযী ও অপরিবর্তনশীল। লোকের অভ্যাস, জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে তাহাদেব চিন্তা ধারণা ইত্যাদিব উপর ইহা নির্ভরশীল, দীর্ঘকালে ইহার পরিবর্তন ঘটিলেও স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে ইহা মোটামুটিভাবে স্থির। সুতরাং, বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তনই প্রধান শক্তি, ইহার ফলেই স্বল্পকালে দামস্তরে পরিবর্তন আসে। বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন সমাজের মোট আর্থিক আয়কে এবং ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণকে পরিবর্তিত করে, দামস্তর তাহার ফলে পরিবর্তিত হয়।*

* [সঞ্চয় ও বিনিযোগ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা "কর্মসংস্থানতত্ত্ব" পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে]

মনে রাখা দরকার যে পৃথকভাবে কোন দ্রব্যের দাম নির্ভর করে উহার উৎপাদন-ব্যয়ের উপর এবং উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে সেই উৎপাদন-ব্যয়ে পরিবর্তন আসে। অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও পৃথকভাবে কোন বিশেষ দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। তবে, অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলে সুদের হারে পরিবর্তন ঘটিয়া উৎপাদন-ব্যয়ও পরিবর্তিত হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিবর্তন সমাজের আর্থিক আয় ও কর্মনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনে, সুতরাং বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদাও পৃথকভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপে সঞ্চয় ও বিনিয়োগও বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর দামের উপর পৃথক পৃথক ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

পৃথকভাবে কোন দ্রব্যের দামে পরিবর্তন

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) :

দেশে আইনচালু অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে যদি দামস্তর বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে সেইরূপ অবস্থাকে, সাধারণভাবে, মুদ্রাস্ফীতি বলা হইয়া থাকে। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই যে দামস্তর বৃদ্ধি হইবে তাহা নহে; যদি অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অর্থের সহিত বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ দেশে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দামস্তর বাড়িবে না, মুদ্রাস্ফীতিও ঘটিবে না। কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ সমান থাকিলে বা উহার বৃদ্ধির তুলনায় দেশের অর্থের পরিমাণ অধিকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তবেই তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।)

মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে

অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই যে দামস্তর বৃদ্ধি হইবে এরূপ নহে, কারণ বর্দ্ধিত অর্থ লোকে ব্যয় না করিয়া মজুত করিয়া রাখিতে পারে। বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় সমাজের ব্যয়োপযোগী আয় বা মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িলেই দেশে দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। (অধ্যাপক পিগু তাই বলিয়াছেন "আর্থিক আয় যখন আয়সৃষ্টিকারী কার্যের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে" তখন তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা চলে।) অধিক কর্মনিয়োগের ফলে সমাজের মোট আর্থিক আয় বাড়িলে দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদাও বর্ধিত হইবে। দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন যতদিন বাড়িবে, ততদিন দামস্তর বাড়িবে না। কিন্তু ক্রমে যখন উৎপাদনকারী কাজকর্মের বা আয়সৃষ্টিকারী কার্যের পরিমাণ আর অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধির তুলনায় বাড়িতে পারে না, তখনই দামস্তর বাড়িতে থাকে।

সমাজের ব্যয়-স্রোতে বৃদ্ধি

প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি

(কেইন্‌সও বলিয়াছেন যে পূর্ণনিয়োগ স্তরের পরেই একমাত্র প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (True Inflation) দেখা দিতে পারে।) অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে সুদের হার কমিবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে, অনিযুক্ত উৎপাদন সমূহের নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবে। (ক্রমে সমাজ পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌঁছিবে এবং তাহার পর অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধি দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বা উপাদানের নিয়োগ বাড়াইতে পারিবে না, দামস্তর বাড়াইয়া দিবে।) তবে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌঁছিয়া যদি ক্রমাগত শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ান হয়, তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি নাও ঘটিতে পারে। কিন্তু স্বল্পকালে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ান সম্ভব না-ও হইতে পারে, সুতরাং ততদিন মুদ্রাস্ফীতি চলিবে।

(অনেক সময় পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌঁছিবার পূর্বেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়, এরূপ অবস্থাকে কেইন্‌স্ আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (Semi-Inflation) বলিয়াছেন। শিল্পে অনুন্নত দেশে বা উন্নত দেশেও পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরে পৌঁছিবার পূর্বেই আধা-মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। এইরূপ আধা-মুদ্রাস্ফীতির ৫টি কারণ আছে। (ক) প্রথমতঃ, বর্ধিত অর্থের সকল পরিমাণ অধিক কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যে নিয়োজিত না হইতে পারে। যেমন, বর্ধিত অর্থের একাংশের সাহায্যে ফাট্‌কা ব্যবসার দ্বারা দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াতে পারে, এবং এইরূপ কয়েকটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে তাহা অপরাপর দ্রব্যের দামবৃদ্ধির জন্য চাপ দেয়। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর বাজার তেজী না হইয়া শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের বাজার তেজী হইয়া উঠিতে পারে।

আংশিক মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ

(খ) দ্বিতীয়তঃ, কোন উপাদান বা উপকরণের ইউনিটসমূহ সমনৈপুণ্য-বিশিষ্ট নহে। নিপুণ ইউনিটসমূহ প্রথমেই নিযুক্ত হইয়া যায়; উৎপাদন বাড়িলে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম নিপুণ ইউনিটসমূহ বা একেবারে অনিপুণ ইউনিট সমূহের সাহায্যে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে উৎপাদনব্যয় বাড়িতে থাকে এবং দামস্তর বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা দেয়। (গ) তৃতীয়তঃ, কতকগুলি উপাদানের যোগান খুবই কম থাকিতে পারে, ফলে অন্যান্য উপাদানসমূহ বেকার অবস্থায় থাকিলেও আর উৎপাদন বাড়ান অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। যে সকল উপকরণের যোগান হঠাৎ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে "গলাবন্ধের"

(Bottlenecks) সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের পরিবর্তে অন্য উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হইলে দামস্তরে বৃদ্ধি কম হইবে। এইরূপ অবস্থায় দামস্তরে বৃদ্ধির পরিমাণ ওই সকল উপকরণের বিনির্দিষ্টতার মাত্রার উপর নির্ভর করিবে। (ঘ) চতুর্থতঃ, ওই সকল উপকরণসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রমিকদল মজুরী বৃদ্ধির জন্য চাপ দিতে পারে কারণ ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির স্তরে দ্রব্য মূল্য কিছুটা বাড়ে। মজুরী বৃদ্ধি হইলে তাহা দুইভাবে দামস্তরকে বাড়াইয়া থাকে ; দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়াইয়া এবং দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া। (ঙ) পঞ্চমতঃ, স্বল্পকালে ফার্মের মাত্রাস্থির রাখিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় প্রান্তিক ও গড় উৎপাদনব্যয় কিছুটা বাড়ে এবং দামস্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকার ভেদ (Types of Inflation) :

লর্ড কেইন্‌স, তাঁহার 'ট্রিটিজ অন মানি' গ্রন্থে চারিপ্রকার মুদ্রাস্ফীতির কথা বলিয়াছেন ; (ক) দ্রব্যস্ফীতি (Commodity Inflation), (খ) মূলধনী দ্রব্যস্ফীতি (Capital Inflation), (গ) মুনাফারূপে মুদ্রাস্ফীতি (Profit Inflation) এবং (ঘ) আয়রূপে মুদ্রাস্ফীতি (Income Inflation).

দ্রব্য মুদ্রাস্ফীতি (Commodity Inflation) বলিলে বোঝা যায় যখন সঞ্চয়ের পরিমাণের তুলনায় বিনিয়োগের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে (The excess in the cost of investment over the volume of saving) ; অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্য সমূহের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় উহাদের দামস্তরে অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। **মূলধনী দ্রব্য** মুদ্রাস্ফীতি (Capital Inflation) বলিলে বোঝা যায় যে অবস্থায় নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় উহাদের দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন মূলধনী দ্রব্যের দামস্তরে বৃদ্ধি অর্থের ক্রয়ক্ষমতা প্রথমেই কমাইয়া দেয় না ; কিছুকাল পরে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা দ্রব্যমুদ্রাস্ফীতি ঘটায়।

মুনাফারূপে মুদ্রাস্ফীতি তখন ঘটে যে অবস্থায় দ্রব্যমূল্য স্থির আছে, কিন্তু উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া যাওয়ায় মোট মুনাফা পূর্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে। **আয়রূপে মুদ্রাস্ফীতি হইল** যে অবস্থায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উৎপন্ন দ্রব্য পিছু পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দক্ষতাজনিত পারিশ্রমিকের হার (rate of efficiency-earnings) বাড়িয়া গিয়াছে।

পরবর্তী কালে, কেইন্‌স **প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি** (True Inflation) এবং

ভুয়া মুদ্রাস্ফীতির (False Inflation) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানের পূর্বে কোন কোন উপাদানের যোগান কম থাকায় বা বিভিন্ন প্রকার "গলাবন্ধের" দরুণ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া ভুয়া মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিতে পারে। অনেক সময় প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতিকে **পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি** (Full Inflation) এবং ভুয়া মুদ্রাস্ফীতিকে **আংশিক মুদ্রাস্ফীতি** (Partial Inflation) বলা হয়।

অধ্যাপক পিগুর মতে মুদ্রাস্ফীতি দুই প্রকারের: **ঘাট্‌তি ব্যয়ের চাপ জনিত** (**Deficit Induced**) এবং মজুরীর চাপজনিত (**Wage-induced**)। দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরে বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধের প্রয়োজনে বা বিশেষ কারণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সমাজে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং সেই আয়ের ফলে দামস্তর বাড়িতে থাকে। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে সরকারী ব্যয় আরও বাড়াইতে হয়, নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া সেই ব্যয় বাড়ান হয়, ফলে মুদ্রাস্ফীতির আরও প্রসার ঘটে। ইহাকে ঘাটতিব্যয় জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির দরুণ শ্রমিকগণের সঙ্ঘবদ্ধ চাপের ফলে মজুরীর পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদন-ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়; বর্ধিত মজুরী দিবার জন্য ব্যবসায়ীরা মুনাফা না কমাইয়া দামস্তর বাড়াইয়া দেয়। শ্রমিকগণ পুনরায় মজুরী বৃদ্ধির জন্য চাপ দেয়। উৎপাদন-ব্যয় পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং দামস্তর আরও বর্ধিত হয়; এইরূপে চক্রাকৃতি গতিতে (Spiral movement) মুদ্রাস্ফীতি বাড়িতে থাকে, দামস্তরে বৃদ্ধি—মজুরী বৃদ্ধি দামস্তরে আরও বৃদ্ধি—এইরূপ এক দুষ্টচক্রের (Vicious Circle) সৃষ্টি হয়। ইহাকে মজুরীর চাপজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি আরও দুই ধরণের হইতে পারে, **উন্মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি** (Open Inflation) এবং **দমিত মুদ্রাস্ফীতি** (Suppressed Inflation)। সমাজের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি যখন অবাধভাবে দ্রব্যসামগ্রীর উপর চাহিদা বৃদ্ধি করিবার এবং দামস্তর বাড়াইবার সুযোগ পায়, তখন দামস্তরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে উন্মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। উন্মুক্ত মুদ্রাস্ফীতিরোধের কোনরূপ প্রচেষ্টা না হইলে উহা অবশেষে **উল্লম্ফনশীল মুদ্রাস্ফীতিতে** (Galloping Inflation) পরিণত হয়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, অল্পসময়ের মধ্যে, দামস্তরে অনবরত প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধিকে এবং ফলে অর্থের মূল্যে দ্রুত পতনকে উল্লম্ফনশীল মুদ্রাস্ফীতি বলা চলে। যদি মুদ্রাস্ফীতি রোধের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট হইতে অধিক অর্থ বা আয়

সরাইয়া না আনিয়া দ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বা রেশনিং চালু করা হয় অথবা বিনিয়োগের ক্ষেত্র (Investment-sector) কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দ্রব্যমূল্যে বিশেষ বৃদ্ধি না হইয়াও ব্যাঙ্ক-আমানতের পরিমাণ, নগদ অর্থের মজুতের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এইরূপ অবস্থাকে 'রুদ্ধ' বা 'দমিত' মুদ্রাস্ফীতি বলা চলে।

মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক বা মুদ্রাস্ফীতির অবকাশ (Inflationary gap) :

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ অর্থের পরিমাণতত্ত্ব অনুযায়ী অর্থের বা স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসাবে ধার্য করিতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কেইন্‌স্ দেশের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যা করেন এবং আধুনিক কালে এই উন্নততর ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক বা অবকাশ কাহাকে বলে

মুদ্রাস্ফীতি সুরু হইবার পূর্বে দ্রব্যাদির দামসমূহকে মূল-দামসমূহ (base prices) বলা হয়। এই মূল দামসমূহ দ্বারা বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে গুণ (multiplication) করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে সম্ভাব্য ব্যয়ের আধিক্যই মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক বা অবকাশ *

*An excess of anticipated expenditures over available output at base prices.

মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক = সম্ভাব্য ব্যয় − বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদি × মূল-দামসমূহ

মূল-দামসমূহে সকল বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যে অর্থের প্রয়োজন হয় যদি সম্ভাব্য ব্যয় তাহাই থাকে তাহা হইলে কোন মুদ্রাস্ফীতি আনয়নকারী ফাঁক সৃষ্টি হয় না, দামও বৃদ্ধি পায় না। সাধারণতঃ বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির মূল্য ও জাতীয় আয় সমান সুতরাং এক্ষেত্রে কোন ফাঁক সৃষ্টি হইতেছে না, দামস্তর স্থির আছে ও আর্থিক ভারসাম্য বজায় আছে। কিন্তু যদি পুরাতন সঞ্চিত আয় হইতে বা নূতন

এই ফাঁক কেমন করিয়া মুদ্রাস্ফীতি বা দামস্তরে বৃদ্ধি ঘটায়

অর্থ সৃষ্টি করিয়া জাতীয় আয় বা অর্থের স্রোতধারা বাড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সম্ভাব্য ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। এইরূপে সম্ভাব্য ব্যয় অধিক হইলেই বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ সমান থাকায় দামসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, মূল-দামসমূহের উপর অধিক ব্যয়ের চাপ পড়ে, দামস্তর বাড়ে ও মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। যেমন, বাজারে যত বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যাদি রহিয়াছে মূল-দামসমূহের হিসাবে উহাদের

মোট মূল্য হইল ১০০০ টাকা। যদি সম্ভাব্য ব্যয় ১০০০ টাকাই থাকে তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি হইবে না; কিন্তু যদি সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ ১৪০০ টাকা হয়, তাহা হইলে এই ৪০০ টাকা বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয় হইতে চাহিবে; ফলে দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যাইবে। এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি আনয়নকারী ফাঁক হইল ৪০০ টাকা।

সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হয় ভোগ-সঞ্চয়ের ধরণ ও কর-কাঠামোর (Consumption-savings patterns plus the tax structure) সম্মিলিত প্রভাবের দ্বারা; বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ স্থির হয় কর্ম-সংস্থানের অবস্থা ও যন্ত্রকৌশলগত কাঠামোর দ্বারা (Conditions of employment plus the technological structure)। নীচের উদাহরণ হইতে স্ফীতিসৃষ্টিকারী ফাঁকের রূপ আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

কিরূপে এই ফাঁক সৃষ্টি হয়

জাতীয় আয় ও দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয় = ১৬০০ টাকা

বিভিন্ন প্রকার কর (কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা স্থানীয়) = ২০০ টাকা

তাহা হইলে, ব্যয়োপযোগী আয় বা সম্ভাব্য ব্যয = ১৪০০ টাকা

মোট জাতীয় আয় (মূল দামসমূহের হিসাবে) = ১১০০ টাকা

অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির পূর্বেকার দামসমূহের হিসাবে)

আত্মভোগ (Self-consumption) বা বিক্রয়ের জন্য বাজারে অনুপস্থিত দ্রব্যাদির মূল্য = ১০০ টাকা

সুতরাং, বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যাদিব মূল্য (মূল দামসমূহের হিসাবে) = ১০০ টাকা

সুতবাং, মুদ্রাস্ফীতি আনয়নকারী ফাঁক = ৪০০ টাকা

আসলে অবশ্য ১৪০০ টাকার ব্যয়োপযোগী আয সবটাই ব্যয় হয় না, কিছুটা সঞ্চিত হয়। যদি স্বাভাবিক অবস্থায় জনসাধারণ শতকরা ১০% সঞ্চয় করে তাহা হইলে ১৪০ টাকা সঞ্চিত হইবে এবং ১২৬০ টাকা (১৪০০-১৪০) দ্রব্যাদি ক্রযে ব্যায়িত হইতে চাহিবে। এমতাবস্থায়, প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক হইল ২৬০ টাকা (১২৬০-১০০০)।

এই ফাঁক পূর্ণ করিতে হইলে (ক) সম্ভাব্য ব্যায়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে; হয় কর বসাইয়া বা সঞ্চয় বাড়াইয়া, অথবা (খ) বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

ফাঁক পূরণের উপায় কি

কেন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে (Why Inflation) ঃ

চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হইতেই মুদ্রাস্ফীতির চাপ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদা বলিতে বোঝা হয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবার জন্য সমাজে কি পরিমাণ ব্যয়োপযোগী আয় রহিয়াছে এবং এক্ষেত্রে যোগান বলিতে বোঝা হয় আর্থিক আয় ব্যয় করা যাইতে পারে এরূপ দ্রব্যসামগ্রীর কি পরিমাণ বাজারে রহিয়াছে। চাহিদার দিকে প্রধান মুদ্রাস্ফীতিকারী শক্তিসমূহ (Inflationary forces) হইল : (ক) অর্থের যোগান (খ) ব্যয়োপযোগী আয় (Disposable income) (গ) ভোগকারীদের ব্যয় ও ব্যবসায়ীদের লগ্নী। (ঘ) বৈদেশিক চাহিদা।

চাহিদার দিক হইতে কারণ সমূহ

(ক) ব্যবসাবাণিজ্যের বৃদ্ধির ফলে নগদ অর্থের যোগান যেমন বাড়ান হয় সেইরূপ ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ বা ঋণগত অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়। ব্যাঙ্কঋণের বৃদ্ধি একই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও ফল উভয়ই বটে। (খ) ব্যয়োপযোগী আয় নির্ভর করে কর-কাঠামোর উপর। যদি করভার কমান হয় তাহা হইতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বা মোট ব্যয় বাড়িয়া যায় যদি করভার বাড়ান হয় তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী আয় বা মোট ব্যয় কমে। শ্রমিকসঙ্ঘের চাপে মজুরীহারের বৃদ্ধি হইলেও সমাজে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়ে। (গ) ব্যবসা সমৃদ্ধির যুগে বেশী পরিমাণে নূতন মূলধন লগ্নী হয় এবং এই লগ্নী বিভিন্নরূপে, যেমন শেয়ারের লভ্যাংশ, মজুরী, কাঁচামাল ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রভৃতি দ্বারা সমাজের আয়-স্রোতে প্রবেশ করে। ইহার সহিত "কল্যাণ-রাষ্ট্রের" জনহিতকর কার্যে ব্যয় বা অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির (economic growth) দরুণ ব্যয় সমাজে মুদ্রাস্ফীতিকারী ফাঁক (Inflationary gap) আরও বাড়াইয়া দেয়।

(ঘ) দেশের দ্রব্য সামগ্রীর জন্য বৈদেশিক ব্যয়ও মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। যদি কোন দেশ নিয়মিতভাবে "রপ্তানীর উদ্বৃত্ত" (Export surplus) বজায় রাখিতে চাহে, তাহা হইলে দেশে আয়-স্তর বাড়ে এবং বিদেশী দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ কম হওয়ায় দেশী দ্রব্যের উপরই এই অধিক আয়ের চাপ পড়ে, আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যোগানের দিক হইতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবার অন্যতম কারণ হইল

(ক) উপাদানসমূহের পূর্ণনিয়োগ। কাঁচামাল, শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতা দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে। (খ) দেশ হইতে বিদেশে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানীও আভ্যন্তরীণ যোগান কমাইয়া দেয়। রপ্তানীর উদ্বৃত্ত একদিকে আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে দেশে দ্রব্যের যোগান কমাইয়া দেয়।

যোগানের দিক হইতে কারণ সমূহ

যে সকল দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বিশেষ শক্তিশালী, তাহাদের অধিক রপ্তানী মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ আরও বাড়াইয়া দেয়।

অর্থের চাহিদা ও যোগান অথবা মোট ব্যয় ও মোট দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে মুদ্রাস্ফীতিকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা ও আশা (Expectations) মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও ইহার গতি নির্ণয় করে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ও আন্দাজী ধারণা চারি প্রকারে মুদ্রাস্ফীতির প্রসার-বেগকে প্রভাবান্বিত করে। (ক) ভবিষ্যতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িবে, এই ধারণার ফলে বর্তমানেই বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, ফলে মুদ্রাস্ফীতির গতিবৃদ্ধি সুরু হইতে পারে। (খ) ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি হইবে এইরূপ ধারণার ফলেও বর্তমানেই দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যৎ আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা যত প্রবল ততই বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা; প্রধানতঃ ইহা নির্ভর করে আয়-জনিত চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার (Income-elasticity of Demand) উপর। উদ্যোক্তাগণ বা ব্যবসায়ীরাও ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধির ধারণা অনুযায়ী বর্তমানে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকে। (গ) ভবিষ্যতে মজুরীর হার বৃদ্ধি হইতে পারে এই ধারণার ফলে ব্যবসায়ীরা বর্তমানেই দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। (ঘ) ভবিষ্যৎ বৈদেশিক চাহিদা সম্বন্ধে ধারণা বর্তমানের উৎপাদন ও দামকে প্রভাবান্বিত করে।

দাম ও আয় সম্বন্ধে স্বল্প-কালীন ও দীর্ঘকালীন আশানিরাশা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিনিয়োগ-কারীদের ধারণা

অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলাফল (Effects of Changes in the Value of Money):

উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর প্রভাবঃ দামস্তর বৃদ্ধি বা দামস্তর হ্রাস অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা সঙ্কোচন (Deflation) দেশে উৎপাদনের এবং কর্ম-সংস্থানের পরিমাণের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। দামস্তর বর্ধিত হইলে কর্ম-

নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, উৎপাদনের প্রসার হয়। অধিক মুনাফা লাভের আশায়, ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়িবে এই ভরসায়, ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাদের বিনিয়োগের বৃদ্ধি সমাজে মোট আয়ের পরিমাণকে আরও বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতিকে ক্রমেই প্রবলতর করিয়া তোলে।) বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকলই পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে বাড়িতে থাকে, ঘূর্ণিচক্রের (Spiral) গতিতে ইহারা প্রসার লাভ করে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলাফল সকল সময়ে শুভ নহে, উৎপাদন-ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও ফাট্‌কা মনোভাব বৃদ্ধি পায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় উদ্যোক্তাগণ ও ফাট্‌কাদারগণ অসঙ্গত আশাবাদের ঝোঁকে সমাজে দ্রব্যের প্রয়োজন ও উহার বিক্রয়-যোগ্যতার কথা চিন্তা না করিয়া অহেতুক উৎপাদনকে ফাঁপাইয়া তোলেন। এই সকলের পুঞ্জীভূত ফল হইল অত্যুৎপাদন এবং হঠাৎ ব্যবসা-সঙ্কটের সৃষ্টি, ব্যবসা-সমৃদ্ধির বুদ্বুদ হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকল কিছুকে অস্বাভাবিক ভাবে কমাইয়া দেয়। অবিক্রীত দ্রব্যের বোঝা বাড়িতে থাকে, অস্বাভাবিক নিরাশাবাদের ঝোঁকে সঙ্কট গভীরতর হইতে থাকে। দামস্তর কমিতে থাকিলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, বিনিয়োগ সবই কম হয়। সম্ভাব্য মুনাফার হার কম থাকায় মুদ্রাসঙ্কোচনের (Deflation) সৃষ্টি হয়।

উৎপাদনের উপর প্রভাব

(মনে রাখা দরকার যে, অনুন্নত দেশসমূহে বা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে অল্প-মাত্রায় মুদ্রাস্ফীতি প্রয়োজনীয় এবং উহা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক বলিয়া আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন।) অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির সহায়ক হিসাবে, সমাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতে ইহা সাহায্য করে। (তবে, লক্ষ্য রাখা দরকার যে ইহা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া না যায়, আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়া ইহাকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্যবহার করা চলিতে পারে।)

বণ্টনের উপর প্রভাব : (দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের উপর মুদ্রাস্ফীতি বিভিন্ন প্রকার প্রভাব বিস্তার করে ; সমাজের একাংশ হইতে সম্পদ অপর অংশের হাতে চলিয়া যায়।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে ঋণগ্রহীতাগণের সুবিধা, কারণ মুদ্রাস্ফীতিতে তাহাদের আয় বৃদ্ধি হওয়ায় ঋণপরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অর্থের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় তাহারা সমান পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিলেও দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে

তাহাদের কম পরিশোধ করিতে হইতেছে।) দামস্তর বেশী থাকায় অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়াছে এবং সেই কম-ক্রয়ক্ষমতা বিশিষ্ট অর্থের সাহায্যে ঋণ পরিশোধ করিলে দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাকে কম দিতে হইতেছে। (ঋণদাতাগণেব অসুবিধা, কারণ মুদ্রাস্ফীতির পূর্বে অর্থের মূল্য যখন বেশী ছিল সেই অবস্থায় তাঁহারা ঋণ দিয়াছিলেন এখন সেই ঋণের পরিশোধ হইলেও সমপরিমাণ অর্থের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে।) তবে যদি ক্রয়-ক্ষমতা কমে নাই এমন বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণের পরিশোধ সে পায় তাহা হইলে ঋণদাতার লোকসান হয় না। সাধারণ ভাবে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির ঋণদাতা হিসাবে লোকসান হইলেও ঋণগ্রহীতা হিসাবে লাভ হইতেছে; সমাজের ব্যক্তিগণ একই সঙ্গে সাধারণতঃ ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতারূপে কাজ চালায়। ৮

ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা

(মুদ্রাস্ফীতির সময়ে উদ্যোক্তাগণের সুবিধা হয় কারণ দামস্তর বৃদ্ধিতে অধিক মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহাদের লাভ বাড়িবার সম্ভাবনা।) তাহা ছাড়া সাধারণতঃ তাঁহারা ঋণগ্রহীতা, সুতরাং মুদ্রাস্ফীতিতে কম ক্রয়ক্ষমতা বিশিষ্ট অর্থের সাহায্যে তাঁহারা ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। দাম-বৃদ্ধি এবং ব্যয়-বৃদ্ধির মধ্যে কিছুদিন সময়ের ফাঁক (time-lag) থাকে, যতদিন না পর্যন্ত শ্রমিকের মজুরী, কাঁচামালের দাম, যন্ত্রপাতির দাম বা সুদের হার বৃদ্ধি পায় ততদিন তাঁহারা দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সুবিধা লাভ করেন। "স্বাভাবিক মুনাফা" হইতে বাস্তবে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ খুবই বেশী থাকে। মুদ্রাসঙ্কোচনের সময় উদ্যোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হর্ন, কারণ তাঁহারা সাধারণতঃ ঋণগ্রহীতা এবং দ্রব্যের দামহ্রাস ও উহার ব্যয়হ্রাসের মধ্যে কিছুকাল সময়ের ফাঁক থাকে।

উদ্যোক্তা

(দাম ও মজুরী উভয়ের দৌড়ে মজুরী কখনও জেতে না, তাই শ্রমিকগণ বা মজুরী আয়কারীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাহাদের আয় স্থির ও নির্দিষ্ট, সুতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে তাঁহারা নির্দিষ্ট আয়ের দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাইয়া থাকেন।) দামস্তর বৃদ্ধির হারের তুলনায় মজুরী বৃদ্ধির হার কম থাকে, সুতরাং দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাঁহাদের আয় কমিয়া যায়, আর্থিক আয়ের বৃদ্ধি হইলেও আসল আয় কমে। পেনশনভোগী বা নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদেরও এই প্রকার অসুবিধা হয়। (তবে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রেণীহিসাবে শ্রমিকের সুবিধা, বেকারী বা কর্মে অনিযুক্ত থাকার সম্ভাবনা বিশেষ কম।)

শ্রমিক ও বেতনভোগী

(বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাঁহারা শেয়ার প্রভৃতিতে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছেন, মুদ্রাস্ফীতিতে তাঁহাদের সুবিধা হয়; কিন্তু যাঁহারা নির্দিষ্ট সুদ বা আয় লাভের জন্য বণ্ড বা ডিবেঞ্চারে অর্থবিনিয়োগ করেন, তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। নিম্ন মধ্যবিত্তগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট সুদে ব্যাঙ্কে বা বীমা কোম্পানীতে অর্থ সঞ্চয় করেন।)

বিনিয়োগকারী

(কৃষিজীবিদের মধ্যে যাঁহাদের জমি-জমা আছে এবং মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করেন বা নির্দিষ্ট খাজনাতে জমি ভাড়া দেন তাঁহাদের লাভ হয়। কিন্তু ভূমিহীন কৃষি মজুরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন।) সাধারণতঃ, কৃষিজাত দ্রব্যের দামে তুলনামূলক ভাবে শিল্পজাত দ্রব্যের দাম হইতে বৃদ্ধি কম হয়; সুতরাং, শিল্পে নিযুক্ত উদ্যোক্তাদের তুলনায় কৃষিতে নিযুক্ত উদ্যোক্তাগণ কম লাভবান হন।

কৃষিজীবি

করভার ও রাষ্ট্রীয় ঋণ: (মুদ্রাস্ফীতির ফলে করদাতাগণের সুবিধা হয়, কারণ করভার একটু বৃদ্ধি হইলেও অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম দিতে হয়। রাষ্ট্রিক ঋণের ভারও কমে, কারণ ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্র দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে কম সম্পদ পরিশোধ করে।) মুদ্রা সঙ্কোচনের সময় করের আর্থিক ভার সমান থাকে, কিন্তু অর্থের মূল্য অধিক হওয়ায় আসল ভার (Real burden) বাড়ে। রাষ্ট্রিক ঋণের আসল ভারও মুদ্রা সঙ্কোচনের সময় বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ (Control of Inflation):

সমাজের মোট ব্যয় যখন মোট দ্রব্যোৎপাদনের তুলনায় অধিকহারে বাড়িতে থাকে, তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি রোধের দুইটি উপায় আছে; দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সমাজে অর্থের পরিমাণ বা আর্থিক আয়ব্যয়ের পরিমাণ কমান। দেশে উপাদানের পূর্ণনিয়োগ থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় কেবল মাত্র শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইয়া এবং উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিয়া। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া। ইহার ফলে সমাজের মোট ব্যয় বাড়িতে পারে এবং সাময়িকভাবে মুদ্রাস্ফীতি প্রবলতর হইতে পারে।

দ্রব্যোৎপাদন বৃদ্ধি

'সমাজের মোট আর্থিক ব্যয়কে কমাইবার জন্য যে সকল পদ্ধতি আছে সেই সকল পদ্ধতিকেই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা সম্ভব। এই সকল পদ্ধতিকে

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(ক) আর্থিক (Monetary) পদ্ধতিসমূহ, (খ) কর-সংক্রান্ত (Fiscal) পদ্ধতিসমূহ এবং (গ) অর্থব্যতীরকী (non-monetary) পদ্ধতিসমূহ।

আর্থিক পদ্ধতি সমূহের প্রয়োগকারী হইলেন আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থান করিয়া দেশের আর্থিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান-সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের সুদের হার বা ব্যাঙ্কহার বাড়াইয়া দিবে। ব্যাঙ্কহার বাড়িলে দেশের ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণতঃ তাহাদের সুদের হার বাড়াইবে এবং ঋণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় উদ্যোক্তাগণ বা ভোগকারীগণ ঋণের পরিমাণ কমাইয়া ফেলিবে এবং সমাজের মোট আর্থিক ব্যয় কমিয়া আসিবে। দ্বিতীয়তঃ, অর্থের যোগানের মধ্যে ব্যাঙ্কঋণও অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং, ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ কমাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে অধিক পরিমাণ নগদের অংশ জমা হিসাবে চাহিতে পারে। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থের পরিমাণই ব্যাঙ্কঋণের ভিত্তি, সুতরাং আমানতের যে অংশ জমা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট গচ্ছিত রাখে, তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও কমিবে, সুদের হারও বাড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং, এইভাবে সমাজের ঋণগত অর্থের প্রসারকে (expansion of credit money) কমাইয়া ফেলা সম্ভব।

আর্থিক পদ্ধতি: ব্যাঙ্ক হার বৃদ্ধি, নগদ জমার অংশ বৃদ্ধি, খোলা বাজারের কার্য-কলাপ, পৃথকভাবে বাছাই করিয়া বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলা বাজারে কার্য চালাইতে (open market operations) পারে অর্থাৎ সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া লোকের হাত হইতে নগদ অর্থ তুলিয়া লইতে পারে; ফলে আয়-স্রোত হইতে নগদ অর্থ কমিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও কমিবার সম্ভাবনা। চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ বন্ধ করিয়া দিতে পারে বা কোনক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দান করিতে হইলে বন্ধকীমূল্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পারে। ইহার ফলে যে শিল্পে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বেশী বা যে দ্রব্যের বাজারে অধিক ফাট্‌কা ব্যবসা চলিতেছে অথবা যে মূল শিল্পসমূহে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অবাঞ্ছনীয়—এইরূপ পৃথক পৃথক করিয়া মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর। পৃথক ক্ষেত্রসমূহে ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই

পদ্ধতিসমূহ (Selective credit-control) মুদ্রাস্ফীতির সময়ে প্রয়োগ করা খুবই দরকার ; কারণ, সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সঙ্কুচিত হইলে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হইবে এবং মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং, বাছাই করিয়া, বিশেষভাবে ফাটকাদাবী ব্যবসাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

কর-সংক্রান্ত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সরকারী ব্যয় যাহাতে কম হয়। সরকারের চেষ্টা হইবে একই সঙ্গে ব্যয় কমান এবং আয়-বৃদ্ধি করা। সরকারী ব্যয় দেশের মোট ব্যয়ের একাংশ, সুতরাং ইহা কমাইলে দ্রব্য সামগ্রীর উপর চাহিদার চাপ কমিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইহারই সঙ্গে নূতন নূতন কর আরোপের দ্বারা বা বর্তমান করের হার বাড়াইয়া ব্যক্তির হাত হইতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ কমাইয়া ফেলাও দরকার। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, করসমূহের প্রকৃতি কিরূপ, যেন তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে বিনিয়োগ কমাইয়া না দেয়। সাধারণভাবে, সরকারী বাজেট উদ্বৃত্ত রাখিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সকল কর বাড়ান হইলেও আমদানীশুল্ক বাড়ান উচিত নহে, তবে রপ্তানীশুল্ক বাড়ান উচিত। রপ্তানীশুল্কের বৃদ্ধি এবং আমদানীশুল্কের হ্রাস দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়াইতে পারে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কমিতে পারে। তৃতীয়তঃ, সমাজ-দেহ হইতে অর্থ সরাইয়া আনিবার জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয়-পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা দরকার। ব্যক্তিদের আয় হইতে বাধ্যতামূলক ভাবে একাংশ সঞ্চয় হিসাবে সরকারের হাতে তুলিয়া আনা উচিত। সরকারী ঋণপত্ররূপে সেই সঞ্চয় থাকিবে, মুদ্রাস্ফীতির পরে সেই অপসৃত আয় ব্যক্তিদের ফেরৎ দেওয়া হইবে।

করপদ্ধতিঃ সরকারীব্যয় কমান, আয় বৃদ্ধি, জনসাধারণের হাত হইতে আয় তুলিয়া লওয়া, রপ্তানী শুল্কের বৃদ্ধি, আমদানী শুল্কের হ্রাস, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়।

অর্থব্যতীরকী পদ্ধতি সমূহের মধ্যে প্রধান হইল দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। স্বল্পকালের মধ্যে হঠাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব না হইলেও যে সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতিজনিত অনুভূতিশীল (Inflation-sensitive) তাহাদের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য মুদ্রাস্ফীতি হইতে কম প্রভাবশীল ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইয়া আনা দরকার। এই সকল দ্রব্যের আমদানীও মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইতে সাহায্য করিবে। এইরূপে উপকরণের নিয়োগবিন্যাসে পরিবর্তন মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কমাইতে পারে। উপকরণের দাম বাড়াইবার প্রচেষ্টাও নিয়ন্ত্রণ করা

অর্থব্যতীরকী পদ্ধতি : দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, মজুরী নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ও দামনিয়ন্ত্রণ

দরকার এবং উপাদানের বাজারে একচেটিয়া অধিকার থাকিলে তাহাও ভাঙিয়া দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, মজুরী-নিয়ন্ত্রণের নীতি। দেশে মজুরীর হার এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাহাতে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির দরুণ আয়বৃদ্ধি পায় এবং জীবন যাত্রার মান না কমে, অথচ সেই মজুরীবৃদ্ধির দরুণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম আরও বর্ধিত না হয়। সুতরাং শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত মজুরীবৃদ্ধির যোগ থাকা দরকার, অধিক দ্রব্যোৎপাদন করিতে পারিলেই যাহাতে মজুরীবৃদ্ধি হয় (ফলে দ্রব্যের ইউনিট-পিছু উৎপাদনব্যয় কমিতে পারে) তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। উদ্যোক্তাগণ মজুরী বাড়াইলেও যাহাতে দাম বাড়াইতে না পারে, অর্থাৎ নিজেদের মুনাফা কমাইয়া সেই বর্ধিত মজুরী দেয় এইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। তৃতীয়তঃ, দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-এর ব্যবস্থা থাকা দরকার। সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা অন্ততঃপক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কিন্তু দাম-নিয়ন্ত্রণের ফলে দ্রব্যাদি খোলা বাজারের বদলে 'কালোবাজারে' চলিয়া যায় এবং অতিরিক্ত দামে বিক্রয় হইতে থাকে। সুতরাং সকলে যাহাতে নিয়ন্ত্রিত দামে দ্রব্য পাইতে পারে এই জন্য ইহার সঙ্গে রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (Savings and Investment): কেইন্‌সের মতে সঞ্চয় (Monetary Equilibrium) বিনিয়োগের ভারসাম্যই অর্থমূল্যকে স্থির রাখে বা আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ একই, সুতরাং সমান

যে কোন আয়স্তরে সমাজে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ সমান। সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সংজ্ঞা এমন ভাবে নির্ধারিত আছে, যে উভয়ে সমান। ইহাদের সমান বলা ঠিক হইবে না, ইহা একই জিনিস, ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, একই বিষয়ের প্রতি দুইদিক হইতে দৃষ্টিপাত। যেমন,

আ = আয়, **উ** = মোট উৎপাদনের মূল্য, **ব্য** = ভোগব্যয়, **স** = সঞ্চয়, এবং **বি** = বিনিয়োগ। এখন, **আ = উ = ব্য + বি**

কিন্তু, **আ = ব্য + স**

*সুতরাং, **স = বি**।

[*আয়কে দুইভাবে দেখা চলে। একদিকে ইহা হইল সমাজের মোট ব্যয় অর্থাৎ মোট উৎপন্নের দাম। অপরদিকে, ইহা সমাজের মোট আয়, খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা সকলের সমষ্টি। ব্যয় বলিলে যেমন আয়কে ব্যয় করা বুঝায়, তেমনই ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর দামকেও বুঝায় (কারণ ঐ দামে ক্রয় করিয়াও ঐ ব্যয় হইয়াছে), এবং ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করিয়া সকল উপাদান মিলিয়া যে আয় করিয়াছে তাহাও আবার দ্রব্যসামগ্রীর মোট দাম।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান, কারণ, একদিকে, আয় হইতে নিশ্চয়ই ভোগ এবং সঞ্চয় হইবে. অপর দিকে, ভোগ্য দ্রব্য এবং বিনিয়োগ দ্রব্য বিক্রয় করিয়াই সেই আয় সৃষ্টি হইবে। সুতরাং সমাজের মোট আয় হইতে যাহা ব্যয় হইল না অর্থাৎ সঞ্চয় নিশ্চয়ই ভোগ্য দ্রব্য ছাড়া বিনিয়োগ দ্রব্যের দাম অর্থাৎ বিনিয়োগের সমান।]

আধুনিক জগতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে একই লোক গ্রহণ করে না। যে লোক সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত করে সে সাধারণতঃ বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তা হয় না, যে উদ্যোক্তা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত করে সে নিজে সঞ্চয় না-ও করিতে পারে। সুতরাং মনে হইতে পারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ কখনই সমান নহে। কিন্তু সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন দল গ্রহণ করিলেও উভয়ের পরিমাণ সমান হইতে বাধা নাই।

পরিবর্তিত অবস্থায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান

যেমন, সমাজে ভোগব্যয় স্থির থাকিয়া যদি বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আয় বাড়িয়া যাইবে। ভোগব্যয় স্থির ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, সুতরাং সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে, উহা বর্ধিত বিনিয়োগের সমান হইবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির পূর্বে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান ছিল, বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরেও বর্দ্ধিত স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমানই রহিল। এইরূপ ঘটিবার কারণ হইল এই যে, আয়স্তর বাড়িয়াছে অথচ ভোগব্যয় সমান-ই আছে। ঠিক এইরূপে, ভোগব্যয় যদি স্থির থাকে এবং বিনিয়োগ কমিয়া যায় তাহা হইলে আয়-স্তর কমিবে। ভোগব্যয় স্থির থাকায় সঞ্চয়ও কমিয়া আসিবে। ভোগব্যয় স্থির না থাকিলেও, বিনিয়োগের পরিবর্তন আয়স্তরে পরিবর্তন ঘটাইবে এবং সঞ্চয় পরিবর্ত্তিত হইয়া বিনিয়োগের সমান হইবে।

ঈপ্সিত সঞ্চয় ও ঈপ্সিত বিনিয়োগে পার্থক্য থাকিতে পারে

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংজ্ঞাগতভাবে সমান হইলেও লোকের **ঈপ্সিত সঞ্চয়** বিনিয়োগের সমান নাও হইতে পারে অথবা উদ্যোক্তাদের **ঈপ্সিত বিনিয়োগ** সঞ্চয়ের সমান নাও হইতে পারে। লোকে বেশী সঞ্চয় করিলে ভোগদ্রব্যের বিক্রয় কমিয়া গেল, বিক্রেতাদের দ্রব্য মজুতের পরিমাণ বা বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইল, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইল। কিন্তু অবিক্রিত দ্রব্য মজুত-রূপে বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিক্রেতাদের মোটেই ঈপ্সিত নহে, তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই বিনিয়োগ ঘটিয়া গেল। ঠিক এইরূপ বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকার দরুণ দ্রব্যের দাম বাড়িলে লোকেরা বাধ্য হইয়া সঞ্চয় বৃদ্ধি করিল, ইহাও তাহাদের ঈপ্সিত নহে।

সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, পূর্বঈপ্সিত সঞ্চয় (Ex Ante savings) এবং পূর্ব-ঈপ্সিত বিনিয়োগ (Ex Ante investment)—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে

পারে, কারণ ইহারা ঈপ্সিত অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার ধারণা অনুযায়ী বর্তমানে আন্দাজীকৃত বিষয়। কিন্তু ঘটনার কাল অতিবাহিত হইবার পরে সময়ান্তরিত সঞ্চয় বা উত্তর-লব্ধ সঞ্চয় (Ex post savings) এবং সময়ান্তরিত বিনিয়োগ বা উত্তর-লব্ধ বিনিয়োগ (Ex post investment) নিশ্চয়ই সমান। আয়স্তরে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যখন সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীদের ইচ্ছাকাল বা ধারণা অনুযায়ী সময় অতিবাহিত হইয়াছে, তখন নূতন আয়স্তরে ইহারা সমান হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব-ঈপ্সিত বিনিয়োগের তুলনায় পূর্ব্ব-ঈপ্সিত সঞ্চয়ের পরিমাণ যদি বেশী থাকে তাহা হইলে আয়স্তর কমিয়া সঞ্চয় কমাইয়া দিবে এবং পরবর্ত্তী কালে ঘটনার স্রোত থামিয়া গেলে উত্তর-লব্ধ সঞ্চয় ও উত্তর-লব্ধ বিনিয়োগ সমান হইবে। পূর্ব্ব ঈপ্সিত সঞ্চয়ের তুলনায় পূর্ব্বঈপ্সিত বিনিয়োগ অধিক হইলে আয়স্তর বাড়িয়া পরবর্ত্তীকালে উভয়কে সমান অবস্থায় আনিবে।

কিন্তু উত্তর-লব্ধ সঞ্চয় ও উত্তর-লব্ধ বিনিয়োগে পার্থক্য থাকে না

সুতরাং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্যের বিন্দু সর্ব্বদাই সমান এবং ভারসাম্য না থাকিলেই মাত্র ইহাদের মধ্যে অসমতা থাকিতে পারে; বলা চলে যে ইহাদের অসমতাই ভারসাম্য বজায় না থাকার কারণ। ইহাদের ভারসাম্য রক্ষিত হয় আয়স্তরে পরিবর্ত্তনের দ্বারা, অর্থাৎ আয়স্তরই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আনয়নকারী শক্তি।

অনুশীলনী

1. Explain clearly relation between the quantity of money in circulation and the general price level. (B. com. 39, B.A. 30,44)

2. How would you account for changes in the general level of prices ? (B. com. 50)

3. How is the value of money determined ? (B. com. 54)

✓ 4. What is meant by Inflation of currency ? Examine the effects of Inflation on the production and distribution of wealth. (B. com. 41, 48, 52 ; B. A. 46, 49, 51, 56)

5. When does Inflation occur ? Discuss the effects of Inflation on the production and distribution of Income.

(B. com 55)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আর্থিক ব্যবস্থা

আর্থিক ব্যবস্থা কাহাকে বলে এবং উহা কয় প্রকার

যে পদ্ধতিতে কোন দেশের অর্থ চালু রাখা হয় এবং তাহার পরিমাণ ও মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহাকে আর্থিক ব্যবস্থা বলে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, তিনপ্রকার আর্থিক ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়; একধাতুমান, দ্বিধাতুমান এবং কাগজীমান। একধাতুমান ব্যবস্থায় আইন-চালু মুদ্রা স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত হয়। এরূপ ব্যবস্থায় ইহাকে হয় স্বর্ণমান অথবা রৌপ্যমান বলা হয়। দ্বিধাতুমান অবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুদ্বারা প্রস্তুত দুই প্রকার মুদ্রা প্রচলিত থাকে; ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়-হার সরকারীভাবে নির্দিষ্ট থাকে। কাগজীমান ব্যবস্থায় কাগজের নোটসমূহ আইনচালু অর্থরূপে সমাজ-দেহে সঞ্চালিত থাকে।

দ্বিধাতুমান (Bimetallism)

দ্বি-ধাতুমানের বৈশিষ্ট্য

দ্বিধাতুমানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে, দুইটি ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা অসীম আইনচালু হিসাবে চলিত থাকিবে; সরকারীভাবে নির্দিষ্ট বিনিময় হার অনুযায়ী ইহাদের পারস্পরিক বিনিময় হইবে; দেশে মুদ্রায়ন (coinage) প্রচলিত আছে, অর্থাৎ সোনা এবং রূপা লইয়া টাঁকশালে গেলে কোন ব্যয় না লইয়া বা অতি অল্প ব্যয়ে মুদ্রা প্রস্তুত করা সরকারী নীতিসম্মত। যখন এরূপ নিয়ম থাকে যে একটি ধাতু মুদ্রায়নের জন্য গৃহীত হয় এবং অন্য ধাতুটি গৃহীত হয় না; তখন তাহাকে খঞ্জমান (Limping Standard) বলা হয়।

সুবিধা

দ্বিধাতুমানের বহু সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, স্বর্ণমান বা রৌপ্যমানের তুলনায় এই ব্যবস্থায় দাম-স্তর অধিকতর স্থির থাকে। দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ বাড়ান সহজ হয়, কারণ কোন ধাতুর যোগান কম পড়িলে অন্য ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ান যায়। অথবা, যখন কোন ধাতুর যোগান বৃদ্ধি পাইতেছে তখন অপর ধাতুর যোগান কমিয়া যাইতে পারে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা এড়ানও সম্ভবপর। শুধু স্বর্ণমান

প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণের প্রয়োজন বেশী থাকায় স্বর্ণের যোগান পর্য্যাপ্ত না হইবারই সম্ভাবনা ; ফলে দামস্তর নামিয়া আসিতে পারে এবং ব্যবসা-সঙ্কট সুরু হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রৌপ্য-উৎপাদনকারী দেশসমূহ রৌপ্য বিক্রয় করিতে না পারিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিত না ; তাই রৌপ্যের অর্থগত ব্যবহারের ফলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকিতে পারে, এই যুক্তি একসময়ে দ্বিধাতুমানের স্বপক্ষে প্রবলভাবে প্রচারিত হইত। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক দ্বিধাতুমান আপনা আপনি বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখে, কারণ স্বর্ণ ব্যবহারকারী দেশসমূহ এবং রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে ধাতু-বিনিময় সম্ভবপর হইয়া থাকে। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময় হার নির্দিষ্ট থাকে, সেই কারণে বৈদেশিক বিনিময় হারও স্থির থাকে।

অসুবিধা

দ্বিধাতুমানের অসুবিধা হইল যে যদি দুইটি ধাতুর উৎপাদন ও যোগান পরস্পর বিরোধী দিকে না হইয়া একই দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইলে ফলে হয় প্রবল মুদ্রাস্ফীতি নতুবা প্রবল মুদ্রাসঙ্কোচন ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ, কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের পক্ষে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা শক্ত, কারণ গ্রেসামের নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাজার মূল্য সরকারী মূল্য হইতে পৃথক হইলে 'নিকৃষ্ট' অর্থ অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য কমিয়া গিয়াছে এইরূপ ধাতু মুদ্রা 'উৎকৃষ্ট' অর্থকে, অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে এইরূপ ধাতুমুদ্রাকে বাজার হইতে অপসারিত করে। সুতরাং দেখা যায় যে কার্যতঃ এক ধাতুমান প্রচলিত থাকে।

আধুনিক কালে দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা কোথাও প্রচলিত নাই এবং ভবিষ্যতেও প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। কাগজী অর্থের বহুল ও ব্যাপক প্রচলন রৌপ্যের পুনরর্থীকরণের (Remonetisation) সম্ভাবনা বিশেষভাবে কমাইয়া দিয়াছে।

স্বর্ণমান (Gold Standard) :

স্বর্ণমান কাহাকে বলে

যখন কোন দেশের প্রধান আইন-চালু অর্থ স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা অথবা এরূপ কাগজী অর্থ যাহার বিনিময়ে সরকারী মুদ্রা-দপ্তর হইতে নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ পাওয়া সম্ভবপর, তখন সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান বলা হয়। পৃথিবীতে ব্যবসা বাণিজ্য সুরু হইবার সময় হইতে স্বর্ণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চলিয়া আসিতেছে এবং বহুদেশ নিজদেশে স্বর্ণমান গ্রহণ করায়,

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও স্বর্ণের সাহায্যে লেনদেন চলিত। অর্থের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীতে এককালে স্বর্ণমানের উদ্ভব ও প্রচলন হইয়াছিল।

স্বর্ণের সহিত দেশে চালু অর্থের সম্পর্কের গভীরতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের স্বর্ণমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্নকালে দেখা গিয়াছে।

এক] স্বর্ণমুদ্রামান বা বিশুদ্ধ স্বর্ণমান (Gold currency standard or the Pure Gold Standard):

১৯১৪ সালের পূর্বে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং আরও কয়েকটি দেশে বিশুদ্ধ স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা প্রধান অর্থরূপে চালু থাকে; মুদ্রাকর্তৃপক্ষ (Currency Authority) আইনতঃ স্বর্ণের বদলে দেশের অধিবাসীদিগকে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন এবং দেশের ভিতরে বা বাহিরে স্বর্ণ যাতায়াতের উপর কোন বাধা নিষেধ থাকে না।

এইপ্রকার স্বর্ণমান প্রচলিত থাকায় স্বর্ণ ও অর্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল; স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত, স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া গেলে অর্থের পরিমাণও হ্রাস পাইত। স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, হয় সেই স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত হইত অথবা সেই স্বর্ণকে মজুত করিয়া ব্যাঙ্কগুলি দেশে ঋণ-জাতীয় অর্থের (Credit Money) পরিমাণ বাড়াইয়া দিত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি এমনভাবে পরিচালিত হইত যে স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি পাইলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত, স্বর্ণের যোগান কমিলে অর্থের যোগানও কমিয়া যাইত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইরূপ স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ইহা স্বয়ংক্রিয়মানরূপে (Automatic Standard) বিভিন্ন দেশের দামস্তর ও লেনদেন ব্যালান্সের (Balance of Payments) ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রত্যেকটি দেশের বৈদেশিক বিনিময়হারে ভারসাম্য আপনা আপনি রক্ষিত হয়। এই স্বয়ংক্রিয়তা (Automatism) স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ বলিয়া পরিগণিত হইত।

যদি এইরূপ অবস্থায় কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable) হইয়া উঠে, অর্থাৎ রপ্তানীর তুলনায় আমদানী অধিক হয়, তাহা হইলে সেই দেশ হইতে স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইবে। স্বর্ণের পরিমাণ কম হওয়ায় দেশে মুদ্রা সঙ্কোচন (Currency Contraction) ঘটিবে, দামস্তর নামিয়া আসিবে। অপরপক্ষে, যে দেশের লেন দেন ব্যালান্স অনুকূল (favourable) হইয়াছিল, সেই দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, মুদ্রাপ্রসার (currency expansion) ঘটিবে এবং দামস্তর উর্ধে উঠিবে। দুই দেশের দামস্তর এইরূপ

স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় গতি-পদ্ধতি

পরিবর্তিত হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণে পরিবর্তন আসিবে। যে দেশের দামস্তর কম, ক্রমে সেই দেশ অধিক রপ্তানী করিতে সক্ষম হইবে ও স্বর্ণ ফিরিয়া পাইবে ; যে দেশের দামস্তর অধিক, তাহার রপ্তানী কমিবে এবং স্বর্ণ দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে। পুনরায় স্বর্ণের আনাগোনা সুরু হইবে, এবং ক্রমে দুই দেশের দামস্তব এরূপ অবস্থায় আসিবে যখন স্বর্ণের আনাগোনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বৈদেশিক বাণিজ্যহার এবং লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুণ লেনদেনের মাবফৎ পৃথিবীব স্বর্ণ বিভিন্ন দেশে বন্টিত হইয়া থাকিবে।

স্বর্ণমানের এইরূপ স্বয়ংক্রিয় গতিবিধির সাফল্যের জন্য কয়েকটি অবস্থা বজায় থাকা চাই। প্রথমতঃ, স্বর্ণের আনাগোনায় কোনরূপ বাধা নিষেধ থাকা চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার স্বর্ণের আনাগোনার ব্যাপারে বা দামস্তরের উপব স্বর্ণের হ্রাস বৃদ্ধির সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। স্বর্ণেব আনাগোনায় বাধানিষেধ থাকিলে বা উহা দামস্তবের উপর প্রভাব ফেলিতে না পারিলে লেনদেন ব্যালান্সেব ভাবসাম্য বিহীনতা দূর হইতে পারে না। স্বর্ণমান সফল ভাবে চালাইতে গেলে এই সকল "খেলাব নিয়ম" (Rules of the gold standard game) মানিয়া চলিতে হয়।

স্বর্ণমান খেলার নিয়মসমূহ

দুই] স্বর্ণধাতুমান (The gold Bullion Standard) :

স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না, কাগজীমুদ্রাব দ্বারাই দেশের মধ্যে ক্রয়বিক্রয়ের কাজ চলে. মুদ্রা কর্তৃপক্ষ আইনতঃ স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে বাধ্য থাকেন না ; তবে বৈদেশিক বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে লেনদেনেব জন্য নির্দিষ্ট হাবে স্বর্ণ বিক্রয় করেন বা নির্দিষ্ট হারে লেন দেন করেন. এইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণ ধাতুমান বলা হয়। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩১ সালেব মধ্যে ইংলণ্ডে এবং ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে এইরূপ স্বর্ণধাতুমান প্রচলিত ছিল।

তিন] স্বর্ণবিনিময় মান (Gold Exchange Standard) :

১৮৯৮ সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণ-বিনিময়মান বলা হইত। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না বা মুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য স্বর্ণ গ্রহণ করেন না বা স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয়ও করেন না। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্য প্রয়োজন হইলে নির্দিষ্ট হারে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে এমন দেশের মুদ্রা বিক্রয় করেন যাহা স্বর্ণ মানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

চার] স্বর্ণমজুতমান (Gold Reserve Standard) :

এইরূপ ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না, কাগজীনোট বা অপর কোন মুদ্রা চালু থাকিতে পারে। মুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্বর্ণের বা বৈদেশিক মুদ্রার একটি ভাণ্ডার গঠন করেন এবং মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারের উঠানামা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাতে ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সেই ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় করেন। এইরূপ ভাণ্ডারকে **বিনিময় সমতা বিধানকারী** ভাণ্ডার (Exchange Equalisation Fund) বলা হয়। ইহারই সাহায্যে দেশীয় অর্থের বহির্মূল্য এই ভাবে স্থির রাখার চেষ্টা করা হয়। যখন অর্থের বহির্মূল্য বা বৈদেশিক বিনিময়হারে উঠানামা ঘটে, তখন এইরূপ ভাণ্ডার হইতে নিজদেশের মুদ্রা বা স্বর্ণক্রয় এবং বিক্রয়ের দ্বারা বিনিময়হারকে স্থির রাখার অথবা লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়। পশ্চিম ইউরোপে এবং ব্রিটেনেও ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

স্বর্ণমানের গুণ ও দোষ বিচার (Merits and Demerits of Gold Standard)

এক] স্বর্ণমানের গুণ হইল যে এই ব্যবস্থায় দামস্তর ও বৈদেশিক বিনিময় হার আপনাআপনি স্থির হইয়া পড়ে এবং ইহাতে ভারসাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুতি হইলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উহা পুনরায় ভারসাম্যের বিন্দুতে ফিরিয়া আসে। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণ আনাগোনার মাধ্যমে উহার প্রভাবের ফলে আপনা আপনি লেন দেন ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য সাধন হয়।

দুই] আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান চালু থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনাপাওনা সুবিধাজনক হয় এবং একটি সর্বজন গ্রাহ্য সাধারণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণের ব্যবহার সম্ভবপর হয়।

তিন] স্বর্ণমান বজায় থাকিলে অর্থের পরিমাণ দেশে স্বর্ণের যোগানের উপর নির্ভর করে : রাজনৈতিক কারণে অর্থের যোগান বাড়ান চলে না, মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না।

চার] জনসাধারণ স্বর্ণ পছন্দ করে, স্বর্ণমান চালু থাকিলে সেই দেশের মুদ্রাব্যবস্থা দেশে ও বিদেশে সম্মান লাভ করে এবং উহার উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।

স্বর্ণমানের ত্রুটি : প্রথমতঃ, ইহাকে কখনই স্বয়ংক্রিয়মান হিসাবে গণ্য করা চলে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা মুদ্রা কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাবধানতা ও বিবেচনার

সহিত স্বর্ণমানের খেলার নিয়মসমূহ মানিয়া না চলিলে নিছক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইহা চালু থাকে না ; ইহাকে তাই পরিচালিত মান (Managed Standard) হিসাবেই গণ্য করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, তথাকথিত 'খেলার নিয়মসমূহ' পরিপূর্ণভাবে কখনই পালন করা হইত না। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ 'ব্যাঙ্ক হার' বাড়াইয়া স্বর্ণের পুনরায় বহির্গমন বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন অথবা বর্ধিত স্বর্ণের বিনিময়ে অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে চাহিতেন না। নিজ দেশীয় স্বার্থরক্ষাই তাঁহাদের প্রধানলক্ষ্য ছিল। পরবর্তী কালে স্বর্ণমানের নিয়ম কেহই বিশেষ মানিয়া চলেন নাই।

দুই] স্বর্ণমান ব্যবস্থায় অর্থের আভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাখার পরিবর্তে প্রধানতঃ উহার বহির্মূল্যের স্থিরতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত। নিজদেশের দামস্তর, উৎপাদন ও আয়স্তর অগ্রাহ্য করিয়া নিছক বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখা কখনই যুক্তিসঙ্গত কার্য বলিয়া মনে করা যায় না। তাহা ছাড়া, কোন দেশ নিজস্ব পৃথক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আয়স্তর বৃদ্ধির জন্য নিজস্ব অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করিতে পারে না।

তিন] কেইন্‌সের অভিমতে স্বর্ণমান ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাসঙ্কোচন ও বেকারীর দিকে ঝোঁক আসিয়া পড়ে। যে দেশে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ বেশী, সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়াইয়া স্বর্ণের রপ্তানী বন্ধ করিতে চাহে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ কমিয়া যায় এবং তাহার দরুণ কর্মনিয়োগের পরিমাণও হ্রাস পায়। যদি দেশে আমদানীর তুলনায় রপ্তানী অধিক হইতে থাকে, তাহা হইলে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশ করে এবং মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় সুদের হার কমে, দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ কর্ম সংস্থান স্তর উত্তীর্ণ হইয়া মুদ্রাস্ফীতি ও সঙ্কটের সৃষ্টি করে।

চার] স্বর্ণমান ব্যবস্থা কিন্তু বাস্তবে কখনই দামস্তর বা বিনিময় হার স্থির রাখিতে পারে নাই। কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণ খনি আবিষ্কার স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে বিভিন্ন কারণে স্বর্ণের চাহিদা ও ব্যবহার খুবই বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থের পরিমাণ কমিয়া মুদ্রাসঙ্কোচনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

পাঁচ] কাগজী মানের তুলনায় স্বর্ণমান খুবই ব্যয় বহুল। কাগজী অর্থের দ্বারা বিনিময়ের কার্য চালান মোটেই অসুবিধাজনক নহে, সুতরাং স্বর্ণপ্রচলন বা স্বর্ণ মজুত রাখা অযথা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। সভ্য মানুষের পক্ষে

এইরূপ 'হলুদে ধাতুর' (yellow metal) প্রতি নিছক আকর্ষণ শোভনীয় নহে। কেইন্‌সের অভিমতে ইহা একপ্রকার 'বর্ব্বর যুগীয় নিদর্শন' (Barbarous relic)।

স্বর্ণমান পতনের কারণ (Cause of the Breakdown of gold Standard):

স্বর্ণমান ব্যবস্থার তথাকথিত 'খেলার নিয়মসমূহ' যথাযথভাবে কখনই প্রতিপালিত হয় নাই, প্রায় সকল দেশই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্বর্ণমানকে প্রায় অচল অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছিল। স্বর্ণের আনাগোনার উপর যথেষ্ট বাধা নিষেধ আরোপিত হইত, এবং স্বর্ণের আগমনের বা বহির্গমনের কোন প্রভাব দামস্তরের উপর পড়িতে দেওয়া হইত না। ইহাই স্বর্ণমান পতনের প্রধান কারণ।

খেলার নিয়ম ভঙ্গ

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে অস্ত্র বা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং স্বর্ণ দ্বারা উহার মূল্য প্রদানের ফলে আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ প্রবেশ করিয়াছিল। সেই স্বর্ণ আমেরিকার দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ মুদ্রাকর্তৃপক্ষ সেই স্বর্ণকে ভিত্তি করিয়া মুদ্রাপ্রসার না করিয়া তাহাকে বন্ধ্যা ধাতু হিসাবে জমাইয়া রাখিয়াছিল। ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকার দামস্তর তুলনামূলক ভাবে কম থাকায় দামস্তরের এই অসমতার (Disparity) ফলে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণ আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। অন্যান্য দেশে স্বর্ণের যোগান কম হওয়ায় তাহারা বাধ্য হইয়া স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও আমেরিকার নীতি

অন্যান্য দেশে স্বর্ণ ছিল অল্প পরিমাণ, উহাকে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার দরুণ রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং ব্রিটেন হইতে যখন স্বর্ণত্যাগের হিড়িক সুরু হইল, সেই অবস্থায় ১৯৩১ সালে ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Auturcky) প্রসার লাভ করায় বৈদেশিক এবং বাণিজ্যহারের তুলনায় নিজদেশের দামস্তর, আয়স্তর প্রভৃতি স্থির রাখা বেকারী দূর করা ও কর্মনিয়োগের স্তর ঊর্ধে তোলা, এই সকল অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল।

সাফল্যের সহিত স্বর্ণমান চালু থাকিতে হইলে ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যেন অধমর্ণ দেশগুলি আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বাড়াইয়া রপ্তানী-উদ্বৃত্ত (Export-

Surplus) সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা উত্তমর্ণ দেশগুলিকে ঋণপরিশোধ করিতে পারে। অর্থাৎ স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত কোন দেশ এমন কোন আর্থিক বা বাণিজ্যিকনীতি গ্রহণ করিবে না যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সের কোন ভারসাম্যবিহীনতা বিদূরিত হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। লেন দেন ব্যালান্সের প্রয়োজনে মুদ্রাপ্রসার ও মুদ্রাসঙ্কোচন করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে অপর দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী গ্রহণ করিতে হইবে এবং স্বর্ণের বহির্গমন মানিয়া লইতে হইবে, কোন শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া বা কৃত্রিম বাধানিষেধ আরোপ করিয়া দ্রব্য বা স্বর্ণের গতিবিধি বন্ধ করা চলিবে না। স্বর্ণমানের এই স্বর্ণসূত্র (golden rule) কেহই মানিয়া না লইবার ফলেই অবশ্যম্ভাবীরূপে উহার পতন হইয়াছে।

সাফল্যের সর্ত

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে স্বর্ণমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে ইংলণ্ড স্বর্ণের সহিত পুরাতন হারে ষ্টার্লিং-এর বিনিময়-মূল্য ধার্য করিল, এবং এই বিনিময় হার ধার্য করার ফলে ষ্টার্লিং 'বর্ধিত মূল্য' মুদ্রাতে (Overvalued Currency) পরিণত হয়। ফ্রান্সে বিনিময়-হার এরূপ স্থির হয় যে ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস (Devaluation) ঘটিয়া গেল। জার্মানীতে নূতন এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন হইল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকালীন উদ্বৃত্ত ক্রয়ক্ষমতার বিলোপসাধন অর্থাৎ মুদ্রার অতি-স্ফীতি (hyper-inflation) রোধ করা।

কিভাবে স্বর্ণমানের পতন হইল

ইংলণ্ডের মুদ্রা-মূল্য বৃদ্ধি (over-valuation) রপ্তানীর পরিমাণ কমাইয়া দিল। তাহার অর্থনৈতিক কাঠামোর কাঠিন্য বা অনমনীয়তা (Rigidities) রপ্তানি দ্রব্যাদির দাম কমাইতে সুযোগ দেয় নাই, ফলে সে রপ্তানী বাড়াইয়া অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, রপ্তানীর তুলনায় আমদানী অধিক হইয়াছে, স্বর্ণের বহির্গমন হইয়াছে। অপর পক্ষে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে, রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশে স্বর্ণপ্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সেই স্বর্ণ ফ্রান্সের দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মজুত করিয়া রাখিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানী দ্রব্যের আগমন এবং স্বর্ণের বহির্গমন উভয়ের উপরেই বাধা নিষেধ আরোপ করিয়া স্বর্ণমানের ভারসাম্য-প্রতিষ্ঠাকারী পদ্ধতিকে (Equilibrating mechanism) বানচাল করিয়া দিয়াছিল।

এই সকল কারণ ছাড়াও সমস্যা ছিল 'উত্তপ্ত অর্থের' (Hot Money)। প্রভূত পরিমাণে অর্থ নিরাপত্তা ও সুদের লোভে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত।

তদানীন্তন পৃথিবীতে বিপুল আন্তর্জাতিক ঋণ, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ জনিত বিপুল দেনা পাওনা এবং তাহার লেনদেন স্বর্ণমানের মুদ্রাপরিবর্তন পদ্ধতির ('Transfer-mechanism) উপর বিশেষ গুরুভার চাপ ফেলিয়াছিল, যাহার ভারে উহার ভরাডুবি প্রায় অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ১৯২৯ সালে আমেরিকার শেয়ার বাজারে সহসা দ্রুত-মন্দার ফলে যে সকল দেশ আমেরিকার অর্থ সাহায্যের দ্বারা বাঁচিতেছিল বা আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত নিজের অবস্থা সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল (বিশেষতঃ জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া), সেই সকল দেশে বিপুল সঙ্কট উপস্থিত হয়। স্বল্পকালীন ঋণ-সমূহ তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চাওয়া হয় এবং ব্যবসায়ীদের আশার মূলে কুঠারাঘাতের ফলে উৎপাদন ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৯৩০ সালে জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়, আমেরিকা এক বৎসর যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ স্থগিত রাখে। ইংলণ্ডে বহুদেশ হইতে অর্থ জমা রাখা হইত, তাহা সহসা তুলিয়া লইবার প্রচেষ্টা সুরু হওয়ায় স্বর্ণমান টিকাইয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। নৌ-বিদ্রোহের ফলে ইংলণ্ড হইতে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণের বহির্গমন চলিতে থাকায় বাধ্য হইয়া ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ড স্বর্ণ প্রদান বন্ধ করিয়া দিল। ১৯৩৩ সালে আমেরিকা স্বর্ণমান ত্যাগ করিল এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী সকলেই নেতৃস্থানীয় দেশগুলির পদাঙ্ক অনুসরণে বাধ্য হইলেন। স্বর্ণমানের কলঙ্ক-বিজড়িত গৌরবময় ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটিল। নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির বাধাস্বরূপ স্বর্ণমানের স্বর্ণশৃঙ্খল অপসারিত হইল।

স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা (Possibility of Restoration):

আধুনিক কালে সকল দেশের সরকারই নিজ দেশে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, পূর্ণকর্মসংস্থান, দেশের সামগ্রিক উন্নতিকে আর্থিকনীতির লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। 'মুদ্রা-সঙ্কোচনের দিকে অন্তর্নিহিত ঝোঁক' (inherent bias towards deflation), অনমনীয় বিনিময় হার, সর্বদা নির্দিষ্ট স্বর্ণ জমা রাখা, স্বর্ণের গতিবিধি অনুযায়ী পারস্পরিক মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচন, রক্ষণশীল অন্তর্দেশীয় ঋণ-নীতি, বাজেটে সমতা বা ঘাটতি বাজেট না করা: স্বর্ণমানের এই প্রকার নিয়মসমূহ নিজদেশে অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় আর্থিক নীতিকে সাহায্য করে না। সুতরাং, নিঃসন্দেহে বলা যায়, যুদ্ধ-পূর্ব ধরণের স্বর্ণমান ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

জাতীয় অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতি

শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ এখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মজুত

হইয়া রহিয়াছে ; অন্যান্য দেশে স্বর্ণের পরিমাণ এত কম যে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার উপযোগী স্বর্ণ তাহারা পাইবে না। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের সংরক্ষণীনীতিও স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

আধুনিক কালে, আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, স্বর্ণের গুরুত্ব বিশেষ কমিয়া গিয়াছে, ফলে প্রধান প্রধান মুদ্রা নিজস্ব লেনদেনের সুবিধার জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে ; ষ্টার্লিং এলাকা, ডলার এলাকা, রুব্‌ল্ এলাকা ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডারের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক দেশ তাহার প্রধান আইন চালু মুদ্রার সহিত স্বর্ণ বা মার্কিন ডলারের বিনিময় হার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে সর্বসম্মত পারস্পরিক বিনিময় হার নির্দিষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইয়াছে। ইহাকে তাই অনেকে মিশ্রমান (Mixed standard) বলেন। কিন্তু ইহা মনে রাখা দরকার যে, স্বর্ণের ভিত্তিতে আর্থিক ব্যবস্থা গঠন করা এই নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন উপায়ে ইহাকে চালু করা বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী সম্ভবপর নয়।

কাগজী মান (Paper Standard) :

দেশের প্রধান আইন-চালু অর্থ হিসাবে কাগজীনোট প্রচলিত থাকিলে তাহাকে কাগজীমান বলা হয়। এই কাগজী নোট সাধারণতঃ আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচলিত হয় এবং সরকারী আর্থিক নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। চেক বা বিনিময়-বিলকে কখনই নোট বলা হয় না, কারণ তাহা সীমাবদ্ধভাবে আইনচালু (Limited legal tender)। এই কাগজীনোট রূপান্তর-যোগ্য (convertible) বা রূপান্তরহীন (Inconvertible) হইতে পারে।

কাগজীমান

কাগজী নোটের বহু সুবিধা আছে। একসঙ্গে বহু অর্থ লেন-দেন করিতে হইলে ধাতু দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রার তুলনায় কাগজী অর্থ বিশেষ সুবিধাজনক। দ্বিতীয়তঃ, ধাতুমুদ্রার তুলনায় ইহাতে ব্যয় অনেক কম। অর্থ প্রস্তুতের ব্যয় কম এবং ক্রমাগত হস্তান্তরের ফলে ধাতুর প্রভৃত অপব্যয় কাগজী নোটের ক্ষেত্রে বহন করিতে হয় না। তৃতীয়তঃ, কাগজী মান ব্যবস্থাতে দেশের আর্থিক নীতি অর্থনৈতিক নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গঠন করা চলে। কেইন্‌সের মতে, দেশে কর্মসংস্থানের স্তরোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে আর্থিক নীতির সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, সুতরাং উহা এরূপ নমনীয় হওয়া

সুবিধা

উচিত যে আভ্যন্তরীন নিয়মকানুনের দ্বারা অর্থ প্রচলনের পরিমাণকে প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা চলে। ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মানের পক্ষে এরূপ নমনীয়তা সম্ভবপর নহে। বাণিজ্যচক্র বা ব্যবসাসঙ্কট দূর করিতে হইলেও অর্থের পরিমাণ সহজে পরিবর্তনযোগ্য রাখা প্রয়োজন। কাগজীমান ব্যবস্থাতে প্রভূত ধাতু মজুত রাখার প্রয়োজন নাই, ইহার নমনীয়তা (flexibility) এবং প্রসার-ক্ষমতা (elasticity) অধিক। বর্ত্তমান পৃথিবীতে অনমনীয় অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহ (Rigid Economic Institutions) থাকায়, (যেমন শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) এবং অর্থ-নৈতিক জাতীয়তাবাদী (Auturcky) মনোভাব শক্তিশালী হওয়ায় কাগজী অর্থের গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাগজী অর্থের অসুবিধা হইল যে, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধক এই ব্যবস্থার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিহিত নাই। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও জাগরূক আছে। তাই তাহাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা উৎপাদন করা কাগজীমানের দ্বারা বিশেষ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, পরিচালনার ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে পারে, শ্রেণীস্বার্থ বা দলগত স্বার্থে অর্থের নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক নীতি পরিচালিত হওয়াও অসম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, কাগজীমান ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময় হারের উঠানামার কোন সীমা পরিসীমা থাকে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাগজীমান ব্যবস্থায় অর্থের অন্তর্দেশীয় মূল্যের স্থিরতা বা স্থায়িত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, অর্থের বহির্মূল্যকে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ, অর্থের পরিমাণ যথেচ্ছ বৃদ্ধি করিলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার বহির্মূল্য পাতন (Devaluation) ঘটে, এবং রপ্তানী-বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিতে পারে। অন্যান্য সকল দেশও আত্মরক্ষামূলক বা প্রতিশোধ-মূলক বহির্মূল্য পাতনের (Devaluation) চেষ্টা করিবে এবং উহা দ্বারা রপ্তানী বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইবে। এইরূপে প্রতিযোগিতামূলক বহির্মূল্য পাতনের দৌড় সুরু হইবে ও বৈদেশিক বানিজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কাগজী অর্থ প্রচলনের এই সকল বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে।

অসুবিধা

কাগজী নোট প্রচলনের নীতিসমূহ (Principles of Note Issue)

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি নীতি অনুযায়ী কাগজী অর্থপ্রচলন করিবে, তাহার সম্বন্ধে দুই প্রকার মতবাদ এককালে প্রচলিত ছিল। একদল ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে দেশে কাগজী

নোট ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে প্রচলিত হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা হিসাবে রক্ষিত মূল্যবান ধাতুর প্রতিনিধি হিসাবে মাত্র ইহা সমাজে প্রচলিত থাকে। সুতরাং, যে পরিমাণ মূল্যের নোট প্রচলিত হইবে তাহার সমমূল্যের ধাতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট জমা রাখিবে। ইহাকে বলা হয় কারেন্সী নীতি (Currency Principle)। অপর মতবাদ অনুযায়ী নোটের কার্য হইল ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তা করা, ইহা তাই সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে অনবরত হস্তান্তরিত হইতে থাকে, খুবই অল্প পরিমাণ কাগজীনোট ধাতু মুদ্রার বা ধাতুতে রূপান্তরনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থাপিত হয়। যদি সমাজে অর্থনৈতিক লেনদেনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক অর্থ চালু করা হয়, তাহা হইলেও ধাতুতে রূপান্তরণের জন্য সেই অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ফিরিয়া আসিবে, প্রয়োজনীয় পরিমাণের সমান হইলে উহা প্রচলিত হইতে থাকিবে। সুতরাং কোন সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যেরূপ অল্প মজুত রাখিয়া অধিক ঋণদান করিতে পারে, সেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও অতি অল্প ধাতু মজুত রাখিয়া কাগজীনোট চালু করিতে পারে। নোট-প্রচলনের এই নীতিকে ব্যাঙ্কিং নীতি (Banking Principle) বলে।

কারেন্সী নীতি ও ব্যাঙ্কীয় নীতি

কারেন্সী প্রথায় প্রচলিত কাগজীনোট জনসাধারণের আস্থাভাজন হইলেও ইহা ব্যয়বহুল এবং অপব্যয়মূলক, প্রভূত মুদ্রা বা ধাতু অযথা অনুৎপাদকভাবে সঞ্চিত থাকে। সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় নোটের পরিমাণ বাড়ান বা কমান সম্ভব নয়, ধাতুর যোগানই অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে। কারেন্সী প্রথায় দেশে সকল উপকরণের পূর্ণনিয়োগের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা বাস্তবে কম বা বেশী অর্থ প্রচলিত হইয়া যাইতে পারে। ব্যাঙ্কিং প্রথায় এই অসুবিধা দূর হইলেও আর্থিক ব্যবস্থা কিছুটা ঝুঁকিবহুল হইয়া পড়ে।

ধাতু জমার পরিমাণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী নোট-প্রচলন ব্যবস্থা-সমূহকে চারি প্রকারে বিভক্ত করা যায়।

১। নির্দ্দিষ্ট ফিডিউসিয়ারী ব্যবস্থা (Fixed Fiduciary System)

এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্য্যন্ত বিনা মজুতে অর্থ প্রচলন করা যাইতে পারে; এই সীমাকে ফিডিউসিয়ারী সীমা (Fiduciary Limit) বলে। এই সীমার পরে অর্থ চালু করিতে হইলে উহার অতিরিক্ত কাগজীনোটের সম্পূর্ণ মূল্য ধাতুতে জমা রাখিতে হয়। এই প্রথা অপচয়মূলক, কারণ ফিডিউসিয়ারী সীমার ঊর্ধে প্রভূত পরিমাণে ধাতু অযথা মজুত থাকে। তাহা ছাড়া ইহা যথেষ্ট

প্রসার-ক্ষম নহে, সম্পূর্ণ মূল্যের ধাতু মজুত রাখার নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করিতে পারে।

১৮৪৪ সালের ব্যাঙ্কচার্টার আইন অনুসারে ইংলণ্ডে এই বিধি গৃহীত হইলেও এবং আরও কয়েকটি দেশ ইহা অনুসরণ করিলেও, দেখা গিয়াছে যে বহুবার ব্যাঙ্ক-চার্টার আইন মুলতুবী রাখিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডকে ধাতু জমা না রাখিয়া নোট প্রচলনের সুবিধা দিতে হইয়াছে। অবশেষে ম্যাক্‌মিলান কমিটির সুপারিশে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়।

২। সর্বোচ্চ সীমা ব্যবস্থা (The Maximum Limit System)

এই অবস্থায় আইনসভা একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয় যে পর্যন্ত বিনা জমাতে অর্থপ্রচলন করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই সীমার পরেও অর্থপ্রচলনের চেষ্টা করিলে আইনসভার অনুমোদনের ও আইন-পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থার দুইটি গুণ আছে: অর্থ-কর্তৃপক্ষ অর্থপ্রচলনের ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ চালাইতে পারে এবং, অযথা ধাতু মজুত করিয়া রাখা হয় না। ইহার অসুবিধা হইল এই যে, যদি এই সীমা খুবই নীচুতে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থার প্রসার-ক্ষমতা রহিল না, যদি খুবই উঁচুতে ধার্য হয় তবে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা রহিয়া গেল। ফ্রান্সে ১৯২৮ সালের পূর্বে ইহা প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার পরে ইহা তুলিয়া দেওয়া হয়।

৩। আনুপাতিক জমা ব্যবস্থা (The Proportional Reserve System)

এই ব্যবস্থায় মোট প্রচলিত নোটের কিছু অংশ ধাতুতে জমা হিসাবে রাখিতে হয় (শতকরা হিসাবে, যেমন ২৫% বা ৩০% বা ৪০% ইত্যাদি)।

এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল এই যে ইহার পরিচালনা খুবই সহজ ও সরল। তদুপরি, ইহা প্রসার-ক্ষম এবং অধিক ধাতু অযথা মজুত রাখার প্রয়োজন হয় না। এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল এই যে কিছু পরিমাণ ধাতুকে ইহা অযথা মজুত রাখে। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় ধাতুর মজুত কমিয়া গেলে উহা হইতে অধিক হারে অর্থ প্রচলন কমাইয়া ফেলিতে হয়। যেমন ৫০০টি নোটের পিছনে ২৫% হারে জমা রাখিয়া ১২৫টি স্বর্ণ মুদ্রা জমা রাখা হইয়াছে। যদি স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া ১২৪টি হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ৪টি কাগজী নোটের প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে। সর্বোপরি বলা যায় যে, যদি অর্থকর্তৃপক্ষের উপর লোকের আস্থা বজায় থাকে তবে ওই জমা

নিতান্তই অনাবশ্যক এবং যদি লোকে আস্থা হারাইয়াই ফেলে তবে ওই আংশিক জমা সকল নোটের স্বর্ণে রূপান্তরনের পক্ষে নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত।

৪। স্বর্ণব্যতীরকী আনুপাতিক জমা ব্যবস্থা (Proportional Reserve System not based on gold)

এই ব্যবস্থায় আইনতঃ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে অপর দেশের অর্থ এবং আংশিকভাবে স্বর্ণ জমা রাখিতে হয়। যেমন ভারতবর্ষে প্রচলিত নোটের মূল্যের ৪০% জমা রাখা হইত, তবে এই জমা কিছু স্বর্ণমুদ্রা, কিছু স্বর্ণ (ধাতু) এবং কিছু বৈদেশিক মুদ্রাতে (ষ্টার্লিং বা ডলার)। এই ব্যবস্থার সুবিধা অনেক। ইহা প্রসার-ক্ষম, বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং বিদেশের ব্যাঙ্কে বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার সুবিধা থাকায় সুদ হিসাবে দেশের কিছু আয়ও হইতে পারে।

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলা হয় যে বৈদেশিক মুদ্রাকে নিজ দেশের অর্থের জমা হিসাবে না রাখাই ভাল। যেমন গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে প্রাপ্ত ষ্টার্লিংকে জমা হিসাবে গণ্য করিয়া ভারতে প্রভূত পরিমাণে নোট প্রচলন হইযাছিল এবং ফলে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থিরতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সুফলদায়ী হইলেও অন্তর্দেশীয় নোট-প্রচলনের ভিত্তি হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রাকে গণ্য না করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

নোট-প্রচলন নিয়ন্ত্রনের সঠিক নীতি (Right Principle of Regulation) :

আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই অর্থনৈতিক উন্নতি, দামস্তরের উঠানামা বন্ধ করা, পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছান এইপ্রকার লক্ষ্য অনুযায়ী অর্থের ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত আছে। সুতরাং কি পরিমাণ নোট চালু করা দরকার অথবা প্রচলন হইতে তুলিয়া লওয়া দরকার, এই সকল নির্ধারণ অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। অর্থ-কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যথেষ্ট দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান, সুতরাং তাহার বিবেচনার উপর এই ব্যাপারে নির্ভর করা চলে। আর সমাজে ঋণরূপ অর্থ নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের, তখন নোটের উপর তাহার দায়িত্ব স্বীকার না করার কি যুক্তি থাকিতে পারে? যখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের এবং ঘাটতি বাজেটের দ্বারা উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা সমূহে অর্থবিনিয়োগের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বহন করিতেছে, তখন নোট প্রচলনের-ধারা দায়িত্ব তাহার উপর

নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দিতে হইবে, আইনের দ্বারা তাহার কার্যের প্রতিবন্ধকতা করিলে চলিবে না।

কিন্তু তবুও জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের সুবিধার জন্য, হঠাৎ প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ, লেনদেন ও বিনিময়হার সঠিক রাখিবার নিমিত্ত কিছু পরিমাণে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার নিয়ম করিয়া দেওয়া ভাল। শুধু তাহাই নহে; নোট প্রচলনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত করিয়া রাখা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের উপায় হিসাবে যথেষ্ট কার্যকরী। তবে এই সীমা বেশ ঊর্ধে ধার্য করা দরকার, যাহাতে স্বাভাবিক সময়ে উন্নয়ন মূলক আর্থিক নীতি গ্রহণে কোন বাধা না আসিতে পারে।

এই সীমা কোথায় ধার্য হইবে বা কি পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা থাকিবে তাহা বিভিন্ন দেশের পৃথক অর্থনৈতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী পৃথক হইবে। শুধু তাহাই নহে, একই দেশের অর্থনৈতিক প্রসারের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী তাহা নির্ধারিত হইবে।

নোট প্রচলনের এমন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা দরকার যাহা কমব্যয়শীল বা ব্যয়সংকোচমূলক, প্রসারক্ষম, ঝুঁকিহীন ও নিরাপদ এবং অর্থের অন্তর্মূল্য (Internal Value) এবং বহির্মূল্য (External Value) মোটামুটি ভাবে স্থির রাখে।

অনুশীলনী

1. When is a country said to be on Gold Standard? 'There are degrees of Gold Standard'—Illustrate the Statement. (C.U. B.Com. 40, 42, 46, 47)

2. Discuss the merits and demerits of Gold Standard. (B.Com. 44, 46)

3. Explain what you understand by the gold Bullion Standard and the Gold Exchange Standard. (B.A. 47)

4. Elucidate the merits and drawbacks of a Paper currency System.

5. Discuss the important Principles of Note Issue.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উৎপত্তি, প্রয়োজনীয়তা ও পরিচালনা ঃ

দেশের অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত থাকিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সকল দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি কার্যকরী করার করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্ক সমূহ হইতে পৃথক। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহ মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া পরিচালিত হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের আর্থিক ব্যবস্থার নেতা ও পবিচালক হিসাবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্য (Economic objectives) সাধনের উদ্দেশ্যে আর্থিক নীতিসমূহ (Moneteiy policies) প্রয়োগ করেন। এই জন্য কাগজী নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয় এবং আইন-সঙ্গত ভাবে বিভিন্ন ক্ষমতা ইহার হাতে ন্যস্ত থাকে।

আর্থিক নীতি প্রয়োগের বৃদ্ধি ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উৎপত্তি

দেশের জটিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে না রাখিলে শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পাবে না। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে, বা দেশের অর্থ-নৈতিক ক্রমোন্নতির গতি বৃদ্ধি করিতে হইলে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের (Sectors) মধ্যে সুসামঞ্জস্য বজায় রাখিতে হইলে কোন কেন্দ্রীয় আর্থিক কর্তৃপক্ষ থাকা প্রয়োজন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও সংকট, অর্থাৎ বাণিজ্য-চক্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় পরিচালনা ব্যতীত সম্ভব নহে।

প্রয়োজনীয়তা

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এইরূপ ধারণা ছিল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে। ইহার কারণ হইল, প্রধানত: রাজনৈতিক প্রভাব হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মুক্ত রাখা। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্র-পরিচালনা আমলাতান্ত্রিক প্রভাবের বৃদ্ধি ঘটায়। বেতনভুক্ সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীর স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা অধিক থাকায় তাহাদের উৎসাহ ও উদ্যোগ ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। ইহাও

রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ বা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত

বলা হইত যে ব্যাঙ্ক ব্যবসা বিশেষ ধরণের কার্য, ইহার জন্য বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন; আইন-সভার সদস্য বা পার্টিনেতাদের এইরূপ জ্ঞান না থাকাই সম্ভব। এই সকল কারণের দরুণ শেয়ার-ক্রেতাদের বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করাই তখন প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই সকল যুক্তি থাকা সত্বেও দেখা গিয়াছে যে, জনস্বার্থ রক্ষাকারী কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। ঝুঁকিগ্রহণ বা অধিক উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন কেন্দ্রীয়ব্যাঙ্কের কর্তাদের নাই, ইহা ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়। আর, যদি কোন মুনাফা হয়, তাহা জাতীয় স্বার্থে জাতীয় অর্থভাণ্ডারে যাওয়াই উচিত। সুতরাং, বর্ত্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্র ক্রমেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে; শেয়ার ক্রয় করিয়া, পরিচালক মণ্ডলীতে মনোনীত সদস্য নিয়োগ করিয়া অথবা সম্পূর্ণ মালিকানা স্থাপন করিয়া।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Functions of a Central Bank) :

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন রকম কার্য করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ **কাগজী নোটের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ**। দেশে অর্থের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত আছে। পূর্বে রাষ্ট্র নিজেই অর্থ প্রচলন করিতেন। পরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এই কার্যের ভার গ্রহণ করে, কিন্তু বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতেই এই ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কাগজী নোট প্রচলনের অধিকার যাহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ইহা ন্যস্ত থাকা উচিত। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকার নোট থাকে; সুতরাং দেশে অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রভূত অসুবিধা হয়, এক প্রকার নোট প্রচলিত হইলে নোটের অধিক প্রচলনের (Excess issue) সম্ভাবনা কম। দেশে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়াতেও নোট প্রচলনের ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে কারণ এই ক্ষমতা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের নির্দেশে ও পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রচলিত এই কাগজী নোট সমূহের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস স্বভাবতঃই বেশী থাকে। তাহা ছাড়া নোট-প্রচলন হইতে যাহাতে মুনাফার উদ্ভব না

আর্থিক ব্যবস্থার সংগঠন গড়িয়া তোলা ও পরিচালনা

হয় এই জন্য নোট-প্রচলনকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের হাতে না দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতেই রাখা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, **সরকারের ব্যাঙ্করূপে কাজ করা ঃ**

(কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সরকারের সকল আয় জমা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতেই সকল ব্যয় হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে এই সরকারী আয় ব্যয়ের হিসাবও রক্ষা করে। সরকারী ঋণ পরিচালনার ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর। সরকারের জন্য প্রয়োজন হইলে ইহা ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ করে, নিয়মিত সুদ দেয় এবং পরিশোধের ব্যবস্থা করে।)

সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য

তৃতীয়তঃ, **দেশের ব্যাঙ্ক সমূহের ব্যাঙ্করূপে কাজ করা ঃ**

(দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নগদ অর্থ সংগ্রহের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে।) জমার পরিমাণ আইন বা প্রথার দ্বারা নির্ধারিত। (এই জমা রাখিবার ফলে ব্যাঙ্ক সমূহ প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ পায় অথবা প্রথম শ্রেণীর বিনিময়-বিলসমূহ ভাঙাইয়া দরকার মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইল সর্বশেষস্তরের ঋণদাতা। অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-সমূহ বিনিময় বিলের বদলে অথবা স্বল্পকালীন ঋণপত্রের (Short-term Securities) বদলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ পাইতে পারে এবং সেই ঋণের দ্বারা নিজেদের দেনা মিটাইতে সক্ষম হয় বা উচ্চ সুদে কোথাও লগ্নী করিতে পারে। কোন ব্যাঙ্ক-সঙ্কটের সময় তাহাদের সম্পত্তিগুলির বদলে হঠাৎ নগদ-অর্থ পাওয়ার এই সুবিধার ফলে তাহাদের পক্ষে বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা সুবিধাজনক। দেশের সমগ্র ঋণ-কাঠামোতে এইরূপে তারল্য ও প্রসারতা (Liquidity and elasticity) আনিয়া দেওয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের ফলেই ঘটে।) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক না থাকিলে, অথবা ঋণপত্র বা বিনিময়-বিল প্রভৃতিকে প্রয়োজন হইলেই নগদ অর্থে রূপান্তরণের সুবিধা না থাকিলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ আমানতের আরও অধিক অংশ নিজেদের নিকট নগদ অর্থরূপে জমা রাখিতে বাধ্য হইত; তাহাদের অর্থলগ্নীর পরিমাণ আরও কম হইত, দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে নগদ অর্থ পাইবার সম্ভাবনা কম থাকিত; ঋণ ব্যবস্থা সঙ্কুচিত থাকিত।

ব্যাঙ্ক সমূহের ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য

সর্বশেষ স্তরের ঋণ দান

চতুর্থতঃ, প্রচলিত কাগজীনোট বা দেশের ঋণব্যবস্থার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য **স্বর্ণ বা বৈদেশিক অর্থ জমা রাখা** কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। দেশে স্বর্ণমান অর্থব্যবস্থা চালু থাকিলে দেশের মধ্যে ও বাহিরে স্বর্ণের আসা যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। **অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার বা অর্থের বহির্মূল্য নিয়ন্ত্রণ** করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা সমূহে দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং বৈদেশিক বিনিময়-হারকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সে মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা (Fundamental Disequilibrium) আসিতে না পারে, তাহা দেখাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব।

অর্থের বহির্মূল্য নিয়ন্ত্রণ

পঞ্চমতঃ, দেশের অর্থের বাজারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য **ব্যাঙ্কঋণকে নিয়ন্ত্রণ** করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম কাজ। ব্যাঙ্ক-হার পরিবর্তনের দ্বারা বাজারের সুদের হার নিয়ন্ত্রণ, খোলাবাজারে কার্যকলাপের দ্বারা দেশে অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে নগদ জমার পরিমাণে পরিবর্তন করিয়া এবং অনুরোধ বা নির্দেশ প্রভৃতির দ্বারা অর্থের বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব।

ঋণনিয়ন্ত্রণ

দেশের ঋণকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে দামস্তর স্থির রাখা সম্ভব হয় না; ব্যবসাসমৃদ্ধি ও ব্যবসাসঙ্কট বা বাণিজ্যচক্র দূর করা সম্ভব হয় না। আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থায়ীভাবে বজায় রাখিবার জন্যও ঋণ-নিয়ন্ত্রণের কার্য বিশেষ সাহায্যকারী। অনুন্নত দেশসমূহ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে যে দ্রুত অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির (Economic growth) চেষ্টা করিতেছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য হইল সেই উদ্দেশ্যে আর্থিক নীতি-সমূহ পরিচালনা করা।

দামস্তর স্থির রাখা, বাণিজ্য চক্র দূর করা, পূর্ণকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি

ষষ্ঠতঃ, ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের **অন্যান্য বহু কার্য** আছে। ব্যাঙ্কসমূহের পারস্পরিক দেনা পাওনা মিটাইবার জন্য ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনা করা, দেশের আর্থিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি নজর রাখা প্রভৃতি কার্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেই করিতে হয়।

ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনা প্রভৃতি

ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Methods of credit Control):

ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়:

(১) **ব্যাঙ্ক হারের পরিবর্তন:** যে হারে সরকারীভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

বিনিময় বিল সমূহের বদলে অর্থঋণ দেয় তাহাকে ব্যাঙ্কহার বা ব্যাঙ্করেট বলে। এই ব্যাঙ্কহার হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদেরহার—এই হারেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কঋণ দেয়। সমাজে দ্রব্যাদি বৃদ্ধির তুলনায় আর্থিক আয়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে বা সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয়ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কহার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্কহারের বৃদ্ধির ফলে বাজারে সুদের হারও বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে ঋণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হয়, ঋণগ্রহণ ও বিনিয়োগ কম পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আর্থিক আয়ের স্রোতে ভাঁটা পড়ে। ব্যাঙ্কহার কমাইলে ঋণগ্রহণের ব্যয় কমিয়া যায়, ঋণগ্রহণ ও বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আর্থিক আয়ের স্রোতে জোয়ার আসে।

২। খোলাবাজারে কার্যকলাপ (Open Market Operations) :

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা সমাজের অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে চেষ্টা করে ; এই পদ্ধতির নাম খোলা বাজারের কার্যকলাপ। সমাজে অর্থের পরিমাণ কমাইতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে, জনসাধারণের বা ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ অর্থ তুলিয়া লয়, ব্যাঙ্কসমূহের ঋণসৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও কমে। অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে ঋণপত্র সমূহ ক্রয় করিয়া লয়, জনসাধারণের বা ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ তুলিয়া দেয়, ব্যাঙ্কসমূহের ঋণসৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

৩। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন (Change in the Reserve Ratios) :

দেশের ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নিকট নগদ জমার কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে। ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সেই নগদ অর্থ ঋণসৃষ্টি করিবার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণসৃষ্টির পরিমাণ বাড়াইতে চান, তাহা হইলে জমার অনুপাত কমাইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাতে অধিক নগদ অর্থ থাকায় তাহার ভিত্তিতে অধিক 'ঋণসৃষ্টি' সম্ভব হয়। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ কমাইতে চান, তাহা হইলে জমার অনুপাত বাড়াইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ অর্থ সরাইয়া আনেন, ঋণ সৃষ্টির ভিত্তি কমিয়া যাওয়ায় ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ কমিয়া যায়।

৪। ঋণের রেশনিং (Rationing of Credit) :

এই পদ্ধতি দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইতে বা বাড়াইতে চাহিলে পৃথক ভাবে তাহা করিতে পারেন। যদি কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্ক মনে করেন যে, ধরা যাউক, বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ অধিক হইতেছে, কিন্তু ইস্পাত শিল্পে আশানুরূপ বিনিয়োগ হইতেছে না, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক সমূহকে নির্দেশ দিবেন যে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ঋণ বস্ত্র শিল্পে দেওয়া চলিবে না। এইরূপে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন শেয়ার বাজারে ফাটকাদারী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

৫। শেয়ার-বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন (Changes in Margin Requirements on Security Loans):

শেয়ার বাজারে ফাটকাদারীর উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক ঋণের-ব্যবহার কমাইবার জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শেয়ারের কোন দালাল বা কোন ফাটকা ব্যবসায়ী শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ঋণ আনিতে গেলে যে পরিমাণ নগদ অর্থ জমা দেয় তাহাকে প্রয়োজনীয় নগদাংশ (Margin Requirements) বলে। যেমন, ১০০০ টাকার শেয়ার বন্ধক দিয়া যদি ৯০০৲ ঋণহিসাবে আনিতে পারা যায় তাহা হইলে ১০০৲ হইল প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন। এক্ষেত্রে মার্জিন হইল শেয়ারের মূল্যের ১০%, অর্থাৎ ১০% মার্জিনে কোন ব্যক্তি সহবন্ধকী (Collateral Security) দ্রব্যের (শেয়ারের) মূল্যের ৯০% ঋণ লইতে পারে। প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন যত অধিক হইবে তত অধিক নগদ টাকা জমা দিতে হইবে বা শেয়ারের বন্ধকীতে তত কম পরিমাণ ঋণ পাইতে পারিবে। যেমন প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন ২০% হইলে সে ৮০০৲ ঋণ পাইবে। এইভাবে মার্জিন বাড়াইয়া ফাটকাদারীতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ কমান সম্ভবপর।

৬। ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের নিয়ন্ত্রণ (Consumer Credit Regulation):

স্থায়ীধরণের ভোগ্য দ্রব্য সমূহ (যেমন রেডিয়ো, টেলিভিশন, ফ্রিজিডেয়ার, গ্রামোফোন, আসবাবপত্র প্রভৃতি) আজকাল প্রায়ই কিস্তিতে দাম দেওয়ার সর্তে ক্রয় বিক্রয় করা হয়; দ্রব্য ক্রয়ের সময় দামের একাংশ (যেমন ২০% বা ২৫%) দেওয়া হয় এবং মাসিক, বা ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক নির্দিষ্ট সংখ্যক কিস্তিতে (যেমন মাসিক হিসাবে ৩০ কিস্তি বা ত্রৈমাসিক হিসাবে ১০ কিস্তি, ষান্মাসিক হিসাবে ৫ কিস্তিতে) সম্পূর্ণ দাম পরিশোধ করা হয়। দেখা গিয়াছে যে স্থায়ীধরণের ভোগ্য দ্রব্যসমূহের চাহিদা অত্যন্ত অস্থায়ী প্রকৃতির (unstable), এবং তাহা দামস্তর, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিশেষ প্রভাবশীল। সুতরাং আধুনিক-কালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে

দেশের স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের কিস্তি বা অন্যান্য সর্তাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। (আমেরিকায় এই ক্ষমতা Regulation W নামে পরিচিত)। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে মুদ্রাস্ফীতি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি কমাইতে হইবে তাহা হইলে সে এই ঋণের সর্তাদি কঠিনতর করিবে যাহাতে দ্রব্যাদির ক্রয় কমিয়া যায়। যেমন, ক্রয়ের সময় নগদ একাংশের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, ঋণে বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা কমাইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিস্তির সংখ্যা কমাইবে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে এইরূপ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি হউক এবং উহাতে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়িয়া যাউক, তাহা হইলে সে এই ঋণের সর্তাদি শিথিলতর করিবে। যেমন ক্রয়ের সময় দামের নগদ একাংশের পরিমাণ কমাইয়া দিবে, ঋণে বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিস্তির সংখ্যাও বাড়াইবে।

৭। **অনুরোধ প্রভাবের দ্বারা (Moral Persuations):**

অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ সকল ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুরোধ সকল প্রতিষ্ঠানই রক্ষা করিবে, এই আশায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনুরোধ উপরোধের পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ব্যাঙ্কঋণ বাড়ান বা কমান উচিত কিনা তাহা ব্যাঙ্কদের বুঝাইবার চেষ্টা করে।

ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the methods of Credit Control):

এই সকল পদ্ধতিসমূহ যে বিনা বাধায় সম্পূর্ণ প্রয়োগশীল ও কার্যকরী হইয়া থাকে তাহা নহে; বাস্তব ক্ষেত্রে ইহারা নানাবিধ কারণে সীমাবদ্ধ, প্রয়োগ করিলে সর্বত্র সফল না-ও হইতে পারে।

যেমন ধরা যাউক, দামস্তরে পরিবর্তন আসিয়াছে দেশে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতেছে, "স্বাভাবিক" অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজস্ব সুদের হার বা **ব্যাঙ্ক-হার** কমাইয়া বা বাড়াইয়া দিবে। (ক) কিন্তু সুদের হার ঠিক কি পরিমাণ কমান বা বাড়ান দরকার তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি ভাবে স্থির করিবে? ভুল ত্রুটির মধ্য দিয়া পরীক্ষা (Trial and Error) করার সুযোগ এই ব্যাপারে খুবই কম। (খ) যদি ব্যাঙ্ক হারের সেই 'আদর্শ' পরিবর্তনটুকু জানাও যায়, তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কহার কমাইলে বা বাড়াইলে অন্যান্য ব্যাঙ্করা

ব্যাঙ্ক-হার পদ্ধতির অসার্থকতা

তাহাদের সুদের হার কমাইবে বা বাড়াইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। অনুন্নত দেশসমূহে, যেমন ভারতবর্ষে, অর্থের বাজার বিশেষ অসংগঠিত, "দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি" (যেমন গ্রাম্য মহাজন, শ্রেষ্ঠী, সাহুকার ইত্যাদি) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারে। (গ) ব্যাঙ্ক সমূহ সুদের হার পরিবর্তন করিলেও যেমন মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সুদের হার বাড়িলেও ব্যবসাদারগণ বিনিয়োগ কমাইবে এমন নিশ্চয়তা নাই, কারণ প্রত্যাশিত মুনাফার হার অত্যধিক এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে সুদের দরুণ ব্যয় অতি অল্প অংশ মাত্র। আবার ব্যবসা-সঙ্কটের সময়ে সুদের হার কমাইলেও গভীর নিরাশার প্রভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা।

খোলা বাজারে কার্যাবলীও যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে তাহা নহে। (ক) দামস্তর বাড়িতে থাকিলে মুদ্রাস্ফীতি কমাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরাইয়া আনিতে পারে, কিন্তু যদি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইয়া সেই নগদ অর্থের সাহায্যে ঋণবৃদ্ধি করিতে থাকে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। (খ) ব্যবসাসঙ্কটের যুগে বাজার হইতে ঋণপত্র সমূহ ক্রয় করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থের পরিমাণ সমাজে বাড়াইয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহ পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্য বা সাবধানতা অবলম্বন করিয়া সেই নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার জন্য ফেরৎ দিতে পারে; ঋণসৃষ্টির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার না করিয়া নিজের আলমারীতে জমাইয়া রাখিতে পারে: জনসাধারণও নগদ অর্থ সরাইয়া লইয়া নিজেদের হাতে মজুত করিয়া রাখিতে পারে। (গ) বর্ধিত নগদ অর্থের সাহায্যে ঋণসৃষ্টি করিতে রাজী হইলেও যে ব্যাঙ্কসমূহ ঋণ দিতে পারিবেই এরূপ নিশ্চয়তা নাই, কারণ ব্যবসা সঙ্কটের কালে গভীর হতাশায় নিমগ্ন ব্যবসায়ীগণ সস্তা ও সহজ ঋণ পাইয়াও বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। ঘোড়াকে জলের সম্মুখে পৌছান যাইতে পারে, কিন্তু অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জলপানে বাধ্য করা যায় না।

খোলাবাজারে কার্যাদির সীমাবদ্ধতা

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন (ক) সকল ব্যাঙ্ককে সমানভাবে প্রভাবান্বিত করে না, কারণ অনেক ব্যাঙ্ক পূর্ব হইতেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নিয়মের বেশী নগদ জমা রাখে। তাহা ছাড়া, নগদ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই যে ব্যাঙ্ক সমূহ ঋণবৃদ্ধি করিতে করিতে চাহিবে এরূপ নহে। আর, ঋণবৃদ্ধি করিতে চাহিলেই তাহারা করিতে পারে না, উদ্যোক্তাগণ ঋণগ্রহণে প্রস্তুত আছে কি না তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকার।

নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তনের সীমাবদ্ধতা

তত্ত্বের দিক হইতে ঋণের রেশণিং সত্যই বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ ইহার দ্বারা ঋণের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করা তো যায়ই, উপরন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমাজের বিভিন্ন দিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতির জন্য ঋণবণ্টন করিতে পারে।

ঋণের রেশণিংএর অসুবিধা

তবে এই পদ্ধতি বাস্তবে প্রয়োগের অসুবিধা হইল ইহার বাধ্যতামূলক দিকটি, জবরদস্তি করিয়া ব্যাঙ্কের ঋণদানের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া ইহাকে মনে করা চলে। এই পদ্ধতির কার্যকারিতাও কম, কারণ এক উদ্দেশ্যে ঋণ লইয়া উদ্যোক্তাগণ অন্য উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণব্যবহারের দিকটি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ অসুবিধাজনক।

শেয়ার বন্ধকী ঋণের প্রয়োজনীয় নগদাংশে বা মার্জিনে পরিবর্তন ফাট্‌কা ব্যবসাকে বহুপরিমাণে সঙ্কুচিত করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বা

মার্জিন নীতির সীমাবদ্ধতা

মুদ্রাসঙ্কোচনের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে না। সমাজে অর্থের পরিমাণ বা আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ কমান বা বাড়ান এই পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হয় না, কেবল মাত্র শেয়ার-লেনদেনে লগ্নীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। **ভোগ্যদ্রব্যক্রয় নিয়ন্ত্রণও** ঋণের বিশেষ

ক্রয়নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

দিকে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা যে মৌলিক কারণগুলির ফলে দামস্তর ভারসাম্যবিহীন হইয়া পড়ে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। **অনুরোধ বা প্রভাব বিস্তার** সাফল্য লাভ করে যদি অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহ স্বভাবতঃই কেন্দ্রীয়

অনুরোধের বা প্রভাবের সীমা

ব্যাঙ্ককে নেতা হিসাবে স্বীকার করিয়া লয় এবং দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কম থাকে। আর ব্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেই দেশে ঋণসৃষ্টি কমান বা বাড়ান যায় না, ঋণগ্রহীতাদের কার্যের উপর ইহা বহুলাংশে নির্ভর করে।

আর্থিক নীতি (Monetary Policy) :

আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ও লক্ষ্য সাধনের জন্য আর্থিক নীতিকে প্রয়োগ করা হয়, আর্থিক নীতি অর্থনৈতিক নীতিরই অঙ্গ। এরূপ

আর্থিক নীতি অর্থনৈতিক নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ

ভাবে আর্থিক নীতি স্থির করা হয় যে তাহা সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতিকে সফলতা লাভ করিতে সাহায্য করে। সুতরাং স্থান কাল, ভৌগোলিক অবস্থান বা সমাজের ও রাষ্ট্রের কাঠামো লক্ষ্যের উপর আর্থিক নীতি নির্ভর করে।

(১) বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা (Stability of external value)

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন আর্থিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থের বহির্মূল্যের স্থিরতা। বিনিময় হারে উঠানামা উর্ধে ও নিম্নে দুই স্বর্ণ বিন্দুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ঐ সীমার মধ্যেই স্বর্ণের গমনাগমনের ফলে দেশে আভ্যন্তরীণ দামস্তর উৎপাদন ও ব্যয়স্তরের কাঠামোতে পরিবর্তন হইত। "খেলার নিয়মসমূহ" মানিয়া চলিয়া স্বর্ণমান বজায় রাখা আর্থিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল বলা চলে। এই আর্থিক নীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ প্রসার হইযাছিল, বৈদেশিক বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায়

কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্ত্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় অর্থের বহির্মূল্য অপেক্ষা অর্থের অন্তর্মূল্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অর্থের মূল্যে পরিবর্ত্তন হইলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান প্রভাবান্বিত হয়, অন্তর্মূল্যকে বাহিরের বিভিন্ন ঘটনাস্রোতের দ্বারা নির্ধারিত হইতে দেওযা কখনই উচিত নহে। আধুনিক যুগের উগ্র অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Autarcky) আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার মান ও আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিযা অর্থের বহির্মূল্যের ভারসাম্য রক্ষা করাকে যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে করে না।

বর্তমান অবস্থায় পরিবর্তন

মনে রাখিতে হইবে উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষ বিরোধ থাকা উচিত নহে: দেশের স্বার্থ অনুযায়ী উভয় মূল্যকেই কখনও স্থির রাখা উচিত এবং কখনও পরিবর্তিত হইতে দেওয়া উচিত, যদিও পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ভরযোগ্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখাই দরকার।

(২) মৃদুবর্ধনশীল দামস্তর (A gently rising price level):

অনেকের মতে দেশের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হওযা উচিত মৃদুবর্ধনশীল দামস্তর বজায রাখা, কারণ (ক) দামস্তরে বৃদ্ধিই দেশে উদ্যোক্তাদের প্রেরণাশক্তি ও উৎসাহবর্ধক হিসাবে কাজ করে। দামস্তর বর্ধনশীল হইলে শিল্পে বাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, দেশে কর্মসংস্থান আয়স্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, বেকারী দূরীভূত হয়। (খ) বর্ধনশীল দামস্তরই উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প সমৃদ্ধির কারণ বলিযা রবার্টসন মনে করেন। (গ) তাহা ছাড়া মনে রাখা দরকার যে সমাজে ক্রমেই মোট ঋণের পরিমাণ বাড়িতেছে। যদি দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে না থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিদের

গ্রহণের পক্ষে যুক্তিসমূহ

পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ ঋণের ভার বহন করা ক্রমেই শক্ত হইয়া উঠিবে ; দামস্তরে ক্রমবৃদ্ধিই ঋণের আসলভার (Real burden) কমাইয়া দিতে পারে। ধীরে ধীরে, অদৃশ্য উপায়ে, ঋণদাতাদের চক্ষুর অন্তরালে ঋণের আসল ভার কমাইয়া আংশিক ভাবে ঋণপরিশোধের কাজ করাও মৃদুবর্ধনশীল দামস্তরের ফল বলা চলে।

কিন্তু অনেকের মতে, শিল্পবাণিজ্যের উদ্যোক্তাদের এইরূপ কোন উৎসাহ ও প্রেরণা দেওযার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাদের 'স্বাভাবিক' মুনাফা এবং পারিশ্রমিকই যথেষ্ট উৎসাহ দান করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। (খ) তাহা ছাড়া বর্ধনশীল দামস্তর তাহাদের মধ্যে অযোগ্য ও উৎসাহহীন উদ্যোক্তাদের বাঁচাইয়া রাখিবে, দামস্তর বাড়িতে থাকায় অযোগ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না।

গ্রহণের বিপক্ষে যুক্তি সমূহ

(গ) দাম বাড়িবে ইহা পূর্বেই জানা থাকিলে কাঁচামাল ও উপকরণের দামও আগেই বাড়িয়া যাইবে, ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া শিল্পোৎসাহ কমাইয়া দিতেও পারে। (ঘ) দামস্তর বৃদ্ধিতে মুনাফার বৃদ্ধি হয বটে, কিন্তু মজুরীর হার সেই অনুপাতে কখনই বাড়ে না ; ফলে জনসাধারণের ক্রয় শক্তি বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়। (ঙ) সর্বোপরি, দামস্তরে মৃদুবৃদ্ধি বিনিয়োগের বাজারে ফাটকা ব্যবসার পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, সমগ্র শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও অতিরিক্ত মুনাফালোভিতার আবহাওয়া আনিযা দিবে, ক্রমশঃ ব্যবসা সঙ্কটের পথ প্রশস্ত করিবে। অস্বাভাবিক শিল্প সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী শিল্পসঙ্কটের বীজ উপ্ত থাকে।

সিদ্ধান্ত

এতদ্‌সত্বেও, অনেকে মনে করেন যে, যদি উপাদানের ব্যয় এবং ফাটকা-ব্যবসা বন্ধ রাখা যায় তাহা হইলে এই নীতি গ্রহণ করা উচিত ; কারণ, বেকারী দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ ও আয়স্তরে বৃদ্ধির জন্য দামস্তরে মৃদু বৃদ্ধি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে।

(৩) মৃদু পতনশীল দামস্তর (A gently falling Price Level) :

মৃদু পতনশীল দামস্তরের পক্ষে বলা হয় যে (ক) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উন্নত যন্ত্র কৌশলের প্রয়োগের ফলে অর্থনৈতিক দিক হইতে সমগ্র সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির হার অনুযায়ী দামস্তরও কমিয়া আসা উচিত, কারণ তাহা হইলেই জনসাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফল লাভ করিতে পারিবে। (খ) তাহা ছাড়া দামস্তর কমিতে থাকিলে শ্রমিক, বেতনভুক্ ব্যক্তিগণ ও

নির্দিষ্ট আয়কারী ব্যক্তিগণ সকলেরই দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে আসল মজুরী বৃদ্ধি পায়, জীবন যাত্রার মান উন্নত হইয়া উঠে। (গ) সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলেও যদি দামস্তর না কমে তাহা হইলে মুনাফা বৃদ্ধি পায় (কারণ মজুরীর হার বা অন্যান্য ব্যয় কখনই সেই হারে বাড়ে না) অর্থাৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফললাভ করে ব্যবসায়ী শ্রেণী ; জনসাধারণ সেই ফললাভে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। দামস্তরে বৃদ্ধি অবশেষে ব্যবসা বৃদ্ধির চরমতম স্তরে সমাজকে পৌঁছাইয়া ব্যবসা সঙ্কটের সৃষ্টি করে।

গ্রহণের পক্ষে যুক্তি-সমূহ

এই আর্থিক নীতিগ্রহণের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে মৃদু পতনশীল দামস্তর শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দেয় এবং দেশে বিনিয়োগ-বৃদ্ধির আবহাওয়া বজায় রাখিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির বা অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার পরিমাপের বহু বাস্তব অসুবিধা আছে, বিশেষতঃ সেই অগ্রগতি ঘটিবার সময়েই উহা সঠিকভাবে পরিমাপযোগ্য নহে।

গ্রহণের বিপক্ষে যুক্তি সমূহ

স্থির দামস্তর (Stable Price level) :

অর্থ হইল দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, ঋণ পরিশোধের মাপকাঠি এবং মূল্যের সঞ্চিত রূপ। এরূপ অবস্থায় উহার মূল্য স্থির থাকাই সর্বদা বাঞ্ছনীয়. সমাজে বহুপ্রকার অনিশ্চয়তা ও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। (খ) দামস্তরে হঠাৎ উঠানামা বা বাণিজ্যচক্র জনসাধারণের সুষ্ঠু জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক। সমৃদ্ধির "অস্বাভাবিকতা" এবং সঙ্কটের গভীরতা উভয়ের হাত হইতেই রক্ষা পাইতে হইলেই দামস্তর স্থির রাখিতে হয়। (গ) তাহাছাড়া দামস্তরের বৃদ্ধি বা হ্রাস সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবান্বিত করে ; কাহারও উপকার করে বা কাহারও অপকার করে। সুতরাং দামস্তর স্থির রাখাই সকলের স্বার্থরক্ষার পক্ষে একমাত্র ন্যায়সঙ্গত নীতি বলিয়া মনে হয়।

সুবিধাসমূহ

দামস্তর স্থির রাখার এই নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে (ক) ইহার ফলে শিল্প বাণিজ্য প্রসারের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ সৃষ্টি হয় না, সুতরাং ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। আরও বলা যায় যে (খ) দামস্তর স্থির রাখার নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা বিশেষ অসুবিধাজনক। কারণ দামস্তর বলিলে পাইকারী দামের স্তর না খুচরা

দামের স্তর কি বোঝা যাইবে ? তাহা ছাড়া, সূচক সংখ্যা পরিমাপের সাহায্যে দামস্তর স্থির রাখা হইল ; কিন্তু ধনীদের ব্যবহৃত বিলাস-দ্রব্যের দামে হ্রাস গরীবদের ব্যবহৃত অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে বৃদ্ধি খণ্ডাইয়া দিতে পারে ; এইরূপে জীবনযাত্রার মানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচক সংখ্যাকে ধরা না পড়িতেও পারে। (গ) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইল, কিন্তু দামস্তর স্থির থাকিলে জনসাধারণ সেই অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারিল না, শুধু ব্যবসায়ীদেরই মুনাফা বৃদ্ধি হইল, এইরূপ ঘটিতে পারে। কেইন্‌স্ ইহাকে মুনাফা-স্ফীতি বলিয়াছেন।

অসুবিধা-সমূহ

সুতরাং সর্বদা দামস্তর স্থির রাখাও সম্পূর্ণ সঠিক আর্থিক নীতি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

(৫) অর্থের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা (Neutral Money) :

অধ্যাপক হায়েক এবং আরও কয়েকজন ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে আর্থিক নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার যাহাতে সমাজের আসল শক্তি সমূহের (Real forces) গতিবিধি প্রভাবান্বিত না হয়। অর্থ যেন পর্দার মতন কাজ করে, অর্থনৈতিক কাজকর্মকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করিতে না পারে ; নিষ্ক্রিয় বিনিময়ের মাধ্যমরূপেই মূল্যের মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে। পণ্য-বিনিময় বা বার্টার প্রথায় সমাজে যেরূপ আসল শক্তিসমূহের দ্বারাই অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলিতে থাকে, অর্থের উপস্থিতি যেন সেই আসল শক্তি সমূহের গতি-প্রকৃতিকে মোটেই বিচলিত বা গতিভ্রষ্ট না করে। উৎপাদন-দক্ষতা, দ্রব্যোৎপাদনের আসল ব্যয়, ভোগকারীর পছন্দ প্রভৃতি অনার্থিক (non-monetary) শক্তিসমূহের দ্বারাই যেন দ্রব্যসমূহের দাম বা পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে, অর্থের পরিমাণের দ্বারা তাহারা যেন নির্ধারিত না হয়।

অর্থের নিরপেক্ষতা কাহাকে বলে

হায়েকের মতে বাস্তবে অর্থের এই নিরপেক্ষতা বজায় রাখা চলে যদি সমাজে অর্থের ও ঋণের "কার্যকরী" যোগান স্থির রাখা যায়। সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন হইলে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহা নহে ; দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন যেন অর্থের পরিমাণকে আপনা-আপনি পরিবর্তন করায়। সমাজের মোট উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে দামস্তর যেন কমিয়া যায়, উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়া গেলে দামস্তর যেন বাড়িয়া যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে যেন অর্থের পরিমাণ বাড়ে, জনসংখ্যা

কিরূপে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা চলে

কমিয়া গেলে (যুদ্ধ বা মহামারী ইত্যাদির ফলে) অর্থের পরিমাণ যেন কমে। অর্থের প্রচলনবেগ বাড়িলে অর্থের পরিমাণ কমাইতে হয়, প্রচলনবেগ কমিলে অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। শিল্প-কাঠামোতে পরিবর্তন হইলে, যেমন উৎপাদন-ধারা আরও বিভক্ত হইয়া গেলে অর্থাৎ বিযোজন ঘটিলে (Disintgration in the Process of Production) অর্থের পরিমাণ বাড়ান দরকার।

এই নীতির সুবিধা সমস্ত

এই নীতির বহুপ্রকার সুবিধা আছে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, উৎপাদন-ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি অনুযায়ী দামস্তরে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটান হইবে, সুতরাং দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক বিনিময়ের "আসল" অনুপাত বাহিরের প্রভাবে বিকৃত হইবে না। বাণিজ্য চক্রের সৃষ্টি হইবে না, দামস্তরে হঠাৎ উঠানামা হইয়া ব্যবসাজগৎ বিধ্বস্ত করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রকৌশলের উন্নতির বা নূতন-প্রচলনের (Innovation) সহিত দামস্তর বা দ্রব্যবিনিময়ের পারস্পরিক অনুপাতে সামঞ্জস্য থাকিবে। তৃতীয়তঃ, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাগণ উপকৃত হইবে, শ্রমিকশ্রেণীও উৎপাদন-ক্ষমতায়-বৃদ্ধির ফল ভোগ করিতে পারিবে।

নীতি প্রয়োগের বাস্তব অসুবিধা

কিন্তু অর্থের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার এই আর্থিক নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করার বিশেষ অসুবিধা আছে। শিল্প কাঠামোতে, অর্থাৎ প্রচলনবেগে বা যন্ত্রকৌশলে পরিবর্তনের হার, সঠিক পরিমাপ করা এবং অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন করিয়া উহাদের প্রভাব খণ্ডাইয়া দেওয়া বাস্তবে কোন আর্থিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সঠিকভাবে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, সমাজে একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া ব্যবসা সংগঠন থাকায় উৎপাদন-ক্ষমতায় পরিবর্তন বা ব্যয়ে পরিবর্তন দামে সমহার পরিবর্তন আনিতে পারিবে, তাহাও বিশ্বাসজনক নহে।

তবে গলদ

সর্বশেষে, ইহাও মনে রাখা দরকার যে বর্তমান সমাজে অর্থ সক্রিয় শক্তি, ইহার পরিমাণে পরিবর্তন সুদের হারে বা মোট আয়ব্যয়ে পরিবর্তন আনিয়া দ্রব্যোৎপাদন ও কর্মসংস্থানে পরিবর্তন আনে। তরলসম্পত্তি (Liquid asset) হিসাবে ইহার আর কোন জুড়ি নাই, সুতরাং লোকে ইহা ব্যবহার করিবেই, এবং আসল সম্পত্তি সমূহের (Real assets) পরিমাণে ইহা প্রভাব বিস্তার করিবেই।

(৬) পূর্ণকর্মসংস্থান (Full Employment) :

ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞান অনুযায়ী সমাজ সর্বদাই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে আছে।

কোন উপকরণ অনিযুক্ত অবস্থায় থাকিলে, উহার দাম কমাইলেই চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং তাহার নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় ; দেশে বেকার শ্রমিক থাকিলে মজুরীর হার কমাইয়া বেকারী দূর করা সম্ভব।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে কেবলমাত্র মজুরীর হার কমাইলেই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছান যায় না। কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে সমাজের মোট ব্যয়-পরিমাণের উপর। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর সমাজের মোট আয় ব্যয়িত না হইলে পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছান সম্ভব নহে। মোট ব্যয় দুই প্রকারের হইতে পারে ; ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় ও মূলধনী দ্রব্য ক্রয়। সমাজের সঞ্চয়-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয় কমিলে মোট চাহিদা সেই পরিমাণ কমিয়া যায় এবং সেই সকল ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমে। দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয় ও চাহিদা আরও কমে, এইরূপে উৎপাদন ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায়। এমতাবস্থায় কর্মসংস্থানের পরিমাণ বজায় রাখিতে হইলে বা বাড়াইতে হইলে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। সুতরাং দেখা যায়, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছিতে হইলে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে ; ভোগ-প্রবণতা বাড়াইয়া সমাজে ভোগ-ব্যয় বাড়ান, ব্যক্তি-উদ্যোগী বিনিয়োগ বৃদ্ধি বা রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে বৃদ্ধি আর্থিক নীতির সাহায্যে কি ভাবে বিনিয়োগ-ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় বাড়ান যাইতে পারে ?

পূর্ণ কর্ম সংস্থানে পৌঁছিবার উপযোগী আর্থিক নীতি সমূহ

ব্যক্তি-উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলে সুদের হার কমাইতে হয়, যাহাতে উদ্যোক্তাদের নিকট বিনিয়োগ লাভজনক বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুদের হার কমাইবার জন্য ব্যাঙ্কহার পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায় এবং অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য খোলাবাজারে কার্যাদি প্রভৃতি নীতি গ্রহণ করা চলে। **রাষ্ট্র-উদ্যোগী বিনিয়োগ** বাড়াইতে হইলেও অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে হয় কারণ তাহা হইলে সমাজে ব্যক্তিদের ঋণ দিবার ক্ষমতাবৃদ্ধি হয় এবং কম সুদের হারে ঋণ পাওয়া সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, নূতন অর্থসৃষ্টি করিয়া, সেই অর্থের সাহায্যে রাষ্ট্র-উদ্যোগী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা চলে। **সমাজে মোট ভোগ ব্যয়** বাড়াইতে হইলে কিস্তি-প্রথায় স্থায়ী-জাতীয় ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয় বৃদ্ধি করা চলে, কিস্তির নিয়মকানুনে পরিবর্তন বা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি আর্থিক নীতির দ্বারা ভোগব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান সম্ভবপর।

অন্যান্য নীতির সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র আর্থিকনীতির দ্বারা পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌঁছান কি পরিমাণ সম্ভবপর, তাহা সন্দেহজনক। দেশে আশাবাদী আবহাওয়া না থাকিলে অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধি এবং সুদের হার কমাইয়া ব্যক্তি-উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়ান চলে না; এরূপ অবস্থায় শুধু আর্থিক নীতি ব্যর্থ হয়, ইহারই সহিত প্রচুর পরিমাণে রাষ্ট্র-উদ্যোগী বিনিয়োগ-ব্যয় করিতে হয়। নিম্নতম ভোগব্যয় বাড়াইবার জন্য ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি বা নিম্নতম প্রাথমিক নগদ-জমার পরিমাণ (Minimum down Payments) কমাইলেই চলে না; ইহারই সহিত আয়ে পুনর্বণ্টনকারী কর-কাঠামো (Redistributive Tax-structure) প্রবর্তনও প্রয়োজন।

আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতা

সুতরাং, অন্যপ্রকার নীতির সাহায্য ব্যতীত নিছক আর্থিক নীতির দ্বারা পূর্ণ-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়, বরং ইহাতে বিপরীত ফল হইতে পারে, যেমন 'সস্তা' অর্থের নীতির (Cheap money policy) ফলে অপ্রয়োজনীয় এবং অসঙ্গত বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে।

৭। অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি (Economic growth):

দামস্তর স্থির রাখা বা পূর্ণকর্মসংস্থান-এর তুলনায়, আধুনিক কালে বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশসমূহে, অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি সাধন বা ক্রমবৃদ্ধি আর্থিক নীতির লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। আধুনিক কালে বিভিন্ন অনুন্নত দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংগঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মে স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিকনীতির লক্ষ্য হইবে "জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত অগ্রগতি", "জাতির সম্পদ ও উপকরণের ক্রমোন্নতি", "দেশের ক্রমবৃদ্ধি" প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যেরূপ পুরাতন লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণকর্মসংস্থান আর্থিকনীতির লক্ষ্য হইয়াছিল, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; পুরাতন ধরণের আর্থিক নীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন প্রকার আর্থিক নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, বিশেষত, অনুন্নত দেশ-সমূহে

মনে রাখা দরকার যে লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণকর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি এক নহে, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মনিয়োগের লক্ষ্যে পৌঁছাইবার

পথে যে সকল আর্থিক নীতিসমূহ গ্রহণ করা হয়, তাহা অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইরূপ হইতে পারে। অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে হার (the rate of economic growth) জাতির পক্ষে বজায় রাখা সম্ভব বা প্রয়োজনীয়; পূর্ণ কর্মসংস্থান লাভের পদ্ধতি সমূহের দ্বারা সেই হারে বৃদ্ধি না-ও আসিতে পারে; অন্য প্রকার পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছিবার জন্য ভোগ-কার্যের ব্যয় (Consumption expenditure) বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিস্তিবন্দী ক্রয়ের (Installment purchases) সুবিধা করিয়া দিল। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য থাকিলে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে (Sector) বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ কমাইতে হইবে। সুতরাং উভয় লক্ষ্যের পৌঁছিবার উপযোগী পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, ফলে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন আর্থিক নীতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ থাকিতে পারে।

পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি—এই দুই লক্ষ্যে বিরোধ থাকিতে পারে; দুই লক্ষ্যের উপযোগী আর্থিক-নীতিও পৃথক হইতে পারে

শুধু তাহাই নহে। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় এই দুই লক্ষ্যে বেশী বিরোধ দেখা যায় না বটে, কিন্তু যতই কর্মনিয়োগ বাড়িতে থাকে, ততই উভয়ের গভীরতর সংঘাত সৃষ্টি হইতে পারে, কারণ তখনও ক্রমবৃদ্ধির হার পূর্বের ন্যায় অধিক রাখিলে মুদ্রাস্ফীতি ও সঙ্কটের সম্ভাবনা বাড়িতে পারে।

অবশ্য উভয় লক্ষ্যের প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রধানতঃ স্বল্পকালীন ধারণা এবং অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি দীর্ঘকালীন হিসাবের বিষয়। যন্ত্র-কৌশল, উহার জ্ঞান ও ব্যবহারের স্তর প্রভৃতি স্থির ধরিয়া সকল উপকরণের নিয়োগ পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য; কিন্তু ক্রমশঃ উন্নত ধরণের যন্ত্র কৌশলের (Technology) স্তর লাভ করিয়া, প্রত্যেক ধাপেই উপকরণের সফল ও পূর্ণ নিয়োগের দ্বারা তদানীন্তন উৎপাদন-ক্ষমতা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উপকরণ ও উৎপাদন-ক্ষমতার (Country's economic potential) ক্রমাগত বৃদ্ধি অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্য।

দুই লক্ষ্যের প্রকৃতিতে কোথায় পার্থক্য

এই লক্ষ্য সাধনের জন্য কিরূপ আর্থিক নীতি গ্রহণ করা উচিত তাহা সাধারণ ভাবে স্থান, কাল, ক্রমবৃদ্ধির হার, প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাদি (Institutional arrangements) প্রভৃতির উপর নির্ভর করিবে।

অনুশীলনী

1. What is the function of a Central Bank in the currency System of a country. (B. A. 48, B.com. 40)

2. Discuss the functions of Central Banks. (B. A. 55, B.com. 51)

3. How and why does a Central Bank control credit ?

4. What are the limits to the Central Bank's power of controlling credit ?

5. What are the objectives of monetary policy in our times ? How Full Employment can be achieved by monetary measures ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আয় ও কর্মসংস্থান তত্ত্ব

বেকারী : সংজ্ঞা শ্রেণীবিভাগ ও কারণ (Unemployment : Definition, Classification and Causes) :

কাজ করিতে সক্ষম ব্যক্তি যদি কাজ না করে, তাহা হইলেই তাহাকে বেকারী বা কর্মে অনিয়োগ বলা চলে না। অনেকে আছেন যাঁহারা **স্বেচ্ছামূলক ভাবে বেকার** থাকেন যেমন ধনিকশ্রেণীর ব্যক্তিগণ, যাহাদের কাজ করিবার প্রয়োজন নাই; চোর ডাকাত প্রভৃতি, এবং কর্মে নিয়োগের অযোগ্য ব্যক্তিগণ যেমন বৃদ্ধ, শিশু বা রুগ্ন প্রভৃতি। ইঁহারা ঠিক বেকার আছেন, তাহা নহে, ইঁহাদের কর্মে অনিয়োগকে বেকারী বলা চলে না। অনেকে আছেন যাঁহারা বর্তমান মজুরীর হারকে প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদেরও বেকার বলা চলে না। যদি কেহ বর্তমান মজুরীর হারে কাজ করিতে চাহিয়াও শ্রম বিক্রয় করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বেকার বলা যায়, এবং এইরূপ অবস্থাকে বেকারী বা কর্মে অনিয়োগ বলা চলে।

স্বেচ্ছামূলক বেকারী ও অনিচ্ছামূলক বেকারী

এইরূপ বেকারীকে **অনিচ্ছামূলক বেকারী** (Involuntary unemployment) বলে এবং ইহা ধনতান্ত্রিক সমাজে অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে পরিগণিত

হয়। এইরূপ অনিচ্ছাকৃত বেকারী না থাকিলে সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান বা পূর্ণ কর্মনিয়োগ আছে, বলা চলে। এই অনিচ্ছাকৃত বেকারীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে এবং বিভিন্ন ধরণের বেকারীর কারণে পার্থক্য থাকে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বেকারী ও তাহাদের কারণসমূহ নিম্নে বর্ণিত হইল।

যন্ত্রজনিত বেকারী

১। সমাজে **কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারী** (Structural and Technological) দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন উৎপাদন-সংগঠন, নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি, নূতন মূলধন-প্রগাঢ় যন্ত্রের প্রচলন, নূতন দ্রব্যের আবিষ্কারে চাহিদায় বিপুল পরিবর্তন, এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে কারখানা বা উৎপাদন-কেন্দ্রকে সরান, পুরাতন বা প্রাচীন শিল্প লোপ পাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের কর্মসংস্থান কমিয়া যাইতে পারে, বেকারী সৃষ্টি হইতে পারে।

ঋতুগত বেকারী

২। **কাল-কাঠামো জনিত বেকারী** (Seasonal unemployment) বহু কারণে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শিল্পে বৎসরের কোন বিশেষ সময়ে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয় কিন্তু বৎসরের অন্য সময়ে তাহাদের কাজ থাকে না (যেমন চিনির কারখানা, ধানকল, কৃষিকার্য, গৃহ-নির্মাণ শিল্প, প্রভৃতি)। অনেক ক্ষেত্রে, বৎসরের যে কোন সময়ে হঠাৎ অধিক কাজ আসিয়া পড়ে এবং কিছুদিন পরে কাজের পরিমাণ কমিয়া যায় (যেমন বন্দর প্রভৃতি স্থানে)। বলা হয় যে, সকল কাজেরই বিশেষ ধরণের সময়-কাঠামো (Time-pattern) থাকে; এই ধরণের বেকারীকে তাই কাল-কাঠামো জনিত বেকার বলা চলে।

বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারী

(৩) বাণিজ্যচক্রের সঙ্কটের কালে সমাজে সামগ্রিক ভাবে আয়স্তর ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং সেই ধরণের বেকারীকে **বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারী** বলা হয়। সঙ্কটের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসা সমৃদ্ধি সুরু হইলে এই বেকারী কমিয়া যায়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়; এই বেকারীর কারণ হইল বাণিজ্যচক্র; ইহাকে আজকাল প্রধানতঃ কর্মসংস্থান-চক্র (Employment cycle) বলিয়া গণ্য করা হয়।

(৪) সমাজের স্বাভাবিক গতিশীলতার ফলে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত ব্যক্তিগণের বেকারীকে অনেকে **সংঘাতজনিত বেকারী** (Frictional unemployment) বলেন।

শ্রমিকের বাজারে শ্রম ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়ার প্রভাব থাকিলে, শ্রমিকের অচলনশীলতার ফলে, কাজকর্মের সুযোগ সুবিধা জানা না থাকিবার ফলে, উৎপাদনের পুনঃ-সংগঠনের ফলে, যন্ত্রপাতি ভাঙিয়া যাইবার ফলে, কাঁচামালের সাময়িক অভাবের জন্য বা শিল্পে বৎসরের মধ্যে কিছু কাল কাজ কর্ম চলিলে, এই সকল কারণের জন্য উদ্ভূত বেকারীকে সংঘাত-সৃষ্ট বেকারী (Frictional unemployment) বলা হয়।

সংঘাতি জনিত বেকারী

(৫) ইহা ব্যতীত দেশে **ছদ্মবেকারীও** (Disguised unemployment) থাকিতে পারে।

বিভিন্ন কারণের ফলে (যেমন মূলধন কম থাকায়) যদি শ্রমিক এমন কাজে নিযুক্ত থাকে যে তাহার শ্রমশক্তি, নৈপুণ্য, কার্যের সময় প্রভৃতিকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করিতে পারে না এবং ফলে তাহার আয়ও কম হইতে থাকে এইরূপ অবস্থাকে মিসেস্ রবিন্‌সন্ ছদ্মবেকারী বলিয়াছেন (যেমন ভারতীয় কৃষকগণ বৎসরের কয়েকমাস কাজের অভাবে বেকার থাকেন)। অন্য কোথায়ও কর্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ নাই, তাই কম আয় হইলেও, বাধ্য হইয়া সেই কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে (যেমন মাত্র ৫ বিঘা জমি ৩ ভাই মিলিয়া সারাবৎসর চাষ করে); এইরূপ অবস্থাকেও ছদ্মবেকারী বলা হয়। ইহার কারণ হইল অনমনীয় কর্মসংস্থান-কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি।

ছদ্ম বেকারী

মনে রাখা দরকার যে পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা আলোচিত বেকারী আর ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশের বেকারী সম্পূর্ণ এক জিনিষ নহে। উন্নত দেশসমূহে কোন লোক গরীব কারণ সে বেকার; আমাদের দেশে তাহার কাজ থাকিলেও সে গরীব, কারণ তাহার আয় কম, কাজ থাকা অবস্থাতেও সে আধা-বেকার। চাকুরী ও বেকারীতে পার্থক্যের সীমারেখা টানা এইরূপ দেশে বিশেষ কষ্টকর।

এই সকল বিভিন্ন কারণ ছাড়াও সমাজে **কার্যকরী চাহিদা কম থাকায় বেকারী** থাকিতে পারে। সমাজে বেকারীর সাধারণ স্তর (General level of unemployment) নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ কম থাকার উপর। শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা এমন পরিমাণ নহে যাহাতে সকল শ্রমিককে কাজে লাগান যায়। অর্থাৎ, শ্রমিকদের দ্বারা তৈরী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে হইলে সমাজে যত পরিমাণ মোট ব্যয় হওয়া দরকার তাহা হইতেছে না, তাই শ্রমিকগণ

অনিচ্ছাকৃত বেকারী

দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারিতেছেন না। এ ক্ষেত্রে বেকারীর কারণ হইল সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কম। সমাজের মোট ব্যয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা চলে : ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আয়বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের অনুপাত ক্রমাগত কমিয়া আসে, ফলে যদি বিনিয়োগ ব্যয় যথোপযুক্ত পরিমাণে বাড়ান না যায়, তবে সমাজের সামগ্রিক চাহিদা কমিয়া যাইবে, যে পরিমাণ শ্রমিক কাজ পাইতে চায়- তাহার কিছু অংশ বেকার থাকিয়া যাইবে। ধনতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতির এমন স্তর আসিয়াছে যে বিনিযোগ বৃদ্ধি করা আর বিশেষ সম্ভব হইতেছে না, ভোগপ্রবণতাও আর বাড়িতেছে না—ফলে, স্থায়ী ও দুরারোগ্য বেকার সমস্যা উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির (Automation) আবিষ্কার ও ক্রমপ্রবর্তন সমাজের মোট কর্মসংস্থান আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কমাইয়া ভোগব্যয় যথেষ্ট কমাইয়া দিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান বিনিযোগের সম্ভাবনাও বঞ্চিত করিয়াছে। মূলধনের অতি দীর্ঘকালীন জড়ত্ব (Secular Stagnation) আসিয়া গিয়াছে- সুতরাং বর্তমানের বেকারী এবং ভবিষ্যতে আরও বেকারীর সম্ভাবনা—ইহাই আধুনিক কালে ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে।

যন্ত্রের স্বয়ংগতিত্ব ও মূলধনের অতি-দীর্ঘকালীন জড়ত্বের ফলে ভবিষ্যতে বেকারী বৃদ্ধির সম্ভাবনা

বেকারীর ফলাফল (Effects of unemployment) :

সমাজের শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার করিতে হইলে দ্রুত মূলধন-গঠনের সহিত কম মজুরীতে শ্রমিক পাওয়াও দরকার। এমন একদল শ্রমিক সর্বদা সমাজে থাকা প্রয়োজন যে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে তাহাদের দিয়া সহজে শ্রমশক্তি বিক্রয় করান যায়, এবং কম মজুরীতে সেই শ্রমিকদের নিয়োগ করা চলে। বেকারী থাকিলেই ইহা সম্ভব, 'শিল্পে নিযুক্ত হইবার জন্য মজুত সৈন্যদল' (Industrial Reserve Army) না থাকিলে শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার সম্ভব নহে। অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করিবার জন্য ব্যয়-স্বীকার বা ত্যাগ হিসাবেই এই বেকারীকে ধরা উচিত ; ইহা বাণিজ্য বৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক, সুতরাং কল্যাণকর।

বেকারীর সুফল

প্রত্যেক দেশেই সমাজের একাংশ বিপুল দুঃখ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে জীবন যাপন করে ; জীবনধারণের উপযোগী নিম্নতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাহারা

ব্যবহারের সুযোগ পায় না। ইহাদের কর্মে নিয়োগ করিলে আয়, ব্যয় ও চাহিদা-সবই বৃদ্ধি হইবে, দ্রব্যসামগ্রীও উৎপন্ন হইবে; ইহাদের জীবন-যাত্রার মানও উন্নত হইবে। শ্রমশক্তিই সম্পদ সৃষ্টির প্রধান সক্রিয় শক্তি, ইহার অব্যবহার সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ কম রাখে, জাতির পক্ষে ইহাকে অপচয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। নিরন্তর বেকারীর ফলে শ্রমিকের মন ভাঙ্গিয়া যায়; আশাহীন, উৎসাহহীন অবস্থায় তাহার দিন কাটে; বর্তমানের অভাব ও ভবিষ্যৎ-এর অনিশ্চয়তা তাহার মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহার ফলে, সে আইন শৃংখলার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে, তথাকথিত "সমাজ-বিরোধী" কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে; দারিদ্র্য দূর করার "সহিংস" পথে চলিতে পারে। বলা হয় যে ইহাই জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ।

বেকারীর কুফল

বেকারী দূর হওয়া বা পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুফল অনেক। ব্যক্তিগত অর্থ-নৈতিক নিরাপত্তা বজায় থাকে, অভাব দূর হয়। অভাব মোচন ও নিরাপত্তার ফলে সমাজের ও সভ্যতার অগ্রগতি বা প্রগতি সম্ভবপর হয়। মানুষ নিজের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের পুরস্কার পাইয়া নিজেকে প্রকৃত মানুষ বলিয়া মনে করে, নিজের ও অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা গড়িয়া ওঠে। সমাজে পরশ্রমজীবির সংখ্যা কমিয়া যায়। গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে, মোহ বা অন্ধতার পরিবর্তে যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে।

পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুফল

বেকারী দূরীকরণের উপায় (Remedies of Unemployment) :

বিভিন্ন ধরণের বেকারী দূর করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার উপায় গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন, কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারী দূর করার জন্য **কর্মবিনিময় কেন্দ্র** (Employment Exchanges) স্থাপনের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্নক্ষেত্রে চাকুরী সম্বন্ধে শ্রমিকদের সংবাদ দেওয়া। সাময়িকভাবে (casual) নিযুক্ত শ্রমিকদের **স্থায়ী চাকুরীর** ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষা বিস্তার, যাতায়াত ব্যয় কমান বা যাতায়াতে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়া শ্রমিকের **চলনশীলতা** বৃদ্ধির চেষ্টা করা দরকার।

সময়-জনিত বেকারী (Seasonal Unemployment) দূর করার জন্য **শিল্পের সংগঠনে পরিবর্তন** প্রয়োজন, যাহাতে এক শিল্পে শ্রমিকের কার্যের কাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য শিল্পের কার্য সুরু হইতে পারে। কৃষকদের জন্য অন্যান্য কুটির শিল্পের বন্দোবস্ত করা দরকার; ইহার ফলে তাহাদের বৎসরের কোন সময়ে অলস হইয়া

থাকিতে হইবে না এবং আয়ও বৃদ্ধি হইবে, দেশে **ছদ্ম-বেকারীর পরিমাণ কমিবে।** দেশে **শিল্প প্রসারের গতিবৃদ্ধি করিয়া বিভিন্ন প্রকার কর্মনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও এই বেকারী কমিতে পারে।**

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারী দূর করার উপায় **হইল বাণিজ্য চক্র রোধ করা।** আর্থিক পদ্ধতি, কর-সম্পর্কীয় বিভিন্ন পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা এইরূপ বেকারী দূর করা যায়।

সামগ্রিকভাবে বেকারীর স্তর কিভাবে কমান যায়, তাহার সম্বন্ধে দুই প্রকার তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, **মজুরীর হার কমাইলেই শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং বেকারী দূর হইবে।** কেইন্‌সের মতে, বেকারী দূর করার পথ হইল দেশে **পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা।** আর্থিক পদ্ধতি-সমূহের দ্বারা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, কর-সম্পর্কীয় পদ্ধতিসমূহের দ্বারা ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, এবং রাষ্ট্রগত ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা সমাজে অধিক আয় সৃষ্টি করা—এই সকল ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে বেকারী দূর করা সম্ভব।

কর্মসংস্থানের সাধারণ তত্ত্ব (General Theory of Employment):

যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিলে তাঁহার মুনাফা সর্বাধিক হইতে পারে, কোন বিশেষ ফার্মের উদ্যোক্তা সেই পরিমাণ শ্রমিককে নিয়োগ করেন। সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতেও সকল উদ্যোক্তাগণ মিলিয়া যে পরিমাণ শ্রমিককে নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক হন, সেই পরিমাণ কর্মসংস্থান হয়।

কেইন্‌সের মতে কর্মসংস্থানের সামগ্রিক চাহিদা দাম এবং সামগ্রিক যোগান দামের উপর দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে। কর্মসংস্থানের সামগ্রিক যোগান দাম ও সামগ্রিক চাহিদা দাম কাহাকে বলে?

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক যাহা উৎপন্ন করে সেই উৎপাদন বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ হয় বলিয়াই পারিশ্রমিক দিয়া শ্রমিককে কর্মে নিযুক্ত রাখা চলে।

সামগ্রিক যোগান দাম কাহাকে বলে

নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমিককে কর্মে নিযুক্ত রাখিতে হইলে সমাজের সকল উদ্যোক্তাগণ মিলিয়া একত্রে যে পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ অর্থ **নিশ্চয়ই পাইতে চাহেন**; নিম্নতম সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইল সেই নির্দিষ্ট পরিমাণে কর্মনিয়োগের সামগ্রিক যোগান দাম। অর্থাৎ, নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার সামগ্রিক যোগান দাম হইল সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমিকের দ্বারা

উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রীর মোট ব্যয়; অন্তত: এই পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ অর্থ না পাইলে ওই পরিমাণ কর্ম নিয়োগ বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে না।

অপর পক্ষে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নিযুক্ত শ্রমিকের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া সকল উদ্যোক্তাগণ মিলিয়া যে পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাইবেন বলিয়া আশা করেন; তাহাই সেই পরিমাণ কর্মনিয়োগের সামগ্রিক চাহিদা দাম। সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মনিয়োগ বজায় থাকিলে সকল উদ্যোক্তাগণ মিলিয়া ওই পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রত্যাশা করেন।

সামগ্রিক চাহিদা দাম কাহাকে বলে

বিভিন্ন পরিমাণ কর্মনিয়োগের স্তবের বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রিক যোগান দাম ও সামগ্রিক চাহিদা দাম থাকে; তাই কর্মনিয়োগের বিভিন্ন স্তরের সামগ্রিক যোগান দামের তালিকা ও সামগ্রিক চাহিদা দামের তালিকা প্রস্তুত করা যায়। যদি উভয়ের মধ্যে সামগ্রিক চাহিদা দাম বেশী থাকে, অর্থাৎ যে পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ অর্থ উদ্যোক্তাগণ মিলিয়া নিশ্চয়ই পাইতে চাহেন সেই নিম্নতম প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা বিক্রয়লব্ধ অর্থ অধিক পরিমাণে পাইবেন বলিয়া আশা করেন, তাহা হইলে সকল উদ্যোক্তাগণ মিলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে, ফলে কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিবে। অবশেষে যদি এমন এক অবস্থায় পৌঁছান যায় যখন সামগ্রিক চাহিদা দাম ও সামগ্রিক যোগান দাম সমান, তখন সেই কর্মনিয়োগের পরিমাণে হ্রাস বা বৃদ্ধির ঝোঁক থাকে না; কর্মসংস্থানের ভারসাম্য-স্তব (Equilibrium Level of Employment) স্থাপিত হয়। এই স্তরে সমাজের সকল অনিয়োগ বা বেকারী দূর হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে সমাজ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে; অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরেও এইরূপ ভারসাম্য থাকা সম্ভব (under-employment equilibrium)। এইরূপ অবস্থায় কর্মসংস্থানের স্তরে ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ উহার বাড়িবার বা কমিবার দিকে কোন ঝোঁক নাই।

যে পরিমাণ কর্মসংস্থান সমাজে উপস্থিত থাকিলে উভয়ে মিলিত হয়, তাহাই কর্মসংস্থানের ভারসাম্যের স্তর

যে বিন্দুতে কর্মসংস্থানের পরিমাণে ভারসাম্য আসিয়াছে, সেই বিন্দুতে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা হয় তাহাকে কার্যকরী চাহিদা (Effective Demand) বলে; অর্থাৎ ওই পরিমাণ মোট চাহিদা থাকাতেই সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় আছে। ওই বিন্দুতে সামগ্রিক চাহিদা দাম, সামগ্রিক যোগান দাম এবং কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ সমান। যদি কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে কর্মনিয়োগের স্তর উর্ধে উঠিবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িবে;

কার্যকরী চাহিদা কাহাকে বলে ও উহার দ্বারা কর্মনিয়োগের স্তর নির্ধারণ

যদি কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে কর্মনিয়োগের স্তর নামিয়া যাইবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমিবে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের (Full Employment) স্তরে পৌঁছিতে হইলে কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া সেই পরিমাণ হওয়া দরকার যখন দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা এত বেশী যে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সকল অনিযুক্ত-উপকরণের নিয়োগ হইয়া গিয়াছে।

কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Factors determining the Volume of Employment) :

জাতীয় আয়, জাতীয় ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদা

কার্যকরী চাহিদা বলিলে অর্থের হিসাবে, কোন বিশেষ স্তরে কর্মনিয়োগ-পরিমাণের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যকে বুঝা যায়। দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যই চারিটি উপাদানের আয়ে বিভক্ত হইয়া যায় ; অথবা বলা চলে যে, চারিটি উপাদানের সকল প্রকার আয় যোগ দিয়াই দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য গঠিত হয়। সুতরাং কার্যকরী চাহিদা = মোট জাতীয় আয় = মোট দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য।*

*(প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে জাতীয় আয়ের পরিমাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে)

সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, কোন দেশে বিনিময়যোগ্য সকল প্রকার সম্পূর্ণোৎপন্ন (Final Product) দ্রব্য সামগ্রীর মোট মূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলা হয়। সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়মূল্য হইতেই সকলের আয় হয়, সুতরাং জাতীয় আয় আর সামগ্রিক চাহিদা সমান।

সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Demand) চারিধরণের বিষয় লইয়া গঠিত হয় (ক) ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যয় (খ) ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ব্যয় (গ) রাষ্ট্রগত বিনিয়োগ-ব্যয় এবং (ঘ) বিদেশী দ্রব্যকার্যাদির উপর দেশীয় জনসাধারণের ব্যয় অপেক্ষা দেশীয় দ্রব্যকার্যাদির উপর বিদেশী জনসাধারণের ব্যয়ে আধিক্য (বা অনাধিক্য)। সুতরাং, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য কার্যাদি বা মোট উৎপাদনের উপর আর্থিক ব্যয়ের স্রোতকেই আমরা সামগ্রিক চাহিদা বলিতে পারি।

সংখ্যাতত্ত্বানুযায়ী হিসাব করিলে দেখা যায়, এই সামগ্রিক চাহিদা এবং মোট জাতীয় উৎপন্ন (Gross National Product) একই বিষয়। ইহারা একই, কারণ কোন আর্থিক লেনদেনকে দুইদিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখা চলে : আয় ও ব্যয়। বিক্রেতার যাহা আয়, ক্রেতার তাহা-ই ব্যয় ; কম-ও নহে, বেশী-ও নহে। সুতারং, বলা যায় যে মোট জাতীয় উৎপন্ন হইল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য বা চলতি সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর মোট

সাধারণভাবে দ্রব্যসামগ্রীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, ভোগ্যদ্রব্য এবং বিনিয়োগ-দ্রব্য ; সুতরাং কার্যকরী চাহিদা (বা মোট ব্যয়) মোট ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের সমষ্টি। আর মোট ভোগ্য দ্রব্যে ব্যয় = মোট ভোগ্য দ্রব্য হইতে বিক্রয় লব্ধ আয় এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয় = মোট বিনিয়োগ দ্রব্য হইতে বিক্রয় লব্ধ আয়। সুতরাং,

কার্যকরী চাহিদা = মোট জাতীয় আয় = জাতীয় উৎপাদনের মোট মূল্য
= ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় + বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়
= ভোগ্য দ্রব্য হইতে বিক্রয় লব্ধ আয় + বিনিয়োগ দ্রব্য হইতে বিক্রয় লব্ধ আয়।

আর্থিক ব্যয়। যেমন, যদি কোন বৎসরে মোট সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হয় ৫০০ কোটি টাকা, তাহা হইলে ইহা হইতে বুঝা যায় ওই সময়ের মধ্যে দেশের মোট ব্যয় হইল ৫০০ কোটি টাকা অথবা ওই সময়ের মধ্যে দেশের সামগ্রিক চাহিদা-ও ৫০০ কোটি টাকা।

মোট জাতীয় উৎপন্নকে বিভক্ত করিলে আমরা আ = ভ + বি, এই কেইন্সীয় সূত্র পাইতে পারি। এখানে আ হইল মোট জাতীয় উৎপন্ন (বা মোট জাতীয় আয়) : ভ হইল ভোগ এবং বি হইল বিনিয়োগ। বি-এর মধ্যে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রগত বা বৈদেশিক সকল প্রকার বিনিয়োগ নিহিত আছে।

"সম্পূর্ণোৎপন্ন" কথার অর্থ হইল যে আধা-উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম হিসাবে গ্রহন করা হয় না, পাছে ডবল হিসাব হইয়া যায়। "মোট" কথাটিতে বোঝা যায় মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতির বাবদ কোন অর্থ পৃথক করিয়া হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইতেছে না। মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পূরণ বাবদ অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। এই নীট জাতীয় উৎপাদনের মোট বিক্রয় মূল্য হইতে বিক্রয়কর বা অন্যান্য ব্যবসা-কর প্রভৃতি বাদ দিলে আমরা "জাতীয় আয়" পাইতে পারি। কারণ, সকল দ্রব্য সামগ্রীর মোট বিক্রয় মূল্য হইতে পরোক্ষ কর আদায় প্রভৃতির পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সকল উপাদানের জন্য ব্যয় বা সকল উপাদানের আয় (খাজনা, মজুরী, সুদ এবং অবন্টিত মুনাফা)।

সুতরাং, বলিতে পারা যায়, মোট জাতীয় উৎপাদন − মূলধনের ক্ষয় ক্ষতি পূরণ = নীট জাতীয় উৎপাদন।

নীট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য − পরোক্ষকর = জাতীয় আয়। নীট জাতীয় আয়ের সাহায্যে দেশের আয়স্তর বা কর্মনিয়োগের তত্ত্ববিশ্লেষণ করা হয় না : বিশ্লেষণের জন্য মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট আয় ব্যবহার করা হয়, কারণ

কার্যকরী° চাহিদার উপর কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে; অর্থাৎ (ক) ভোগব্যয় এবং (খ) বিনিয়োগ ব্যয়, এই উভয় ব্যয়ের দ্বারা কর্মনিয়োগের পরিমাণ স্থির হয়। যদি ভোগ ব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয়ে বৃদ্ধি পাইয়া মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে কর্মসংস্থান বাড়ে; যদি ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয়-হ্রাস পাইয়া, মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে কর্মসংস্থান কমে। ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয় কিসের উপর নির্ভরশীল, কি শক্তির দ্বারা ইহারা নির্ধারিত হয়?

ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়

(ক) সমাজের ভোগব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে মোট আয়ের কি অংশ ব্যক্তিরা মিলিয়া ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে অর্থাৎ মোট আয় এবং সমাজের গড় ভোগ-প্রবণতার উপর। আয় বৃদ্ধি হইলে ভোগের পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু যে হারে আয়ে বৃদ্ধি হয়, ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ সেই হারে বৃদ্ধি হয় না। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধির অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলে।

ভোগ প্রবণতা নির্ভর করে প্রধানতঃ **আয়ের স্তরের উপর**। তাহা ছাড়া, **জাতীয় আয় কি ভাবে বণ্টিত হয়** তাহার দ্বারাও ভোগপ্রবণতা স্থির হয়; যদি জাতীয় আয়ের অধিক অংশ কম সংখ্যক ধনী ব্যক্তির হাতে থাকে তাহা হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা কম, যদি জাতীয় আয়ের অধিক অংশ অধিক সংখ্যক গরীব লোকের হাতে থাকে, তাহা হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা বেশী। সঞ্চয় ও ব্যয় সম্বন্ধে জনসাধারণের **প্রচলিত রীতি, নীতি, চিন্তা ও অভ্যাস** প্রভৃতি ভোগপ্রবণতার পরিধি নির্ণয় করে। ব্যক্তিদের হস্তে **সঞ্চিত তরল সম্পত্তির** (Liquid Assets) **পরিমাণের উপরও** ভোগপ্রবণতা নির্ভরশীল; কারণ অধিক পরিমাণ তরল সম্পত্তি (যেমন সরকারী ঋণপত্র, নগদ অর্থ, বা সঞ্চয়ী আমানত প্রভৃতি) হাতে থাকিলে নিরাপত্তার মনোভাব বেশী হওয়ার জন্য এবং ভবিষ্যতে ইহা হইতে আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা

ভোগপ্রবণতা নির্ভর করে মোট আয়; আয়-বৈষম্যের হার; প্রচলিত অভ্যাস ও রীতি; সঞ্চিত তরল সম্পত্তির পরিমাণ; কর-কাঠামো প্রভৃতি

পরোক্ষকর বা মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ যথাক্রমে রাষ্ট্রকর্তৃক বা ফার্মকর্তৃক ব্যয়িত হয়, দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা সৃষ্টি করে।

থাকায় বর্তমান আয় হইতে সঞ্চয়ের ইচ্ছা কম থাকে, অর্থাৎ ভোগপ্রবণতা বেশী থাকিতে পারে। **কর-কাঠামোর উপরও** ভোগপ্রবণতা নির্ভর করে, অর্থাৎ করসমূহের প্রকৃতি এবং হার উভয় মিলিয়া ভোগপ্রবণতা নির্ধারিত করে। দীর্ঘকালে ভোগপ্রবণতা নির্ধারণকারী এই **সকল** বিষয়সমূহে পরিবর্তন হইয়া সমাজের গড় ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন ঘটাইলেও স্বল্পকালে ইহা মোটামুটিভাবে স্থায়ী বিষয়।

স্বল্পকালে ইহা মোটামুটি স্থির

(খ) সমাজের মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর (১) **মূলধনের প্রান্তিক** কার্যকারিতা (Marginal Efficiency of Capital) ও (২) **সুদের হার**। এক ইউনিট মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া তাহা হইতে ব্যয়ের উর্ধ্বে যে নীট আয় হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ নূতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন হইতে সম্ভাব্য আয়ের হার—ইহাকেই মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বলা হয়। যদি প্রচলিত সুদের হার হইতে সম্ভাব্য আয়ের হার অধিক হয়, তাহা হইলে সমাজে বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি হইবে; মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বা সম্ভাব্য আয়ের হার সুদের হার হইতে কম হইলে বিনিয়োগ কমিয়া যাইবে। এই উভয় বিষয় মিলিয়া স্থির করে বিনিয়োগ-প্রবণতা (Propensity to Invest)।

বিনিয়োগ-ব্যয় নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের হারের উপর

(১) মূলধনের প্রান্তিক-কার্যকারিতা বা বিনিয়োগ-প্রবণতা বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। (ক) **ভবিষ্যতে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা** বৃদ্ধি পাইবে কি না—চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বাড়ে; চাহিদা হ্রাসের সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কমে (খ) **জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা** থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশী থাকে, হ্রাসের সম্ভাবনা থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম থাকে। (গ) সেই বিশেষ প্রকার মূলধনী দ্রব্যের **বর্তমান উৎপাদন ও যোগানের** পরিমাণের উপর, পরিমাণ বেশী হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম, পরিমাণ কম হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বেশী (ঘ) **বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও নূতন যন্ত্র প্রচলনের হার** অধিক থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম, হার কম থাকিলে বিনিয়োগ প্রবণতা বেশী। (ঙ) মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে **বর্তমান বিনিয়োগ-হার কিরূপ**—ইহা বেশী থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, ইহা কম থাকিলে প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশী। (চ) বর্তমান **কর-কাঠামোর প্রকৃতি ও হার** এবং

মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কিসের উপর নির্ভর করে

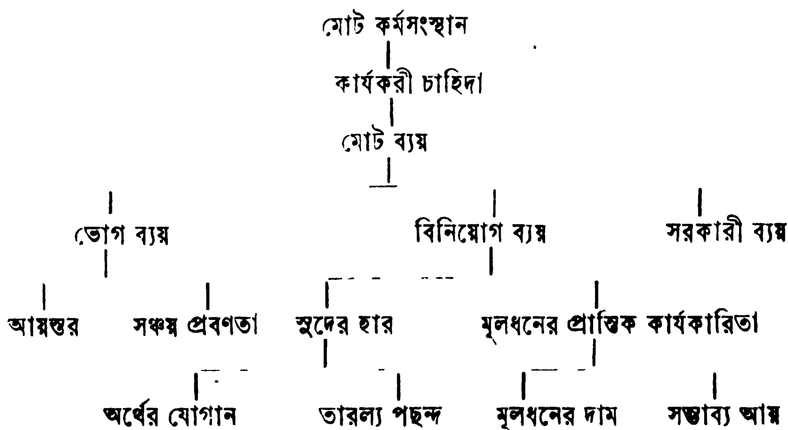
তাহাতে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা : করহার অধিক হইলে প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, করহার কম হইলে ইহা অধিক। (ছ) ব্যবসাবাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশানিরাশার অবস্থার উপর : ভবিষ্যতে লাভের আশা বা ক্ষতির ভয়, অর্থাৎ ব্যবসা জগতে প্রচলিত **ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণার** উপর : আশাবাদী মনোভাব প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশী, নিরাশাবাদী মনোভাব প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা দুই প্রকার : স্বল্পকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা ও দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা। বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বল্পকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা স্থির হয় ; অপরপক্ষে, স্থায়ী ধরণের আশা ও ভয়ের ভিত্তিতে দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা গড়িয়া উঠে। কাল যত স্বল্প, বর্তমান ও পরিচিত অবস্থা চলিতে থাকার সম্ভাবনা তত বেশী, নিশ্চয়তার অনুভূতি প্রবল ; কাল যত দীর্ঘ, বর্তমান ও পরিচিত অবস্থা চলিতে থাকার সম্ভাবনা তত কম, অনিশ্চয়তার অনুভূতি প্রবল। (ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান, পরিকল্পনাবিহীন বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভব, ব্যবসা-বিশ্বাসে (business Confidence) বিপুল উঠানামা বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা ও গভীরতা বৃদ্ধির কারণও বটে)।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বল্প-কালীন ধারণা ও দীর্ঘকালীন ধারণা

(২) সুদের হার নির্ভর করে (ক) অর্থের পরিমাণ ও (খ) নগদ-পছন্দের তালিকার উপর। অর্থের পরিমাণ কমিয়া গেলে অথবা নগদ পছন্দের হার বাড়িয়া গেলে সুদের হার বৃদ্ধি পায় ; অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে অথবা নগদ পছন্দের হার কমিয়া গেলে সুদের হার হ্রাস পায়।

সুদের হার নির্ভর করে অর্থের পরিমাণ ও নগদ পছন্দের উপর

সুতরাং কর্মসংস্থানের স্তর-নির্ধারণী শক্তিসমূহকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজান যায় :



গুণক ও ত্বরক তত্ত্ব (Theory of Multipler and Acceleration)

গুণক কাহাকে বলে (What is Multiplier) :

বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে সমাজে কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায় ; বিনিয়োগে প্রাথমিক বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান ও আয়ে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে গুণকের উপর।

গুণক কাহাকে বলে : বিনিয়োগে নির্দিষ্ট বৃদ্ধি উহার কতগুণ মোট আয় বৃদ্ধি ঘটায়

উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাউক্ যে সমাজে চলতি বিনিয়োগ-পরিমাণের অধিক নূতন ভাবে ১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হইল। যেমন, কোন কারখানা স্থাপনের জন্য এই ১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইল। কারখানা স্থাপন এবং চালু করার জন্য বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী, মজুর, প্রভৃতি উপকরণ ক্রয়ের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হইল। অর্থাৎ বিনিয়োগের ফলে পূর্বে বেকার ছিল এইরূপ শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি হইল এবং অন্যান্য উপকরণের মালিকদেরও আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইল। ১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের ফলে প্রথমেই জাতীয় আয় ১ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গেল।

গুণক নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার উপর

কিন্তু আয় প্রসারের ধারা এই স্তরেই ক্ষান্ত থাকে, তাহা নহে। কারণ, যাহারা আয় করিল তাহারা সেই আয় মোটেই ব্যয় না করিয়া সবটাই সঞ্চয় করে, তাহা হইতে পারে না। যদি বর্ধিত আয়ের সমস্তটাই সঞ্চিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সমাজে মোট ওই ১ লক্ষ টাকার অধিক আয় সৃষ্টি হইতে পারিল না ; আয় প্রসারের ধারা স্তব্ধ হইয়া গেল। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, যদি সমাজের গড় প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হয় (অর্থাৎ আয় বৃদ্ধির ফলে ভোগের পরিমাণ মোটেই না বাড়ে), তাহা হইলে গুণক হইল ১ (গ=১) অর্থাৎ নূতন বিনিযোগের পরিমাণ পর্যন্তই মাত্র মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে, ইহার বেশী নহে।

যদি এইরূপ হয় যে বিনিয়োগের দরুণ যাহারা একলক্ষ টাকা নূতন আয় হিসাবে পাইল, তাহারা সবটাই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে ওই একলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া ভোগ্যদ্রব্য বিক্রেতাদের নূতন আয় সৃষ্টি করিল। ভোগ্যদ্রব্যের বিক্রেতাগণ সেই নূতন আয় যদি সবটাই ব্যয় করেন তাহা হইলে তাঁহারা যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিলেন, উহাদের বিক্রেতাদের ১ লক্ষ টাকা নূতন আয় হইল। রামের ব্যয় হইতেই শ্যামের আয় হয় এবং শ্যামের ব্যয়ই যদুর আয়, যদুর ব্যয়ই মধুর

আয়—এইভাবে সমাজের ব্যয় ও আয় পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। যদি মোটেই সঞ্চয় না হয়, তাহা হইলে এক লক্ষ টাকা আয় সম্পূর্ণটাই অনবরত ব্যয় ও আয় সৃষ্টি করিতে থাকিবে এই ধারা কোথাও থামিবে না। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, যদি সমাজের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ১ হয়, অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হইয়া যায়, তাহা হইলে গুণক হইল অসীম (গ = ∞)।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ০ হইতে বেশী (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটাই সঞ্চিত হয় না) এবং ১ হইতে কম (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটাই ব্যয়িত হয় না।) প্রথমে যাহাদের হাতে বিনিয়োগের ফলে ১ লক্ষ টাকা আয় হিসাবে আসিয়াছিল, তাঁহারা কিছুটা সঞ্চয় করিয়া বাকী অংশ ব্যয় করিল. এই ব্যয় আবার অন্যের আয় সৃষ্টি করিবে; তাঁহারা আবার তাঁহাদের বর্ধিত আয়ের অংশ সঞ্চিত করিয়া বাকী অংশ ব্যয় করিবেন, সেই ব্যয় হইতে আরও নূতন আয়, ফলে আরও নূতন ব্যয় ও আয় ক্রমাগত সৃষ্টি হইতে থাকিবে। প্রত্যেক স্তরে সঞ্চয় হইতে থাকায়, প্রতিবারের নূতন আয়-সৃষ্টির পরিমাণ এইরূপে কমিতে থাকিবে, অবশেষে বর্ধিত আয়ের পরিমাণ যখন খুবই কম, ব্যয়ের দ্বারা আর নূতন আয় সৃষ্টি হইতে পারিতেছে না, সেই স্তর পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া অবশেষে ক্ষান্ত হইবে। নূতন বিনিয়োগ হইতে সৃষ্ট প্রাথমিক আয় বহুগুণ বর্ধিত হইবে। প্রাথমিক আয়ের ফলে মোট আয় যতগুণ বর্ধিত হয় তাহাই আয়ের গুণক (Income Multiplier); প্রাথমিক কর্মসংস্থানের ফলে মোট কর্মসংস্থান যতগুণ বর্ধিত হয়, তাহাই কর্মসংস্থানের গুণক (Employment Multiplier)*। পুকুরের ঠিক মধ্যস্থানে ঢিল ছুঁড়িলে জলে চক্রাকৃতির ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়, ঢেউগুলি পরিধিতে বাড়িতে থাকে ও উচ্চতায় কমিতে থাকে, তীরের দিকে সেই উচ্চতা ক্রমেই কমিয়া যায় কিন্তু সমগ্র জলস্তরে উত্তালতার সৃষ্টি করে। সমাজের অর্থনৈতিক দেহে নূতন বিনিয়োগের ফলও তাই; আয় ও কর্মসংস্থানে প্রাথমিক বৃদ্ধি নূতন আয় ও কর্মসংস্থানের ঢেউ সৃষ্টি করিয়া সমগ্র সমাজ দেহে সঞ্চারিত হইয়া অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তরে উত্তালতা আনে, প্রথম স্তরে আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেশী থাকে, ক্রমেই ইহা কমিয়া অবশেষে মিলাইয়া যায়।

আয়-গুণক ও কর্ম-সংস্থান-গুণক

বিনিয়োগে বৃদ্ধির ফলে সমাজের মোট আয় কি পরিমাণ বৃদ্ধি হয় তাহাকেই গুণক বলে, (অর্থাৎ, $গ = \frac{পআ}{পবি}$) এবং এই গুণকের আয়তন (Size of the

*ইহাদের আয়তন সাধারণতঃ সমান হয় না।

Multiplier) নির্ভর করে, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার আয়তনের উপর। প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা অধিক হইলে গুণকের আয়তনও বেশী, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই অধিক পরিমাণ ব্যয় পরবর্তী স্তরে অধিক পরিমাণ আয় সৃষ্টি করে। প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কম হইলে গুণকের আয়তনও ক্ষুদ্র, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই কম পরিমাণ ব্যয় পরবর্তী স্তরে কম পরিমাণ আয় সৃষ্টি করে। যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $\frac{১}{২}$ হয়, তাহা হইলে গুণক হইল ২ (অর্থাৎ বর্ধিত বিনিয়োগের পরিমাণের দ্বিগুণ নূতন আয় সৃষ্টি হইবে) ; প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{২}{৩}$ হইলে গুণকের আয়তন ৩ ; প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{৩}{৪}$ হইলে গুণকের আয়তন ৪।

গুণকের আয়তন কিভাবে পরিমাপ করা হয়? ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা (Marginal Propensity to Save) হইল প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতারই ঠিক অপর দিক। নূতন ১০০৲ আয়ের ৮০৲ যদি ব্যয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ২০৲ সঞ্চয় হইতেছে ; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{৪}{৫}$ হইলে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা $\frac{১}{৫}$। গুণককে এইভাবে প্রকাশ করা চলে যে $গ=\frac{১}{সপ্র}$; গ হইল গুণকের আয়তন এবং সপ্র হইল প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা। উপরের উদাহরণে $গ=\frac{১}{\frac{১}{৫}}$, ∴ গ = ৫।

সুতরাং গুণকের সাহায্যে বিনিয়োগে বৃদ্ধির বা হ্রাসের ফলে মোট আয়ে বা মোট কর্মসংস্থানে বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ জানা যায়। ইহাকে নিম্নলিখিত সূত্ররূপে প্রকাশ করা চলে—

$$\text{মোট আয়ে পরিবর্তন} = \frac{১}{১ - \text{প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা}} \times \text{বিনিয়োগের পরিবর্তন।}$$

$$\text{অথবা, পআ} = \frac{১}{\text{সপ্র}} \times \text{পবি}$$

প হইল স্বল্প পরিবর্তন বুঝাইবার চিহ্ন।

ধনাত্মক গুণক ও ঋণাত্মক গুণক

বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে গুণকের আয়তন অনুযায়ী যেমন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে তখন ইহাকে ধনাত্মক গুণক (Positive Multiplier) বলা হয় ; বিনিয়োগ কমিলে গুণকের আয়তন অনুযায়ীই আয় ও কর্মসংস্থান কমে, সেই অবস্থায় ইহাকে ঋণাত্মক গুণক (Negative Multiplier) বলা হয়। গুণক ৪ হইলে ১ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ বৃদ্ধি সমাজে ৪ লক্ষ টাকার মোট আয় বৃদ্ধি করে ; ঠিক সেইরূপ ১ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ কমিয়া গেলে সমাজে মোট ৪ লক্ষ টাকার আয় হ্রাস করে।

মনে রাখা দরকার যে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা (যাহার ভিত্তিতে গুণকের আয়তন হিসাব করা হয়) আয়ের সকল স্তরে সমান থাকে না। আয়স্তর বাড়িতে থাকিলে প্রতেক আয়স্তরের বৃদ্ধিই প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে কমাইয়া দেয়; সুতরাং আয়স্তরে প্রত্যেক বৃদ্ধিই গুণকের আয়তন পূর্বাপেক্ষা কমাইতে থাকে। আবার, ঋণাত্মক গুণকের কার্যকারিতার সময়ে আয়স্তরে প্রত্যেক বারের হ্রাস প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে পূর্বাপেক্ষা বাড়াইয়া গুণকের আয়তন বাড়াইতে থাকে।

আয় পরিবর্তন ঘটাইবার কালে গুণকের নিজেরই পরিবর্তন হয়

গুণকের উপর সময়েরও বিশেষ প্রভাব থাকে। কারণ, বিনিয়োগের পরিবর্তন সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চারিত হইয়া আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণে পরিবর্তন আনিতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। ১ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ প্রথমে ১ লক্ষ টাকার আয় সৃষ্টি করিল এবং পরবর্তীবারে ($\frac{8}{5}$ প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা থাকিলে) ৮০ হাজার টাকার নূতন আয় সৃষ্টি করিবে, ইহার পরবর্তীস্তরে ৬৫ হাজার টাকায় নূতন আয় সৃষ্টি করিবে। কিন্তু প্রথম বারের ভোগ ব্যয় এবং দ্বিতীয় বারের ভোগ ব্যয় একই সময়ে ঘটিতেছে না, এবং আয় সৃষ্টির প্রত্যেক স্তরেই এইরূপ সময় অতিবাহিত হয়; ইতিমধ্যে অন্যান্য বিনিয়োগের ফলাফল বা প্রভাব আয়ের উপর পড়িতে পারে। কোন বিশেষ বিনিয়োগের বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলাফল সম্পূর্ণ হইতে যে সময় প্রয়োজন তাহাকে গুণক-কাল বা প্রসার কাল (Multiplier or Propagation Period) বলা হয়।

গুণক কাল বা প্রসার কাল

গুণকের আয়তন বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা কমিয়া যাইতে পারে, বিভিন্ন প্রকার "ছিদ্রসমূহ" (Leakages) গুণকের আয়তন কমাইয়া বিনিয়োগ পরিবর্তনের দরুণ আয়ে পরিবর্তনের হার কমাইয়া দিতে পারে। (ক) নূতন আয় যাহাদের হাতে আসিল তাহারা উহার সাহায্যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে (খ) আয় বৃদ্ধির ফলে অধিক নগদ অর্থ হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে, বা তারল্য-পছন্দ বাড়িয়া যাইতে পারে (গ) বিদেশী আমদানী-দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে* (ঘ) দামবৃদ্ধি হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্র হইতে শ্রমিক ও উপকরণ সরাইয়া আনিবে, ফলে ভোগদ্রব্যের উৎপাদন কমিবে। উপাদানের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম বৃদ্ধি হইবে, যথেষ্ট পরিমাণে আয়-বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না।*

ছিদ্রসমূহ

*রপ্তানী হইতে প্রাপ্ত নীট আয় দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ন্যায় কাজ করে, এবং দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের উপর ইহার প্রভাব আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগেরই ন্যায়। রপ্তানীর উপর বিদেশীয়দের ব্যয়

অনুন্নত দেশে, এই গুণকের আয়তন বা প্রভাব আরও তিনটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়। প্রথমতঃ, দেশে আর্থিক মূলধনের পরিমাণ কম থাকায়, রাষ্ট্র কর্তৃক বিনিয়োগ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে কমাইয়া দিতে পারে, কারণ মূলধনের বাজার হইতে রাষ্ট্র নিজেই বিনিয়োগের জন্য মূলধন তুলিয়া লইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, দেশে আসল মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ কম থাকায় আয় বৃদ্ধি হইলেই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ান সম্ভব নাও হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, আয় বৃদ্ধি খাদ্যদ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইয়া, উহাদের দাম বৃদ্ধি করে, অধিক আয় সৃষ্টি করিতে পারে না। ('অনুন্নত দেশ ও পূর্ণকর্মসংস্থান তত্ত্ব' দ্রষ্টব্য)

অনুন্নত দেশ ও গুণক প্রভাব

ত্বরণ তত্ত্ব (Acceleration Theory) :

সমাজের ভোগব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণ নূতন বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় তাহাদের অনুপাতকে ত্বরণ (Acceleration) বলা হয়।

সমাজে সাধারণতঃ দুই প্রকারের বিনিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ (Autonomous Investment) এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ (Derived or Induced Investment)। রাষ্ট্র বা অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক, স্বাস্থ্যরক্ষা বা অন্যান্য কারণে বহু বিনিয়োগ করিয়া থাকেন, যেমন পার্ক, সরোবর প্রভৃতি ; অথবা, নূতন আবিষ্কৃত দ্রব্য বা যন্ত্র প্রভৃতিতে বিনিয়োগ ; অথবা অনেক কাল পরে উহা হইতে আয় হইতে পারে এরূপ কার্যে বিনিয়োগ প্রভৃতিকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ বর্তমানের কোন আর্থিক বিষয় (যেমন আয়স্তর বা মুনাফার হার প্রভৃতি) এই বিনিয়োগের পিছনে কারণ হিসাবে কার্য করে না। ইহাদের তাই স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলা চলে।

দুই প্রকারের বিনিয়োগ

রপ্তানী দ্রব্যে নিযুক্ত শ্রমিক ও উপকরণের মালিকদের আয় বাড়ায়, তাহাদের সেই আয় পুনরায় ব্যয়িত হইয়া দেশে নূতন আয় সৃষ্টি করে, মোট আয়-সৃষ্টির পরিমাণ গুণকের আয়তনের উপর নির্ভর করে। আমদানীকে "ছিদ্র" হিসাবে, আভ্যন্তরীণ প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার (সপ্র) মধ্যে একই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক পরিমাপ করা চলে, অর্থাৎ দেশের আয়স্তরের উপর রপ্তানীর মোট ফল নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা হিসাব করা যায় :

$$\text{রপ্তানীতে পরিবর্তন} \times \frac{১}{১ - (\text{সপ্র} + \text{আমদানীপ্রবণতা})} = \text{আভ্যন্তরীণ আয়ে পরিবর্তন।}$$

কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদা থাকায় সেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে হয়; আবার ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতির উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতিও দরকার। ইহাদের উপর বিনিয়োগের কারণ ভোগ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদা; ইহাদের তাই, উদ্ভূত বিনিয়োগ বলা হইয়া থাকে। সমাজের ভোগব্যয় বাড়িলে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদকগণ যন্ত্রের চাহিদা করায় এই জাতীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সমাজের ভোগব্যয়ে পরিবর্তন এবং উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন—এই দুই-এর অনুপাতকে ত্বরণসহগ (Acceleration Coefficient) বা ত্বরক (Accelerator) বলে। যেমন, যদি সমাজের ভোগব্যয়ের পরিমাণ ২ কোটি টাকা বাড়িয়া যায়, ফলে যদি ইহার দরুণ উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ ৪ কোটি টাকা বাড়ে, তাহা হইলে ত্বরণসহগ বা ত্বরক হইল ২। যদি উদ্ভূত বিনিয়োগ ৮ কোটি টাকা হয়, তাহা হইলে ত্বরণসহগ বা ত্বরক হইল ৪।

ত্বরণসহগ বা ত্বরক কাহাকে বলে

যদি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে কোন মূলধনী যন্ত্রপাতির ব্যবহারই না হয়, (যেমন অতি প্রাচীনকালের আধা-অসভ্য অবস্থায় বা হাত দিয়া ফল পাড়িয়া আনা—এইরূপ উৎপাদন ক্ষেত্রে) তাহা হইলে ত্বরণ সহগ 0, কারণ ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি হইলেও বিনিয়োগ মোটেই বৃদ্ধি হইতেছে না। আরও কয়েকটি কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে যেমন (ক) বর্তমান যন্ত্রপাতির উৎপাদনী শক্তি থাকিলে অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিলে (খ) ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি বা নূতন যন্ত্রপাতির জন্য চাহিদা খুবই সাময়িক ও অস্থায়ী ধরণের হইলে এবং (গ) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ঘটিলে, কারণ ইহা বিভিন্ন অনার্থিক ও বাহ্যিক কারণের দ্বারা নির্ধারিত। এইরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে, ত্বরণসহগ 0 হইতে পারে, বা খুবই কম (অর্থাৎ ১ হইতেও অনেক কম, যেমন $\frac{১}{৬}$ বা $\frac{১}{১০}$) হইতে পারে।

কি অবস্থায় ত্বরণ-সহগ 0 বা খুবই কম

যদি ভোগব্যয়ে পরিবর্তন অধিক হয়, এবং সেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য এমন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় যাহার ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় খুবই বেশী, তাহা হইলে ত্বরণ-সহগ বেশী হইয়া থাকে।

কি অবস্থায় ত্বরণ-সহগ বেশী

ত্বরণনীতি (Acceleration Principle) কিরূপে কার্য করে বা ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি হইলে কিরূপে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায়? ধরা যাক্ দেশে এক বিশেষ ধরণের ১০০০টি যন্ত্র ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছে; প্রত্যেকটি যন্ত্রের স্থায়িত্ব ১০ বৎসর;

সুতরাং, প্রত্যেক বৎসর ১০০টি যন্ত্র অকেজো হইয়া যায়, ফলে ১০০টি যন্ত্র নূতনভাবে পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে (for replacement) প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয়। যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে ১০০টি যন্ত্র উৎপাদনের উপযোগী কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ আছে। যদি এই অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বা ভোগব্যয়ে শতকরা ১০% বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আরও ১০০টি নূতন যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজন হইবে, পুনঃস্থাপনের জন্য প্রতি বৎসর উৎপন্ন ১০০টি যন্ত্রের উৎপাদন তো চলিতে থাকিবেই। সুতরাং যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে বৎসরে ১০০টি যন্ত্রের স্থলে ২০০টি যন্ত্রের উৎপাদন সুরু করিতে হইবে, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। মাত্র ১০% ভোগব্যয়ে পরিবর্তন ১০০% বিনিয়োগে পরিবর্তন আনিতে পারে। ঠিক এই কারণে বাণিজ্য চক্রের সময়ে দেখা যায় যে মূলধনী যন্ত্রপাতির উৎপাদন ভয়ানক অস্থায়ী এবং ইহাতে হঠাৎ বিপুল পরিমাণে উঠানামা ঘটে।

ত্বরণনীতি কিভাবে কার্য করে

কিন্তু পরের বৎসর যখন উৎপাদন শেষ হইয়া গেল, তখন আর ২০০টি যন্ত্রের চাহিদা থাকিবে না, আবার পুনরায় ১০০টি যন্ত্র (পুনঃস্থাপনের জন্য যাহা প্রয়োজন) উৎপন্ন হইতে থাকিবে। বিনিয়োগ ৫০% কমিয়া যাইবে ২০০টির উৎপাদন হইতে কমিয়া ১০০টির উৎপাদন হইবে।

গুণক ও ত্বরণের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত এবং মিলিত প্রভাব (Interactions of Multiplier and Accleration and their combined effect) :

ব্যয়ের বৃদ্ধির ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি, গুণক ও ত্বরণ এই দুই-এর সম্মিলিত ফলাফল। মোট ব্যয় বাড়িয়া গেলে সমাজে আয় বাড়িয়া যায়, কি পরিমাণ মোট আয় বাড়িবে তাহা গুণকের উপর নির্ভর করে। বর্ধিত আয় ব্যয় হইবার ফলে নির্ভর করে। বর্ধিত আয় ব্যয়িত হইবার ফলে ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির দরুণ উদ্ভূত বিনিয়োগও বাড়িবে, ইহা নির্ভর করিবে ত্বরকের উপর। বিনিয়োগে বৃদ্ধি গুণকের ফলে পুনরায় আয় বাড়াইবে এবং সেই আয় ব্যয়কে বাড়াইয়া ত্বরণের ফলে পুনরায় বিনিয়োগ বাড়াইবে। উভয়ের পারস্পারিক সহযোগিতায় উহাদের সম্মিলিত প্রভাবের ফলে বিনিয়োগের বৃদ্ধি মোট আয়, ব্যয়, কর্মসংস্থান সকল কিছুকেই বাড়াইয়া দিবে (ঋণাত্মক ত্বরণ অর্থাৎ Negative Accleration-এর সম্মিলিত ফলে সকল কিছু কমাইয়া দিতেও পারে)। এই

মিলিত ফলাফল

দুই-এর মিলিত ফলকে লিভারেজ্ প্রভাব (Leverage effect) বলে ; মোট বিনিয়োগে বৃদ্ধি এবং উভয়ের মিলিত ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি—এই দুই-এর অনুপাতকে লিভারেজ্ সহগ-ও (Leverage Coefficient) বলা হয়।

পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full Employment) :

আধুনিক কালে প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক লক্ষ্য হইল বেকারী দূর করা এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সমগ্র পৃথিবীতে শিল্পোন্নত সকল দেশেই অর্থনৈতিক সঙ্কট ও বেকারী দেখা দিয়াছিল, ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব এই সঙ্কটের কারণ ও উৎস খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়াছে। "কল্যাণ রাষ্ট্রের" ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বেকারী দূর করিয়া সমাজকে পূর্ণসংস্থান স্তরে পৌঁছান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইতেছে।

পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে দেশের আপামর সকল জনসাধারণের কর্মে নিয়োগ থাকা বুঝায় না। স্বেচ্ছামূলক বেকারী : সংঘাতজনিত বেকারী ; দেশের সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথাজনিত বেকারী (স্ত্রীলোকদের চাকুরী সংক্রান্ত প্রথা প্রভৃতি) ; দেশের সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মকানুন জনিত বেকারী (দৈনিক শ্রমের সময় কার্য হইতে অবসর গ্রহনের নিয়ম, নিম্নতম শিক্ষার বয়স প্রভৃতি) ; নিয়োগের অযোগ্যতাজনিত বেকারী (বৃদ্ধ, শিশু, রুগ্ন বা অসুস্থ প্রভৃতি)—এই সকল কারণে কিছু লোক সর্ব্বদাই দেশে বেকার থাকিবে। পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে বোঝা যায় যে অনিচ্ছামূলক বেকারী নাই, প্রচলিত মজুরীর হারে যাঁহারা কর্মে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা মোটামুটি ভাবে সকলেই কর্মে নিযুক্ত আছে।*

পূর্ণ কর্মসংস্থান কাহাকে বলে

উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান (মার্ক্সীয়তত্ত্ব বাদে) এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে সমাজে সর্বদাই পূর্ণকর্মসংস্থান রহিয়াছে। তাঁহারা ধরিয়া

*পূর্ণ কর্মসংস্থান লক্ষ্যের মধ্যে নিছক পরিমাণগত ভাবে কর্মনিয়োগের আদর্শ আছে তাহা নহে, জীবন যাত্রার মান উন্নত করা বর্ধিত আয়স্তরে স্বাধীন সুখী জীবন নিরাপত্তার সহিত যাপন করার ধারণাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন কালের দাস-সমাজেও পূর্ণকর্মসংস্থান ছিল ; আধুনিক কালের ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রেও অপ্রচুর পারিশ্রমিকে পূর্ণ কর্মনিয়োগ দেখা গিয়াছে। অভাব ও উপবাস হইতে মুক্তি, ভবিষ্যতের গভীর অনিশ্চয়তা হইতে মুক্তি, নিজের ঝোঁক অনুযায়ী যোগ্যতা ও দক্ষতা পূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা পাওয়া—এই সকল মিলিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানকে নিছক অর্থনৈতিক লক্ষ্য হইতে বৃহত্তর সামাজিক আদর্শে পরিণত করিয়াছে]।

লইয়াছিলেন যে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে আপনা আপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনবিজ্ঞানী শ্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী যোগান নিজেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে ; শ্রমিকের যোগান বাড়িলে মজুরীর হার কমিয়া শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি হইবেই। তাঁহাদের মতে বেকারী তখনই থাকা সম্ভব যদি শ্রমিক তাহার উৎপাদন ক্ষমতা বা বাজারে প্রচলিত মজুরী হইতে বেশী মজুরী দাবী করে। একচেটিয়ামূলক শ্রমিক সঙ্ঘের চাপে মজুরীর হার অধিক থাকিলে, তাই বেকারী অধিক হইবার সম্ভাবনা।

ক্লাশিকাল ধারণা

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের, বিশেষ করিয়া কেইন্‌স্‌ ও তাঁহার অনুগামীগণের মতে, সমাজ সাধারণতঃ পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে অবস্থান করে না ; যুদ্ধ বা ওই প্রকার সময় ব্যতীত সকলদেশেই অনিচ্ছামূলক বেকারী আছে, সকল দেশই অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে রহিয়াছে, পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছান এবং সেই স্তরে ইহাকে রক্ষা করা—ইহাই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্য।

আধুনিক ধারণা

কি কারণে সমাজ পূর্ণকর্মসংস্থানের ভারসাম্যাবস্থায় (Full Employment Equilibrium) নাই ; পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর হইতে বিচ্যুতির (Lapses from full Employment) কারণ কি ? ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানের যুক্তি হইল যে শ্রমিকগণ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়া রাখা মজুরীর স্তর-ই ইহার কারণ ; আধুনিক ধনবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে না। কেইন্‌সের মতে সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশী নহে যাহাতে সকল শ্রমিককে কর্মে নিযুক্ত রাখা যায়। দেশের কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ কম, তাই শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণও কম। সমাজের মোট ব্যয়কে দুই ভাবে ভাগ করা চলে, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়। সমাজের ও আয়স্তরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় না সুতরাং যদি বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি করা না হয়, তবে সমাজের মোট আয়, ব্যয় এবং কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাইবে, শ্রমিকের কিছু অংশ বেকার থাকিয়া যাইবে।

পূর্ণ কর্মসংস্থান হইতে বিচ্যুতির কারণ

কি ভাবে সমাজ পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছিতে পারে ? শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়াইতে পারিলে তাহাদের কর্মনিয়োগ বাড়িবে, এবং ইহার জন্য সমাজে মোট ব্যয় বাড়াইতে হইবে অর্থাৎ ভোগ্য-দ্রব্যের দরুণ ব্যয় এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যয়—উভয় প্রকার ব্যয়ের পরিমাণই বাড়ান দরকার। সমাজে বিনিয়োগ করে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাগণ এবং সরকার। সুতরাং, পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌঁছিবার তিনটি

পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছিবার তিনটি পথ

পথ: ভোগব্যয় বাড়ান, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ান এবং সরকারী বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ান।

ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় বাড়াইবার প্রধান উপায় হইল কম ভোগ-প্রবণতা সম্পন্ন ধনী শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিয়া বা প্রত্যক্ষ করসমূহের হার বৃদ্ধি করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়া সেই অর্থ বেকার ভাতা, সামাজিক বীমা, অসুস্থতার বীমা, বার্ধক্যে পেনসন প্রভৃতির মাধ্যমে গরীব শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দেওয়া—কারণ তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশী। একই সঙ্গে, এই উদ্দেশ্যে, পরোক্ষহারের পরিমাণ ও হার কমাইয়া দিলে ভোগব্যয় বাড়িয়া যাইতে পারে। এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়াইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমে কি না। তাই প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি করিয়া আয়ের পুনর্বণ্টন করিবার সময়ে যাহাতে বিনিয়োগে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও প্রেরণা না কমে এইজন্য বিশেষ ধরণের সুবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে; যেমন ব্যবসা-লব্ধ আয় পুনর্বিনিয়োগ হইলে কর দিতে হইবে না, অথবা করের হার কম হইবে, মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে আয়ের অধিক অংশ জমা রাখিতে পারিবে, প্রভৃতি।

ভোগব্যয় বৃদ্ধির উপায় সমূহ

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রধান পদ্ধতি হইল সুদের হার কমাইয়া রাখা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে আয়কর বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর হইতে উদ্যোক্তাদের কিছুটা রেহাই দেওয়া। কিন্তু এই পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অসুবিধা হইল ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা এরূপ নিরুৎসাহী অবস্থায় থাকিতে পারে যে কম সুদের হার বা কম আয়করের হার কিছুতেই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তাহাদের উৎসাহিত করিতেছে না।

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায়সমূহ

সুতরাং, প্রধান পদ্ধতি হইল সরকারী ব্যয় বাড়ান। রাষ্ট্র বা জনপ্রতিষ্ঠান-সমূহ যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ রাস্তা ঘাট, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করে তাহা হইলে সমাজের মোট বিনিয়োগব্যয় বৃদ্ধি হইবে, কর্মসংস্থানও বাড়িয়া যাইবে। সরকারী বিনিয়োগের বৃদ্ধি যাহাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিমাণ সঙ্কুচিত করিতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার দুই উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে (ক) কর বৃদ্ধি এবং (খ) ঋণবৃদ্ধি। প্রত্যক্ষকরের যতখানি

সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায়সমূহ

বৃদ্ধি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে নিরুৎসাহ করিবে না, সেই পরিমাণ অর্থ করবৃদ্ধি দ্বারা উঠান হইবে ; আরও অধিক অর্থের প্রয়োজনে সরকার ঋণ করিবে। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ করিলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের জন্য অর্থ কমিয়া যাইবে, ভোগব্যয়ও কিছুটা সঙ্কুচিত হইতে চাহিবে। সুতরাং তাহা না করিয়া, রাষ্ট্র প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া (Deficit Financing) বাজেট্ ঘাট্‌তি পদ্ধতির দ্বারা সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া দিবে। নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করাকে বিনা সুদে অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতিও (Interest-free financing) বলে, কারণ এই অর্থের জন্য রাষ্ট্রকে কোন সুদ দিতে হয় না।

ঘাট্‌তিব্যয়

ঘাট্‌তি ব্যয়ের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ করিলে যাহাতে দ্রুত কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে, এই জন্য (ক) শ্রমিকের চলনশীলতা বাড়াইতে হইবে, যাহাতে শ্রমিকগণ দ্রুত কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে (খ) নূতন শিল্পের কেন্দ্র স্থাপন (Location) সঠিক ভাবে করিতে হইবে। পরিকল্পিতরূপে সরকারী উন্নতিমূলক বিনিয়োগ কার্য (Public Works) সুরু করিতে হইবে।

ঘাট্‌তি ব্যয় পদ্ধতির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

ঘাট্‌তি ব্যয়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা প্রবল, কারণ কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি শ্রম ও উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করিতে পারে। অনুন্নত দেশসমূহে ঘাট্‌তি ব্যয়ের বৃদ্ধি সমাজে অধিক আয় সৃষ্টি করিবে কিন্তু মূলধনী দ্রব্যের অভাবের দরুণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন বাড়ান যায় না, ফলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি দামস্তরের বাড়াইয়া দিবে। সুতরাং এই সকল দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান সর্বপ্রথমে অর্থনৈতিক নীতি ও পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতে পারে না, প্রথমে দ্রুত শিল্পসম্প্রসারণের চেষ্টা করিতে হইবে, মূলধনী দ্রব্যাদি প্রস্তুতের হার খুবই বাড়াইয়া দিতে হইবে (যেমন ভারতের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা)। (খ) তাহা ছাড়া ঘাট্‌তি ব্যয়ের বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মনে নিরুৎসাহ সঞ্চার করিতে পারে, তাহারা ভবিষ্যৎ করের ভয়ে, মুদ্রাস্ফীতির ভয়ে বা সঙ্কটের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িতে পারে (গ) সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির বহু প্রকার বিপদ আছে, সুদ প্রদান, আসল পরিশোধ, বিশেষতঃ ক্রমবর্ধমান ঋণব্যবস্থার সঠিক পরিচালনা সকল বিষয়েই ইহা অনেক রকম অসুবিধার সৃষ্টি করে।

ঘাট্‌তিব্যয়ের অসুবিধা

অনুন্নত দেশ ও পূর্ণ কর্মসংস্থান তত্ত্ব (Underdeveloped countries and Full Employment Theory) :

অনুন্নত দেশসমূহ প্রধানত: কৃষি-প্রধান, মূলধনী সামগ্রীর পরিমাণ কম, যন্ত্র-সম্পর্কীয় জ্ঞানের স্তর খুবই নীচু। দ্বিতীয়তঃ, মালিকের নিকট মজুরীর বিনিময়ে চাকুরী করে এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা তুলনা মূলক ভাবে কম, অধিকাংশ জনসাধারণই স্বয়ং-নিযুক্ত, নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। তৃতীয়তঃ, জাতীয় উৎপন্নের একটি বিশেষ বড অংশ বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না, উৎপাদকগণ নিজেরা ভোগের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন করে। এইরূপ অবস্থায় গুণকের নীতি উন্নত দেশসমূহের ন্যায় সহজে কার্যকরী হয় না।

অনুন্নত দেশের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য

বিনিয়োগের বৃদ্ধি প্রথমে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ায়, তাহার পরবর্তী স্তরে সেই আয় ভোগব্যয়ের মারফৎ নূতন আয় ও কর্মসংস্থান বাডাইয়া দেয়। দ্বিতীয় স্তরের আয় পুনরায় ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়িত হয় এবং এই ভাবে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িয়া প্রথম-বারের-বর্ধিত আয় ও কর্মসংস্থান × গুণকের আয়তন—এই পর্যন্ত বাড়িবে। কিন্তু অনুন্নত দেশে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পরবর্তী স্তরসমূহের ভোগব্যয় বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের আয় ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির পরে পরবর্তী স্তরে উহাদের আরও বৃদ্ধির পথে বহু বাধা থাকে। যদিও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা খুবই বেশী থাকে এবং তত্ত্বানুযায়ী গুণকের আয়তন খুবই বড হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে তাহা হয় না। ইহার প্রধান কারণ হইল এইরূপ দেশে আয়ে বৃদ্ধি প্রধান ভোগ্যদ্রব্য হিসাবে খাদ্যশস্যের চাহিদা-ই প্রথমে বাড়ায়। কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান স্বল্প-কালে সঙ্কোচপ্রসার বিহীন, আর অনুন্নত দেশে প্রধানতঃ প্রকৃতির খেয়ালেই কৃষির উৎপাদনে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। তাহা ছাডা উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি না থাকায় ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেও পারে। আর কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িলে কৃষকের অলসতা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইতেও পারে।

গুণক ও ত্বরক উভয়ই কেন কম হয়

খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে (কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন সমান থাকায়) দাম বাড়িবে এবং ফলে কৃষক শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীকে বেশী দাম দিয়া খাদ্যাদি ক্রয় করিতে হইবে ; কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে (sector), কৃষকের সঞ্চয়-প্রবণতা বেশী থাকায়, আয় বৃদ্ধির সুবিধা পাইবে খুবই কম। কৃষকেরা শিল্পজাত দ্রব্য

ক্রয় করিলেও শিল্পের উৎপাদন বাড়ান এইরূপ দেশে সহজ নহে, তাই আয়ে বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান না বাড়িতেও পারে।

ছদ্মবেকারী (Disguised unemployment) থাকাতেও গুণক ও ত্বরকের প্রভাবের গতি ভিন্নরূপ দাঁড়ায়। অনিচ্ছাকৃত বেকারীর বদলে ছদ্মবেকারী থাকায় প্রাথমিক বিনিয়োগে বৃদ্ধি ছদ্মবেকারদের আয়ে বৃদ্ধি করিলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী স্তরের কর্ম সংস্থান ও আয় বাড়াইতে পারে না। তাহা ছাড়া এইরূপ চলতি মজুরীর হারে অন্যত্র চাকুরী করিবার কোন প্রেরণা তাহাদের সাধারণতঃ থাকে না। দেশ এক ধরণের "তথাকথিত" পূর্ণ কর্মসংস্থান-এর স্তরে থাকে; তাই বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রধানতঃ, মুদ্রাস্ফীতি-ই ঘটায়।

অনুশীলনী

1. Discuss the principal types of unemployment in modern society and suggest some remedies for the mitigation of unemployment. (B. A. 46, 52, 56 ; B.com. 53)

2. Analyse the different types of unemployment. What are the causes of unemployment ? (B. A. '55)

3. How is the Level of Employment determined in a country ?

4. What factors determine the volume of Employment in a country ?

5. What is full Employment ? What are the causes of lapses from Full Employment and how to achieve full employment in a free society ?

6. Discuss the implications of keynesian theories to underdeveloped countries.

7. Write short notes on : (a) Effective Demand (b) Propensity to Consume (c) Marginal Efficiency of Capital (d) the Multiplier (e) Full Employment (f) Secular Stagnation (g) Acceleration Principle (k) Pump-priming (i) Deficit-Spending (ii) Interest-free financing.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাণিজ্য চক্র

আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামা বা বাণিজ্য চক্র Trade Cycle কাহাকে বলে ঃ

পৃথিবীর যে সকল দেশ শিল্পবিপ্লবের ফলে পুরাণো সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হইতে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণ করে তাহাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান রূপ হইল দ্রুত মূলধন-সঞ্চয় (Rapid Capital Accumulation) এবং উৎপাদন ধারায় ক্রমাগত মূলধন নিয়োগের অনুপাত বাড়াইয়া দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি। উনবিংশ শতাব্দীর সুরু হইতে সেই সকল ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই ধারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সকল দেশে সুদীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার (Secular Expansion) ঘটিলেও স্বল্পকালে আয়স্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রভৃতিতে নিয়মিতভাবে, প্রায় নির্দিষ্টকাল অন্তর, তীব্র উঠানামা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জোয়ারের পরেই ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্কটের ভাঁটা দেখা দেয়। সমৃদ্ধির যুগে আয়স্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সকলই অধিক, ব্যবসাজগৎ আশায় উদ্বেল ; এবং তাহার পরেই সঙ্কটের যুগে আয়স্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান খুবই কম, ব্যবসাজগৎ নিরাশায় আচ্ছন্ন। অর্থনৈতিক কাজকর্মে এইরূপ উঠানামাকে বাণিজ্য চক্র (Trade Cycle) বলা হয়।*

সুদীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার, কিন্তু আয়স্তর ও কর্মসংস্থানে স্বল্পকালীন উঠানামা

*ঢেউএর মত এই উঠানামা বা চক্র সাধারণতঃ তিন প্রকারের দেখা গিয়াছে : (ক) দীর্ঘ ঢেউ অথবা কন্‌ড্রতিয়েফ চক্র : ৫০ হইতে ৬০ বছরের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের উঠানামা—এইরূপ দুইটি চক্রের আলোচন হইয়াছে (১৭৮৯-১৮১৪ ; ১৮১৪-১৮৯৬) ; তৃতীয়টি যাহা বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে সুরু হইয়াছে, তাহার আলোচনা চলিতেছে। স্যুম্‌পিটারের মতে, প্রথম চক্রের কারণ হইল শিল্পবিপ্লবের নূতন আবিষ্কার ; দ্বিতীয় চক্রের কারণ হইল বাষ্প ও ইস্পাত প্রচলন ; তৃতীয় চক্রের কারণ হইল বিদ্যুৎ, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতির ব্যবহার। বর্তমানে স্বয়ংক্রিয়শক্তির দ্বারা যন্ত্র চালনা ও অ্যাটমের ব্যবহার নূতন চক্রের অবতারণা করিতেছে। (খ) স্বল্পকালীন ঢেউ অথবা জাগ্‌লার চক্র : ৮ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে এইরূপ উঠানামাকেই বাণিজ্যচক্র বলা হয়। (গ) স্বল্পতর ঢেউ বা অত্যল্পকালীন ঢেউ অথবা কিচিন্‌ চক্র : প্রত্যেক জাগ্‌লার বাণিজ্যচক্রের মধ্যেই তিনটি ছোট ছোট চক্র দেখা যায়, প্রত্যেকটির স্থায়িত্ব মোটামুটি ৪০ মাস। ইহা ব্যতীত আমেরিকার ধনবিজ্ঞানীগণ বিশেষ করিয়া আমেরিকায় ১৮-২০ বৎসর লইয়া গৃহনির্মাণ-শিল্পের চক্র লক্ষ্য করিয়াছেন।

সাধারণভাবে বাণিজ্যচক্রকে উঠা ও নামা এই দুই দিকে ভাগ করা হয়। উঠার দিকে বা তেজীর দিকে দুইটি স্তর : উন্নতি (Recovery) ও সমৃদ্ধি (Prosperity) ; নামার দিকে বা মন্দার দিকে দুইটি স্তর : অবনতি (Recession) ও সঙ্কট (crisis)। উঠার দিকে সর্বাধিক সমৃদ্ধির বিন্দু হইল চরম-সমৃদ্ধি (Boom); নামার দিকে সর্বাধিক সঙ্কটের বিন্দু হইল চরম-সঙ্কট (Slump)।

চক্রের বিভিন্ন স্তর

আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের ঢেউএর এইরূপ উঠানামাকে 'চক্র' বলা হয় কারণ, কোনদিকে অতিরিক্ত গতিই অপরদিকের অতিরিক্ত গতি সৃষ্টি করে ; একদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য শুধু নিজের অবস্থার সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, অপরদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য সৃষ্টি করে। ঘড়ির দোলকের ন্যায় একদিকের গতিই আপনা আপনি অন্য দিকে যাইবার বেগ সৃষ্টি করে ; সমৃদ্ধির মধ্যেই সঙ্কটের বীজ উপ্ত থাকে, আবার সঙ্কটই সমৃদ্ধির দিকে উন্নতির পথ প্রশস্ত করে। ইহাকে চক্র বলার আরও কারণ হইল যে এই উঠা-নামা নিয়মিত ভাবে ঘটে (Regularity) এবং এই উঠা-নামা ঘটিবার কিছুটা সময়ানুগত্য বা সময়ানুসরণ (Periodicity) দেখা যায় ; ৮ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে মোটামুটি একটি চক্রের গতিধারা প্রবাহিত হয়।

ইহাকে 'চক্র' কেন বলা হয়

বাণিজ্য চক্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রথম হইল সকল শিল্পে ও ব্যবসাতে উন্নতি বা অবনতি মোটামুটি একই সময়ে আসে। কোন বিশেষ শিল্পের উন্নতি অন্য শিল্পের উন্নতির সহায়ক ; কোন বিশেষ শিল্পের অবনতি অন্য শিল্পেরও অবনতি ডাকিয়া আনে ; ইহারা তাই একত্র-সংক্রামক (Synchronic)। দ্বিতীয়তঃ, বাণিজ্যচক্রগুলি মোটামুটি আন্তর্জাতিক প্রকৃতির। আমদানী রপ্তানীর উপর দেশের আভ্যন্তরীন অর্থনীতির প্রভাব যত বেশী, ততই অন্য দেশের উন্নতি বা অবনতি (বৈদেশিক-বাণিজ্যের গুণক ও ত্বরণের পরিমাপে) দেশীয় শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি বা অবনতি সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায়। তৃতীয়তঃ, বাণিজ্য চক্রের প্রভাব সকল শিল্পেই অনুভূত হয় বটে, কিন্তু এই উঠানামা সকল শিল্পেই সমান হারে দেখা যায় না। ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে এই উঠানামা তীব্রতর হইয়া থাকে (ত্বরণ-প্রভাবের দরুণ)। চতুর্থতঃ, সকল বাণিজ্যচক্র একই প্রকারের হইলেও প্রত্যেকটি চক্র অন্যচক্র হইতে

বাণিজ্যচক্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ
(১) একত্র-সংক্রামক
(২) আন্তর্জাতিক
(৩) মূলধনী শিল্পে প্রভাব তীব্রতর
(৪) প্রত্যেক চক্রের নিজস্ব রূপ

কিছুটা পৃথক, প্রত্যেকটি চক্রেরই নিজস্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পিগু তাই বলিয়াছেন যে ইহারা একই পরিবারের সন্তান হইলেও ইহাদের মধ্যে যমজ দেখা যায় না।

বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন স্তরসমূহ (Different Phases of a Trade cycle) :

উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং অবনতি ও সঙ্কট—এই চারিটি স্তর লইয়া একটি বাণিজ্য চক্র গঠিত, ইহাদের প্রত্যেক স্তরেরই নিজস্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) উন্নতি (Revival or Recovery) :

সঙ্কটের কাল অতিবাহিত হইলে দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা যখন বাড়িতে সুরু করে, বিশেষ করিয়া যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণের জন্য বা অকেজো যন্ত্রপাতি বাদ দিয়া নূতন যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের জন্য তাগিদ দেখা দেয়, সেই সময় হইতে উন্নতির সুরু। দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা সুরু হয়, বিক্রেতাদের নিকট হইতে উৎপাদকগণ অর্ডার পাইতে সুরু করে। শিল্পের উদ্যোক্তা উৎপাদন সুরু করিবার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে কম সুদে ঋণ পাইতে থাকে; অধিক কাঁচামাল ক্রয় করে ও শ্রমিকদের কর্মে নূতন নিয়োগ করিতে থাকে। ইহাদের হাতে আয় সৃষ্টি হওয়ায় তাহা ব্যয়ের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে; গুণক ও ত্বরনের নীতি কার্যকরী হইতে থাকে। বিনিয়োগের বৃদ্ধি আয়ও কর্মসংস্থানকে ক্রমেই বাড়াইয়া দিতে থাকে, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা অধিক থাকে। মুনাফা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, মুনাফার আশা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বাড়ে। যদিও সকল দ্রব্যের দাম সমান হারে বাড়ে না, তাহা হইলেও দামস্তর বাড়িতে থাকে, ব্যবসা সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

পারস্পরিক সংশ্লিষ্টভাবে বৃদ্ধির ঘূর্ণাবর্তন বা আয় ও কর্মসংস্থানে উদঘূর্ণমান বৃদ্ধি

(খ) সমৃদ্ধি (Prosperity) :

দামস্তর বাড়িলেও উৎপাদন ব্যয় সেই হারে বাড়ে না, তাই মুনাফা অধিক হয়—আশার প্রাবল্যে উদ্যোক্তাগণের মনে ভবিষ্যৎ মুনাফার হার আরও বেশী থাকে। উৎপাদনের পরিমাণ, উপাদান নিয়োগের পরিমাণ, আয়, ব্যয় সকল কিছুর বৃদ্ধি পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিয়া দামস্তর বাড়াইতে থাকে। সমগ্র ব্যবসায়ী সমাজে এক অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য সুরু হয়, যে কোন ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করাটাই উদ্যোক্তাদের

ঘূর্ণাবর্তনের অতিবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু

লক্ষ্য থাকে। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ও শেয়ারের মূল্য দ্রুত বাড়িতে থাকে, ইহার ফলে দ্রব্যের বাজারে বা শেয়ারের বাজারে ফাট্‌কা সুরু হয়, তাহার ফলে দাম ও মুনাফার বৃদ্ধি সকল স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী সঙ্কটের বীজ রোপিত হইতে থাকে: কাঁচামাল ও উপকরণ সমূহের জন্য চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, ঋণ-সৃষ্টির ক্ষমতা কমিয়া আসায় ব্যাঙ্কসমূহ ঋণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয়, সুদের হার বাড়ে। উৎপাদন-ব্যয়ে বৃদ্ধি, সুদের হারে বৃদ্ধি এবং দ্রব্যসামগ্রীর অধিক উৎপাদন মুনাফার হার কমাইয়া দেয়, দামবৃদ্ধির তুলনায় গরীব জনসাধারণের আয় না বাড়ায় ক্রয়ক্ষমতা ও সঙ্কুচিত হইয়া আসে, এবং এইরূপে অবনতির পথ প্রশস্ত করে।

(গ) অবনতি (Recession):

চরমসমৃদ্ধির যুগে হঠাৎ আশাভঙ্গের ফলে ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ কমাইয়া দেয়, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা হঠাৎ কমিয়া যায়, চরমসমৃদ্ধির বুদ্বুদ ফাটিয়া গিয়া তীব্র ব্যবসা অবনতি দেখা দেয়। বিক্রেতাগণ অর্ডার দেন না, উদ্যোক্তা উৎপাদন করে না, ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য ঋণদাতাগণ ঋণপরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে। উদ্যোক্তাগণ অর্থ পরিশোধ করিতে পারে না, কারণ দ্রব্য অবিক্রীত থাকে। সমাজে এমনই ভয়ের আবহাওয়া দেখা যায় যে আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ তুলিয়া লইতে চাহে, কিন্তু নগদ পরিশোধ করিতে না পারায় ব্যাঙ্কে "দৌড়" (run) হইতে থাকে, জনসাধারণের সঞ্চয়ের সর্বনাশ করিয়া ব্যাঙ্ক-সমূহ ফেল পড়িতে বাধ্য হয়।

পারস্পরিক সংশ্লিষ্টভাবে হ্রাসের ঘূর্ণাবর্তন বা আয় ও কর্মসংস্থানে অধোঘূর্ণ্যমান হ্রাস

(ঘ) সঙ্কট (Depression or Crisis):

ক্রমে অর্থনৈতিক সঙ্কট সকল শিল্পে ও ব্যবসাকে আচ্ছন্ন করে, দেশের আয়স্তর কর্মসংস্থানের পরিমাণ ভীষণ কমিয়া যায় (ঋণাত্মক গুণক ও ঋণাত্মক ত্বরণের ফলে।) দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের মধ্যে ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখা দেয়, দামস্তর কম থাকিলেও দ্রব্য-বিক্রয় করা সম্ভব হয় না ক্রয় করিবার মত আয় থাকে না। এই চরম সঙ্কটের ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রচুর পরিবর্তন আসে, অনেক প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায়, বহু উদ্যোক্তা দেউলিয়া ঘোষিত হয়। কিছুকাল পরে ব্যাঙ্কসমূহ ক্রমে পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠে, ধীরে ধীরে পুনরায়

ঘূর্ণাবর্তনের গতিরোধ ও সঙ্কটের নিম্নবিন্দু

উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ফুরাইয়া যায়, যন্ত্রপাতিসমূহ অকেজো হইয়া পড়ে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ অনুভব করা যায়। যন্ত্রপাতির স্থায়িত্বকাল ও ভোগ্যদ্রব্য মজুতের পরিমাণের উপর সঙ্কটকাল নির্ভর করে। ক্রমে উন্নতি সুরু হইবার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

কেন বাণিজ্য চক্র ঘটে (Causes of Trade Cycles) :

বাণিজ্য চক্রের কারণ সম্বন্ধে বহু প্রকার আলোচনা হইয়াছে, প্রত্যেক তত্ত্বই কোন না কোন কারণের উপর জোর দেয়। কোন তত্ত্বই এককভাবে বাণিজ্যচক্রের কারণ নির্ণয় করিতে পারে না। আধুনিক তত্ত্ব বলিতে হিক্‌সের তত্ত্বকেই বোঝা হয়। যদিও কেইন্‌সীয় তত্ত্বের সমর্থক এখনও অধিক; তবুও হিক্‌সের বাণিজ্য চক্রের তত্ত্বের কেইন্‌সের পরবর্তীকালে ধন-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতিও গৃহীত হইয়াছে। প্রধান তত্ত্ব সমূহ নিম্নে আলোচিত হইল।

(১) আবহাওয়া সংক্রান্ত তত্ত্ব (Climatic theories)

ধনবিজ্ঞানী জেভন্‌স্ বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ১০ বা ১২ বৎসর পর নিয়মিত ভাবে সূর্য্যের কলঙ্কের দ্বারা। সূর্য্যের কলঙ্ক বা দাগগুলি বৃদ্ধি পাইলে সূর্য্য হইতে তেজ বিকীরণ কমিয়া যায়। ইহার ফলে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়, কৃষকশ্রেণীর হাতে আয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে না পারায় দেশের সকল শিল্পই উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ কমাইতে বাধ্য হয়।

তত্ত্বের রূপ

কিন্তু আধুনিককালে এই তত্ত্ব গ্রহণ করা যায় না, কারণ কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ শিল্পে উন্নত দেশ সমূহে মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে কম অংশ, সুতরাং ইহার পরিবর্তন বাণিজ্য চক্রের কারণ এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

গ্রহণ যোগ্যতা

(২) অপ্রচুর ভোগ পরিমাণ বা সঞ্চয়াধিক্য সংক্রান্ত তত্ত্ব (Under consumption or over saving theories)

এই তত্ত্বের মতে ব্যবসা ও বাণিজ্য সঙ্কটের কারণ হইল ভোগকারী জনসাধারণের হাতে ক্রয়শক্তির অভাব; উৎপাদকগণ যে দামে বিক্রয় করাকে লাভজনক বলিয়া মনে করেন সেই দামে ক্রয় করিবার ক্ষমতা জনসাধারণের থাকে না। হবসনের মতে আধুনিক সমাজে বিপুল আয় বৈষম্য রহিয়াছে, ব্যবসা সমৃদ্ধির যুগে ধনিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর

তত্ত্বের রূপ

অর্থ মুনাফা রূপে আসিয়া থাকে কিন্তু সেই অর্থের অতি ক্ষুদ্র অংশ ভোগ্য-দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হয়, অধিকাংশই তাহারা পুনরায় বিনিয়োগ করে। এই বিনি-য়োগের ফলে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িয়া যায়, কিন্তু জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি না হওয়ায় উহা ক্রয় করিবার মত ক্রয় ক্ষমতা তাহাদের হাতে থাকে না।

এই তত্ত্ব গ্রহণ করা যায় না; ইহা ব্যবসা সংকটকে ব্যাখ্যা করে বটে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বাণিজ্যচক্রের কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। তাহা ছাড়া ব্যবসায়ীদের বর্দ্ধিত আয় প্রায় সম্পূর্ণই পুনরায় বিনিয়োগে নিযুক্ত হয় ইহা ঠিক নাও হইতে পারে। বাণিজ্যের চক্রাকৃতি গতি উন্নতি ও সমৃদ্ধি, অবনতি ও সঙ্কট প্রভৃতি স্তর সমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা এই তত্ত্ব হইতে পাওয়া যায় না।

গ্রহণ যোগ্যতা

(৩) বিনিয়োগাধিক্য তত্ত্ব (The over-investment theory)

এই তত্ত্বের মতে মূলধনী দ্রব্যের শিল্পগুলি ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলির তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পাইলে অবশেষে সঙ্কট সুরু হয়। ডাঃ হায়েকের মতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য রক্ষিত হইলেই আর্থিক ভারসাম্য (Monetary equilibrium) বজায় থাকে, এবং সমাজে ভারসাম্যাবস্থার সুদের হার (equilibrium rate of interest) বজায় থাকিলেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য থাকা সম্ভব। কিন্তু সমাজে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ঋণরূপে অর্থ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা অপরিসীম। ভারসাম্যের সুদের হার অধিক হওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্কসমূহ বাজারের সুদের হার কমাইয়া দিতে পারে, ফলে মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে অধিক অর্থ নিয়োজিত হইয়া পড়ে। ভোগ্য দ্রব্যের তুলনায় বিনিয়োগ দ্রব্যের উৎপাদন অধিক প্রসার লাভ করায় সঙ্কট ও ব্যবসায় অবনতি ঘটে।

তত্ত্বের রূপ

(৪) আর্থিক তত্ত্ব (Monetary theory) :

অধ্যাপক হট্রের মতে বাণিজ্যচক্র নিছক অর্থ সংক্রান্ত ঘটনা। দ্রব্য সামগ্রীর জন্য মোট ব্যয় বা আর্থিক চাহিদা অথবা আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণে পরিবর্তনকেই তাঁহার মতে বাণিজ্যচক্র বলা চলে। আধুনিক উন্নত ধরণের সমাজে ব্যাঙ্ক ঋণই ব্যবসা জগতে অর্থের প্রধান রূপ এবং এই ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বাড়ান বা কমান

বিশেষ সম্ভবপর। অর্থের স্রোতে পরিবর্তনই বাণিজ্য চক্র ঘটাইয়া থাকে; এবং ব্যাঙ্কসমূহ সুদের হার কমাইয়া বা বাড়াইয়া, ঋণপত্র ক্রয় করিয়া বা বিক্রয় করিয়া অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনিতে পারেন। ব্যাঙ্ক-ঋণের প্রসার বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধির দিক সৃষ্টি করে; ব্যাঙ্ক-ঋণের সঙ্কোচন বাণিজ্য চক্রের অবনতির দিক ডাকিয়া আনে। কম সুদে ধার পাইলে খুচরা বিক্রেতাগণ অধিক দ্রব্য মজুত করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া উৎপাদকের নিকট অধিক অর্ডার দেয়; উদ্যোক্তাগণ উৎপাদন বাড়াইয়া দেয় এবং অধিক অর্থ বিনিয়োগ করিতে থাকে, ব্যবসা সমৃদ্ধির যুগ সুরু হয়। ব্যবসা বৃদ্ধির ফলে ব্যাঙ্কের নগদ অর্থের পরিমাণে টান পড়ে, তাহারা ঋণ-সৃষ্টি কমাইয়া দেয় এবং ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে। ঋণগ্রহীতা মজুতকারী খুচরা বিক্রেতাগণ ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে মজুত দ্রব্যাদি বাজারে ছাড়িয়া দেয়, দ্রব্য সামগ্রীর দাম কমিয়া যায়, উৎপাদকগণ কম অর্ডার পাইতে থাকে, তাহারাও উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া ফেলে। কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমিয়া যায়, ব্যবসার অবনতি সুরু হয়। হট্রের মতে ব্যাঙ্কের নীতিই বাণিজ্য চক্রের নায়ক, ব্যাঙ্ক-নীতির অস্থায়িত্বই বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব ঘটায়।

ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণে উঠা-নামা ও ব্যাঙ্কের ভূমিকা

এই তত্ত্ব ব্যবসা সমৃদ্ধির সুরু ব্যাখ্যা করিতে পারে না এবং বাণিজ্য চক্রের সময়ের নির্দিষ্টতা (Regularity) ব্যাখ্যা করিতেও অক্ষম। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, আর্থিক কারণ ব্যতীত অন্যান্য বহু কারণ বাণিজ্যচক্র ঘটাইতে সাহায্য করে।

সম্পূর্ণ নহে

(৫) মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Psychological Theory) :

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ চাহিদার রূপ অনুযায়ী বর্তমানে উৎপাদন সুরু হয়; উদ্যোক্তার উৎপাদন সুরু করা এবং দ্রব্য সামগ্রী বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত হওয়া—ইহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে। ভবিষ্যতের দাম, ব্যয় বা মুনাফা সম্বন্ধে ব্যবসায়ীদের মনে বর্তমান ধারণা অনুযায়ী উৎপাদন হয় এবং ব্যবসায়ীদের আশা ভরসা বা ধারণা সব কিছুর মধ্যেই অনিশ্চয়তা মিশ্রিত থাকে। আশাবাদের ঢেউ যখন বহিতে থাকে তখন উৎপাদকগণও উৎপাদন বাড়াইয়া দেন, দ্রব্যসামগ্রী অধিক উৎপন্ন হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে আশানুরূপ বিক্রয় না হওয়ায় ব্যবসায়ীদের লোকসান হইতে থাকে, দেশে নিরাশার স্রোত বহিতে সুরু করে, উদ্যোক্তাগণ অস্বাভাবিক পরিমাণে

আশা নিরাশার জোয়ার ভাঁটা

নিরুৎসাহ হইয়া যান, উৎপাদন কমাইয়া দেন ও ব্যবসা অবনতির যুগ সুরু হয়। সুতরাং এই তত্ত্ব অনুযায়ী আশা নিরাশার গলদ ও আধিক্যের জন্যই (Errors and excesses of optimism and Pessimism) বাণিজ্যচক্র ঘটিয়া থাকে।

মনস্তাত্ত্বিক কারণের উপর সঠিকভাবে জোর দিলেও এই তত্ত্বের ত্রুটি হইল যে ইহা অর্থনৈতিক ও আর্থিক কারণ সমূহকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়। আর, সঙ্কটের শেষ হইয়া উন্নতির সুরু কেন হয় বা নিরাশার গহ্বর হইতে আশার পুনরুদ্ধার কেন ঘটে তাহা এই তত্ত্বের দ্বারা জানিতে পারা যায় না।

কিন্তু অপরাপর কারণ বাদ দেয়

(৬) **নূতন-প্রচলন তত্ত্ব (Innovation Theory) :**

অধ্যাপক শুমপিটারের মতে এই গতিশীল সমাজে কোন কিছুর নূতন-প্রচলন মূলধনের চাহিদা সৃষ্টি করে, ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। কোন নূতন-প্রচলিত যন্ত্র উৎপাদনের জন্য কাচামাল ও অন্যান্য উপাদানের দাম বাড়িয়া যায়, কিন্তু ঐ যন্ত্র প্রচলনের ফলেই উহার দ্বারা উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্যাদির দাম কমিয়া আসে। ইহাই হইল নূতন-প্রচলনের এক অপূর্ব পরস্পর বিরোধী ফল; যন্ত্রটি উৎপাদনের সময় ব্যবসা সমৃদ্ধির যুগ, কিন্তু যন্ত্রটি ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হইলেই ব্যবসা-অবনতির যুগের সূত্রপাত, কারণ উৎপন্ন দ্রব্যাদির দাম কমিয়া যাওয়ায় মুনাফা কমে এবং ঐ যন্ত্র-প্রচলন ক্ষতির ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং নূতন-প্রচলনের ফলই হইল সমৃদ্ধির যুগ সৃষ্টি করা এবং সেই নূতন-প্রচলন সমাজে সম্পূর্ণ গৃহীত হওয়ার ফলই হইল সঙ্কটের সৃষ্টি করা। এইরূপে সমৃদ্ধি ও সংকটের মধ্য দিয়াই গতিশীল সমাজ যন্ত্র-কৌশলজনিত পরিবর্তন বা নূতন-প্রচলনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয়।

নূতন প্রচলনের জোয়ার-ভাটা

(৭) **কেইন্সীয় তত্ত্ব (Keynesian Theory) :**

কেইন্সের মতে কর্মসংস্থান, আয় ও উৎপাদনের পরিমাণে নির্দিষ্ট সময় অন্তর উঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলা হয়। তাঁহার অভিমতে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাতে উঠানামার দরুণ বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন এইরূপ বাণিজ্যচক্র ঘটাইয়া থাকে। দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ মোট আয় ও উৎপাদন স্থির করে এবং এই কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে সামগ্রিক ব্যয়ের উপর। এই মোট ব্যয় তিনটি পরিবর্তনীয় বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত : মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা, সুদের হার এবং ভোগ-প্রবণতা।

মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় জোয়ার ভাঁটা

সাধারণতঃ, স্বল্পকালে সুদের হার এবং ভোগ-প্রবণতা পরিবর্তিত হয়না, সুতরাং আয় ও কর্মসংস্থানের উঠানামার পিছনে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাই হইল প্রধান সক্রিয় শক্তি। নূতন বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার হারকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বলা হয়।

ব্যবসা-উন্নতির গোড়ার দিকে মুনাফা সম্বন্ধে আশার প্রাবল্য দেখা যায়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ দ্রুত বাড়িতে থাকে, আয়স্তর বাড়িয়া যায়, বিনিয়োগের বৃদ্ধি বহু পরিমাণে আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়, গুণকের প্রভাবের ফলে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু হারে বিনিয়োগ ও আয় বাড়াইয়া সমৃদ্ধির প্রসার করে। কিন্তু এই সমৃদ্ধির সীমা আছে। প্রথমতঃ, ক্রমশঃ নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায় কারণ কাঁচামাল, শ্রমিক বা অন্যান্য উপকরণের ঘাট্‌তি সুরু হইতে থাকে, এবং ফলে তাহাদের দাম বাড়িতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, মূলধনী দ্রব্যের যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফার হার কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, ভোগ্য-দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িলেও বিক্রয় সেই অনুপাতে বাড়ে না; কারণ আয়বৃদ্ধি হইলেও ভোগ-প্রবণতা সেই অনুপাতে বাড়িতে না থাকায় ভোগব্যয়ে অধিক বৃদ্ধি হয় না। এই সকল কারণে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা দ্রুত হ্রাস পায়। অবস্থার চাপে সুদের হার এই সময়ে বেশী থাকে. উহাকে কমান সম্ভব হয় না। কারণ (ক) ব্যাঙ্ক-ঋণের জন্য চাহিদা খুবই বেশী থাকে এবং (খ) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিশেষ করিয়া ফাট্‌কা ব্যবসাতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে তারল্যপছন্দ বাড়িয়া যাওয়ায় লোকে নগদ অর্থ বেশী পরিমাণে হাতে রাখিতে চায়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় দ্রুত হ্রাস অথচ সুদের হারে বৃদ্ধি—এই উভয়ের ফলে বিনিয়োগ একসঙ্গেই হঠাৎ কমিয়া যাইতে চায়। 'হঠাৎ' কমিয়া যাওয়ার কারণ হইল ব্যবসায়ীগণের সাম্মিলিত দলমতের প্রভাবে ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় আশা-নিরাশা নির্ধারিত হয়, দলবদ্ধ বাজারী মতামত সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল।

উন্নতি

সমৃদ্ধি

অবনতি

অবনতি সুরু হইলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়স্তর সবই কমিতে থাকে, গুণকের প্রভাবে অবস্থার নিম্নগতি ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে বাড়ে। সমগ্র সমাজ দ্রুতগতিতে চরম-সঙ্কটের স্তরে পৌঁছায়। এই অবস্থায় মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বৃদ্ধির সূচনা হইলেই পুনরায় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। ইহা নির্ভর করে (ক) মজুত করা বা উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব কালের (durability) উপর এবং (খ) গুদামজাত অবস্থায় যন্ত্র বা দ্রব্যাদি মজুত রাখার ব্যয়ের

সঙ্কট

উপর। তাহা ছাড়া, (গ) মজুত করা ভোগ্যদ্রব্যের যোগান কিছু পরিমাণে কমিয়া যাওয়ার উপর। মূলধনী ও ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইলেই উৎপাদন হইতে মুনাফা এবং মুনাফার প্রত্যাশা উভয়ই বৃদ্ধি পায়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িতে থাকে; উৎপাদনে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতে থাকে।

(৮) হিক্‌সের তত্ত্ব (Hicks' theory):

হিক্‌সের মতে, অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে বিভিন্ন দেশে শিল্পোন্নতি সুরু হইয়াছে এবং বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব ঘটিতেছে। অর্থাৎ ইহা ক্রমপ্রসারমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ সমস্যা; ক্রম-বর্ধমান অর্থনৈতিক ধারার দুইপার্শ্বে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের এইরূপ নিয়মিত উঠানামা ঘটিয়া চলিয়াছে। বলা যায় যে ব্যবসা বাণিজ্যের এইরূপ পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার মধ্য দিয়াই দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী ধারা প্রবাহিত; ক্রমপ্রসারশীল অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই চক্রাকৃতি সঙ্কট এবং সমৃদ্ধির প্রকৃতি ও কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার।

এইরূপ বাণিজ্যচক্র হইল সমাজের আয় কর্মসংস্থান প্রভৃতির নিয়মিত উঠানামা: তাই ইহাদের উপর ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রভাব পরিমাপকারী গুণক ও ত্বরক তত্ত্বের সাহায্যেই এই উঠানামার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই দুই পদ্ধতির মিলিত ফলাফলে কি ভাবে ও কি কারণে বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব ঘটে, হিক্‌স তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উৎপাদন বা আয়ে পরিবর্তন বিনিয়োগে, বিশেষ করিয়া উদ্ভূত বিনিয়োগে কিরূপ পরিবর্তন আনে, তাহারই উপর প্রধানত: বাণিজ্যচক্র নির্ভর করে।*

তাঁহার মতে কোন সমাজে বিনিয়োগ প্রধানত: দুইধরণের, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ (Autonomous Investment and Induced Invest-

---

*কেইন্‌সীয় কর্মসংস্থানতত্ত্বে গুণকতত্ত্ব প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার মতে মোট আয় হইল মোট বিনিয়োগ × গুণক: গুণককে সমান ধরিয়া লইলে আয়ে পরিবর্তনের হার = মোট বিনিয়োগে পরিবর্তনের হার × গুণক। সুতরাং, বাণিজ্যচক্র বা আয়স্তরে পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করিতে তিনি এই গুণকতত্ত্বের উপর বিশেষ নির্ভর করিয়াছেন।

হিক্‌স এই তত্ত্বকে কার্যত: অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং কেইন্‌সীয় গুণকতত্ত্বকে বাদ দিয়াই বাণিজ্যচক্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন। কেইন্‌সীয় গুণককে তিনি

ment)। সমাজে কোন কোন ধরণের বিনিয়োগ-ব্যয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্র কর্তৃক স্কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহ নির্মান প্রভৃতি; বা আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি বা নূতন দ্রব্য উৎপাদন, এবং যাহা হইতে দীর্ঘকালে আয় সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ বিনিয়োগ, ইহারা সকলে **স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ**—ইহা অপরাপর দ্রব্যাদি উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নহে। ক্রমপ্রসারমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এইরূপ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে। অপরপক্ষে, বিশেষ কোন দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন কোন ধরণের যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে হয় (যেমন বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মাকু-র উৎপাদন বাড়ান দরকার); মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে এইরূপ বিনিয়োগকে **উদ্ভূত বিনিয়োগ** বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে দ্রব্যোৎপাদন ও যন্ত্রোৎপাদন ইহাদের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক আছে এবং তাহা দ্রব্যের ও যন্ত্রের প্রকৃতি এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলের দ্বারা নির্দিষ্ট (যেমন বৎসরে ১০০০০ কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ৫০টি মাকুর উৎপাদন প্রয়োজন)। ইহাই ত্বরণনীতি, অর্থাৎ উৎপাদনে বৃদ্ধি কি অনুপাতে বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায়।

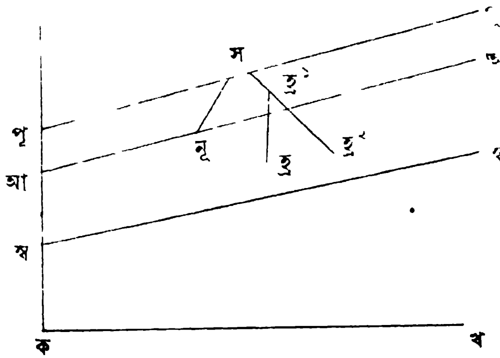
দুই শ্রেণীর বিনিয়োগ

বলিয়াছেন ক্ষণোৎভব গুণক (Instantaneous Multiplier)। গুণক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কেইন্‌সের ভোগপ্রবণতা তত্ত্বের প্রকৃতি মনে রাখা দরকার। তাঁহার মতে, চলতি ভোগ্যব্যয় চলতি আয় হইতেই করা হয়, এবং এই চলতি ভোগব্যয় সঙ্গে সঙ্গে কি পরিমাণ মোট আয় সৃষ্টি করিয়া ফেলিল তাহা ভোগপ্রবণতার উপর নির্ভর করে এবং সেই নির্দিষ্ট বা স্থায়ী গুণকের দ্বারা পরিমাপযোগ্য।

হিক্‌স কিন্তু ভোগপ্রবণতাকে অন্যভাবে দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে গুণকের পরিমাণকে নির্দিষ্ট ও স্থায়ী বলিয়া ধরা চলে না। তিনি বলিয়াছেন যে চলতি ভোগব্যয় (কেইন্‌সের মত চলতি আয়ের উপর নির্ভর করে না) নির্ভর করে "গত কালের" আয়ের উপর, সকল "গত কালের" মিলিত আয়ের উপর। আয় এবং ভোগ-ব্যয়ে সময়ের ব্যবধান (time-lag) স্বীকার করিয়া লইলেই এবং সেই ব্যবধানের পরিমান সকল ক্ষেত্রে সমান নহে ইহা ধরিয়া লইলেই কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ভাবে হিসাব করা প্রয়োজন। সেই অবস্থায়, গুণকের আয়তন স্থায়ী ধরিয়া লইলে বিনিয়োগ পরিবর্তনের ফলে নূতন ভারসাম্যাবস্থার আয় পাওয়া যাইবে অসীম এক কেন্দ্রাভিমুখী শ্রেণীর শেষে (at the end of the infinite convergence series)। সুতরাং, বিশেষতঃ, স্বল্পকালীন বিষয়ের বিশ্লেষণে গুণকতত্ত্বের প্রয়োগ ঠিক নহে বলিয়া তিনি মনে করেন।

কোন দেশে যে আয়স্তর আছে তাহা, সাধারণভাবে তিনটি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত : স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ, উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ। নীচের চিত্রে দেখা যাইতেছে, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের রেখা ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, কারণ সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ক্রমেই এইরূপ বিনিয়োগ বাড়াইতে থাকে। উৎপাদনের ও আয়ের রেখা উহার ঊর্ধ্বে অবস্থিত থাকে, কারণ উপরোক্ত তিন বিষয় লইয়াই মোট আয় গঠিত।

বিনিয়োগ ও আয়স্তর



চিত্রে স্ব স্ব রেখা স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং আ আ রেখা মোট আয় স্তরের নির্দেশক. উভয়ের মধ্যে দূরত্ব গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফল। এই উভয়ের মিলিত ফলকে অতিগুণকের (Super-multiplier) ফলাফল বলিয়া মনে করা হয়।

ধরা যাক যে নূ বিন্দুতে আয় ও উৎপাদন হইতেছে এবং সেই সময় কোন স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ঘটিল : কোন আবিষ্কৃত দ্রব্যের উৎপাদন বা সরকারী ব্যয় প্রভৃতির ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইল। স্বাভাবিক স্তর হইতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় বাড়িতে লাগিল। গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলে, উভয়ের ঘাত প্রতিঘাতে, নূ স রেখা অবলম্বন করিয়া উৎপাদন ও আয় বাড়িতে থাকে। ব্যবসাসমৃদ্ধির যুগে মুনাফার প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আরও বাড়াইয়া দিতে পারে এবং গুণক ও ত্বরণের ফলে তাহাও অধিক আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিতে থাকিবে। উৎপাদন বৃদ্ধির স্তর নির্ভর করিবে (ক) প্রাথমিক স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ (খ) গুণক

কেন সমৃদ্ধির সুরু হয়

(গ) ত্বরণ (ঘ) ব্যবসায়ীদের মনে ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার সৃষ্টি, ফলে বর্ধিত বিনিয়োগ—এই সকল বিষয়ের শক্তি কিরূপ তাহার উপরে।

সমৃদ্ধির স্তর নির্ণয়

যদি ইহারা মিলিয়া বিশেষ শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে এমন এক অবস্থায় পৌছিবে যেখানে আর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, পূর্ণকর্মসংস্থানের 'ছাদে' (Full Employment ceiling) ঠেকিয়া উৎপাদন আর বাড়িতে পারিতেছে না। পূর্ণ কর্ম-সংস্থান স্তরের উৎপাদন পূ পূ রেখায় দেখান হইয়াছে। নিয়োগযোগ্য উপকরণের অভাবে উৎপাদন ছাদে ঠেকিবার পর আর বাড়িতে পারে না।

নূতন আবিষ্কৃত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বা সরকারী ব্যয় অর্থাৎ প্রথম স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ শেষ হইয়া যাইবার পর, ইহা নিজে আর বৃদ্ধি পায় না, পুরাণো রেখায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আইসে। কিন্তু উদ্ভূত বিনিয়োগ নিজে শেষ হয় না, নূতন আয় সৃষ্টি ও উৎপাদন বাড়াইয়া নিজেই নিজেকে বাড়াইয়া চলে; এইরূপে পূর্ণকমসংস্থান স্তরে পৌছায়। উহার পরে উৎপাদন আর বাড়িতে পারে না, ওই রেখার উপরেই গড়াইতে থাকে (এবং ডান দিকেই গড়াইবে কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ, উৎপাদন,

ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দিষ্ট-কারী বিষয়সমূহ

আয়স্তর, প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজ এখন রেখার একটু ডান দিকেই অবস্থিত)। কিন্তু উৎপাদনের রেখাকে নিম্নে নামিতেই হইবে কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ আর নাই, কেবলমাত্র উদ্ভূত বিনিয়োগ অত উচ্চস্তরে উৎপাদনকে রক্ষা করিতে পারিবে না। রাষ্ট্র যদি সময় বুঝিয়া আবার স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ না করে বা ক্রমাগত করিতে না থাকে অথবা সমাজে পুনরায় এইরূপ বিনিয়োগ না ঘটে তাহা হইলে উৎপাদন ও আয়ের স্তর কমিয়া আসিবে। উৎপাদন কমিলে (ঋণাত্মক ত্বরনের ফলে) অবিনিয়োগ (Disinvestment) ঘটিতে থাকিবে। যদি ঠিক যে হারে বিনিয়োগ উদ্ভূত হইয়াছিল ঠিক সেই হারেই উহা হ্রাস পাইতে থাকে, তাহা হইলে উৎপাদন হ্র১হ্র রেখায় কমিবে। কিন্তু, সাধারণতঃ তাহা ঘটে না। স্থায়ী মূলধনে অবিনিয়োগ ধীরে ধীরে ঘটিতে থাকে, স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটিতে বেশী সময় লাগে। সুতরাং হ্র১হ্র২ রেখায় উৎপাদন নামিয়া আসে।

হিক্‌সের মতে, প্রধানতঃ দুইটি কারণে উৎপাদনের নিম্নগতি ত্বরান্বিত হইবে। প্রথমতঃ আর্থিক কারণের ফলে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ আর্থিক কর্তৃপক্ষ

নিম্নগতি কি কারণে ত্বরান্বিত হইয়া থাকে

ঋণসৃষ্টি কমাইয়া দিতে চেষ্টা করে, ফলে সুদের হার বাড়িয়া যাইতে থাকে; তাহা ছাড়া তারল্যপছন্দ বাড়িয়া যাওয়াতেও সুদের হার বাড়িবে। এই সকল বিষয় ঋণাত্মক গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলাফলকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিবে; উৎপাদন, আয় ও

কর্মসংস্থান নামিয়া আসার গতি দ্রুততর হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ অবস্থায় ব্যবসায়ীদের আশাভঙ্গের ফল বিশেষ তীব্র হয়। অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণ সমৃদ্ধি বেশীদিন চলিতে থাকিলেই ভয় পাইয়া উৎপাদন সঙ্কুচিত করিতে থাকেন; তাহাদের বাণিজ্য চক্রের সচেতনতা-ই (Cycle-consciousness) উৎপাদন ও বিনিয়োগ কমাইবার ঝোঁক সৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া, শেয়ার বাজারের "দলবদ্ধ জনতার মতামত" বিশেষ অস্থির প্রকৃতির।

উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতি নামিয়া আসারও কিন্তু সীমা আছে; সেই মেঝেতে (floor) ঠেকিয়া উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান আর নামিতে পারে না।

নিম্নতম সীমা নির্ধারণকারী বিষয় সমূহ

তিনটি বিষয়ের দ্বারা এই নিম্নতম সীমার স্তর নির্দিষ্ট হয়।

প্রথমতঃ, সঙ্কট যতই গভীরতর হউক না কেন, কিছু পরিমাণ ভোগব্যয় সর্বদা সমাজে হইবেই, আয় না থাকিলেও ঋণ করিয়া, সঞ্চয় ভাঙাইয়া যে কোন উপায়ে ব্যক্তিরা নিম্নতম দৈহিক প্রয়োজন মিটাইতে থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, সঙ্কটের কালে সরকারী ব্যয় সাধারণতঃ কমে না, সুতরাং তাহা চলিতে থাকিবে: এমন কি দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য উহা কিছুটা বাড়িতেও পারে।

তৃতীয়তঃ, কিছু পরিমাণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ, যেমন স্কুল, কলেজ, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতির জন্য ব্যয়, সমাজে চলিবেই; ইহারা চলতি অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। এই তিন বিষয়ের উপর মোট ব্যয় সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার নিম্নতম সীমা এবং সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপযোগী অর্থনৈতিক কাজকর্ম চরম সঙ্কটের সময়েও চলিতে থাকিবে; ইহারা বেকারীর পরিমাণের উর্ধ্বতম সীমা (Upper limit of Unemployment) নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

উন্নতির সূচনা

মজুত মূলধনী দ্রব্যাদির অবিনিয়োগ (Disinvestment), এবং তাহাদের ক্ষয়ক্ষতির বা অকেজো হইয়া যাইবার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সঙ্কট স্থায়ী হইবে, কারণ তাহার পর উহাদের পুনঃসংস্থাপনের জন্য কিছু নূতন বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হইতে পারে। ফলে, আবার সেই গুণক ও ত্বরণের সম্মিলিত ফলাফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দৌড় সুরু হইবে, সমাজের সঙ্কটত্রাণ ঘটাইয়া উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে।

বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধের পদ্ধতি (Remedies of Trade Cycles):

বিভিন্ন কারণের সম্মিলিত ফলে বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব হয়; কারণ সম্বন্ধে

ধনবিজ্ঞানে কোন মতৈক্য নাই, সুতরাং প্রতিরোধের পদ্ধতি সম্বন্ধেও ধনবিজ্ঞানীগণ একমত নহেন। বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণের ফলে প্রতিরোধেরও বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। সাধারণভাবে, বাণিজ্য চক্র নিরোধের পদ্ধতিসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে; আর্থিক নীতিসমূহ, করসম্পর্কীয় নীতিসমূহ এবং বাজেট সম্বন্ধীয় নীতিসমূহ।

আর্থিক পদ্ধতি সমূহ

বাণিজ্য চক্র নিরোধের জন্য আর্থিক পদ্ধতিসমূহ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রধানতঃ, বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে (ক) ব্যাঙ্কঋণ এবং অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা, এবং (খ) সুদ সম্পর্কীয় সঠিক নীতি স্থির করা—এই দুই নীতি গ্রহণ করা চলে। সমৃদ্ধির সময় হইতেই যখন সমাজ "চরম-সমৃদ্ধির" দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে অর্থের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করিবে (খোলাবাজারের কার্যাদির দ্বারা), ব্যাঙ্কের ঋণদান করিবার ক্ষমতা ও সুযোগ সঙ্কুচিত করার প্রচেষ্টা করিবে। আবার ব্যবসা-অবনতির সুরুতেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে অর্থের পরিমাণ ও ব্যাঙ্কসমূহের ঋণদানের ক্ষমতা ও সুযোগ বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয় নীতি অনুযায়ী সমৃদ্ধির যুগে ঋণদানের ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়াইবার এবং ব্যবসা-অবনতির গোড়াতেই সুদের হার কমাইয়া রাখার নীতি গ্রহণ করিবে।

করসংক্রান্ত পদ্ধতিসমূহ

দ্বিতীয়তঃ, বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কর নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ করা দরকার, এবং করনীতিকেও প্রধানতঃ দুই প্রকার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলে। (ক) করের সাহায্যে দেশে আয়-বৈষম্য কমাইয়া দিলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়া সমাজের ভোগব্যয় বাড়াইয়া দিবে। সমৃদ্ধি অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনীদের আয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহাদের ভোগপ্রবণতা কম এবং সঞ্চয়প্রবণতা বেশী। সুতরাং তাহাদের উপর করস্থাপন করিয়া গরীবদের সেই অর্থ দিয়া দিলে ক্রয়-ক্ষমতার সঙ্কোচন রোধ করা যাইবে এবং সঙ্কটকালীন চাহিদা হ্রাসের সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে।

(খ) কেইন্‌সের মতে বাণিজ্যচক্র রোধের জন্য চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতি (Contra-cyclical fiscal Policy) গ্রহণ করা উচিত। সমৃদ্ধির সময়ে অধিক হারে এবং অধিক সংখ্যায় প্রত্যক্ষ কর স্থাপন করা উচিত এবং প্রত্যক্ষ করের বৃদ্ধি দ্বারা (১) অধিক বিনিয়োগে বাধা দেওয়া, এবং (২) অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া দরকার। সঙ্কটের সময়ে গরীবদের হাতে অর্থ ঢালিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করা উচিত,

বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত—এই সকল কারণে প্রত্যক্ষ করের ও পরোক্ষ করের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া দরকার। কর-কাঠামো এরূপ নমনীয় থাকা উচিত, যাহাতে বাণিজ্য চক্রের গতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি করের হার ও দিক্ পরিবর্তন করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, বাজেট সম্পর্কীয় নীতিই আধুনিক কালে বিশেষ কার্যক্ষম বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাঁহাদের মতে, প্রতি বৎসর বাজেটে আয় ব্যয় সমান রাখিবার নীতির পিছনে কোন অর্থনৈতিক যুক্তি নাই, গোঁড়ামির ধারণার ফলেই এরূপ করা হইয়া থাকে। বাণিজ্যচক্র রোধ করিবার জন্য চক্রকাল অনুযায়ী বাজেট প্রস্তুত হওয়া উচিত। সমৃদ্ধির প্রাবল্য রোধ করিতে পারিলে আগামী সঙ্কট রোধ করিতে পারা যায়; তাই সমৃদ্ধির যুগ পার হইয়া চরম সমৃদ্ধির স্তরে সমাজ যাহাতে যাইতে না পারে সেই জন্য করের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এবং সরকারী ব্যয় হ্রাস করিয়া রাখা দরকার। বাজেটে উদ্বৃত্ত (Surplus) রাখা উচিত; সমৃদ্ধির যুগের বাজেটে বাৎসরিক আয় ব্যয়ের সমতা রাখিলে চলে না। ব্যবসাবনতি ও সঙ্কটের যুগে করের সংখ্যা ও হার একেবারে কমাইয়া দেওয়া উচিত এবং সরকারী-ব্যয় বিশেষ পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া দরকার এবং স্কুল কলেজ, রাস্তা-ঘাট, বেকারভাতা প্রভৃতির দ্বারা সমাজ দেহে অর্থ ঢালিয়া দেওয়া কর্তব্য। সঙ্কটের সময়ে বাজেট অনবরত ঘাটতি করিয়া সমৃদ্ধির যুগের সঞ্চিত বাজেটের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় করা দরকার। এইরূপে চক্রানুযায়ী বাজেট রচনা করা দরকার। যদি তাহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে সাধারণ বাজেটেরই দুইটি অংশ থাকা উচিত: এক অংশে সাধারণ আয় ব্যয়ের হিসাবে সমতা বজায় রাখিয়া অন্য অংশে সমৃদ্ধি যুগের উদ্বৃত্ত এবং সঙ্কটকালীন ঘাট্‌তি সৃষ্টি করা—এইরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

বাজেটীয় পদ্ধতিসমূহ

চক্রানুযায়ী বাজেট রচনা

সর্বশেষে মনে রাখা দরকার যে বাণিজ্যচক্র ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই অঙ্গ, সুতরাং অনেকের মতে, এই সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করিতে পারিলে বাণিজ্যচক্র রোধ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে এবং মুনাফা-ভিত্তিক উৎপাদন চলিতে থাকায় সম্পূর্ণ বিশৃংখল এবং অপরিকল্পিত ভাবে উৎপাদন চলে, বাণিজ্য-চক্রের সৃষ্টি হয়। যদি পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা যায়, উৎপাদনের পরিমাণ, আয়স্তর, কর্মসংস্থান সকলই পরিকল্পনা দ্বারা নির্ধারিত করা হয়, তাহা হইলে শত সহস্র বাহ্যিক কারণাবলী ব্যবসায়ীদের মনে অযথা আশা নিরাশার প্রাবল্য ঘটাইতে পারে না, বিনিয়োগের হারে উঠানামাও হয় না, বাণিজ্যচক্রও ঘটিতে পারে না।

অনুন্নত দেশ ও বাণিজ্যচক্র :

অনুন্নত দেশসমূহে বাণিজ্যচক্র দেশের অভ্যন্তরে কৃষি উৎপাদনে উঠানামার উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে ; শিল্পের সংখ্যা, পরিমাণ ও শিল্পে বিনিয়োগ এইরূপ দেশে কম। তবে, অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগসূত্র থাকায় অপর দেশের সমৃদ্ধি ও সঙ্কট উভয়ই অনুন্নত দেশসমূহে প্রবেশ করে।

আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হওয়ায় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান বাড়িয়া যাওয়ায় স্বয়ং-স্বাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চল বিশেষ আর নাই ; বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরস্পর নির্ভরশীল ও সংযুক্ত। সুতরাং কোন উৎপত্তি কেন্দ্র (Epicentre) হইতে সুরু হইয়া ভূমিকম্প যেরূপ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে, অর্থনৈতিক জগতেও কোন দেশের সঙ্কট বা সমৃদ্ধি এইরূপে বিভিন্ন দেশে ছড়াইতে থাকে ; ইহারা কিরূপ ছড়াইবে তাহা নির্ভর করে প্রতিবেশী দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক ও ত্বরকের আয়তনের উপর।

যদি কোন অনুন্নত দেশ প্রধানতঃ **কৃষিজাত কাঁচামাল** রপ্তানী করে তাহা হইলে অধিক রপ্তানী এবং বাণিজ্য হারে আনুকূল্যের মাধ্যমে সে আমদানীকারী উন্নত দেশের **সমৃদ্ধির** অংশ লাভ করে। **সঙ্কটের সময়ে** তাহার দুরবস্থা দুই প্রকারের (ক) কৃষিজাত কাঁচামালের চাহিদা কমিয়া যাইয়া রপ্তানীর উদ্বৃত্ত থাকে না (খ) সঙ্কটে বিপন্ন উন্নত দেশগুলি হইতে অবিক্রীত দ্রব্যসমূহ আসিয়া তাহার দেশের শিশু শিল্পসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করে।

তবে যদি কোন অনুন্নত দেশ প্রধানতঃ **কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যের** রপ্তানীকারক হয়, তাহা হইলে সঙ্কটের সময়ে তাহার সর্বাধিক সুবিধা; কারণ উন্নত দেশে সঙ্কট আসিলেও সে খাদ্য ক্রয় করিবেই, সুতরাং অনুন্নত দেশের রপ্তানী বিশেষ কমিবে না, অথচ সঙ্কট কালীন সস্তা দামে নিজের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য সে ক্রয় করিতে পারিবে ; বাণিজ্যহার তাহারই অনুকূলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ বেশী হইতে থাকিবে। উন্নত দেশে সমৃদ্ধি আসিলে অবশ্য তাহার সুবিধা বিশেষ নাই, কারণ সমৃদ্ধির ফলে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। ঠিক সেই সময়ে শিল্পজাত আমদানী দ্রব্যের দাম বাড়িবার ফলে বাণিজ্যহার তাহার প্রতিকূলে যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কম হইতে থাকে।

কৃষিজাত কাঁচামাল অথবা খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানীকারক

অনুশীলনী

1. What are Cyclical fluctuations ? Discuss their causes. Mention some measures that have been suggested for the effective control of these fluctuations. (B. A. 53)

2. Indicate the causes of overproduction in all or most industries at the same time. (B.com. 50)

3. Discuss the theories that have been put forward to explain the cyclical nature of trade fluctuations.

4. Examine the main features of Business cycles and mention some measures that may be adopted to control these cycles. (B.com. 52)

5. Explain Keynes' theory regarding trade cycles.

6. Describe the phases of a typical business cycle. What remedial measures would you suggest for controlling these cycles ? (B.com. 55)

7. Explain what is meant by 'trade cycles' and describe different phases of the trade cycle. (B. A. 56.)

নবম পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

উৎপাদনের উপাদানসমূহ পৃথিবীর সকল অঞ্চলে সমান ভাবে বণ্টিত নাই ; কোন অঞ্চলে কোন উপাদানের পরিমাণ বেশী, কোথাও উহার পরিমাণ কম। বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপাদানসমূহ কম বা বেশী পরিমাণে নিয়োগ করা হয়। কোন দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সেই অঞ্চলে অধিক পরিমাণে ও কম দামে পাওয়া গেলে উহার উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে : উপাদানসমূহের যোগান কম হইলে ও দাম বেশী হইলে দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় অধিক হয়। সুতরাং কোন বিশেষ অঞ্চলে উপাদান-লভ্যতা (Availability of factors) অনুযায়ী সেই অঞ্চল বিশেষ ধরণের দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয় ; ব্যক্তি যেমন নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে বিশেষ প্রকার কর্মে বা জীবিকাতে নিযুক্ত থাকে, সেইরূপ কোন অঞ্চলও এমন দ্রব্য উৎপাদনে উহার সকল উপাদানসমূহ নিয়োগ করে

আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ

যাহাতে তুলনামূলক ভাবে, উহার উৎপাদন-ক্ষমতা সর্বাধিক বা উৎপাদন-ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম।

কিন্তু পৃথিবীতে সকল অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক ভাবে এক রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত নাই, বরং বলা যায় যে রাজনৈতিক ভাবে পৃথিবী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারিত আছে। এক রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসাদারদের সহিত অন্য রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসাদারদের পরস্পরের নিকট হইতে ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেন-কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয় এবং ইহাকে দেশের আভ্যন্তরীন বাণিজ্য হইতে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে

ইহার কারণ হইল এই যে রাজনৈতিক ভাবে রাষ্ট্রবিভাগ অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে বহু প্রকার ভিন্ন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ, উপাদানসমূহ একটি দেশেব মধ্যে যতখানি চলনশীল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তাহাদের চলনশীলতা তুলনামূলক ভাবে আরও কম। দেশের অভ্যন্তরে কোন অঞ্চলে কোন উপাদানের দাম বেশী হইলে অন্যান্য অঞ্চল হইতে উপাদানসমূহ সেই অঞ্চলে ধাবিত হয, ফলে মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপাদানের পারিশ্রমিকে অধিক পার্থক্য থাকে না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক, মূলধন বা উদ্যোগ-ক্ষমতার চলনশীলতা তুলনামূলক ভাবে অনেক কম ; অন্য রাষ্ট্রে মজুরী, সুদ বা মুনাফা অধিক হইলেও উপাদান-সমূহ নিজের রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রে যাইতে চাহে না। ফলে সকল রাষ্ট্রে উপাদানসমূহের পারিশ্রমিকের হাব সমান নহে ; বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের উপর ইহার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।

কেন ইহা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক

তুলনামূলক চলনশীলতা

দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা আছে, এক রাষ্ট্রের অর্থ অপর রাষ্ট্রে লেনদেনের কার্যে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক দেশের অর্থকে অন্য দেশের অর্থে রূপান্তরিত করিতে হয় ; উপরন্তু এক দেশের অর্থের বিনিময়ে অপর দেশের যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় সেই বৈদেশিক বিনিময়-হার বা অর্থের বৈদেশিক মূল্য সকল সময় স্থিরও থাকে না, তাহার উঠানামা ঘটে।

নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম, উৎপাদন, বণ্টন,

বিনিময় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ধরণের আইন-কানুন বা রীতি-নীতি, প্রথা, প্রভৃতি প্রচলিত থাকে, তাহাও সেই দেশের উৎপাদন-ব্যয়কে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে। প্রত্যেকটি দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, বীমা ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পৃথক ধরণের, তাহাদের রীতিনীতি ও যোগ্যতা পৃথক। সুতরাং বিভিন্ন দেশের উৎপাদন স্বতন্ত্র পরিবেশে পরিচালিত হয়।

পৃথক অর্থ নৈতিক সংগঠন ও পরিবেশ

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে আধুনিক জগতে রাষ্ট্রসমূহ প্রত্যেকে নিজস্ব বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করে এবং অপর রাষ্ট্র হইতে দ্রব্য সামগ্রী আমদানী রপ্তানীতে বিভিন্ন ধরণের বাধা নিষেধ আরোপ করে। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মাল চলাচলে সাধারণতঃ এইরূপ বাধা নিষেধ বিশেষ থাকে না। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্বকে পৃথক করিয়া আলোচনা করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি, রীতিনীতি ও সমস্যার বিশ্লেষণ এই তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

পৃথক বাণিজ্য নীতি

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তিঃ উৎপাদন ব্যয়সমূহের অনুপাতে পার্থক্য (The basis of International trade : Difference in cost-ratios) :

কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয় বা কেন এক দেশ বিশেষ ধরণের দ্রব্যাদি আমদানী বা রপ্তানী করে তাহা বিশ্লেষণের জন্য ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রত্যেকটি দেশ সেই সকল দ্রব্যই উৎপাদন করিবে যাহাদের উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক দক্ষতা বা সুবিধাসমূহ সর্বাপেক্ষা অধিক। সেই দেশের জলবায়ু, জমি, খনিজ ও কৃষি সম্পদ লোকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, ঘরবাড়ী, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির দরুণ যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, সেই দেশ সেই সকল দ্রব্যই উৎপাদন করিবে। নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া সেই উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানী হিসাবে অন্য দেশে প্রেরণ করিবে এবং অন্য দেশ হইতে এমন দ্রব্য আমদানী করিবে যাহার উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক সুবিধার পরিমাণ অপর দেশের তুলনায় কম।

আমদানী ও রপ্তানী কিসের উপর নির্ভরশীল

কোন দেশের কোন্ ধরণের দ্রব্যাদি উৎপাদনে কিরূপ স্বাভাবিক সুবিধা আছে তাহা বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীসমূহের উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা প্রকাশ পায়। একটি দ্রব্য অন্য

দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে এই দ্রব্য উৎপাদনে স্বাভাবিক সুবিধা অধিক বলিয়া ব্যয় কম পড়িতেছে। এই ব্যয়-পার্থক্য তিন প্রকারের হইতে পারে : সমান ব্যয়-পার্থক্য, চরম ব্যয়-পার্থক্য, এবং তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য।

(ক) সমান ব্যয় পার্থক্য : যদি উভয় দেশের মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে সমান পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় উহাদের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। যেমন, ধরা যাউক্—

'ক' দেশে,	১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে	২০ ইউনিট ধান, এবং
	১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে	৩০ ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়,
আবার, 'খ' দেশে,	১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে	৩০ ইউনিট ধান, এবং
	১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে	৪৫ ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয়।

এমতাবস্থায় 'ক' দেশে ১ ইউনিট ধানের বিনিময়ে ১$\frac{১}{২}$ ইউনিট কাপড পাওয়া যায়, কারণ উভয়ের উৎপাদন-ব্যয় সমান। 'খ' দেশেও উভয় দ্রব্যের আভ্যন্তরীন বিনিময়-হার হইল ১ ধান : ১$\frac{১}{২}$ কাপড়। এই অবস্থায় উভয় দেশে উভয় দ্রব্যের মধ্যে ব্যয়ের অনুপাত সমান হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইতে পারে না,) কারণ কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া নিজের দেশে যাহা পাওয়া যায তাহার অধিক অন্য দ্রব্য পাইতে পারে না।*

(খ) চরম ব্যয় পার্থক্য : যদি উভয় দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাতে চরম পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য হওয়া সম্ভবপর। যেমন, ধরা যাউক—

'ক' দেশে,	১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে	২০ ইউনিট ধান, এবং
	১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে	১০ ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়।
'খ' দেশে,	১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে	১০ ইউনিট ধান, এবং
	১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে	২০ ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়।

'ক' দেশের মধ্যে ১ ইউনিট ধানের বদলে $\frac{১}{২}$ ইউনিট কাপড পাওয়া যায়, 'খ' দেশের মধ্যে ১ ইউনিট ধানের বদলে ২ ইউনিট কাপড যাওয়া যায়। 'ক' দেশের

(*অবশ্য এই অবস্থাতেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইয়া গেলে উপাদানের নিয়োগে দিক্ পরিবর্তন ঘটিবে, উৎপাদন-ব্যয়ে পরিবর্তন আসিবে, ব্যয় পার্থক্যের অনুপাত সমান থাকিবে না, সফল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইবে।)

ধান উৎপাদনে চরম সুবিধা এবং 'খ' দেশের কাপড় উৎপাদনে চরম সুবিধা। উৎপাদন ব্যয়েও চরম পার্থক্য; 'ক' দেশ ধান উৎপাদনে, এবং 'খ' দেশ কাপড় উৎপাদনে তাহাদের সকল উপাদান নিয়োগ করিবে। এইরূপে উভয় দেশের নিজস্ব স্বাভাবিক সুবিধা অনুযায়ী উপাদান নিয়োগের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইবে। (পূর্বে ২০+১০=৩০ ইউনিট ধান এবং ১০+২০=৩০ ইউনিট কাপড উৎপন্ন হইতেছিল, বাণিজ্যের দরুণ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ফলে ২০+২০=৪০ ইউনিট ধান এবং ২০+২০=৪০ ইউনিট কাপড উৎপন্ন হইবে)। (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বহুলাংশ এইরূপ চরমব্যয়-পার্থক্যের উপর নির্ভর করে;) পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশের ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে বিনিময় ও বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়।

(গ) তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য ঃ

উৎপাদন ব্যয়ে চরমপার্থক্য না থাকিয়া তুলনামূলক পার্থক্য থাকিলেও উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারিবে। যেমন, ধরা যাউক—

'ক' দেশে,	১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে	২০ ইউনিট ধান, এবং
	১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে	২০ ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয়।
'খ' দেশে,	১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে	২০ ইউনিট ধান, এবং
	১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে	৩০ ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয়।

'ক' দেশে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত হইল ১ : ১ এবং এই হারেই দেশের মধ্যে উহাদের বিনিময় হইতে থাকিবে। কিন্তু 'খ' দেশে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত হইল ১ : ১½ ; দেশের অভ্যন্তরে উহাদের এই হারেই বিনিময় হয়। কোনো দেশেরই কোনো দ্রব্য উৎপাদনে চরম সুবিধা নাই, তুলনামূলকভাবে 'খ' দেশের কাপড উৎপাদনে সুবিধা বেশী। যেহেতু দুই দেশের মধ্যে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে ব্যয়-পার্থক্য আছে, সেইজন্য উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারিবে। 'ক' দেশের ব্যবসায়ীগণ ১ ইউনিট ধানের বদলে নিজের দেশে ১ ইউনিট কাপড পায়, তাহারা 'খ' দেশ হইতে ১ ইউনিট কাপড়ের কিছু বেশী পাইয়া ১ ইউনিট ধান রপ্তানী করিবে। অপরদিকে, 'খ' দেশের ব্যবসায়ীগণকে ১ ইউনিট ধান পাইতে হইলে নিজের দেশে ১½ ইউনিট কাপড় দিতে হয়, তাহারা ১½ ইউনিট কাপড়ের

তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্যের নীতি

কিছু কম বিদেশে রপ্তানী করিয়া ১ ইউনিট ধান আমদানী করিবে। ধরা যাউক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইবার পরে উভয় দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত হইয়াছে ১ ইউনিট ধান=১$\frac{1}{2}$ ইউনিট কাপড়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে 'ক' দেশ প্রতি ইউনিট ধান রপ্তানী করিয়া $\frac{1}{2}$ ইউনিট কাপড় লাভ (gain) করিতেছে; 'খ' দেশেও প্রতি ১ ইউনিট ধান আমদানীতে $\frac{1}{2}$ ইউনিট কাপড় লাভ (gain) হইতেছে। উভয় দেশেই উপাদানসমূহের নিয়োগে পুনর্বিন্যাস হইতেছে, 'ক' দেশ কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদের ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে; 'খ' দেশ ধানের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদের কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে।) উভয়ের স্বাভাবিক সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদন হওয়ায় এবং আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হওয়ায় উভয় দেশের শ্রমিক-দক্ষতা ও উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ফলে, উভয় দেশের জনসাধারণের আয়ত্তর জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতেছে।

সমালোচনা: অনেকে বলেন যে, স্বীকার্য বিষয়সমূহের (assumptions) ফলে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং ইহার সত্যতা নাই। কিন্তু যদি স্বীকার্য বিষয়সমূহ একে একে অপসারণ করা যায়, তাহা হইলেও তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি বা এই নিয়ম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ব্যাখ্যার পক্ষে সঠিক বিশ্লেষণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। (১) দ্রব্যের বা দেশের সংখ্যা বাড়াইলেও ইহা লক্ষ্য করা যায় যে কোন দেশের মধ্যে যে সকল দ্রব্যসমূহের ব্যয় তুলনামূলকভাবে অন্য দেশগুলির ব্যয় হইতে কম তাহারাই রপ্তানী দ্রব্য এবং যে সকল দেশের ব্যয়ের তুলনায় কম, সেই সকল দেশেই উহাদের রপ্তানী হইয়া থাকে। (২) শ্রমশক্তির হিসাবে উৎপাদন-ব্যয়ের পরিবর্তে অর্থের হিসাবে দ্রব্যের প্রান্তিক ও গড়ব্যয়ের হিসাব করিলেও তুলনামূলক ব্যয়ের নীতির মূলকেন্দ্র সঠিক বলিয়াই ধরা যায়। কারণ, অর্থের সাহায্যে হিসাব করিলেও যে সকল দ্রব্যসামগ্রী অধিক ব্যয়ে নিজের দেশে উৎপাদন করিতে হয় তাহাদের বিদেশ হইতে আমদানী করার চেষ্টা হইয়া থাকে এবং ইহার বিনিময়ে নিজের দেশ হইতে সেই দ্রব্যই রপ্তানী করা হয় যাহাদের উৎপাদন-ব্যয় কম, এবং দেশের পক্ষে এই নীতি যে লাভজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। (৩) ক্লাসিকাল তত্ত্ব ধরিয়া লইতেছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইবার দরুণ উপাদান-নিয়োগে পুনর্বিন্যাসের এবং কোন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাসের

সমালোচনা ও তাহার উত্তর

দরুণ ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয়ে কোনওরূপ পরিবর্তন হয় না। বাস্তব জীবনে কিন্তু ইহা সত্য নয়, উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতেও পারে বা কমিতেও পারে। কিন্তু তাহাতেও নীতি হিসাবে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতির ভুল প্রমাণিত হয় না। উভয় দ্রব্যেরই উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকিলে অবশ্য এমন এক সময় আসিবে যে ব্যয-পার্থক্য বিলুপ্ত হইবে, বাণিজ্যে লাভ না থাকায় উভয় দ্রব্যের আমদানী রপ্তানীই বন্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ, সেই সময়ে তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য না থাকায় বাণিজ্য চলিবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বহুদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য চলে, কাহারও উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে বা কাহারও কমে, উপাদানের পূর্ণনিয়োগ হইয়া গেলে উৎপাদন আর বাড়ান যায় না, উৎপাদন-ব্যয়েও বিশেষ পরিবর্তন আসে না, (সুতরাং এক দেশের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্য সর্বদাই চলিতে পারে এবং তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যই তাহার কারণ।) উৎপাদন-ব্যয়ে হ্রাস বৃদ্ধি ব্যয়-পার্থক্যের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণে পরিবর্তন আনে। (৪) বলা হয় যে ক্লাসিকাল তত্ত্ব পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব করে না, সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থাবিচ্যুত ধারণা। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে আলোচনার সুবিধার জন্যই পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব এই তত্ত্বের মধ্যে নাই। পরিবহন-ব্যয় ধরিয়া লইলে এই নীতিকে এইরূপে বলা যায় যে, দ্রব্যের পরিবহন-ব্যয় হইতে উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু অধিক হইলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব। অবশ্য পরিবহন-ব্যয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও উহা হইতে লাভের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, ইহা নিশ্চয়ই বলা চলে।

প্রতিদানের নিয়ম ও তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্যের নীতি

পরিবহন ব্যয় ও তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্যের নীতি

আন্তর্জাতিক মূল্যের তত্ত্ব: বাণিজ্য হার (Theory of International values: The terms of trade):

আন্তর্জাতিক মূল্যতত্ত্ব ও বাণিজ্যহার (Terms of trade) সম্পর্কীয় আলোচনা করেন জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল এবং তাঁহার এই আলোচনাকে ক্লাসিকাল তুলনামূলক ব্যয় তত্ত্বের উপসিদ্ধান্ত (Corollary) হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উভয় দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে তুলনামূলক পার্থক্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি।) যে দেশ যে দ্রব্য অন্য দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিবে, সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে সকল উপাদান নিয়োগ

করিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানী করিবে। নিজের দেশে অন্য দেশের তুলনায় যে দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বেশী তাহা সে আমদানী করিবে। রপ্তানী দ্রব্যের বিনিময়ে যে হারে সে আমদানী দ্রব্য পাইবে, অর্থাৎ রপ্তানী ও আমদানীর বিনিময়ের অনুপাতই হইল বাণিজ্য-হার। তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্যের মধ্যে যে কোন স্থানে এই বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইতে পারে। যেমন, 'ক' দেশে ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের অনুপাত হইল ১ ধান : ১ কাপড়, 'খ' দেশে উহাদের ব্যয়ের অনুপাত হইল ১ ধান : ১$\frac{১}{২}$ কাপড। ১ ইউনিট ধান রপ্তানী, করিয়া কি পরিমাণ কাপড আমদানী করা হইল (যেমন, ১$\frac{১}{১২}$, ১$\frac{১}{৮}$, ১$\frac{১}{৪}$, ১$\frac{১}{৩}$, ইত্যাদি), রপ্তানী ও আমদানীর এই অনুপাতকেই বাণিজ্য-হার বলা হয়। এই বাণিজ্য-হার হইতেই অন্য দেশের দ্রব্যের হিসাবে নিজের দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য বোঝা যায়।

বাণিজ্য হার কাহাকে বলে

দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য বা বাণিজ্য হার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর। 'ক'-এর দ্রব্যের জন্য 'খ'-এর চাহিদা যদি 'খ'-এর দ্রব্যের জন্য 'ক'-এর চাহিদা হইতে অধিক শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার খ-এর প্রতিকূলে যাইবে (রপ্তানীর বিনিময়ে 'খ' দেশ আমদানীর পরিমাণ কম পাইবে) এবং ক-এর অনুকূলে আসিবে (রপ্তানীর বিনিময়ে 'ক' দেশ আমদানীর পরিমাণ বেশী পাইবে)। আবার, 'ক'-এর দ্রব্যের জন্য 'খ'-এর চাহিদা যদি 'খ'-এর দ্রব্যের জন্য 'ক'-এর চাহিদা হইতে কম শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার 'খ'-এর অনুকূলে আসিবে এবং 'ক'-এর প্রতিকূলে যাইবে। অন্যের দ্রব্যের জন্য নিজের দেশে চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা এবং নিজের দ্রব্যের জন্য অন্য দেশে চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা—এই দুই বিষয়ের উপর বাণিজ্য-হার নির্ভর করে। বাণিজ্য-হার 'ক'-এর অনুকূলে আসিলে সে ১ ইউনিট ধানের বদলে, ধরা যাউক, ১$\frac{১}{৩}$ ইউনিট কাপড পাইবে; বাণিজ্য হার 'ক'-এর প্রতিকূলে আসিলে সে ১ ইউনিট ধানের বদলে, ধরা যাউক, ১$\frac{১}{২৪}$ ইউনিট কাপড পাইবে।

বাণিজাহার কিসের উপর নির্ভর করে

বাণিজ্য-হারকে নিম্নলিখিত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করা যায়:

$$\text{বাণিজ্য হার} = \frac{\text{আমদানীর মূল্য}}{\text{রপ্তানীর মূল্য}}$$

$$= \frac{\text{আমদানীর দাম} \times \text{আমদানীর পরিমাণ}}{\text{রপ্তানীর দাম} \times \text{রপ্তানীর পরিমাণ}}।$$

আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ সমান থাকিলে,

$$\text{বাণিজ্য হার} = \frac{\text{আমদানীর দাম}}{\text{রপ্তানীর দাম}}।$$

বাণিজ্যহারে পরিবর্তন পরিমাপ করিতে হইলে কোন এক বৎসরকে মূল-বৎসর (Base-year) ধরিয়া আমদানী ও রপ্তানীর সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে আন্তর্জাতিক মূল্য সম্পর্কীয় এই ক্লাসিকাল তত্ত্ব কেবলমাত্র প্রায় সমশক্তি সম্পন্ন দেশসমূহের পারস্পরিক বাণিজ্যহারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। বৃহৎ দেশ এবং ক্ষুদ্র দেশের মধ্যে বাণিজ্যহার পারস্পরিক চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, কারণ ক্ষুদ্র দেশের মোট উৎপাদন বৃহৎ দেশের চাহিদার অতি অল্প অংশ হইতে পারে, অথবা ক্ষুদ্র দেশের মোট চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই বৃহৎ দেশ উৎপাদন চালাইয়া যাইতে পারে।

সমালোচনা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ (The gains from Foreign Trade) :

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর সকল দেশ সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং সকল দেশই রপ্তানী দ্বারা অপর দেশ হইতে কম দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানী করে। নিজের দেশে উৎপাদন করিতে হইলে যে ব্যয় করিতে হইত এবং ফলে যে দাম দিতে হইত, তাহা অপেক্ষা অনেক কম দামে সে দ্রব্যসামগ্রী পাইতে পারে। সুতরাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে, **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ** যত বৃদ্ধি পাইবে, সকল দেশের মোট লাভ তত বাড়িবে। পরিবহন-ব্যয় বা বাণিজ্য-শুল্ক হ্রাসের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের পরিমাণও বাড়িবে। (মনে রাখা দরকার যে, জার্মানীর ঐতিহাসিক মতবাদ এই তত্ত্বের বিরোধিতা করিতেন। তাঁহাদের মতে, বর্তমানে অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি অপেক্ষা বর্তমানে বাণিজ্য শুল্কের দ্বারা দেশের উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি করান দেশের পক্ষে অধিকতর লাভজনক হইতে পারে)।

মোট লাভ নির্ভর করে: বাণিজ্যের মোট পরিমাণের উপর

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে প্রত্যেকটি দেশ স্বতন্ত্রভাবে কিরূপ লাভ করে, অর্থাৎ মোট লাভ কিরূপে বাণিজ্যকারী দেশসমূহের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়? কোন্ দেশ কি পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

প্রথমতঃ, ইহা নির্ভর করে। দুই দেশের দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয়ের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্যের পরিমাণের উপর। যদি দুইটি দেশের তুলনামূলক ব্যয়ের অনুপাতে অধিক পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে লাভের পরিমাণ বেশী হইবার সম্ভাবনা; উৎপাদন-ব্যয়সমূহের মধ্যে পার্থক্য যত বেশী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও তত অধিক। উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে এই পার্থক্য নির্ভর করে উভয় দেশে শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদন-ক্ষমতা ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর। আমাদের আমদানী

উৎপাদন-ব্যয়ে তুলনামূলক পার্থক্যের পরিমাণের উপর

দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত বিদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে আমাদের লাভ অধিক হইতে থাকিবে (কারণ আমরা একই পরিমাণ রপ্তানী করিয়া অধিক বিদেশী দ্রব্য আমদানী করিতে পারিব) ; আমাদের রপ্তানী দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত দেশীয় শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে বিদেশ অধিকতর লাভ করিতে পারিবে (কারণ বিদেশ হইতে একই আমদানীর বিনিময়ে আমরা অধিক দেশী দ্রব্য রপ্তানী করিব)।

দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ নির্ভর করে বাণিজ্য হারের উপর। যে হারে এক দেশ নিজের রপ্তানী দ্রব্যের পরিবর্তে বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্য পায়, তাহাকে বাণিজ্যহার বলা হয়। নিজের দেশের কম দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দেশের কত অধিক দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাই লাভের নির্ধারক।

বাণিজ্যহারের উপর

এই বাণিজ্যহার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার উপর। নিজের দ্রব্যের জন্য অপর দেশের চাহিদার তুলনায় অপর দেশের দ্রব্যের জন্য নিজের চাহিদা অধিকতর শক্তিশালী হইলে বাণিজ্যহার সেই দেশের প্রতিকূলে যাইবে এবং অপর দেশের অনুকূলে আসিবে। সুতরাং এই পারস্পারিক চাহিদা নির্ভর করে আমদানী ও রপ্তানীর পারস্পরিক সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার উপর। যে দেশের রপ্তানীর জন্য বৈদেশিক চাহিদা সঙ্কোচ প্রসাব বিহীন হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলেও চাহিদা বেশী কমিবে না, মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পাইবে), এবং ইহারই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী আমদানীর জন্য চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলে চাহিদা অধিক কমিয়া যাইবে, মোট রেভিনিউও কমিয়া যাইবে), সেই দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে বেশী লাভ করিতে পারিবে, কারণ বাণিজ্যহার তাহারই অনুকূলে আসিবে।

অর্থের হিসাবে বাণিজ্যহারকে অনেক সময় আমদানী দাম ও রপ্তানী দামের অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয় (Ratio of Import Prices and Export Prices)। রপ্তানী দামের তুলনায় যদি আমদানী দাম কমিয়া যায়, তবে বাণিজ্যহার অনুকূলে আসিবে, লাভও অধিক হইবে।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য দেশের তুলনায় একটি দেশের আয়তন যত ছোট হইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ তত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ,

দেশের আয়তনের উপর

বিদেশী দ্রব্যের জন্য তাহার চাহিদা খুবই কম এবং ফলে বিদেশী দ্রব্যের দামও তাহার চাহিদার দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয় না। কিন্তু তাহার রপ্তানীর জন্য বিদেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের চাহিদার পরিমাণ বেশী এবং, ফলে, সে অধিক দামে দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা পাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে **লাভের পরিমাণ পরিমাপ** করার উদ্দেশ্যে মার্শাল **ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের** সাহায্য লইয়াছেন। তাঁহার মতে দেশের ক্রেতাগণ কোন দ্রব্যের জন্য যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত আছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুণ বিদেশ হইতে তাহা অপেক্ষা কম দামে তাঁহারা জিনিষটি পাইবেন ; চাহিদাদর ও বাজার-দরের এই পার্থক্যই ভোগোদ্বৃত্তরূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে একটি দেশের লাভের পরিমাপ।

লাভের পরিমাপ :
(১) ভোগোদ্বৃত্তের দ্বারা

টাউসিগ বলিয়াছেন যে একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পায় **দেশের মধ্যে বর্ধিত মজুরীর হারের স্তরের ও আয়স্তরের মাধ্যমে** এবং ইহাদের দ্বারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করা যায়। যে দেশ অধিক পরিমাণে রপ্তানী করিতেছে, সেই দেশের রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে মজুরের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইবে। রপ্তানী শিল্পে বর্ধিত মজুরীর হার (প্রতিযোগিতার দরুণ) দেশের অন্যান্য শিল্পে মজুরী হার বাড়াইয়া দিবে, দেশের সাধারণ আয়স্তরও বৃদ্ধি পাইবে।

(২) মজুরী ও আয়-স্তরের দ্বারা

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ **গুণক তত্ত্বের** (Concept of Multiplier) সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করেন। রপ্তানী বৃদ্ধির ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলের ন্যায়, ইহার ফলে দেশে নূতন আয় সৃষ্টি হয়, ভোগ্যদ্রব্যের ও মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দেশে আরও বেশী পরিমাণ কর্মসংস্থান, নূতন আয়, নূতন বিনিয়োগের ধারা প্রসারিত হইতে থাকে। কিন্তু নূতন আয় সৃষ্টি বা আয়স্তরে বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক আমদানী-প্রবণতা (Marginal propensity to Import) বাড়িয়া যায়, আমদানীর পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। এই আমদানীর পরিমাণে বৃদ্ধি অপর দেশের আয়স্তরে বৃদ্ধি ঘটাইলে তাহাদের আমদানী বাড়িতে পারে এবং ফলে প্রথম দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি হইতে পারে। আমদানী-প্রবণতার বৃদ্ধি ছিদ্ররূপে (leakage) কাজ করে এবং গুণকের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, দেশের আয়স্তর ও কর্মসংস্থানে সম্পূর্ণ প্রসার ঘটিতে দেয় না। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, জাতীয় আয়ের উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাবের ফলে লাভ বা ক্ষতি, এই ভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের সাহায্যে (Foreign Trade Multiplier) পরিমাপ করা যাইতে পারে।

(৩) বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের দ্বারা

বৈদেশিক বিনিময় কাহাকে বলে (What is Foreign Exchange) :

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ সমস্যা হইল এক দেশের অর্থ-কে অপর দেশের অর্থে রূপান্তরণ (Conversion)। পৃথিবীর সকল দেশে এক প্রকার অর্থ নাই, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার অর্থ চালু, সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উদ্ভূত দেনা পাওনা মিটাইতে হইলে ক্রেতার অর্থকে বিক্রেতার অর্থে রূপান্তরিত করিতে হয়। এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থে রূপান্তরণের পদ্ধতি, রীতিনীতি ও কার্যাবলীকে বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) বলা হয়।

বৈদেশিক বিনিময় কাহাকে বলে

কিরূপে অর্থের এই রূপান্তরণ ঘটে? মনে করা যাউক যে ভারতের মিঃ সেন, ইংলণ্ডের মিঃ টমের নিকট ৫০০০৲ টাকা মূল্যের চা বিক্রয় করিয়াছে (বা রপ্তানী করিয়াছে)। মিঃ টম ক্রেতা, সুতরাং বিক্রেতাকে এই মূল্য বা ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে পাউণ্ডকে টাকায় রূপান্তরিত করিতে হইবে।

মিঃ সেন চা রপ্তানীর সময় একখানা হুণ্ডি বা বিনিময়-বিল তৈরী করিয়া মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়াছিলেন; ধরা যাউক, মিঃ টম্ ৯০ দিন পরে পাউণ্ড দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া ওই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ৯০ দিন শেষ হইবার পূর্বে বা পরে মিঃ সেন ভারতে অবস্থিত কোন বিনিময়-ব্যাঙ্কের (Exchange Bank) নিকট উপস্থিত হইয়া ওই বিল ভাঙাইয়া টাকা পাইয়া গেলেন, প্রাপ্তি-সময়ের পূর্বে ভাঙান হইল বলিয়া ব্যাঙ্ক বাট্টা লইল। বিনিময়-ব্যাঙ্কের ইংলণ্ডে যে অফিস আছে, বিল বা হুণ্ডি সেখানে চলিয়া গেল, প্রতিশ্রুত ৯০ দিন উত্তীর্ণ হইলে মিঃ টমের নিকট উহা উপস্থাপিত হইল এবং ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কটি তাঁহার নিকট হইতে পাউণ্ড পাইয়া গেল। আমদানী হইলেও এইরূপে মূল্য পরিশোধ করা চলে।

কিরূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মূল্য প্রদান করা হয়: বিনিময়-বিল ও ব্যাঙ্কের ড্রাফ্‌ট

আধুনিক কালে মূল্য পরিশোধের জন্য বা অর্থের রূপান্তরনের জন্য সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের ড্রাফ্‌ট ব্যবহৃত হয়। যেমন, মিঃ সেন মিঃ টমের নিকট হইতে ৫০০ পাউণ্ড মূল্যের যন্ত্র আমদানী করিয়াছেন। তিনি বিনিময়-ব্যাঙ্কে গিয়া টাকার বদলে পাউণ্ড কিনিতে চাহিলেন। ব্যাঙ্ক তাঁহাকে বিনিময়-হার জানাইয়া দিল অর্থাৎ সে ১ টাকায় কি পরিমাণ ব্রিটিশ অর্থ বিক্রয় করিতে রাজী আছে, তাহা জানাইল। সেই হারে ৫০০ পাউণ্ড ক্রয় করিতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তাহা জমা দিয়া মিঃ সেন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৫০০ পাউণ্ডের একখানি ব্যাঙ্কের ড্রাফ্‌ট পাইলেন, তিনি উহা

মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ টম্ ড্রাফ্‌ট্ প্রদানকারী ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখা বা অফিস হইতে পাউণ্ড পাইয়া গেলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে ভারতবর্ষ রপ্তানী করিলে টাকায় উহার মূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিদেশে বিদেশী অর্থ বিনিময়-ব্যাঙ্কে জমা পড়ে এবং বিদেশের ব্যবসায়ীগণ টাকা ক্রয় করিতে চাহে; বৈদেশিক বাজারে টাকার চাহিদা সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষ আমদানী করিলে উহার মূল্য পরিশোধের জন্য বিনিময়-ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমরা বিদেশী অর্থ ক্রয় করিতে চাহি; বৈদেশিক বাজারে টাকার যোগান হয়, এবং বিদেশী অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হয়।

বাণিজ্য ব্যালান্স ও লেনদেন ব্যালান্স (Balance of trade and Balance of Payments):

কোন দেশ হইতে দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানী হইলে তাহার জন্য মূল্য পাওয়া যায় এবং বিদেশ হইতে দ্রব্য সামগ্রী আমদানী করিতে হইলে তাহার জন্য মূল্য দিতে হয়। রপ্তানী দ্রব্যাদির মূল্য ও আমদানী দ্রব্যাদির মূল্যের একত্রে হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালান্স (Balance of trade) বলা হয়। বাণিজ্য ব্যালান্সে সমতা অর্থাৎ আমদানী ও রপ্তানীর মূল্যের সমতা থাকিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশের আমদানীর মূল্য রপ্তানীর মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল (Unfavourable); এবং রপ্তানীর মূল্য আমদানীর মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল (Favourable)।

বাণিজ্য ব্যালান্স

কিন্তু দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয় ছাড়াও অন্যান্য বহু বিষয়ের জন্য বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় বা বিদেশ হইতে অর্থ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্রব্যসামগ্রী ছাড়াও বহু বিষয়ে বিদেশের সহিত লেনদেন করিতে হয়; কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশের সহিত পৃথিবীর সকল দেশের যে লেনদেন হয়, তাহার হিসাবকে সেই দেশের লেনদেন ব্যালান্স (Balance of Payments) বলা হয়।

লেনদেন ব্যালান্স

যে বিষয়সমূহ লইয়া দেশের লেনদেন ব্যালান্স গঠিত হয় তাহাদের নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়:

I চলতি ব্যালান্স (Current Balance):

(ক) দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন, আমদানী ও রপ্তানীর দ্রব্যাদি বা "দৃশ্য" (Visible) বিষয়সমূহ। **(খ)** "অদৃশ্য" (Invisible) বিষয়সমূহ, যেমন জাহাজের ভাড়া বা

পরিবহন ব্যয়, ব্যাঙ্ক বা বীমার ব্যয়, ভ্রমণকারীদের ব্যয়, বিদেশী কোম্পানীদের মুনাফা, সরকারী অর্থ প্রেরণ প্রভৃতি।

II পুঁজির ব্যালান্স (Capital Balance) :

দেশ হইতে বিদেশে পুঁজির রপ্তানী বা বিদেশ হইতে দেশে পুঁজির আমদানী অথবা স্বর্ণের আগমন ও বহির্গমন।

পুঁজির হিসাবকে (Capital Account) দুইভাগে বিভক্ত করা যায় : (ক) দীর্ঘকালীন পুঁজির হিসাব (খ) স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাব। স্থায়ী বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশ হইতে যে মূলধন বিদেশে চলিয়া যায় বা বিদেশ হইতে দেশে আসে তাহাদের এই খাতে হিসাব করা হয়। ইহাকে বলা যায় লেনদেন ব্যালান্সের বিনিয়োগ-ক্ষেত্র (Investment sector), দীর্ঘকালের জন্য দেশীয় মূলধনের বিদেশে বিনিয়োগ বা দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মূলধনের বিনিযোগ এই খাতে হিসাবের জন্য ধরা হয়। স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাবে প্রথমেই ধরা হয় স্বর্ণের আগমন বা বহির্গমনের পরিমাণকে। ইহা ছাড়া বিদেশে ব্যাঙ্কে বা ব্যবসায়ীদের নিকট দেশীয় ব্যবসায়ীদের জমা বা পাওনাসমূহকে এবং দেশে ব্যাঙ্কে বা দেশীয় ব্যবসায়ীদের নিকট বিদেশী ব্যবসায়ীদের জমা বা পাওনাসমূহকে এই স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাবে ধরা হয়।

লেনদেন ব্যালান্সে সমতা ও ভারসাম্য (Equality and Equilibrium in the Balance of Payments) :

হিসাব-পদ্ধতি (accounting procedure) অনুযায়ী কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সের দেনা ও পাওনার দিক সবদা সমান থাকিবে। (নিছক হিসাবের ক্ষেত্রে দেনা পাওনার উভয় দিক নিশ্চয়ই সমান থাকে।) দেশ হইতে প্রেরিত সকল অর্থ ইহার দেনা (debit)। যদি কোন দেশ অন্য দেশের তুলনায় অধিক দ্রব্য, শেয়ার ইত্যাদি বিক্রয় করে বা মাল বহন প্রভৃতি কার্যাদির দ্বারা অধিক আয় করে তাহা হইলে এই সকল মিলিয়া তাহার পাওনার দিক (credit) গঠিত হইল, ইহা সে অন্যের নিকট হইতে পাইবে। যদি এই মূল্যের স্বর্ণ বিদেশীরা দেশের মধ্যে পাঠাইয়া দেয়, তবে সেই লেনদেন দেনার দিকে (debit side) লিখিয়া রাখা হইল (কারণ বিদেশ হইতে উহা পাওয়া যাইতেছে)। যদি স্বর্ণ পাঠাইয়া না দেয়, তাহা হইলে বিদেশে ব্যাঙ্ক বা ব্যবসায়ীদের নিকট স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন পুঁজি হিসাবে ইহা রক্ষিত আছে, সেইভাবেই হিসাব লিখিয়া রাখা হইল ; যেন অন্যকে ঋণ হিসাবে ইহা দেওয়া হইয়াছে। দেশের বৈদেশিক ঋণদানের পরিমাণ (foreign lending) বৃদ্ধি পাইয়াছে, লেনদেন ব্যালান্সে ইহাই ধরা হইবে। সুতরাং, লেনদেন ব্যালান্সের দেনা পাওনার উভয়দিক সর্বদা সমান-ই থাকিবে, ইহাকে একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ বলা চলে।

লেনদেন ব্যালান্সের দেনা পাওনার উভয়-দিকই সর্বদা সমান

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে রপ্তানীর দ্বারাই আমদানীর মূল্য পরিশোধ করা হয় (Exports Pay for Imports)। কারণ আমদানী হইলে তাহার মূল্য পরিশোধের জন্য হয় দ্রব্য রপ্তানী অথবা মূলধন রপ্তানী করিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। (দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি আমদানী করিলে তাহার মূল্য দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর বা পুঁজির রপ্তানী করিয়াই মিটান হয়।) লেনদেন ব্যালান্সে উভয় দিকের সমতা হইতেই ইহা বোঝা যায়।

রপ্তানীর দ্বারাই আমদানীর মূল্য পরিশোধ

লেনদেন ব্যালান্সের উভয়দিকে এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ সমতা নিছক যান্ত্রিক সমতামাত্র (mechanical equality); ইহাকে লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য (equilibrium) বলা উচিত নয়। ভারসাম্য বলিলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আছে বা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় আছে এরূপ বোঝা যায়। (কিন্তু লেনদেন ব্যালান্সে নিছক হিসাবের সমতা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য অথবা দেশীয় আর্থিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলে না, দেশের ঘোর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও লেনদেন ব্যালান্সে তথাকথিত সমতা থাকিবেই।) দীর্ঘকালের হিসাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের জন্য চাহিদা ও যোগান সমান আছে, প্রভূত পরিমাণ মূলধন দেশ হইতে রপ্তানী হয় না বা দেশে আমদানী হয় না, দেশীয় অর্থের বৈদেশিক মূল্য বা বৈদেশিক বিনিময়-হার (Rate of Foreign Exchange) মোটামুটি স্থায়ী ও বিশেষ উঠানামা হয় না— এইরূপ অবস্থাকেই লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য (Equilibrium in the Balance of Payments) বলা হইয়া থাকে। যদি এইরূপ অবস্থা না থাকে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবৎ দেশ হইতে পুঁজি বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে বা বাহির হইতে দেশে আসিতে থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্যহারে ঘন ঘন এবং প্রচুর পরিমাণে উঠানামা (fluctuations) ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে বলা হয় যে লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যবিহীনতা (Disequilibrium) সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সমতা ও ভারসাম্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।*

সমতা ও ভারসাম্যে পার্থক্য: লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য এবং ভারসাম্য বিহীনতা কাহাকে বলে

*কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য বিহীনতা আসিতে পারে যদি (ক) দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ অথবা (খ) স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পুঁজির আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ পরিবর্তিত হয় যদি (১) চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতায়

ভারসাম্য সাধনের পদ্ধতি (Theories of Balancing Process) :

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য-বিহীনতা আসিলে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে লেনদেন ব্যালান্সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় ভারসাম্য ফিরিয়া আসে। এই স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্য সাধনের পদ্ধতি (self-equilibrating mechanism) সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রচলিত আছে।

ক্লাসিকাল তত্ত্ব : স্বর্ণের গতিবিধি ও দামস্তরে পরিবর্তনের দ্বারা

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণের অভিমতে আর্থিক পদ্ধতির মাধ্যমেই লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যদি একদেশের রপ্তানীর মূল্য উহার আমদানীর মূল্য হইতে অধিক হয়, তবে সেই দেশ অপর দেশ হইতে স্বর্ণ পাইবে এবং যাহার লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূলে সে স্বর্ণ পাঠাইয়া দিবে। অনুকূল লেনদেন ব্যালান্স থাকার দরুণ স্বর্ণ দেশে প্রবেশ করিবে, ফলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, দামস্তরও বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে, প্রতিকূল লেনদেন ব্যালান্সের দরুণ অপর দেশটি হইতে স্বর্ণ চলিয়া আসিবে এবং ফলে উহার অর্থের পরিমাণ কমিযা যাইবে, দামস্তরও কমিয়া আসিবে। কালক্রমে, যে দেশের দামস্তর বৃদ্ধি হইযাছে তাহার রপ্তানী কমিবে এবং অপর দেশের দামস্তব কমিয়া যাওয়ায় সেই দেশ হইতেই আমদানী বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে আমদানী ও রপ্তানীর মূল্যে সমতা সাধিত হইবে। যে দেশের দামস্তর কমিযা গিয়াছে সেই দেশ অধিক রপ্তানী করিতে পারিবে এবং বিদেশী দামস্তর অধিক থাকায় উহার আমদানী কমিয়া যাইবে ; আমদানী ও রপ্তানীর মূল্যে সমতা সাধন হইবে, লেনদেন ব্যালান্সের প্রতিকূলতা থাকিবে না। এইরূপে দুই দেশের লেনদেন ব্যালান্সই পুনরায় ভার-সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। স্বর্ণ যাতায়াতের ফলে দামস্তরে উত্থান পতনের মাধ্যমে লেনদেন ব্যালান্সে সমতা সাধনের এই ক্লাসিকাল তত্ত্বের নাম হইল 'স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্ডীয় তত্ত্ব' (Ricardian theory of gold Movements)।

আধুনিক কালে ভারসাম্য-বিধানের এই ক্লাসিকাল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সম্বন্ধে

পরিবর্তন ঘটে, (২) যোগানের সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতায় পরিবর্তন ঘটে, (৩) দ্রব্য সামগ্রীর সংখ্যাতে ও উৎকর্ষে পরিবর্তন ঘটে, (৪) দেশের বা বিদেশের উৎপাদন ক্ষমতা বিধ্বস্ত বা ভিন্নরূপ হইয়া যায় (যেমন যুদ্ধের ফলে), (৫) জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে (যাহাতে দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়ে বা কমে), (৬) ঋণ গ্রহণ, ঋণদান, ক্ষতিপূরণ দান বা গ্রহণ করা হয় এবং (৭) বিনিময় হারে পরিবর্তনের দরুন আমদানী রপ্তানীর দামে পরিবর্তন হইয়া উহাদের চাহিদায় পরিবর্তন ঘটে। পুঁজির আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ পরিবর্তিত হয় যদি (১) নূতন বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে, (২) ঋণ পরিশোধ বা সুদ প্রদান সুরু হয়, এবং (৩) মুনাফা বা নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ফাট্‌কাদারী লেনদেনের পরিমাণে পরিবর্তন হয়।

সমালোচনা করা হইয়াছে। এই তত্ত্ব অর্থ-মূল্যসম্পর্কীয় পরিমাণতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ ইহা ধরিয়া লয় যে স্বর্ণের পরিমাণের পরিবর্তন দেশে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনিবেই, এবং, অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আসিলে দামস্তরও পরিবর্তিত হইবে (অর্থাৎ সমাজে পূর্ণকর্মনিয়োগ স্তর ধরিয়া লওয়া হইতেছে)। কিন্তু পৃথিবীতে স্বর্ণমান প্রচলিত নাই, আর অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলেই দেশের দামস্তর পরিবর্তিত হয় না, কারণ সাধারণতঃ দেশগুলিতে অপূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধিতে সুদের হার কমিয়া বিনিয়োগ, কর্মনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়িতে পারে; প্রথমেই দামস্তরে বৃদ্ধি হয় না।

ক্লাসিকাল তত্ত্বের সমালোচনা

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে স্বর্ণের যাতায়াত এবং দামস্তরের পরিবর্তন ছাড়াও লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে। মনে করা যাউক যে 'ক' দেশের লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হইয়াছে এবং 'খ' দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল অবস্থায়। 'ক' দেশ হইতে অধিক রপ্তানী হওয়ার ফলে সেই দেশে রপ্তানী দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কর্মসংস্থান ও আয়স্তরও বর্ধিত হইয়াছে। অপরদিকে 'খ' দেশে অধিক পরিমাণ আমদানী হওয়ায় এবং কম রপ্তানী হওয়ায় আভ্যন্তরীন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমিয়া গিয়াছে। আয়স্তর বৃদ্ধি হওয়ায় এইরূপ অবস্থায় আমদানী-প্রবণতায় বৃদ্ধি দরুণ (Propensity to Import) 'ক' দেশে আমদানীর পরিমাণ বাড়িবে; অপরপক্ষে 'খ' দেশে আয়স্তর কমিয়া যাওয়ায় বিদেশ হইতে আমদানী কমিবে। এইরূপে উভয় দেশে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণে পরিবর্তন হইয়া উভয়ের সমতাসাধন হইবে, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

আধুনিক তত্ত্ব: আয়স্তরে ও কর্মসংস্থান স্তরে পরিবর্তনের দ্বারা

ক্লাসিকাল তত্ত্ব ও আধুনিক তত্ত্বের মিল হইল এই ক্ষেত্রে যে উভয়েই বলিতেছেন ভারসাম্যাবস্থায় ফিরিয়া আসিবার জন্য স্বয়ংক্রিয় ধরণের পদ্ধতি আছে। কিন্তু মিল অপেক্ষা ইহাদের পার্থক্যই গভীর। ক্লাসিকাল মতে দামস্তরে পরিবর্তনের দ্বারা সমতা-সাধন হয়, কিন্তু আধুনিক মতে আয়-স্তরে পরিবর্তনের মাধ্যমেই ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার ঘটে।

দুই তত্ত্বের মিল ও পার্থক্য

মনে রাখা দরকার যে, ফাট্‌কাদারী মূলধনের আমদানী বা রপ্তানীর ফলে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটিলে এই পদ্ধতিতে ভারসাম্যে পুনরাগমন করা চলে না, কারণ ফাট্‌কাদারী পুঁজির লেনদেন উভয় দেশের আয়স্তরকে পরিবর্তিত করিয়া আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে আয়-স্তরের পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণভাবে লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য ফিরিয়া না-ও আসিতে পারে। এরূপ ঘটিতে পারে যে আয়স্তরের পরিবর্তনের পরিমাণ এত বেশী হইল না যাহাতে আমদানী ও রপ্তানীর মূল্যে পুনরায় সমতা ফিরিয়া আসিল। এরূপ অবস্থায় যদি ভারসাম্য-বিহীনতা (ধরা যাউক, প্রতিকূলতা) চলিতেই থাকে তাহা হইলে এইরূপ প্রতিকূলতা দূর করিয়া সাম্যাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে :

স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি বিফল হইলে কি করা হয়

(ক) **রপ্তানী বৃদ্ধি :** উন্নত ধরণের বিক্রয় ব্যবস্থার সাহায্যে বা আভ্যন্তরীন ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

(খ) **আমদানী হ্রাস :** প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (direct controls) দ্বারা আমদানীর পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করা।

(গ) **অর্থের বহির্মূল্য হ্রাস :** সরকারীভাবে বিদেশী অর্থের হিসাবে দেশীয় অর্থের বিনিময় মূল্য কমাইয়া দেওয়া। ইহার ফলে দেশীয় দ্রব্যাদি বিদেশের বাজারে সস্তা হইবে এবং বিদেশী দ্রব্যের দাম দেশের বাজারে বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাস একই সঙ্গে ঘটিবে, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে।

বৈদেশিক বিনিময়-হার কিরূপে নিরূপিত হয় (How the Rate of Foreign Exchange is Determined) ?

দুই দেশের অর্থ যে হারে পরস্পরের সহিত বিনিময় হয়, তাহাকে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময় হার (Rate of Foreign Exchange) বলা হয়। কোন দেশের অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ অপর দেশের অর্থ পাওয়া যায়, অর্থাৎ অপর দেশের অর্থের হিসাবে নিজের দেশের অর্থের মূল্য—ইহাই বৈদেশিক বিনিময়-হার। ইহাকে অর্থের বহির্মূল্যও (External Value) বলা চলে।*

বৈদেশিক বিনিময়হার কাহাকে বলে

কোন দেশের অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার কোন নির্দিষ্ট ও স্থির অনুপাত নহে, প্রায় সর্বদাই ইহার উঠানামা ঘটে। যেভাবে এবং যে শক্তিসমূহের দ্বারা বৈদেশিক বিনিময়-হার নিরূপিত হয় তাহাদের দুইটি পৃথক অবস্থা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন : (১) যখন উভয় দেশের মধ্যেই স্বর্ণমান প্রচলিত আছে এবং,

* যেমন, ভারতের অর্থ ১ টাকার বিনিময়ে ব্রিটেনের অর্থ ১ শিঃ ৬ পেঃ পাওয়া যায়।

(২) যখন উভয় বা অন্ততঃ একটি দেশে অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ (Inconvertible Paper Currency) প্রচলিত।

(১) স্বর্ণমান প্রচলিত থাকাকালীন বিনিময়-হার নিরূপন

যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে তাহা হইলে দেশে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকিতে পারে অথবা দেশীয় অর্থের সহিত স্বর্ণের বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত থাকে। এইরূপ অবস্থায়, উভয় দেশের অর্থের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় নিজ নিজ অর্থের সহিত স্বর্ণের পরিমাণগত সম্পর্কের দ্বারা।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায়

ধরা যাক্ 'ক' দেশের ১টি মুদ্রার মধ্যে যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে সেই সমপরিমাণ স্বর্ণ 'খ' দেশের তিনটি মুদ্রার মধ্যে রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় স্বর্ণের হিসাবে ১টি 'ক' মুদ্রা ৩টি 'খ' মুদ্রার সমান মূল্যের ; সুতরাং ১টি 'ক' মুদ্রার বিনিময়ে ৩টি 'খ' মুদ্রা পাওয়া যাইবে (১ক = ৩খ) ; ইহাই পরস্পরের বিনিময়-হার। ইহাকে বলা হয় মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহার (Mint Par of Exchange)। স্বাভাবিক অবস্থায়, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য বজায় থাকিলে, উভয় দেশের মধ্যে এই হারই নির্ধারিত থাকিবে এবং এই হারেই আমদানী ও রপ্তানী হইবে। কিন্তু লেনদেন ব্যালান্সে ভারসমতা নষ্ট হইলে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হারেও উঠানামা (Fluctuations) হইবে ; তবে এই উঠানামার নির্দিষ্ট সীমা থাকে, সেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ভারসাম্য-বিচ্যুতির পরিমাণ অনুযায়ী বিনিময়-হার নির্ধারিত থাকিবে। বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার সীমা (Limit) বা পরিধি নির্ভর করে এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার ব্যয়ের উপর।

বৈদেশিক লেনদেন খাতে কোন দেশের আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশী হইলে বিনিময়হার তাহার অনুকূলে যাইবে, রপ্তানীর তুলনায় আমদানী অধিক হইতে থাকিলে বিনিময়হার তাহার প্রতিকূলে যাইবে। প্রথমক্ষেত্রে যদি লেনদেন ব্যালান্স 'ক'এর অনুকূলে হয় তাহা হইলে 'ক'এর ১ মুদ্রা খ দেশের ৩ মুদ্রা + স্বর্ণ প্রেরণের ব্যয়ের সমান হইবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, লেনদেন ব্যালান্স 'ক'এর প্রতিকূল হইলে বিনিময়হারও তাহার প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ ১ 'ক' মুদ্রা = ৩ 'খ' মুদ্রা—স্বর্ণ প্রেরণের ব্যয়। বিনিময়হারের উঠানামা এই দুই হারকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে, 'খ'এর ব্যবসায়ীরা উহা হইতে অধিক মূল্য দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে 'ক' মুদ্রা কিনিবে না, ব্যাঙ্ক উহা অপেক্ষা অধিক দাম

বিনিময় হারে বিচ্যুতির সীমা : উচ্চ ও নিম্ন স্বর্ণবিন্দু

চাহিলে স্বর্ণ ক্রয় করিয়া 'ক'এর ব্যবসায়ীদের নিকট পাঠাইয়া দিবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, 'ক'এর ব্যবসায়ীরা ওই দামেই 'খ' মুদ্রা কিনিতে বাধ্য হইবে, স্বর্ণ ক্রয় করা ও প্রেরণ করার ব্যয় তাহাদের বহন করিতেই হইবে। বিনিময় হারের উঠানামার এই দুই সীমাকে উচ্চ স্বর্ণবিন্দু (Upper gold point) এবং নিম্ন স্বর্ণবিন্দু (Lower gold point) বলে।

(২) অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ থাকাকালীন বিনিময়হার নির্ধারণ

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ধাতুবিন্দুগুলির (Specie points) দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে বিনিময়হার উঠানামা করিতে পারে না ; কিন্তু যখন অরূপান্তরনীয় কাগজী-অর্থ চালু থাকে তখন বৈদেশিক বিনিময়হারের উঠানামার কোন সীমা পরিসীমা নাই, ইহার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। সেইরূপ অবস্থায় কি ভাবে বিনিময়হার নির্ধারিত হয়, তাহার সম্বন্ধে দুইটি প্রচলিত তত্ত্ব আছে : (ক) ক্রয়শক্তির সমতা তত্ত্ব (Purchasing power parity Theory), এবং (খ) আধুনিক কালের চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply Theory)।

অরূপান্তরীয় কাগজী অর্থ ব্যবস্থায়

(ক) ক্রয় শক্তির সমতা তত্ত্ব : সুইডেনের ধনবিজ্ঞানী গুস্তাভ ক্যাসেল কর্তৃক বৈদেশিক বিনিময়হার নির্ধারণ সম্পর্কে ক্রয়শক্তির সমতাতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সাধারণ অবস্থায় উভয় দেশের অর্থের বিনিময়-হার নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে অর্থের ক্রয়শক্তি সমূহের সম্পর্ককে প্রকাশ করে। নিজের দেশে অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি এবং অন্য দেশে অপর অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি—এই উভয় দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির সমতার বিন্দুতেই ইহাদের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়। যেমন, ইংলণ্ডে কিছু পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী যদি ১ পাউণ্ডে পাওয়া যায় এবং সেই একই ধরণের সমপরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রীর (Similar assortment) যদি ভারতের অর্থে ১৫ টাকা দাম হয় তাহা হইলে ১ পাউণ্ডের ক্রয় ক্ষমতা এবং ১৫ টাকার ক্রয় ক্ষমতা সমান। সুতরাং বিনিময়-হার হইবে ১ পাউণ্ড=১৫ টাকা।

দুই দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ মূল্যের সমতা

নিজ দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির পরিবর্তন ঘটিলে বৈদেশিক বিনিময় হারেরও পরিবর্তন ঘটিবে ; আভ্যন্তরীণ মূল্য কমিলে বহির্মূল্যও কমিবে, আভ্যন্তরীণ মূল্য বাড়িলে বহির্মূল্যও বাড়িবে। সুতরাং ক্রয়শক্তির সমতার বিন্দু স্থিরবিন্দু নহে, ইহা চলনশীল বা পরিবর্তন-শীল বিন্দু, দেশের অভ্যন্তরে দামস্তরের পরিবর্তন অনুযায়ী ইহা পরিবর্তিত হয়। ভারসাম্যের বিনিময়-হারকে উভয় দেশের দামস্তরে পরিবর্তনের হার দিয়া গুণ করিলে এই পরিবর্তিত বিনিময়-হার পাওয়া যায়।

বিনিময়হারে উঠানামা ও তাহার কারণ

উদাহরণ স্বরূপ, ভারত ও ইংলণ্ডের অর্থের মধ্যে ১ পাঃ=১৫ টাকা বিনিময়-হার স্থির ছিল। কিছুদিন পরে উভয় দেশেই দামস্তরে পরিবর্তন হইল, সূচক-সংখ্যা অনুযায়ী ইংলণ্ডের দামস্তর হইল ৩০০ এবং ভারতের দামস্তর হইল ২০০। এরূপ অবস্থায় নূতন বিনিময় হার হইবে ১ পাঃ=টাকা $\frac{১৫ \times ২০০}{৩০০}$ =১০, অর্থাৎ ১ পাঃ=১০ টাকা। ইংলণ্ডের দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় পাউণ্ডের বহির্মূল্যও কমিয়া গিয়াছে : পাউণ্ডের বিনিময়ে পূর্বের তুলনায় কম ভারতীয় টাকা পাওয়া যাইতেছে।

ক্যাসেল বর্ণিত এই ক্রয় শক্তির সমতাতত্ত্ব আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন কারণের জন্য গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। (ক) যে সূচক-সংখ্যার সাহায্যে দেশীয় অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয় শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় করা হয় সেই সূচক-সংখ্যার নির্মানকালে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এইরূপ সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রী যদি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে এই তত্ত্ব নির্ভুল থাকিতে পারে না ; কারণ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দ্রব্য সামগ্রীর দামে পরিবর্তন লেনদেন ব্যালান্সে প্রভাব বিস্তার করে না, বিদেশী বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদাকেও প্রভাবিত করে না। আর, শুধু যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এইরূপ দ্রব্যের সাহায্যে সূচক-সংখ্যা গঠিত হয়, তবে এই তত্ত্ব নিছক স্বতঃসিদ্ধ, কারণ ইহাদের দামস্তর সকল দেশে স্বভাবতঃই সমান। (খ) মূলধনের আগমন বা নির্গমনের ফলে বৈদেশিক বিনিময়-হারের পরিবর্তন এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। (গ) বিদেশে রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে বা কমিলে, অথবা দেশে আমদানী দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে বা কমিলে (দেশে ও বিদেশে উৎপাদন-ব্যয়ে পরিবর্তন হইলে) আভ্যন্তরীণ দামস্তরে পরিবর্তন না হইয়াও বিনিময় হারে পরিবর্তন আসিতে পারে।

সমালোচনা

অবশ্য দীর্ঘকালে বিভিন্ন দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি বিনিময়-হারকে প্রভাবিত করে বা দেশের লেনদেন ব্যালান্সের উপর অর্থের ক্রয়-শক্তিরও প্রভাব আছে, এই তত্ত্বের সাহায্যে এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু বিনিময়-হার নির্ধারণের তত্ত্ব হিসাবে আধুনিক কালে ইহাকে গ্রহণ করা হয় না।

এই তত্ত্বের আংশিক সত্যতা

(খ) আধুনিক তত্ত্ব: কি ভাবে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়:

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ বিনিময়-হারকে দাম বলিয়া মনে করেন, বৈদেশিক অর্থের হিসাবে প্রকাশিত নিজ দেশের অর্থের দাম। সকল দ্রব্য সামগ্রীর দাম যেরূপ উহার যোগান ও চাহিদার দ্বারা ভারসাম্যের বিন্দুতে নিরূপিত হয়, সেইরূপ অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার থাকিলে অর্থের বহির্মূল্যও বৈদেশিক বাজারে উহার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা

বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের চাহিদা নির্ভর করে রপ্তানীর মূল্যের উপর এবং বিদেশীরা বিভিন্ন কারণে কি পরিমাণ অর্থ সেই দেশে পাঠাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন ব্যালান্সের পাওনার দিকের উপর)। বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের যোগান নির্ভর করে আমদানীর মূল্যের উপর এবং দেশ হইতে কি পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন ব্যালান্সের দেনার দিকের উপর)।

বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগান কোথা হইতে উদ্ভূত হয়

বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হয়, তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থ চাহিতে থাকিবে, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থের দাম বাড়াইয়া দিবে, অধিক বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় অর্থ ক্রয় করিতে হইবে, বৈদেশিক বাজারে বিনিময়-হার দেশের অনুকূলে আসিবে। অপরপক্ষে, বৈদেশিক বাজারে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থের চাহিদা করিবে না, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থের দাম কমাইয়া দিবে, কম বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় অর্থ ক্রয় করিবে, বৈদেশিক বিনিময়-হারও দেশের প্রতিকূলে যাইবে।

চাহিদা বা যোগানে পরিবর্তন বিনিময়-হারকে পরিবর্তিত করে

সুতরাং লেনদেন ব্যালান্সের উঠানামার উপরই বিনিময়ের হারের উঠানামা নির্ভর করে; লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য থাকিলে বিনিময়-হারেও ভারসাম্য থাকে, অর্থাৎ লেনদেন ব্যালান্সের উপরই বিনিময়-হার নির্ভর করে।. লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী বিষয়সমূহ বিনিময়-হার নির্ধারণ করে। লেনদেন ব্যালান্স গঠিত হয় (ক) আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ এবং (খ) মূলধনের গমনাগমন বা বিদেশে ঋণদানের পরিমাণের (Foreign lending) দ্বারা।

লেনদেন ব্যালান্সে গঠনকারী বিষয় সমূহই বিনিময় হার নির্ধারণ করে

আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ নির্ভর করে চারিটি বিষয়ের সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার উপর: (ক) দেশীয় রপ্তানীর জন্য বৈদেশিক চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা (খ) নিজ দেশে রপ্তানীর যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা (গ) বিদেশী আমদানীর যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা, এবং (ঘ) দেশের মধ্যে বিদেশী আমদানীর জন্য চাহিদার সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা। এই সকল প্রভাবসমূহকে একত্রে বলা হয় **"বাণিজ্যাবস্থা" (Trade Conditions)**।

বৈদেশিক ঋণদান (Foreign lending) তিন প্রকার প্রভাবের দ্বারা নির্ধারিত হয়:

(ক) শেয়ার বাজারের প্রভাবসমূহ (Stock Exchange Influences):

আন্তর্জাতিক ঋণদান, সুদপ্রদান, ঋণপরিশোধ, দেশীয় লোক কর্তৃক বৈদেশিক শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় বা বিদেশী কর্তৃক দেশীয় শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি।

(খ) ব্যাঙ্কিং প্রভাবসমূহ (Banking Influences):

বিনিময়-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফ্‌ট্‌ ক্রয় বিক্রয়, ভ্রমণকারীদের অর্থ প্রেরণ বা আনয়ন প্রভৃতি।

(গ) কারেন্সীর অবস্থা (Currency conditions):

দেশের মুদ্রাব্যবস্থার উপর বিশ্বাস ও আস্থা থাকিলে বিদেশ হইতে দেশে অর্থ আসে, মূলধনের আগমন (Inflow) ঘটে। অপরপক্ষে, মুদ্রাব্যবস্থার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিলে দেশ হইতে অর্থ বাহির হইয়া যায়, মূলধনের বহির্গমন (out flow) হয়।

বিনিময় হারে উঠানামা

লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী এই সকল বিষয়সমূহের দ্বারা বৈদেশিক বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় এবং ইহাদের পরিবর্তনের ফলে লেনদেন ব্যালান্সে পরিবর্তন ঘটে, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদায় পরিবর্তন আসে, বিনিময়-হারে উঠানামা (fluctuations) ঘটিয়া থাকে।

ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Foreign Exchange):

স্বর্ণমান ব্যবস্থায়

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহার (Mint Par of Exchange) অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের বিনিময়-হার স্থির হয়; এবং স্বর্ণ প্রেরণের ব্যয় পর্যন্ত এই হারের উপরে ও নীচে বিনিময়-হার উঠানামা করিতে পারে। সুতরাং, স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহারই উভয় দেশের মধ্যে ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার।

কাগজীমান প্রচলিত থাকিলে, ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব গ্রহণ করিলে, উভয় দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাত-ই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে বিনিময়-হার স্থির থাকে না; আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতায় পরিবর্তন বিনিময়-হারকে নির্ধারণ করে না; লেনদেন ব্যালান্সের দেনা ও পাওনার উপর, অর্থাৎ বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদার দ্বারা বিনিময়-হার স্থির হয়।

কাগজীমান ব্যবস্থায় ক্রয়ক্ষমতার তত্ত্বানুযায়ী

আধুনিক লেনদেন ব্যালান্সের তত্ত্ব (Balance of Payments theory) অনুযায়ী, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিনিময়-হার এইরূপ হইবে যাহাতে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদা সমান থাকে। অর্থাৎ বিনিময়-হার স্থির থাকে যদি এই যোগান ও ঐই চাহিদা সমান থাকে। বৈদেশিক বাজারে, দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদা নির্ভর করে বাণিজ্য-ব্যালান্স (Balance of Trade) ও 'ঋণদান-ব্যালান্সের' উপর (Balance of Lending)। বাণিজ্য-বালান্স নির্ভর করে যোগান বা চাহিদার পরিমাণ নিধারণকাবী চারি প্রকার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার উপর এবং ঋণদান-ব্যালান্স নির্ভর করে শেয়ার বাজারের প্রভাবসমূহ, ব্যাঙ্কের প্রভাবসমূহ ও কারেন্সীর অবস্থার উপব। যে বিনিময়-হার বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদাকে এমন ভাবে সমান রাখে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সে স্থায়িত্ব থাকে, ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতি-সাধনকারী প্রভাব সমূহের ক্রিয়া সুরু না হয, সেই হারকেই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Exchange) বলা চলে।

লেনদেন ব্যালান্স তত্ত্ব, বা আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী

বাস্তবক্ষেত্রে, নীতিনির্ধারণ ও প্রয়োগের ব্যাপারে, এই তত্ত্বগত ধারণা বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারে না, কারণ প্রচলিত বিনিময়-হারের দরুণ লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী বিষয়সমূহে (যেমন বিভিন্ন সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতাগুলিতে) স্থায়িত্ব আছে কি না অথবা কতখানি অস্থায়িত্ব (Instability) সৃষ্টি হইতেছে তাহা সঠিকভাবে পরিমাপ-যোগ্য নহে। তবুও মিশরের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালক রেগ্‌নার্ নার্স্‌কে বিভিন্ন নীতিনির্ধারণের ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার হইল "সেই হার যাহা কিছুদিন ধরিয়া লেনদেন ব্যালান্সকে ভারসাম্যাবস্থায় রাখে।"

নার্স্‌কের সংজ্ঞা

"কিছুদিন ধরিয়া" বলিলে বুঝা যায় যে খুব অল্পসময় হিসাব করিলে চলিবে না, কারণ,লেনদেন ব্যালান্সে সাময়িক উঠানামা ও বিচ্যুতি ঘটিবেই বা বাণিজ্যচক্র-জনিত উঠানামাও স্বাভাবিক। এই সকল স্বল্পকালীন উঠানামা বা ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঠেকাইবার জন্য প্রত্যেক দেশই কোন না কোন বন্দোবস্ত রাখে; সাধারণতঃ বৈদেশিক অর্থ মজুত করা কোন কেন্দ্রীয় তহবিল; স্বর্ণ, বৈদেশিক মুদ্রা ও বিভিন্ন দেশে ঋণ পাইবার সুযোগ, সুবিধা ও ব্যবস্থা প্রভৃতি লইয়া এই কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয়। লেনদেন ব্যালান্স স্থির থাকিলে বৈদেশিক অর্থের এই কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত ভাণ্ডার অক্ষুন্ন থাকে, এই ভাণ্ডারে বৈদেশিক অর্থের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং বলা চলে "যে হার বজায় থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে দেশের বৈদেশিক অর্থভাণ্ডারে মজুতের পরিমাণে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, তাহাই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার।"

সংজ্ঞার ব্যাখ্যা

"লেনদেন ব্যালান্স" বলিলে এক্ষেত্রে দেনা পাওনার সকল বিষয় ধরিলে চলিবে না, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বাদ দিয়া হিসাব করিতে হইবে।

(ক) ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে ব্যয়িত বৈদেশিক অর্থ।

(খ) মূলধনের স্বল্পকালীন আদানপ্রদান। এই স্বল্পকালীন মূলধন দুই প্রকৃতির: (১) ভারসাম্য আনয়নকারী ধরণের, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কহার বাড়াইলে স্বল্পকালীন মূলধনের দেশে আগমন—যে কোন মুহূর্তে বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে বলিয়া ইহাদের প্রকৃতপক্ষে দেনার দিকেই ধরা উচিত। (২) ভারসাম্য বিচ্যুতিকারী ধরণের, যেমন মূলধনের বহির্গমন, "উত্তপ্ত অর্থের" আনাগোনা প্রভৃতি —এই সকল অস্বাভাবিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণে আনাই উচিত।

"ভারসাম্যাবস্থায়" বলিলে এক্ষেত্রে বোঝা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা নিষেধ আরোপ না করিয়া দেনা ও পাওনার পরিমাণ সমান থাকা। আমদানী কমাইয়া বা দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দেনাপাওনাকে সমান করা হইলে তাহাকে ভারসাম্য বলা চলে না।

অগ্র বিনিময় (Forward Exchange)

যখন কোন দেশের বিনিময়-হার সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট থাকে না (স্বর্ণমান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে), তখন ব্যবসাবাণিজ্যে ঝুঁকি আসিয়া পড়ে, কারণ বিনিময় হারে অনিশ্চিত উঠানামার ফলে ব্যবসায়ীদের অপ্রত্যাশিত লাভ বা লোকসান ঘটিতে পারে।

বিনিময়-হারে উত্থান-পতনজনিত লোকসানের ঝুঁকি এড়াইবার জন্য অনেক ব্যবসায়ী কিছুদিন পূর্বেই ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থ ক্রয়ের জন্য চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন। যেমন ভারতবর্ষের মিঃ সেন ইংলণ্ডের মিঃ টমের নিকট হইতে ১০০০ পাউণ্ডের জিনিষ ক্রয় করিয়াছে, তিন মাসে পরে এই দাম দিতে হইবে স্থির হইয়াছে। মিঃ সেন যদি মনে করেন যে তিন মাস পরে বিনিময়-হার ভারতের প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রতি পাউণ্ড ক্রয় করিতে হইলে বর্তমানের তুলনায় অধিক টাকা দিতে হইবে, তাহা হইলে, তিনি লোকসানের ঝুঁকি এড়াইবার জন্য বর্তমানে হার নির্দিষ্ট করিয়া তিনমাস পরে পাউণ্ড ক্রয়ের জন্য ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন।

বিনিময় হারে উঠানামার ঝুঁকি কমাইবার উদ্দেশ্যে

সুতরাং দেখা যায় বৈদেশিক অর্থের বাজারে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দুই প্রকার বিনিময়-হার থাকে: বর্তমান লেনদেনের জন্য তৎকালীন হার (Spot rate) এবং ভবিষ্যত লেনদেনের জন্য অগ্রহার (Forward rate)। চুক্তির সময়ে তৎকালীন হারের হিসাবে অগ্রহার উল্লিখিত (quoted) হয়। অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইলে বোঝা যায় দেশীয় অর্থের বদলে ভবিষ্যতে অধিক বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইবে: অগ্রহার প্রিমিয়াম যুক্ত হইলে বোঝা যায় যে দেশীয় অর্থের বদলে ভবিষ্যতে কম বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইবে।

অগ্রহার কাহাকে বলে

তৎকালীন হার ও অগ্রহারে কি পরিমাণ পার্থক্য থাকিবে তাহা প্রধানতঃ, দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) দুই দেশে প্রচলিত সুদের হার এবং (২) ভবিষ্যৎ বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে ধারনা। যদি বিদেশে সুদের হার দেশের তুলনায় অধিক থাকে তাহা হইলে অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইবে। অর্থাৎ, বর্তমানের তুলনায় দেশীয় অর্থের বিনিময়ে অধিক বৈদেশিক অর্থ দিতে ব্যাঙ্ক রাজী হইবে। ভবিষ্যতে যে পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ বিক্রয়ের জন্য সে চুক্তি করিয়াছে ব্যাঙ্ক নিজে ঝুঁকি এড়াইবার জন্য তাহা এখনই বিদেশে প্রেরণ করিবে; বিদেশে সুদের হার বেশী থাকায় ওই প্রেরিত অর্থ হইতে তাহার যে অধিক আয় হইবে উহারই দরুণ সে বাট্টা দিতে পারিবে। অপর পক্ষে, যদি সুদের হার দেশে অধিক থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক এখনই বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিবে না, তাহাতে সুদ হইতে তাহার আয় কম হইবে। সুতরাং সে বর্তমানে প্রিমিয়াম্ সহকারে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিবে অর্থাৎ দেশীয় অর্থের বিনিময়ে কম পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ দিতে চাহিবে। দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থের দামের উঠানামার সম্ভাবনা, আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রভৃতির দ্বারাও অগ্রহার নির্ধারিত হইবে।

কিসের উপর নির্ভর করে

বহির্মূল্যপাতন (Devaluation) :

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় দেশের লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্যে বিচ্যুতি ঘটিলে দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থের পরিমাণ সঙ্কুচিত করিযা দামস্তর, কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ কমাইযা রপ্তানি বৃদ্ধির ও আমদানী হ্রাসের চেষ্টা করা হইত। কাগজীমান

লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য-বিহীনতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে

ব্যবস্থায় সেরূপ করা সম্ভব হইলেও আধুনিক কালে জাতীয় অর্থনীতির স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য দেশের আয়স্তর, কর্মসংস্থান প্রভৃতি কমাইবার নীতি কোন আর্থিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে চাহেন না। বিভিন্ন উপায়ে যদি আমদানী হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আর্থিক কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের মূল্য কমাইযা দেন।

কাহাকে বলে

বৈদেশিক মুদ্রার বা স্বর্ণের তুলনায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য কমাইয়া দেওয়া হইলে তাহাকে বহির্মূল্যপাতন (Devaluation) বলে। যেমন, ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন ডলারের (এবং স্বর্ণের) তুলনায় ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য ১৲=৩০ সেণ্ট হইতে ১৲=২১ সেণ্টে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কেন ভারসাম্য ফিরাইয়া আনে

বহির্মূল্যপাতনের প্রধান ফল হইল, মূল্যহ্রাসকারী দেশের বাজারে বিদেশী আমদানী দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যাওয়া এবং বিদেশের বাজারে মূল্যহ্রাসকারী দেশের রপ্তানী দ্রব্যাদির দাম কমিযা যাওয়া। যেমন ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরের পূর্বে ১৲-র বদলে আমেরিকা হইতে সেখানকার ৩০ সেণ্ট দামের জিনিষ পাওয়া যাইত, কিন্তু বহির্মূল্য হ্রাসের ফলে ১৲র বদলে পূর্বের তুলনায় কম, মাত্র ২১ সেণ্ট দামের দ্রব্য পাওয়া যাইবে : পূর্বের পরিমাণ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে বেশী টাকা দিতে হইবে অর্থাৎ আমদানী দ্রব্যের দাম বাড়িবে। অপর পক্ষে, বহির্মূল্য হ্রাসের পূর্বে ভারতবর্ষের ১৲ দামের

রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাস

দ্রব্য আমেরিকাতে ৩০ সেণ্ট দামে বিক্রয় হইত, কিন্তু বহির্মূল্য হ্রাসের পরে মাত্র ২১ সেণ্ট দিযাই আমেরিকার ব্যবসাযীরা তাহা ক্রয় করিতে পারিবে। ফলে বিদেশের বাজারে বিদেশীরা তাহাদের অর্থে কম দাম দিয়া ভারতীয় রপ্তানি-দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে। সুতরাং বিদেশী বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশীয় বাজারে বিদেশ হইতে আমদানী কমিয়া যাইবে। লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যের বিচ্যুতি দূর হইয়া পুনরায় ভারসাম্য স্থাপনের ঝোঁক দেখা দিবে।

বহির্মূল্যপাতনের ফলে রপ্তানি কি পরিমাণ বাড়িবে ও আমদানী কি পরিমাণ কমিবে তাহা নির্ভর করে (১) মূল্য পাতনের পরিমাণ (Degree) ও স্থিতিকালের (Duration) উপর এবং (২) আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্যাদির চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার উপর। যদি মূল্যপাতনের পরিমাণ নিতান্ত কম হয় অথবা বহির্মূল্য হ্রাসের স্থিতিকাল খুব কম হয় তাহা হইলে আমদানী রপ্তানি পরিমাণের উপর উহা কোন প্রভাব বিস্তার না করিতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ, যদি বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের জন্য দেশের চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারবিহীন হয তবে আমদানী দ্রব্যের দাম বাড়িলে দেশীয় চাহিদা উপযুক্ত পরিমাণে না কমায় বৈদেশিক খাতে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। ঠিক সেইরূপ যদি দেশের রপ্তানী দ্রব্যাদির জন্য বিদেশের চাহিদা সঙ্কোচপ্রসার-বিহীন হয় তবে রপ্তানি দ্রব্য বিদেশে সস্তা হওয়ার ফলেও চাহিদা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি হইবে না, ফলে বৈদেশিক খাতে পাওনা হ্রাস পাইবে। অপর পক্ষে, উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হইলে মূল্য হ্রাসের ফলে অধিক পরিমাণে আমদানী করিবে ও রপ্তানী বাড়িবে। সুতরাং বহির্মূল্যপাতনের ফলে মোট প্রভাব কি দাঁড়াইবে সেই অনুযায়ী বহির্মূল্য পাতনের পরিমাণ বা হার স্থির করা হয়। **ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতির পরিমাণ ও মূল্য হ্রাসের মোট ফলাফলের সম্ভাবনা**—বিচার করিয়া বহির্মূল্যপাতনের পরিমাণ স্থির করা হইবে।

বহির্মূল্য পাতনের প্রভাব দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল

বহির্মূল্যপাতনের পরিমাণও দুইটি বিষয়ের নির্ভর করে

রপ্তানী বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিকতর সুবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে করা ব্যবহার হইলেও বহির্মূল্যপাতন প্রকৃতপক্ষে বিপদ্‌জনক কৌশল। প্রথমতঃ, ইহার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যয় ও দামস্তর বাড়িয়া যাইতে পারে (মজুরী-হার বৃদ্ধির দরুণ এবং আমদানী দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির দরুণ)। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য দেশও এই সুযোগ গ্রহণ করিতে সুরু করিতে পারে; পৃথিবীতে প্রতিযোগিতামূলক বহির্মূল্যপাতন ঘটিতে পারে। অথবা, এইরূপে রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে অন্যান্য দেশ সাধারণতঃ উচ্চহারে আমদানী-শুল্ক বসাইয়া থাকে।

বিপদসমূহ

কিন্তু বিপদ সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (Internal economic stability) বজায় রাখিতে হইলে এবং লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যের বিচ্যুতি দূর

করিতে হইলে এই নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বহির্মূল্যপাতন নীতি প্রয়োগ করা উচিত। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (International Monetary Fund) এক ধারায়, তাই বলা হইয়াছে যে কেবলমাত্র লেনদেন ব্যালান্সে কোন "মৌলিক ভারসাম্য-বিচ্যুতি" (Fundamental dis-equilibrium) সংশোধন করিবার জন্যই বিনিময়-হারে এইরূপ পরিবর্তন করা চলিবে।

প্রয়োজনীয়তা

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Exchange Control)

রপ্তানির পরিবর্তে দেশের পাওনা বৈদেশিক অর্থ এবং আমদানীর দরুণ দেশের দেনা—অর্থাৎ বৈদেশিক খাতে দেনা ও পাওনার পরিমাণ; বিনিময় হার এবং দেনা পাওনার দিক নির্ণয়, সবই যদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত হয় তবে তাহাকে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বলে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগ হইতে আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ও স্বর্ণমান পরিত্যাগের দরুণ বৈদেশিক লেনদেনে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বৈদেশিক লেনদেনের খাতে সকল দেনা পাওনাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ কাহাকে বলে

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য: বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনিময় নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা হইতে পারে। যেমন,

(১) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব (Stability) রক্ষা করা; রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম বিনিময় হার রক্ষা করিয়া অর্থের বহির্মূল্য কমান; অথবা, সস্তায় আমদানী করিবার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বিনিময় হার রক্ষা করিয়া অর্থের বহির্মূল্য বৃদ্ধি। (২) মূলধন, স্বর্ণ ও বা অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির রপ্তানিতে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। (৩) অত্যাবশ্যক আমদানীর যোগান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে। (৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজ দেশের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য। (৫) লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষার জন্য। (৬ দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের হাত হইতে সংরক্ষণের (Protection) উদ্দেশ্যে। (৭) রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (যেমন, চিলি)। (৮) কোন বিশেষ দেশ বা দেশসমূহকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য। (৯) রাজনৈতিক কারণে; কোন বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে ব্যবসা-বাণিজ্যের মারফৎ আক্রমণ চালাইবার জন্য। (১০) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয়

দ্রব্যাদি আমদানী ; কাঁচামালের রপ্তানি বন্ধ করা ; বা প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি : বিনিময় হার বা বৈদেশিক খাতে দেনা পাওনা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন রাষ্ট্র বহুবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বহু প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিন প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

(১) হস্তক্ষেপ পদ্ধতি (Intervention) ঃ রাষ্ট্র যদি মনে করে যে, বিনিময়-হার সাধারণ চাহিদা ও যোগানের শক্তির দ্বারা যেরূপ হইতে পারে তাহা অপেক্ষা ভিন্ন রূপ হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে সে নিজেই সরাসরি বিনিময়হার নির্ধারণেব উদ্দেশ্যে (বহির্মূল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাইবার জন্য) হস্তক্ষেপ করিতে পারে। ইহার জন্য সে নিজে তাহার তহবিল হইতে বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করিয়া লইতেও পারে। হস্তক্ষেপেব দ্বারা বিনিময় হার প্রভাবিত করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বৈদেশিক অর্থ মজুত করিবার ক্ষমতার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। তাহা ছাড়া হস্তক্ষেপের দ্বারা নিযন্ত্রণ নীতি সামযিক ভাবে চলিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালে স্থায়ীভাবে চলিতে পারে না।

হস্তক্ষেপ পদ্ধতির উপায়

(২) অবরোধ পদ্ধতি (Restriction) : সাধারণ ভাবে সকল বৈদেশিক অর্থ সংক্রান্ত লেনদেনেব ক্ষমতা রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক বা কোন কর্তৃপক্ষ নিজেদের হাতে তুলিয়া লয়। এই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিজের লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাবে বাজারের অবাধ কাজ কর্মের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করে বা কেন্দ্রীয় ভাবে সকল বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত ব্যবসা নিজেই পরিচালনা করে। বহু প্রকার নিয়মকানুন সৃষ্টি করিয়া এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করিয়া তুলিতে হয। যেমন (ক) বিদেশে অর্থ পাঠাইতে হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হইবে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট কারণেই মাত্র অর্থ প্রেরণ করা চলিবে, কোন দেশে পাঠাইতে পারিবে তাহাও স্থির করিযা দিবে। বিদেশ হইতে অর্থ আসিলেও তাহা নির্দিষ্ট হারে আসিতে হইবে, সেই সকল বৈদেশিক অর্থ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে এইরূপ নিয়ম হইতে পারে। (খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ না করিয়া কোন আমদানী রপ্তানি করা চলিবে না এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে। প্রত্যেক লাইসেন্সে আমদানী রপ্তানির পরিমাণ এবং কোন্ দেশ বা কোন্ মুদ্রাঞ্চল (Currency area) হইতে আমদানী রপ্তানি করা চলিবে

অবরোধ পদ্ধতির বিভিন্ন উপায়

তাহা নির্দিষ্ট থাকে। (গ) বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জমান বা আটক-হিসাব পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে (Freezing or Blocking of accounts)। আটক-হিসাব পদ্ধতিতে বিদেশী পাওনাদারদের নামে রক্ষিত হিসাবে তাহাদের সকল পাওনা জমা দিবার জন্য দেশীয় দেনাদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈদেশিক পাওনাদারগণ এই অর্থকে নিজেদের দেশীয় মুদ্রায় ব্যয় করিতে পারেন না। আটককারী দেশ হইতেই দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে উহা ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ সেই দেশ হইতেই দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা চলে। অনেক সময়, (যেমন জার্ম্মানীতে) ঐ আটক অর্থের দ্বারা বিদেশী পাওনাদার দেশ হইতে কি জিনিষ এবং কত পরিমাণ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় বহু কম হারে, লোকসান দিয়া বিদেশী পাওনাদারকে এই আটক অর্থ বা উহার বিনিময়ে দ্রব্যাদি পাইবার সুযোগ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে রক্ষিত দ্বিতীয় অ্যাকাউণ্টে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং অর্থ ইহার প্রকৃষ্ট নমুনা।

(৩) চুক্তি (Agreements):

নিয়ন্ত্রণকারী দেশ অন্যান্য দেশের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করিয়া বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ চুক্তি সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইতে পারে।

(ক) **পণ্যবিনিময় চুক্তিসমূহ (Barter Agreements):** অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ দুই দেশের ব্যবসায়ীগণকে নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময়ের চুক্তি করিবার অধিকার দেন। এইরূপ ক্ষেত্রে, কোন দ্রব্য আমদানি করিয়া তাহার বদলে কোন দ্রব্য রপ্তানী করা হয়, অর্থ লেনদেনের কোন প্রয়োজন ঘটে না। সাধারণভাবে, আধুনিক জগতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বা অন্য রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের সহিত এইরূপ চুক্তি দ্বারা আমদানী ও রপ্তানী চালাইয়া থাকেন। (খ) **ক্লিয়ারিং চুক্তি সমূহ (Clearing Agreements):** উভয় দেশের মধ্যে চুক্তির দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিনিময়-হার স্থির করা হয় এবং উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দেনাপাওনা মিটাইবার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করিয়া নিজের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নিজের দেশের অর্থ-ই জমা দেয়, পরে দুই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দেনাপাওনা মিটাইয়া লন। (গ) **লেনদেন চুক্তিসমূহ (Payments Agreements):** নির্দিষ্ট সময়ের শেষে দেনাপাওনার কিছু বাকী থাকিলে স্বর্ণের দ্বারা বা অপর কোন তৃতীয় দেশের

বিভিন্ন প্রকার চুক্তিসমূহ

অর্থের দ্বারা উহা মেটান হইবে এইরূপ চুক্তি করা যাইতে পারে। অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ওই অর্থ জমা থাকে, এবং পাওনাদারগণ আগামী বৎসরের বাণিজ্যে দেনাদারদের অধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়া ওই অবশিষ্ট পাওনা অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলেন, এইরূপও হইতে পারে। অনেক সময় দুই-এর বেশী কয়েকটি দেশের মধ্যে একত্রে দেনাপাওনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ চুক্তি থাকে (Multiple clearing), যেমন ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার সংগঠন (Organisation for European Economic co-operation) এবং ইউরোপীয় লেনদেনের সঙ্ঘ (European Payments Union) প্রভৃতি।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দোষগুণ (Merits and Demerits or Exchange Control) :

বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের প্রধান সুবিধা বা গুণ হইল যে সঠিক ভাবে ব্যবহার করিলে এই পদ্ধতির সাহায্যে রপ্তানী বৃদ্ধি করা বা অপ্রয়োজনীয় আমদানী কমান সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, বিনিময়-হারে তীব্র উঠানামা বন্ধ হয় বলিয়া দেশের বৈদেশিক অর্থ লইয়া ফাটকা ব্যবসা চালান সম্ভব হয় না এবং বিনিময়-হারে উঠানামার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা না থাকায় ব্যবসায়ীদের দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না। তৃতীয়তঃ, গত সুবৃহৎ অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময়ে দেখা গিয়াছে, ক্ষুদ্র দেশগুলি নিজেদের মধ্যে এইরূপ চুক্তি করিয়া বা শক্তিশালী দেশগুলির সহিত চুক্তি দ্বারা ব্যবসাবাণিজ্য চালাইতে সক্ষম হইয়াছে, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে তাহারা ব্যবসা চালাইতে পারিত না। চতুর্থতঃ, অনুন্নত দেশসমূহ দেশের শিল্পসম্প্রসারণ করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে এবং তাহা অতীব প্রয়োজনীয়।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের চারি প্রকার সুবিধা

ইহার প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ কমাইয়া দেয়, সুতরাং সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক। দ্বিতীয়তঃ, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পৃথিবীতে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি দ্বারা (Bilateral Trade Agreements ব্যবসা চালায় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষতিকারক। তৃতীয়তঃ, সমগ্র পৃথিবীতে অর্থনৈতিক রেষারেষির ও অন্যকে ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা সুবিধালাভের চেষ্টা—এইরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য যে উন্মুক্ত অবাধ পরিবেশ ও সদিচ্ছার আবহাওয়া থাকা প্রয়োজন তাহা সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ, সরকারী নিয়ন্ত্রণ

চারি প্রকার দোষ বা অসুবিধা

ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ ; দীর্ঘসূত্রতা, অযোগ্যতা, অক্ষমতা প্রভৃতি থাকার দরুণ ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

কিন্তু তাহা সত্বেও মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীর সকল দেশ শিল্পোন্নয়নের সমান স্তরে উপনীত হয় নাই এবং বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকটি দেশ বিভিন্ন অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া দ্রুত শিল্পায়নের চেষ্টা করিতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমূহের সার্থক রূপায়নের জন্য আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ, দিক ও দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই স্বাভাবিক, সুতরাং দোষ ত্রুটি ও রেষারেষি সত্বেও ইহার পরিচালনা নিকট ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করা চলে।

আধুনিক জগতে ইহার প্রয়োজনীয়তা

বহুধা বিনিময় হার (Multiple Exchange Rates)

লেনদেন ব্যালান্সের স্বল্পকালীন উঠানামার ফলে বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামা ঘটিয়া থাকে; বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদার পরিবর্তন সর্বদাই বিনিময়-হারে পরিবর্তন আনিয়া থাকে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট বিনিময়-হারে রাষ্ট্রের আর্থিক লেনদেন হয়, কিন্তু বাজারের বিনিময়-হার (Market Rate of Exchange) সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল, একেবারে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নহে।

সরকারী-হার ও বাজার-হার

সেইরূপ বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বিচার করিলে দেখা যায় যে বিনিময়-হারে তারতম্য আছে। যেমন, বাজারে ভারতের টাকার বদলে ব্রিটিশ পাউণ্ড কি পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার অনেক বিনিময়-হার রহিয়াছে। বর্তমানেই ক্রয় করিলে যে দামে পাউণ্ড পাওয়া যায়, ৩০ দিন, ৬০ দিন বা ৯০ দিন পরে ক্রয়ের জন্য চুক্তি করিলে পাউণ্ডের জন্য অন্য দাম দিতে হইতে পারে। সুতরাং বর্তমানেই বিভিন্ন প্রকার সময় অনুযায়ী অগ্রবিনিময়ের (Forward Exchange) দরুণ বহুসংখ্যক বিনিময়-হার দেখিতে পাওয়া যায়।

সময়ের পার্থক্যে বাজার-হারে পার্থক্য

কিন্তু অনেক সময়ে রাষ্ট্রের নির্দেশেই দুই দেশের অর্থের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বিনিময়হার রক্ষা করা হয়; একই সময়ে দুই দেশের অর্থের মধ্যে বহুসংখ্যক বিনিময়-হার বজায় রাখা হইলে তাহাকে বহুধা বিনিময় হার (Multiple Exchange Rates) বলে। সরকার এইরূপ নির্দেশ দেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বিনিময়-হার পৃথক হইবে, এবং কৃত্রিম ভাবে (বাজারের যোগান ও চাহিদার প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া) বিভিন্ন প্রকার বিনিময়-হারের প্রয়োগ করাকে কার্যকরী করিয়া তোলেন। যেমন বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য আমদানী

কিন্তু সরকারী-ভাবেই বিভিন্ন বিনিময়-হার ধার্য থাকিতে পারে। উহাকে বহুধা বিনিময় হার বলে

করিতে হইলে, বা রপ্তানী করিতে হইলে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করিতে হইলে দেশীয় অর্থের হিসাবে বিভিন্ন দাম নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন বিনিময়-হার থাকে। ১৯৩০ সালের পর হইতে প্রথমে লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ ও পরে জার্মানী বিভিন্নরূপ বিনিময়-হার প্রথা ব্যাপক চালু করে এবং বিশেষ নিন্দার্হ হইলেও বর্তমানে অনেক দেশ ওইরূপ বহুধা বিনিময়-হার বজায় রাখিয়াছে। যেমন, পূর্বে জার্মানীর অর্থ মার্ক ক্রয় করিতে হইলে উদ্দেশ্য অনুযায়ী উহার দাম নির্দিষ্ট হইত। ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মার্ক কিনিলে এক দাম, কোন দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অন্য দাম, বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ দাম, এইরূপে বিভিন্ন হারে বিদেশীদের নিকট মার্ক বিক্রয় করা হইত। এই সকল হারের সহিত জার্মান অধিবাসিগণ মার্কের বিনিময়ে অন্য দেশের অর্থ যে হারে ক্রয় করিতেন তাহারও কোনরূপ সমতা ছিল না। যেমন, বর্তমানে লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে চিলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ডলার ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দাম (চিলির অর্থ পেসোর হিসাবে) স্থির করিয়া রাখিয়াছে। মূলধনী দ্রব্য আমদানীর উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ কম দেশীয় অর্থ দিয়াই বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করা যায়, কিন্তু বিলাস দ্রব্য আমদানী করিতে হইলে অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থ দিয়া বৈদেশিক অর্থ পাইতে হয়; সরকারী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য আবার ভিন্নরূপ বিনিময়-হার নির্দিষ্ট থাকে।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হয়

এইরূপ বহুধা বিনিময় হার থাকিলে বেআইনী মুনাফার সম্ভাবনা খুবই বাড়িয়া যায়; কারণ কম দামে বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করিয়া বেশী দামে বিক্রয়ের সুযোগ ও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। সুতরাং, বহুধা বিনিময় হার প্রথা কার্যকরী করিতে হইলে খুবই শক্তিশালী ও দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে হয়; বস্তুতঃ, আন্তর্জাতিক লেনদেনের সকল দিকই নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন হয়। বহির্মূল্যপাতন (Devaluation) বা বহির্মূল্যবৃদ্ধির (Appreciation) তুলনায় এইরূপ বহুধা বিনিময় হার প্রথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির পক্ষে এবং অবাধ দ্রব্যচলাচলের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকারক ও গুরুতর বাধা নিষেধ আরোপকারী। এই কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডার বহুধা বিনিময়-হার প্রথা নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

এই পদ্ধতির ত্রুটি সমূহ

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (Free Trade and Protection):

ইংলণ্ডের ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যবসা বাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক

ক্ষেত্রে উদারনৈতিক (Liberalism) মনোভাব এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থন ইংলণ্ডে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ না করার নীতিকে অবাধ বাণিজ্যনীতি বলা হয়। এই নীতির স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহার ফলে সকল দেশ আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের সুফল ভোগ করিবার সুযোগ পায়। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশ সর্বাধিক সুবিধার সহিত যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনেই সকল উপকরণ নিয়োগ করিবে। ফলে, সকল দেশেরই উপাদান সমূহের নৈপুণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি হয়, সমগ্র পৃথিবীর সকল দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়িয়া যায়, দ্রব্যসামগ্রীর ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ও কমিয়া যায়। উপাদান সমূহের আয় বাড়িয়া যায়, কারণ সর্বাধিক সুবিধার সহিত উৎপাদন করিলে তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ভোগকারী হিসাবে সকলেই উন্নত ধরণের দ্রব্য কমদামে পাইতে পারে। অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করিয়া আমদানী শুল্ক স্থাপনের ফলে দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পায়, উৎপাদকের স্বার্থে ভোগকারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হয়।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তিসমূহ: দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস, আয় বৃদ্ধি, ভোগ বৃদ্ধি

সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, অবাধ বাণিজ্য আপনাআপনি উপাদান-সমূহকে প্রত্যেক দেশে সর্বাধিক সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করে তাহা ঠিক নহে। যেহেতু কোন দেশ অন্য দেশের তুলনায় কিছুকাল পূর্বে শিল্পসম্প্রসারণ সুরু করিয়াছিল, সেইজন্য তাহার অনেক লব্ধ সুবিধা থাকিতে পারে। পূর্বে সুরু করার এই সকল সুবিধার ফলে তাহার তুলনায় অন্য দেশগুলির উৎপাদন ব্যয় বেশী থাকায় তাহারা প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়।

সুতরাং, সংরক্ষণের সাহায্যে উভয়ের সুবিধা প্রথমে সমান করিয়া লইয়া তাহার পরেই অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। অসমান শক্তিধারীদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতায় দুর্বলের পরাজয় নিশ্চিত; উহা সবলের একাধিপত্য বজায় রাখিবার এবং দুর্বলকে শক্তিশালী না হইতে দিবার ছলনা মাত্র। সংরক্ষণের সাহায্যে বর্তমানে দেশের সম্পদবৃদ্ধির ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলা, বর্তমানেই সম্পদ্ প্রাপ্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক কারণে অবাধ বাণিজ্য উন্নততর নীতি হইলেও অপরাপর বহু কারণে যেমন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে, সংরক্ষণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। যেমন, অস্ত্রোৎপাদন বা আত্মরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপন করা, উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইলেও অবশ্য প্রয়োজন। ইহাও মনে রাখা দরকার, দেশের স্বাস্থ্য বা চরিত্র-হানিকর বহুদ্রব্যের আমদানী অবশ্যই জাতীয় স্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি সমূহ: দুর্বলের বা নবাগতদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি, জাতীয় স্বার্থরক্ষা, অন্যায় ব্যবসার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ বা বাণিজ্যচক্র বিরোধী উপায় প্রভৃতি

উচিত। অপর দেশ ডাম্পিং করিয়া দেশীয় শিল্পকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, তাহাও ঠিক নয়; সেই ডাম্পিং রোধ করার প্রচেষ্টা সর্বদাই করা দরকার। অথবা, অপর দেশ সরকারী সাহায্যপুষ্ট হইয়া রপ্তানী বাড়াইয়া দেশের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত করিবে—তাহাও চলিতে দেওয়া জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নহে। তাহা ছাড়া, আধুনিক জগতে দেশীয় অর্থনীতির সার্বিক উন্নতি, জীবনযাত্রার মান বাড়ান প্রভৃতির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নিজস্ব নীতি স্থির করিতেছেন; এরূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ অনুন্নত দেশসমূহ, দেশের বাহিরের শক্তিগুলির হাত হইতে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের রক্ষার প্রচেষ্টা করিবে। বাণিজ্যচক্রের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ করা খুবই দরকার। চরম-সঙ্কটের কালে আমদানী শুল্ক বসাইলে দেশের উৎপাদন ও কর্ম-সংস্থান বাড়িতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া অপর কোন দেশের বাণিজ্য সঙ্কট যাহাতে আমাদের দেশে প্রসারিত হইতে না পারে, তাহার উদ্দেশ্যেও সংরক্ষণ নীতিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সুতরাং সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সাধারণ ভাবে অবাধ বাণিজ্যের নীতি সুফলদায়ী হইলেও, কোন বিশেষ দেশের নিজস্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাকে কখনই গ্রহনযোগ্য মনে করা চলে না, এবং সংরক্ষণনীতি সাধারণ ভাবে জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ (Arguments in favour of Protection):

১। দেশের অর্থ দেশে রাখা (Keeping money at home):

যুক্তি

অনেকে বলিতে চাহেন যে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিলে দেশের লোকে দ্রব্য পাইলেও বিদেশীরা অর্থ পায়; কিন্তু দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিলে দেশের লোকে দ্রব্যও পায় আর অর্থও পায়। ইহার সমর্থকদের বক্তব্য হইল যে, যাহাতে দেশের অর্থ বাহিরে যাইতে না পারে সেইজন্য বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করাই উচিত।

বিরুদ্ধ যুক্তি

কিন্তু এই যুক্তি একেবারেই ভুল, কারণ আমদানী না করিলে রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাইবে, বিদেশীদের দ্রব্য ক্রয় না করিলে বিদেশীরাই বা কি করিয়া দেশের রপ্তানী ক্রয় করিবে? দ্রব্য ক্রয় না করিয়া জাতীয় আয় বাড়ান যায় না, কারণ তাহা হইলে রপ্তানী হইতে আয়ও কমিয়া যায়। আর, সকল দেশই এইরূপ নীতি গ্রহণ করিলে অবশেষে কাহারও উপকার হয় না; সকলেরই বৈদেশিক ব্যবসা ও বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়; বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি কেহই লাভ করিতে পারে না।

২। দেশে বাজার সৃষ্টি করা (Home Market Argument) :

সংরক্ষণের ফলে বিদেশী দ্রব্য দেশে না আসিলে দেশীয় শিল্প স্থাপিত হইবে, দেশে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে দেশীয় দ্রব্যাদির আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হইবে, দেশের সকল শিল্পেরই লাভ হইবে—ইহাই এই যুক্তির রূপ।

যুক্তি

কিন্তু এই যুক্তির সমর্থকগণ ভুলিয়া যান যে সংরক্ষণের দ্বারা আমদানী কমাইলে উহার ফলে রপ্তানীও কমিয়া যায়। সুতরাং আমদানী বন্ধ করিয়া সেই দ্রব্য দেশে উৎপাদন সুরু করিলে আয় ও ক্রয় ক্ষমতার বৃদ্ধি হইয়া দেশীয় বাজার বিস্তৃত করে বটে, কিন্তু, রপ্তানী হ্রাস পাইবার দরুণ রপ্তানী শিল্পে বেকারীর ফলে আয় ও ক্রয় ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়া দেশীয় বাজারকে একইরূপে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে।

বিরুদ্ধ যুক্তি

কিন্তু যদি আমদানী হ্রাসের ফলে দেশে নূতন আয় সৃষ্টির পরিমাণ রপ্তানী কমিবার ফলে আয় হ্রাসের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের মোট আয়ে নীট বৃদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং উভয় দেশের আমদানী ও রপ্তানীর পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর এই যুক্তির সত্যতা নির্ভর করে; বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ অবস্থায় এই যুক্তি সত্য।

সত্যতা

৩। বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল রাখা (Balance of Trade Argument) :

প্রাচীন মার্কেণ্টাইলিষ্ট ধনবিজ্ঞানীগণ বলিতেন যে, বিদেশ হইতে স্বর্ণ আনিতে পারিলেই দেশ সম্পদশালী হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্বদা রপ্তানী আধিক্যের নীতি গ্রহণ করা উচিত। রপ্তানী-আধিক্যের দ্বারা সর্বদা বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকূল রাখিতে পারিলেই স্বর্ণ দেশের অভ্যন্তরে আসিতে পারে।

যুক্তি

ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ এই মার্কেণ্টাইলিষ্ট ধারণা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে স্বর্ণ-ই একমাত্র সম্পদ নহে। আর অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্সের দরুণ স্বর্ণের ক্রমাগত দেশে আগমন আভ্যন্তরীণ অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দামস্তর বাড়াইয়া দিবে এবং ফলে ভবিষ্যতে রপ্তানী কমিয়া স্বর্ণ পুনরায় বাহির হইয়া যাইবে (স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্ডীয় তত্ব)। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণও মনে করেন যে অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্সের ফলে দেশের আয়স্তর বর্ধিত হইবে, সুতরাং প্রান্তিক আমদানী-বৃদ্ধির প্রবণতার দরুণ আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, বাণিজ্য ব্যালান্সে আনুকূল্য হ্রাস পাইবে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য

বিরুদ্ধ যুক্তি

বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল রাখার নীতি গ্রহণ করা কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। যদিও কেইন্‌সের মতে রপ্তানী-আধিক্যের ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ন্যায়—ইহার ফলে আয়স্তর ও কর্মসংস্থান বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও মনে রাখা দরকার যে, সকল দেশ-ই একসঙ্গে এই নীতি গ্রহণ করিতে সুরু করিলে অবশেষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল বিশৃংখলা সৃষ্টি হইবে। প্রত্যেক দেশই অপর দেশের স্বার্থের বিনিময়ে নিজের স্বার্থবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া এইরূপ প্রতিবেশীকে দরিদ্র করার (Beggar my neighbour) নীতি গ্রহণ করিলে মোট ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়া সকলকেই দরিদ্র করিয়া তুলিবে।

(৪) উচ্চমজুরী বজায় রাখা (To maintain High Wages):

অনেক সময় বলা হয় যে নিম্ন মজুরীর হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানীর বিরুদ্ধে শুল্ক না বসাইলে সস্তা আমদানী দ্রব্য দেশের মধ্যে প্রবেশ করিযা দেশের উচ্চ মজুবীর হারকে নামাইযা দিবে। কারণ, বিদেশে নিম্ন মজুরী-হারের ফলে উৎপাদনব্যয় কম এবং দেশে উচ্চ মজুবী-হারেব ফলে উৎপাদন ব্যয় বেশী। সুতরাং, আভ্যন্তরীণ উচ্চ মজুবীর হার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিম্ন মজুরীর হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানীর বিরুদ্ধে শুল্ক বসান উচিত।

যুক্তি

এই যুক্তি গ্রহণ করা চলে না, কারণ উচ্চ মজুরীর ফলে উৎপাদন ব্যয় সর্বদাই অধিক হইবে বা নিম্ন মজুরীর ফলে উৎপাদনব্যয় কম হইবে—ইহা ঠিক নহে। উচ্চ মজুরীর হার অধিক উৎপাদন ক্ষমতার দরুণ বা উন্নত সাংগঠনিক নৈপুণ্যের দরুণ বা প্রাকৃতিক সম্পদের আধিক্যের দরুণ হইতে পারে। ফলে প্রকৃতপক্ষে সেই দেশে ইউনিট-প্রতি ব্যয় কম, এইরূপ ঘটিতে পারে।

এইরূপ অবস্থায় সংরক্ষণের নীতি দেশের উচ্চ মজুরীকে রক্ষা না করিয়া কমাইয়া দিতেও পারে। কারণ সংরক্ষণের ফলে সর্বাধিক সুবিধাজনক ক্ষেত্রে নিযুক্ত না হইয়া নিম্ন উৎপাদন-ক্ষমতা-সম্পন্ন শিল্পে শ্রমিক নিযুক্ত হইতে সুরু করিবে, সুতরাং জাতীয় সম্পদ বা মজুরীর হার উভয়ই কমিবে। তাহা ছাডা, সংরক্ষনী শুল্কের ফলে দ্রব্যের দাম বাড়িবার দরুণ আসল মজুরী কমিয়া যাইবে।

বিরুদ্ধ যুক্তি

কিন্তু, সাধারণভাবে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী উভয় দেশে উপাদানের দামে সমতা আসে। এরূপ অবস্থায় নিম্ন মজুরী-সম্পন্ন

দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য সুবিধাজনক, এবং উচ্চ মজুরী-সম্পন্ন দেশের পক্ষে অসুবিধাজনক। কারণ, উচ্চ মজুরী কিছুটা নামিয়া এবং নিম্ন মজুরী কিছুটা উঠিয়া উপাদানের দামে সমতাসাধন হয়।

(৫) বেকারী দূর করা (To Cure Unemployment):

কিরূপে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় ও ক্লাসিকাল যুক্তি: কেন বৃদ্ধি পায় না

অনেক সময় বলা হয়, সংরক্ষনের ফলে দেশে বেকারী দূর হইয়া কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সংরক্ষণের দ্বারা আমদানী হ্রাস পাইলে সেই সকল দ্রব্যের শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়িলেও রপ্তানী কমিয়া যাওয়ার ফলে রপ্তানী দ্রব্যের শিল্পে বেকারী বাড়িবে; সুতরাং দেশের মোট কর্মসংস্থানে নীট বৃদ্ধি হইবে না।

আধুনিক যুক্তি: কিরূপে আমদানী স্থির রাখিয়া রপ্তানী বাড়ান যায়, ১। অর্থ সাহায্য

তবে, যদি আমদানী শুল্কের দ্বারা আমদানী কমাইয়া দেশে কর্মসংস্থান বাড়ান হয়, অথচ রপ্তানীর পরিমাণ যাহাতে না কমে সেই ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। অবশ্য যদি অপর দেশও প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাদের আমদানীর উপর শুল্ক বসায় তাহা হইলে রপ্তানী কমিয়া কর্মসংস্থান কমাইয়া দিবে। রপ্তানী হ্রাস বন্ধ করার জন্য দেশটি দুই প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমতঃ, আমদানী শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা রপ্তানী শিল্পকে অর্থ সাহায্য (Bounty) করা—যাহাতে বিদেশে কম দামে বিক্রয় করিয়া পূর্বের পরিমাণ রপ্তানী বজায় রাখিতে পারে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় বিদেশও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২। বিদেশে ঋণ বৃদ্ধি

দ্বিতীয়তঃ, যদি সংরক্ষণকারী দেশ রপ্তানী-আধিক্যের দরুণ পাওনা বিদেশী অর্থ দেশে আনিতে না চাহে এবং বিদেশেই ঋণ বা বিনিয়োগ অথবা সাহায্য হিসাবে খাটায়, তাহা হইলে এই রপ্তানীর আধিক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে। যেমন, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমেরিকা সর্বাধিক রপ্তানী করে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংরক্ষণের দ্বারা আমদানীতে বিপুল বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। রপ্তানীর ফলে আমেরিকার পাওনা অর্থ বিদেশী দ্রব্যের আমদানী দ্বারা পরিশোধ লইলে পাছে দেশে আয় ও কর্মসংস্থান কমিয়া যায় এইজন্য উচ্চ সংরক্ষনী প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া সে ব্যবসা যুদ্ধ চালায়। যাহাতে বিদেশ হইতে তাহাকে দ্রব্যের আমদানী করিতে না হয়, এইজন্য সে পাওনা অর্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঋণ দেয়, দান

করে, ইউরোপীয় পুনর্গঠনের দরুণ ব্যয় করে বা বিদেশে সৈন্যবাহিনী রক্ষা করে। (এইজন্য আমেরিকার নীতিকে অনেকে "কূটনৈতিক মানবপ্রীতি" (Strategic Philanthropy) বলিয়া থাকেন)।

কিন্তু এই নীতি নিতান্তই স্বল্পকালীন, কারণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য কেহ মূলধনের রপ্তানী চালাইয়া যাইতে পারে না। এমন সময় আসে যখন আসল পরিশোধ লইতেই হইবে বা সুদ লইতেই হইবে; এরূপ অবস্থায় আমদানী বৃদ্ধি না করিলেই চলিবে না। তাহা ছাড়া, এই নীতির ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ কমিয়া আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান হ্রাস পাইতেও পারে।

এই পদ্ধতির অসুবিধা

(৬) **শিশু শিল্পকে রক্ষা করা (To Protect Infant Industries):**

পৃথিবীর সকল দেশে শিল্পোন্নয়নের স্তর সমান নহে, সকলেই শিল্পবিপ্লবের সুবিধা সমান পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই; প্রথমে যাহারা শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই অধিকতর সুযোগ, সুবিধা, শিল্পজ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হইয়াছে। সুতরাং, শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহ শিল্পোন্নয়নের কার্য সুরু করিয়া অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করিলে প্রতিযোগিতায় উন্নততর দেশগুলির নিকট পরাজিত হইবে। অনুন্নত দেশগুলি উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে সংরক্ষণের দ্বারা নিজেদের শিল্প বাণিজ্যে শিশু দেশকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইবে, শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক জ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির স্তর বিদেশীদের হাত হইতে রক্ষা করিবে। জার্মান ধনবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক্ লিষ্ট্ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাঁহার মতে, কৃষি-উৎপাদনের স্তর হইতে কোন দেশে শিল্প সম্প্রসারণ করিতে হইলে এইরূপ সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

অনুন্নত দেশ ও অনুন্নত শিল্প

লিষ্ট্ এই নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন "অনুন্নত দেশ" সম্বন্ধে, কিন্তু আধুনিক কালে দেশের শিশু "শিল্পকে" বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন—এই যুক্তিতে সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করা হইয়া থাকে। "সদ্যোজাতকে সেবা কর, শিশুকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে মুক্ত কর"—ইহাই এই যুক্তির মূল কথা।

যুক্তি সঠিক হইলেও এই নীতিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অসুবিধা আসিয়া পড়ে। এই নীতি অনুযায়ী যে সকল শিল্প ভবিষ্যতে এমন ভাবে উন্নত হইয়া উঠিবে

যে সংরক্ষণ তুলিয়া লইলে উন্নত দেশের শিল্পসমূহের সহিত প্রতিযোগিতা দ্বারা নিজেকে বাঁচাইতে পারিবে, তাহাদের রক্ষা করা অর্থাৎ সেই দ্রব্য আমদানীর উপর শুল্ক বসান দরকার। কিন্তু পূর্ব হইতেই সঠিক ভাবে জানা যায় না কোন্ শিল্প এরূপ বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া একবার শুল্ক বসাইলে সংরক্ষণের আড়ালে গড়িয়া উঠিবার পরেও সেই শিল্প চিরকাল "সংরক্ষিত" থাকিতেই চায়, নিজের পায়ে স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইবার বাসনা ও মনোভাব কখনও গড়িয়া উঠে না, শিশুর আর বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটিতে চাহে না।

প্রয়োগ-গত অসুবিধা

(৭) শিল্পের বৈচিত্র্য সাধন (To Diversify the Industries)

সংরক্ষণের সাহায্যে দেশে সকল প্রকার শিল্প গড়িয়া তোলা উচিত কারণ দেশে বহুপ্রকার ব্যক্তি থাকেন, প্রত্যেকের প্রতিভা সমান নয়। যাহাতে সকল ব্যক্তি নিজেদের ঝোঁক, প্রবণতা বা নৈপুণ্য অনুযায়ী নিজেকে উন্নত করিতে পারে সেই জন্য সকল প্রকার শিল্প থাকা প্রয়োজন। শিল্পের বিভিন্নতা সাধিত হইলে ইহার ফলে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা (National Selfsufficiency) ঘটিবে প্রয়োজনের সময় সকল দ্রব্যোৎপাদনের ব্যবস্থাই থাকিবে। তাহা ছাড়া সমরোপকরণ-শিল্প বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে যে সকল শিল্প থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়—এই সকল শিল্পের উন্নতির জন্য নিশ্চযই সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করা উচিত। অ্যাডাম্ স্মিথ্ বলিয়া গিযাছেন যে দেশরক্ষার তুলনায় অর্থের গুরুত্ব কম (opulence is less important than defence)।

শিল্পের বৈচিত্র্য সাধন

(৮) ডাম্পিং-এর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া (To protect from Foreign Dumping) :

বিদেশী ব্যবসায়ীরা নিজের দেশে চড়া দাম বজায় রাখিয়া অন্য দেশে উৎপাদন-ব্যয় হইতে কম দামে বিক্রয় করাকে সাধারণতঃ ডাম্পিং বলা হয়। এই ডাম্পিং-এর ফলে দেশীয় শিল্পপতিগণ প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে না পারায় ক্রমে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হন, বিদেশী ব্যবসায়ীরা তখন বাজারের একচেটিয়া অবস্থার সুযোগ পাইবার জন্য দাম চড়াইয়া দেয়।

ডাম্পিং-এর বিরুদ্ধে

ডাম্পিং ঘটিতে থাকিলে অবশ্যই তাহার বিরুদ্ধে শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শিল্পসমূহকে সংরক্ষিত করা উচিত, কিন্তু দেখা যায় যে ডাম্পিং বন্ধ হইলেও শুল্ক চলিতে থাকে এবং কোন কারণে শুল্ক বসান হইলে সেই শুল্ক অন্যান্য আইনকানুনের ন্যায় স্থায়ীভাবে সরকারের নীতির অঙ্গ হিসাবে চলিতে থাকে।

অসুবিধা

সংরক্ষণ নীতির বিপদ (Positive Dangers of Protection):

প্রতিযোগিতা হ্রাস, আমদানী হ্রাস, দামবৃদ্ধি, একচেটিয়া শিল্পসংগঠন, রাজনৈতিক অসাধুতা, প্রভৃতি

সংরক্ষণ নীতির কয়েকটি ত্রুটি ও বিপদ থাকে। যেমন, প্রথমতঃ, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা কমিয়া গেলে দেশীয় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ অলস, নিরুৎসাহ বা উদ্যোগহীন হইয়া উঠিতে পারে, সকল প্রকার উন্নতি সাধনের প্রেরণা নষ্ট হইতে পারে; উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের কোন প্রচেষ্টা থাকে না, সংরক্ষিত শিল্পে যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধারণতঃ করা হয় না। অনেক সময় উচ্চ-হারে আমদানী শুল্ক স্থাপনের ফলে আমদানীর পরিমাণ খুবই কমে, মোট রাজস্বের পরিমাণও কমিয়া যায়।

ভোগকারীগণ দামবৃদ্ধির ভয় করেন, কারণ আমদানী শুল্কের ভার খুবই কম ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার স্কন্ধে পড়ে, প্রধানতঃ ভোগকারীর নিকট হইতে দাম বাডাইযাই উহা আদায় করা হয়। গরীব ভোগকারীর উপর আরও চাপ পড়ে।

বলা হয় যে শুল্কই একচেটিয়া সংগঠনের জন্মদাতা। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা দূর হইলেই দেশীয় উদ্যোক্তাগণ একত্রে জনসাধারণকে তীব্রতর ভাবে শোষণ করিবার জন্য একচেটিয়া সংগঠন গডিয়া তোলেন।

তাহা ছাড়া, দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অসাধুতা ও অন্যায় প্রভৃতি বৃদ্ধি হয়; অনেক ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের জন্য ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থানুযাযী চলিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে অর্থের সাহায্যে রাজনৈতিক নেতাদের ক্রয় করিযা রাখেন, অন্ততঃ বহু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা দেখা গিয়াছে।

সংরক্ষণের পদ্ধতি ও রূপ (Methods and Forms of Protection):

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে বহুপ্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ও পদ্ধতিকে বিভিন্ন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে; দেখা গিয়াছে যে সংরক্ষণ মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

(১) শুল্ক (Duties):

শুল্ককে দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়: **রাজস্ব শুল্ক** (Revenue Duties) এবং **সংরক্ষণী শুল্ক** (Protective Duties)। প্রধানতঃ সরকারী আয় বাড়ানর উদ্দেশ্যে প্রথম প্রকার শুল্ক বসান হয়, এবং প্রধানতঃ দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় প্রকার শুল্ক বসে। অবশ্য এইরূপ ভাগ করা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত নহে, আইন প্রণয়নকারীদের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শুল্কের সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা

চলে না। তবুও এইরূপ বিভাগ করিলে দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা থাকিতে পারে, অর্থাৎ রাজস্বের দিক হইতে যে শুল্ক বিশেষ আয়কারী তাহা সংরক্ষণের দিক হইতে পর্যাপ্ত নহে; আর সংরক্ষণের দিক হইতে যাহা পর্য্যাপ্ত, তাহাতে আমদানী বন্ধ হইয়া যায় ও রাজস্ব আদায় খুবই কমিয়া যাইতে পারে।*

শুল্ককে আরও দুইপ্রকারে বিভক্ত করা যায়: আমদানী শুল্ক ও রপ্তানী শুল্ক।

(ক) **আমদানী শুল্ক:** বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইলে তাহাকে আমদানী শুল্ক বলা হয়; এইরূপ আমদানী শুল্ক, প্রধানতঃ, দুইপ্রকারের হইতে পারে: নির্দিষ্টানুসার শুল্ক (specific duty) এবং মূল্যানুসার শুল্ক (Ad valorem Duty)। নির্দিষ্টানুসার শুল্কে দ্রব্যের ওজন, আয়তন বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শুল্কের হার স্থির করা হয়; মূল্যানুসার শুল্কে দ্রব্যের মূল্য অনুযায়ী শুল্কের হার স্থির হয়।

(খ) দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সেই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর **রপ্তানী শুল্ক** বসান হইতে পারে। রপ্তানী শুল্কের ফলে রপ্তানী কমিবে; আভ্যন্তরীণ বাজারে কাঁচামালের দাম কমিয়া যাইবে, বিদেশে কাঁচামাল দুষ্প্রাপ্য হইবে, উহার দামও বাড়িবে। এইরূপ করিলে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল, ইহা কার্যতঃ কাঁচামাল উৎপাদকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষা করে।

(২) অর্থ সাহায্য (Bounties and Subsidies):

কোন বিশেষ দেশীয় শিল্পের উৎপাদন ব্যয় অধিক থাকিলে বা বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কম থাকিলে সরকার উহাকে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। এই পদ্ধতিতে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণী নীতিকে অর্থ সাহায্য পদ্ধতি বলা হয়। অনেক সময়, কমহারে আমদানী শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শিল্পকে একই সঙ্গে কিছুটা অর্থ সাহায্যও করা হয়; আমদানী শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থ, অর্থ-সাহায্যে ব্যয়িত হইতেছে, এরূপও দেখা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (I. T. O.) আমদানী শুল্ক স্থাপনে পছন্দ না করিলেও অর্থ-সাহায্য সম্বন্ধে নীরব আছেন। সাধারণতঃ উৎপাদনের

কিরূপে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়

*অবশ্য দীর্ঘকালে, সংরক্ষণী শুল্কের ফলে দেশে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হওয়ায় সরকারী রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে।

পরিমাণ অনুযায়ী অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়; কিন্তু অনেক সময়ে মোট কিছু অর্থও একত্রে (lumpsum) সাহায্যরূপে দেওয়া চলিতে পারে।

বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ

অর্থ-সাহায্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে (ক) এই নীতি কার্যকরী করিতে হইলে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পরিমাণের উপর তীক্ষ্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন, বাস্তবে তাহা সম্ভব না-ও হইতে পারে। (খ) দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে অত্যন্ত বেশী পরিমাণ অর্থ-সাহায্যের প্রযোজন হইতে পারে। (গ) জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহা মুষ্টিমেয় শিল্পপতির স্বার্থ-রক্ষায় ব্যয় করা উচিত কিনা তাহা সন্দেহজনক।

স্বপক্ষে যুক্তি

কিন্তু অর্থ-সাহায্য নীতির স্বপক্ষে বলা হয় যে (ক) শুল্কের ফলে দামবৃদ্ধি হইবে, কিন্তু অর্থ-সাহায্যে দাম বৃদ্ধি হইবে না, (খ) প্রদত্ত অর্থ দেশেই থাকিবে, (গ) দ্রব্যের বিভিন্ন গুণগত স্তরের (grade) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা ও সেই অনুযায়ী অর্থ-সাহায্য করা সম্ভব, (ঘ) সকলেই সঠিকভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারে যে ঠিক কি পরিমাণ অর্থ এই সংরক্ষণের জন্য ব্যয়িত হইতেছে।

(৩) পরিমাণগত বাধা-নিষেধ (Quantitative Restrictions):

লাইসেন্স

এই পদ্ধতি অনুযায়ী কোন রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ স্থির করিয়া দেয় এবং সাধারণতঃ, (ক) **লাইসেন্স** প্রদান করিয়া আমদানীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা আছে। অনেক সময় শুল্ক ধার্য করিলেও উৎপাদন-ব্যয়ে বা দামে পরিবর্তন ঘটিয়া শুল্কের কার্যকারিতা কমাইয়া দিতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমদানীর পরিমাণ সঙ্কুচিত করিয়া সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সফল করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে বৈদেশিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ খুবই বাড়িয়া যায়। শুল্কের দ্বারা সংরক্ষণ করিলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দামের মধ্যে কিছুটা সংযোগ রক্ষিত হয়, কিন্তু এই পদ্ধতিতে দুই দেশের দামে কোন সংযোগ থাকে না। আমদানী-নিয়ন্ত্রণের ফলে দামবৃদ্ধি হয়, এবং তাহার দরুণ

শুল্ক ও পরিমাণগত বাধা-নিষেধ উভয়-পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার

মুনাফা ব্যবসায়ীরাই লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু শুল্ক ধার্য করিলে আমদানীও নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের আয়ও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। আমদানী-নিয়ন্ত্রণ করিলে সাধারণতঃ ইহাও ঠিক করিতে হয় যে কোন আমদানীকারীকে কত আমদানীর সুযোগ দেওয়া হইবে এবং কোন দেশ হইতে কত আমদানী করিতে পারিবে। পক্ষপাতিত্ব

ও অসাধুতার সুযোগ ইহার ফলে বাড়িয়া যায়। আমদানীর পরিমাণ খুবই কমাইলে দেশীয় উৎপাদকগণ মিলিয়া একচেটিয়া সংগঠন স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে শোষণের সুযোগ পায়।

(খ) পরিমাণগত বাধা-নিষেধের আর একটি রূপ হইল বিদেশী দ্রব্য আমদানী করিয়া **নির্দিষ্ট অনুপাতে দেশী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া** তবেই বিক্রয় করা চলিবে এইরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া। সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চলিতে পারে না, একই প্রকার ও একই ধরণের দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে (Standardised Products) এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলে অবশ্য দেশীয় দ্রব্যের কিছু বিক্রয় নিশ্চিত করা যায়।

(গ) পরিমাণগত বাধা-নিষেধের বিশিষ্ট উপায় হইল আমদানীর আনুপাতিক অংশ বা **কোটা** নির্দিষ্ট করা।

সর্বব্যাপী কোটা

যখন কোন দ্রব্য আমদানীর পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে আমদানি করা চলে তখন তাহাকে সর্বব্যাপী (Global) কোটা বলে। তবে, ইহাতে বিভিন্ন রপ্তানীকারী দেশ অনেক ক্ষেত্রে আমদানীকারী দেশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনিয়া থাকে। সুতরাং, অনেক ক্ষেত্রে কোন্ দেশ হইতে কত আমদানী হইবে তাহা ও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

শুল্ক কোটা

যদি কোন দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনা শুল্কে বা কম হারে আমদানী করিবার অনুমতি থাকে, কিন্তু উহার বেশী আমদানী করিতে হইলে শুল্ক বা অধিক হারে শুল্ক দিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে শুল্ক কোটা (Tariff Quota) বলে। অধিক হারে শুল্ক দিলে অবশ্য আমদানীর কোন পরিমাণগত বাধা থাকে না।

একপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক কোটা

অপর কোন দেশের সহিত আলাপ আলোচনা না করিয়া নিজের স্বার্থে কোন সরকার কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমদানীর উচ্চতম পরিমাণ স্থির করিয়া দিলে তাহাকে একপাক্ষিক কোটা (Unilateral Quota) বলে। উভয় দেশের সহিত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে উভয়ের আমদানীর পরিমাণ স্থির হইলে তাহাকে দ্বিপাক্ষিক কোটা (Bilateral Quota) বলে।

(৪) শাসনতান্ত্রিক সংরক্ষণ (Adminstrative Protection) :

শাসন সংক্রান্ত বহু আইনকানুনের ফলে সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী হইতে

পারে। যেমন, (ক) শুল্ক কর্তৃপক্ষের আদেশ নির্দেশ, (খ) রেল ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের আদেশ, নির্দেশ বা ভাড়ার স্বতন্ত্রীকরণ (গ) সরকারী প্রয়োজনে দ্রব্যাদি ক্রয়-সংক্রান্ত আদেশ নির্দেশ প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীক বাণিজ্য (State Trading):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে যখন ব্যক্তির হাতে বাণিজ্যের কোন ক্ষমতা না রাখিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র নিজের হাতেই তুলিয়া লয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল ব্যবসাই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে, তাই বৈদেশিক বাণিজ্যও তাহা হইতে বাদ যাইতে পারে না। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবেই রাষ্ট্র আমদানী ও রপ্তানীর বাণিজ্য নিজের আয়ত্তে রাখে। প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া ও পরে জার্মানী এইরূপ রাষ্ট্রিক বাণিজ্য পরিচালনা পদ্ধতির প্রসার করিয়াছে। অন্যান্য দেশের নিকট হইতে দরকষাকষিব ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুবির্ধা লাভ করা রাষ্ট্রিক বাণিজ্যের অপরাপর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রিক বাণিজ্য কাহাকে বলে

বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রিক বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করিতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের দাম স্থির রাখা, অন্য রাষ্ট্রেব সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা মজুত করা, প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনেব জন্য বাষ্ট্রিক ব্যবসা পরিচালিত হইতে পাবে। রাশিযা, পুর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ; নয়া চীন ছাড়াও আর্জেন্টিনা; গমের ব্যবসাতে অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা; কাঁচা তুলা, চা, লৌহ সংক্রান্ত ব্যতীত অন্যান্য ধাতুসমূহের এবং খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসাতে ইংলণ্ড এবং অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকাও এইরূপ রাষ্ট্রিক বাণিজ্য চালাইয়া থাকেন। ভারতেও বাষ্ট্রের তরফ হইতে বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্যে রাষ্টিক বাণিজ্য করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যসমূহ

রাষ্ট্রিক বাণিজ্যের সুবিধা হিসাবে বলা হয় যে ইহাব ফলে ভোগকারীরা উপকৃত হইবেন, কারণ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে আমদানী ও রপ্তানীর বিপুল মুনাফা রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসিলে রাষ্ট্র দ্রব্যাদির দাম কমাইয়া দিতে পারে বা উন্নয়নমূলক কার্যে ওই মুনাফা ব্যয় করিতে পারিবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে একচেটিয়া সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়াও সম্ভব হইবে। অপর রাষ্ট্রের সহিত দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যহার দেশের অনুকূলে আসিবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করিবার উপযোগী দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানীর নিয়ন্ত্রণ সহজ হইবে।

সুবিধা

রাষ্ট্রিক বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে সরকারী কর্মচারীগণ বাণিজ্য সম্পর্কে একান্ত অনভিজ্ঞ এবং দেশের চাহিদা ও যোগানের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় তাহারা ভুল পরিমাণে এবং ভুল দামে আমদানী ও রপ্তানী করিবে। বাণিজ্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মনান্তর ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় আন্তর্জাতিক কলহ তিক্ততা ও সংঘর্ষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, প্রতিযোগিতা লোপ পাইয়া একচেটিয়া অধিকার সৃষ্টি হইবে এবং সরকারী কর্তৃত্বের অনবরত পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলি এই ক্ষমতাব উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবে না। কোন রাষ্ট্রেব অর্ডার অপর দল সরকার গঠন করিয়া বাতিল করিয়া দিবে—এইরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। ইহাও মনে রাখা দরকার যে সরকারী সকল ব্যবসার ন্যায় এক্ষেত্রেও উদ্যোগ ও উৎসাহ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবে। রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল দেশগুলি রাজনৈতিক চাপে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে।

ত্রুটিসমূহ

আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহ

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund)

পৃথিবীতে যখন স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তখন বৈদেশিক বিনিময়হাব স্বয়ংক্রিয় ভাবে নির্ধারিত হইয়া পড়িত এবং স্বর্ণের আদান প্রদান দ্বারাই আমদানী ও রপ্তানীব মূল্য পরিশোধ করা হইত বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার লেন-দেন করা হইত। ১৯২৯/৩০ সালের মহা অর্থ নৈতিক সঙ্কটের ফলে স্বর্ণমানের পতন হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিনিময়-ব্যবস্থা (Exchange Mechanism) সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া গেল। তাহাব পর সুরু হইল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, অস্থির ও সদাচঞ্চল বিনিময়হার, বহির্মূল্য পাতন, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক, কোটা প্রভৃতির যুগ। আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া গেল, আভ্যন্তরীণ দামস্তর, আয় ও কর্ম সংস্থানের স্তর সঠিক রাখাই প্রত্যেক দেশের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় এমন এক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার প্রয়োজন দেখা দিল যাহার দ্বারা আভ্যন্তরীণ আর্থিকনীতির স্বাধীনতা থাকে এবং ইহারই সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন অবাধভাবে

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

চলিতে পারে। ব্রেটন উডস্ চুক্তি দ্বারা স্থাপিত এই আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার পুরাতন স্বর্ণমানের স্থলে প্রতিষ্ঠিত নূতন ব্যবস্থা; স্বর্ণ ও কাগজীমান উভয়ের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া গৃহীত এক ধরণের মিশ্রমান; কেইন্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে "উন্নত ধরণের আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা" স্থাপনের প্রচেষ্টা। বহু আলাপ অলোচনার পর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচনার প্রথমে ব্রিটেন এবং আমেরিকা উভয় দেশই নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করেন; প্রস্তাবিত ইংলণ্ডের পরিকল্পনাকে বলা হয় ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা (Bancor Plan) এবং মার্কিণ প্রস্তাবকে বলা হইত ইউনিটাস্ পরিকল্পনা (Unitas Scheme)।

আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা

কেইন্‌সের নেতৃত্বে ব্রিটেন যে পরিকল্পনা পেশ করিযাছিল তাহার মূল কথা ছিল আন্তর্জাতিক লেন দেনের উদ্দেশ্যে নূতন এক ধরণের মুদ্রা প্রচলন করা। এই পরিকল্পনায় বলা হইযাছিল যে এক আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং সংস্থা স্থাপিত হইবে; পৃথিবীর সকল দেশই সেই সংস্থার সভ্য হইবে; ব্যাঙ্কে ব্যক্তি যেরূপ হিসাব রাখে জাতিসমূহও নিজ নিজ নামে ক্লিয়ারিং সংস্থায় সেইরূপ হিসাব রাখিবে; স্বর্ণের সহিত নির্দিষ্টহারে নির্ধারিত ব্যাঙ্কর (Bancor) নামে নূতন আন্তর্জাতিক অর্থে এই হিসাব রক্ষিত হইবে। আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ভুত সকল দেনাপাওনা এই অর্থের হিসাবে ক্লিয়ারিং সংস্থার নিকট জাতির জমা বাড়াইয়া বা কমাইয়া মিটাইয়া ফেলা হইবে। সংস্থার সভ্য সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নামেই এই হিসাব রক্ষিত হইবে; লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হইতে থাকিলে সংস্থার নিকট রক্ষিত জমার হিসাব বাড়িতে থাকিবে; লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে থাকিলে সংস্থার নিকট রক্ষিত জমার হিসাব কমিতে থাকিবে। যাহাতে জমা ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হ্রাস না পায় সেই জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সের আনুকূল্য বা প্রতিকূলতা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক সভ্য-রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধ করিলে সংস্থা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত ওভারড্রাফ্‌ট্ লইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা থাকিবে; ইহার ফলে কোন দেশ অপর দেশের দেনা মিটাইবার জন্য কিছুটা সময়ও পাইবে।

ব্রিটেন কর্তৃক উত্থাপিত কেইন্‌সীয় প্রস্তাব বা ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা

আমেরিকার পরিকল্পনায় একটি আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব-সাধনকারী ভাণ্ডার

(International Stabilization Fund) স্থাপনের কথা বলা হইয়াছিল। নিজ দেশের কিছু মুদ্রা সকল সদস্য রাষ্ট্রই এই ভাণ্ডার কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দিবে, অন্য রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয়ের জন্য তাহা ব্যবহৃত হইবে। সকল লেনদেনের রূপই হইবে এক মুদ্রার দ্বারা অপর মুদ্রার ক্রয় ও বিক্রয়, ব্যাঙ্কর পরিকল্পনার ন্যায় কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রা সৃষ্টি করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল না। লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হইলে ভাণ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা দ্রুত ফুরাইয়া আসিবে (অন্যান্য দেশ দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়া লইবে); লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইলে ভাণ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা মোটেই ফুরাইবে না, ভাণ্ডারে হাতেই থাকিয়া যাইবে (অন্যান্য দেশ ক্রয় করিবে না, কারণ দেনা মিটাইবার প্রয়োজন নাই)।

আমেরিকা কর্তৃক উত্থাপিত হোয়াইট প্রস্তাব বা ইউনিটাস্ পরিকল্পনা

ব্রিটেন ও আমেরিকার উভয় পরিকল্পনা লইয়া দুই দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ এবং ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর নূতন এক পরিকল্পনার উদ্ভব হয় এবং ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটেন উড্‌স্ নামক স্থানে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনা সম্পর্কীয় চুক্তির দুই অংশ : প্রথম অংশ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার সংক্রান্ত এবং অপর অংশ আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত। ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর হইতে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের কার্য সুরু হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার স্থাপন

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংগঠন ও কার্য্যাবলী (Organisation and Functions of the I.M.F.):

বৈদেশিক বিনিময় সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। সকল সভ্যই নিজ দেশের মুদ্রা এবং স্বর্ণ বা ডলারে কিছু পরিমাণ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা দেয় এবং প্রযোজন হইলে ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারে।

৮৮০ কোটি ডলার লইয়া এই অর্থ ভাণ্ডার গঠিত, যাহারা এই ভাণ্ডারের সদস্য তাহারা নিজ নিজ (Quota) জমা দিয়া এই তহবিল সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক সদস্যের কোটার ২৫%, অথবা সরকারী ভাবে রক্ষিত স্বর্ণ বা ডলারের ১০% (উভয়ের যেটির পরিমাণ কম) স্বর্ণ বা ডলারে জমা দিতে হইয়াছে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অবশিষ্ট অংশ নিজ মুদ্রাতেই জমা দিয়াছে। ছোট ছোট কয়েকটি রাষ্ট্র নিজ কোটার সম্পূর্ণ অংশ জমা দিতে পারে নাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অর্থ ভাণ্ডারে

ভাণ্ডারের সংগঠন ও কার্যকলাপ

যোগদান করে নাই। সকল সদস্য রাষ্ট্রই স্বর্ণ বা ডলারের সহিত নিজ মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত করিয়া সরকারীভাবে তাহা ঘোষণা করিয়াছে। সরকারীভাবে নির্দিষ্ট ও ঘোষিত এই বিনিময়-হারের উভয় দিকে (উর্ধে বা নিম্নে) সর্বাধিক ১০% পর্যন্ত বিনিময়-হারে পরিবর্তন সদস্যগণ প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেরাই করিতে পারেন; এবং ভাণ্ডার কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া বৈদেশিক বিনিময়-হারে আরও ১০% পরিবর্তন করা চলে। লেনদেন ব্যালান্সে "মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা" (Fundamental Disequilibrium) দেখা দিলেই সরকারী বৈদেশিক বিনিময়-হারে এরূপ পরিবর্তন করা সম্ভব; কিন্তু ভাণ্ডারের কোন নিয়মে বলা হয় নাই যে কতবার বা কতদিন পরে পরে এইরূপ পরিবর্তন করা নিয়মসঙ্গত। স্বর্ণের বা ডলারের সহিত বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওয়ায় সকল সদস্য-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যেই পারস্পরিক বিনিময় হার আপনা আপনি স্থির হইয়া পড়িয়াছে।

লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিকূলতা আসিলে বা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনা হইলে কোন সদস্যরাষ্ট্র ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থক্রয় করিতে পারিবে। সরকারী-ভাবে নির্দিষ্ট দামের উপর ½% হইতে ১% অধিক দামে উহা ক্রয় করিতে হইবে; ভাণ্ডারের কাজকর্ম চালাইবার উপযোগী ব্যয় এইরূপে পাওয়া যাইবে। কোন সদস্য রাষ্ট্র প্রতিবৎসর নিজের কোটার ২৫% পর্যন্ত অন্য দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারেন।* কোন সদস্য দেশ নিজের কোটার ২০০% এর অধিক নিজদেশীয় অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা রাখিতে পারিবে না। ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে সুদ দিতে হইবে: দীর্ঘকালের জন্য এবং অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে সুদের হার বেশী; স্বল্পকালের জন্য এবং কম পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে সুদের হার কম। ভাণ্ডার কোন দেশের মুদ্রাকে "দুষ্প্রাপ্য" (Scarce) বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেই সদস্য দেশকে স্বর্ণের বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রয় করিতে বা ভাণ্ডারকে ঋণদান করিতে অনুরোধ জানাইতে পারে।

পরিচালনা

ভাণ্ডারের দৈনন্দিন পরিচালনা করিবে ১২জন লইয়া গঠিত একটি কার্যকরী পরিচালকবৃন্দ (Executive Directors); সর্বাধিক কোটাসম্পন্ন পাঁচটি দেশ (সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগ না দেওয়ায় ভারতবর্ষ ইহার একজন স্থায়ী সদস্য) পাঁচজন প্রতিনিধি; যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অপরাপর আমেরিকার দেশগুলি হইতে দুইজন; অন্যান্য দেশ হইতে পাঁচজন। কার্যকরী

* ভাণ্ডারের বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে দ্রুত ফুরাইয়া না যায় এবং সদস্যরা ভারসাম্য-বিহীনতা দূর করিবার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন—সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পরিচালকবৃন্দ একজন সভাপতি নির্বাচিত করিবে এবং তিনি কার্যকরী সংস্থার প্রধান হিসাবে ভাণ্ডারের কার্যাদি পরিচালনা করিবেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও পরিধি বিস্তৃতির জন্য বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে সকল প্রকার বাধা নিষেধ দূরীভূত করা; সংক্ষেপে বলিলে সকল দেশের অর্থের সমমুখী রূপান্তরযোগ্যতা (Multilateral convertibility) প্রতিষ্ঠা করা। তাহা সত্ত্বেও বর্তমান অবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া বৈদেশিক বিনিময়ের বাধানিষেধসমূহ (Foreign exchange restrictions) সম্পূর্ণ দূর করার কথা ভাণ্ডারের নিয়মে বলা হয় নাই। পরিবর্তনের যুগে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সকল পদ্ধতি, এমন কি বহুধা বিনিময়-হারও (Multiple Exchange Rates) রাখা যাইতে পারে; তবে সম্ভব হইলেই এবং লেনদেন ব্যালান্সে অবস্থার উন্নতি ঘটিলেই ইহাদের পরিহার করা কর্তব্য হইবে। ভাণ্ডার হইতে ঋণগ্রহণ না করিয়াই অন্যান্য সকল দেশের দেনা মিটান যায়—এইরূপ অবস্থায় আসিলেই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ পরিহার করা বাঞ্ছনীয় হইবে। ৫ বৎসরের পরও এইরূপ ব্যবস্থাদি ব্যবহার করিতে হইলে ভাণ্ডারের অনুমতি লইতে হইবে, ইহাই নিয়ম দ্বারা স্থির হইয়াছিল। এইরূপে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বিনিময়-কাঠিন্যের (Exchange rigidity) পরিবর্তে বিনিময়-স্থায়িত্ব (Exchange stability) বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন এবং কিছু পরিমাণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ (Exchange control) বজায় রাখিয়া বিনিময়-নমনীয়তা (Exchange flexibility) আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বৈদেশিক বিনিময়ের বাধানিষেধসমূহ

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কেইন্‌সের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং সংস্থার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না আনিলেও ইহার কতকগুলি বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। পরিবর্তনের যুগ শেষ হইলে অর্থের সর্বমুখী রূপান্তর-যোগ্যতা ফিরিয়া আসিতে পারে, সর্বমুখী বৈদেশিক বাণিজ্য (Multilateral Trading) সুরু হইতে পারে, এরূপ আশার সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিবর্তনের মূলে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া এই সংস্থা সকল দেশকে যুদ্ধজনিত অবস্থা পার হইয়া আসার সুযোগ দিয়াছে—ইহা সঠিক অবস্থা-বিচার ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশের কোটা একত্রে মিলাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন কিছুটা সহজ করিয়াছে; কোটার পরিমাণ অল্প হইলেও লেনদেন ব্যালান্সে সাময়িক ভার-

আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের গুণাবলী

সাম্যের বিচ্যুতি দূর করিতে কিছুটা সাহায্য করিয়াছে। চতুর্থতঃ, দেনদার দেশগুলির ঋণভার লাঘব করিতে পাওনাদার দেশগুলিরও যে কিছুটা কর্তব্য আছে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে সেই বোধ জাগ্রত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের দোষাবলী বা কিছুটা অসাফল্যের কারণ

যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় থাকিলে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার সাফল্য লাভ করিতে পাবে, তাহার অভাব-ই ইহার অসাফল্যের কারণগুলি সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা ছাড়া, বহু সদস্যরাষ্ট্র ভাণ্ডারের নিয়ম বিরোধী কাজ করিলেও সেই সকল বেআইনী কার্যাদি বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও সম্ভব না হইলে "উন্নত ধরণের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা" গড়িয়া তোলা যাইবে না। যেমন, সোভিয়েট রাশিয়া এই ভাণ্ডারে যোগ দেয় নাই; ফ্রাঙ্ক বা ষ্টার্লিং-এর বহির্মূল্যে নিয়মবিরুদ্ধ পরিবর্তন হইয়াছে; ভাণ্ডার কর্তৃক নির্দিষ্ট দামের উপরে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বর্ণ বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে। তাহা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে বহু বাধা বিপত্তি ও পরস্পর বিরোধী জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করার এই প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজনীয়; আর কেইন্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে কোন ভাল কিছু গড়িয়া তুলিতে হইলে, কোথাও হইতে নিশ্চয়ই সুরু করা দরকার ("One must begin somewhere")।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development)

ব্রেটন্‌সৃউড্ চুক্তিতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপনের কথাও বলা হইয়াছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিতে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন এবং অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ইহাই এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। সদস্য দেশগুলি হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া ১০০০ কোটি ডলার অনুমোদিত মূলধন লইয়া এই ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সকল সদস্য এই ব্যাঙ্কেরও সদস্য বটে।

উদ্দেশ্য

যে সকল ধনশালী দেশে মূলধন উদ্বৃত্ত রহিয়াছে তাঁহারা যদি স্বল্পমূল-ধনশালা দেশে মূলধন প্রেরণ না করেন তাহা হইলে পৃথিবীর সকল দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারে না; পৃথিবীর কোন অঞ্চলে দারিদ্র্য ধনীদেশের জীবন যাত্রার মান-কেও নীচে টানিয়া রাখে। তাই এই ব্যাঙ্কের গুরুত্ব খুবই বেশী, অনুন্নত দেশসমূহে অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে এই ব্যাঙ্ক সাহায্য করিবে।

গুরুত্ব

ব্যাঙ্ক হইতে বিভিন্ন দেশের সরকার বা ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্য করা হয় এবং ব্যক্তি অর্থসাহায্য গ্রহণ করিলে সেই দেশের সরকার উহাতে নিশ্চয়তা বা গ্যারাণ্টি (Guarantee) প্রদান করেন। অর্থনৈতিক উন্নতি বা উৎপাদনশীল কার্যের উদ্দেশ্যেই একমাত্র ঋণ দেওয়া হয়। কোন ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী বিদেশে বিনিয়োগ করিলে ব্যাঙ্ক তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন; নিজেও ঋণগ্রহণ করিয়া অপরকে ঋণ দিতে সাহায্য করিতে পারেন।

কিরূপে সাহায্য করে

১৯৪৭ সালের মে মাস হইতে ব্যাঙ্কের কার্য সুরু হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ন্যায় এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয়; কার্যকরী পরিচালকমণ্ডলীর প্রধানকে প্রেসিডেণ্ট বলা হয়।

পরিচালনা

এই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বলা হয় যে ইহা প্রধানতঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহকে সাহায্যদান করিতেই ব্যস্ত এবং সেক্ষেত্রেও ইহার সাহায্যের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। তাহা ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার রাজনৈতিক দলভুক্ত দেশগুলিকেই সাধারণতঃ অধিক সাহায্য করা হয়, অর্থাৎ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সহায়ক হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করা হয়, এরূপও বলা হয়। অনুন্নত স্বল্পমূলধনশালী দেশগুলি এখন পর্যন্ত বিশেষ সাহায্য ইহা হইতে পায় নাই। আরও বলা হয় যে, উদ্বৃত্ত মার্কিন মূলধনের বহির্নিয়োগ এবং মুনাফাশীল নিয়োগই ইহার প্রধান লক্ষ্য; ইহা হইল আভ্যন্তরীণ নিয়োগের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়ায় বিদেশী বাজারকে শোষণ করার সংগঠন।

সমালোচনা

অনুশীলনী

1. Show how the comparative costs of producing different commodities in different countries determine international specialisation of production as well as Trade.
(B.com. 44, 49 ; B. A. 46,50)

2. Explain the basis of International Trade. Can there be a large volume of Trade between two highly industrialised countries ? (B.com. '51)

3. Discuss the advantages and disadvantages of International Division of Labour. (B. A. 48)

4. "Our Imports are paid for by our Exports"—Elucidate.
(C. U. B. A. 41)

5. How is a difference in the values of Exports and Imports corrected ? (B.com. 50, 52 ; B.A. 54)

6. On what factors the gains from International Trade depend ? How the gains can be measured ?

7. "There are limits to the fluctuations of Rate of Exchange". Explain with reference to (*a*) Countries on gold standard (*b*) Countries on Inconvertible paper money.
(B.com. 45 ; B. A. 45, 49)

8. Explain how foreign exchange rates are determined between two countries with Inconvertible paper currencies.
(B. A. 51 ; B.com. 48, 53)

9. Examine the effects of a Depreciating currency on Foreign Trade. (B.com. 49, 53)

10. State the case for Free Trade.

11. Discuss the case for Protection. (B. A. 52)

12. Examine the principal arguments foi Free Trade and Protection.

13. Do you advocate Free Trade or Protection ? Give reasons in support of your answer. (B. A. 55)

14. Examine the validity of the different arguments that have been advanced in favour of protection. (B.com. 55)

15. Compare Import duties and Quantitative restrictions as means of protecting home Industries.

16. Discuss briefly the main functions of I M F
(B.com' 1760)

দশম পরিচ্ছেদ
রাষ্ট্রিক অর্থনীতি

ধনবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্র ও অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠান সমূহের (মিউনিসিপালিটি, করপোরেশন প্রভৃতির) আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ইত্যাদির নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা করে তাহাকে রাষ্ট্রিক অর্থনীতি বা গণ-অর্থনীতি (Public finance) বলে। রাষ্ট্রিক অর্থনীতি ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েরই অংশ : রাষ্ট্রীয় আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি দেশের উৎপাদনের পরিমাণ ও ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে ; জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও জীবন যাত্রার মান-এ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায়। রাষ্ট্রীয় আয়ে হ্রাস ব্যক্তির আয় কমাইয়া দেয়, রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যক্তির আয় বাড়ায় ; দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর

রাষ্ট্রিক অর্থনীতি, ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন ও বাধানিষেধের মধ্যেই অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলে, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও নীতি ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজকর্মকে প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং, ইহা ধনবিজ্ঞানের অংশ বিশেষ।

চিন্তাজগতে উনবিংশ শতাব্দীয় ভাবধারার প্রভাব এখন আর নাই, রাষ্ট্রের কাজকর্মের পরিমাণে ও ধরণে আধুনিককালে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কেবলমাত্র আইন ও শৃংখলা রক্ষা করাই আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য নহে, ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতি বা বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক কাজকর্ম করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক ধারণা যে রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ কম হওয়াই মঙ্গল, এমতাবস্থায় তাই চলিতে পারে না। কল্যাণ রাষ্ট্র বা মঙ্গলরাষ্ট্র গঠন করা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের আদর্শ; সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার জয়যাত্রা আজিকার যুগে অব্যাহত। এরূপ অবস্থায় ক্রমেই রাষ্ট্রের আয়, ব্যয় ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, রাষ্ট্রিক বা গণঅর্থনীতির আলোচনা তাই ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রিক অর্থনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি

ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রিক অর্থনীতির পার্থক্য (Distinction between Private Finance and Public Finance):

ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রিক অর্থনীতির মধ্যে বহুক্ষেত্রে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম, ইহা লক্ষ্যনীয় যে, সাধারণতঃ ব্যক্তি নিজের আয় অনুযায়ী ব্যয় স্থির করেন, কিন্তু রাষ্ট্র প্রথমে ব্যয় স্থির করিয়া পরে সেই পরিমাণ আয়সংগ্রহের চেষ্টা করে। যদিও অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ব্যয়সঙ্কোচের চেষ্টা করে এবং আয় অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়-বিভাগের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলেও সাধারণতঃ রাষ্ট্রিক অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী একটু পৃথক।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র নিজের অভ্যন্তরে নাগরিকদের বা রাষ্ট্রের বাহিরে বিদেশীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে সকল ঋণই বাহ্যিক; ব্যক্তি কখনই নিজের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র অর্থ সৃষ্টি করিয়া নিজের ব্যয় নির্বাহ করে, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ অর্থ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

চতুর্থতঃ, কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের চেষ্টা

করেন, কিন্তু রাষ্ট্র সর্বদাই সেইরূপ উদ্বৃত্ত-গঠন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না। ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারাও দ্রুত শিল্পোন্নয়ন বা পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া, দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব খুবই বেশী, সর্বদা ইহা মনে রাখিয়াই রাষ্ট্র বর্তমানের আয় ব্যয়ের ব্যবস্থা করে।

পঞ্চমতঃ, ব্যক্তির ব্যয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে যেরূপে প্রভাবান্বিত করে তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাবের রূপ পৃথক ধরণের। তাহা ছাড়া, নিজের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের ফলে সমাজ-দেহে সামগ্রিক ভাবে কি প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহা বিচার করিয়া ব্যক্তিগত অর্থনীতি পরিচালিত হয় না; কিন্তু রাষ্ট্র তাহার কাজকর্ম চালাইবার জন্য সর্বদাই সামগ্রিক প্রভাব ও ফলাফল বিচার করিয়া থাকে।

সর্বশেষে, বলা চলে, ব্যক্তি যখন ব্যয় করে তখন সে ব্যয়ের প্রত্যেক দিক হইতেই সমান প্রান্তিক উপযোগিতা পাইবার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র কিন্তু চেষ্টা করিলেও সাধারণতঃ উহাতে সক্ষম হয় না। কারণ, রাজনৈতিক, দলগত, শ্রেণীগত বা আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক সময় অর্থনৈতিক হিসাবে অযৌক্তিক ব্যয় করিতে হইতে পারে; অথবা, ভবিষ্যতে সুফলদায়ী কিন্তু বর্তমানে প্রান্তিক উপযোগিতা খুবই কম, এরূপ ব্যয়ের প্রয়োজনও হইতে পারে।

রাষ্ট্রিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য (The objects of Public Finance) :

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রিক অর্থনীতির লক্ষ্যই হইবে যথাসম্ভব কম কর আদায় ও ব্যয়। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ-ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য, সুতরাং অর্থনৈতিক কাজকর্ম ব্যক্তির হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া বিশেষ দরকার। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্র ব্যয় করিলে তাহা অনুৎপাদক হইবেই, অন্ততঃ ব্যক্তিরা ব্যয় করিলে যতটা উৎপাদনশীল হইতে পারিত ততটা কিছুতেই হইবে না। সুতরাং গ্লাডষ্টোনের ভাষায় বলা চলে, ফলপ্রসূ হইবার জন্য অর্থকে ব্যক্তির পকেটেই ফেলিয়া রাখা দরকার (Money should be left to fructify in the pockets of the individual)।

সর্বনিম্ন পরিমাণ ব্যয়ের নীতি

কিন্তু এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়, এবং আধুনিক কালে ইহা বর্জিতও হইয়াছে। সাধারণভাবে সকল কর সর্বদাই খারাপ এরূপ বলা চলে না, যেমন নেশার উপর কর সরাসরিভাবে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রাষ্ট্র ব্যক্তির তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল ভাবে ব্যয় করিতেছে; ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত বিলাসিতায় বা খেয়াল খুশীতে অযথা ব্যয় করিত, রাষ্ট্র তাহা আদায় করিয়া

এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়

জনসাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিতেছে এরূপ ঘটিতে পারে। অবশ্য, কর এরূপ ভাবে আরোপিত হওয়া দরকার যাহাতে কর্মোত্তম ও সঞ্চয়-স্পৃহা কমিয়া না যায় এবং ব্যয় এরূপ প্রকার হওয়া উচিত যাহাতে উহা অপব্যয় হইয়া না পড়ে।

রাষ্ট্রিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় আর একটি নীতি হইল সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতার নীতি (The Principle of maximum social advantage)।

সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতার নীতি

ব্যক্তি যেরূপ আয় ও ব্যয়ের মাধ্যমে সর্বাধিক তৃপ্তি পাইতে চাহে, রাষ্ট্রও সেইরূপ এমনভাবে আয় ও ব্যয় করিবে যাহাতে সামগ্রিক ভাবে সকল সমাজ সর্বাধিক উপকৃত হয়। রাষ্ট্রীয় আয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় উভয়ের ফলেই কাহারও হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসিতেছে এবং কাহারও হাতে উহা চলিয়া যাইতেছে, সম্পদের হস্তান্তরণ (Transfer of wealth) ঘটিতেছে এবং ইহার ফলে উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে (changes take place in the amount and the nature of wealth which is produced)।

সম্পদের এইরূপ হস্তান্তরণের দ্বারা উহার পরিমাণ ও প্রকৃতিতে এইরূপ পরিবর্তন আনিতে হইবে যাহাতে সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতা ঘটে, ইহাই হইল রাষ্ট্রিক অর্থনীতির লক্ষ্য।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে সর্বাধিক সামাজিক উপকারিতা পাওয়া যায় কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমতঃ, কর-কাঠামোর প্রকৃতি (Nature of Tax-structure) ও করপদ্ধতি (Methods of taxation) সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার কর আছে এবং তাহাদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরোপ করিয়া রাজস্ব তোলা যাইতে পারে।

বিচার্য বিষয় সমূহ:
(ক) কর প্রকৃতি ও কর পদ্ধতি
(খ) রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি ও দিক্ বিচার

কোন প্রকার করের ক্ষেত্রে এবং কোন পদ্ধতিতে করভার অধিক, কোথায়ও বা ইহা কম। সুতরাং করের প্রকৃতি ও পদ্ধতি এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে করভার (burden of taxation) সর্বনিম্ন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, কর আরোপনের সর্বশেষ ফলাফল বিচার করাও প্রয়োজন। যদি কর আরোপ করার ফলে কর্মোত্তম ও সঞ্চয়স্পৃহা কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে সমর্থন করা চলে না। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি ও দিক্-বিচার (Nature and direction) করাও বিশেষ প্রয়োজন। যেমন বর্তমানে অধিক ভার বহন করিতে হইলেও রাষ্ট্রীয় ব্যয়

যদি মূলধন-গঠনের কার্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক বিচারে তাহা গ্রহণযোগ্য। রাষ্ট্রীয় ব্যয় পরিমাণে কম হইলেও অনেকক্ষেত্রে উহা অপ্রয়োজনীয় দিকে নিয়োজিত হয়, অর্থনৈতিক বিচারে উহা পরিত্যজ্য। রাজনৈতিক কারণে, দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শৃংখলারক্ষার উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয় খাঁটি অর্থনৈতিক বিচারে গ্রহণযোগ্য না হইলেও সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থে কল্যাণকর হইতে পারে।

শিল্পপ্রধান দেশসমূহে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌছান ও তাহা বজায় রাখা বা আর্থিক অসাম্য দূর করা

আধুনিক কালে শিল্পপ্রধান দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছান-ই রাষ্ট্রিক অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। রাষ্ট্র এরূপ হারে ও এমন প্রকার কর স্থাপন করিবে যাহাতে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অনিযুক্ত উপকরণ সমূহের নিয়োগ বাড়ে, আয়স্তর বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের উপযোগী ভারসাম্য বজায় থাকে। এমনভাবে কর স্থাপিত হইবে যাহাতে কম-ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসে, এবং এমনভাবে ব্যয় হইবে যাহাতে অধিক-ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট সেই অর্থ চলিয়া যায়; সমাজের মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনেকক্ষেত্রে সমাজে আয়-বৈষম্যের পরিধি কমানও রাষ্ট্রিক অর্থনীতির লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়।

শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রসারকে ত্বরান্বিত করা

শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে রাষ্ট্রিক অর্থনীতিব লক্ষ্য হইবে দ্রুত শিল্প সম্প্রসাবণ বা অর্থনৈতিক প্রসারকে ত্বরান্বিত করা। এমনভাবে রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ব্যবস্থা গঠন করা দরকার যাহাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্রুততর হইবার উপযোগী মূলধন-গঠনের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উৎপাদন, জাতীয় আয়, বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও মূলধন গঠন সকল কিছুই যাহাতে একসঙ্গে বাড়িতে থাকে অথচ তীব্র মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে না পারে, ইহা লক্ষ্য রাখা দরকার। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে (Private Sector) আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় না কমাইয়া রাষ্ট্রগত ক্ষেত্রে (Public Sector) বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইতে থাকে; ইহাই এই নীতির বাস্তব লক্ষ্য।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় (Public Expenditure)

দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আয়ের ক্ষেত্রে, তাহাদের জীবন যাত্রার মান প্রভৃতির ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব রাষ্ট্রীয় আয় হইতে কিছুমাত্র কম নহে,

এই তত্ত্ব আধুনিক যুগের ধনবিজ্ঞানীদের চিন্তা জগতে একটি বিশেষ দান। পূর্বে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণই ছিল খুব কম, সুতরাং ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ফলাফল ধনবিজ্ঞানীদের তত্ত্বালোচনায় অংশগ্রহণ করে নাই। রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায়, রাষ্ট্রীয় ব্যয় দ্রুতগতিতে ও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়া যাওয়ায় এবং কেইন্‌সীয় মতবাদের প্রভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা সমগ্রালোচন পদ্ধতি (Macro-analysis) প্রসার লাভ করায় ইহার আলোচনা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিতেছে।

পূর্বের তুলনায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ অনেক। প্রথমতঃ, আধুনিক কালের রাষ্ট্র আর পূর্বের ন্যায় ক্ষুদ্রায়তন নাই, রাষ্ট্রের সীমা বর্ধিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে, ভৌগলিক সীমা বর্ধিত না হইলেও ইহার জনসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি হইয়াছে; স্বভাবতঃই সরকারী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য অধিক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তৃতীয়তঃ, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে, মাথাপিছু ব্যক্তিগত আয় বাড়িতেছে, জীবন যাত্রার মান-ও বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় উভয়ই বাড়িতেছে। চতুর্থতঃ, আধুনিক কালে যুদ্ধ চালান বা সমরোপকরণ সংগ্রহ করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ প্রস্তুতি, যুদ্ধ বা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সর্বদাই রাষ্ট্রের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া রাখিয়াছে। পঞ্চমতঃ, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারের ফলে রাষ্ট্র ক্রমেই জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম অধিক পরিমাণে করিতেছে, ফলে উহার ব্যয়ও বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাও দেখা যায় যে অনেক শিল্প বা ব্যবসা রাষ্ট্রের হাতে থাকিলে উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে, উপকরণের অপচয় হয় না। এই সকল কারণে আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাধারণভাবে সর্বত্র রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির কারণ

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত তাহার সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বলা যায় না, রাজনৈতিক নীতি এবং জনসাধারণের ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুযায়ী ইহার পরিমাণ ধার্য্য করা উচিত। তবে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, জাতীয় ও ব্যক্তিগত আয়ের উপর ইহার গভীর প্রভাব থাকায় এই সকল বিষয়কে আকাঙ্খিত স্তরে লইয়া আসিবার উপযোগী পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা উচিত।

ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কীয় নীতি নির্ধারণ

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Expenditure) :

বিভিন্ন ভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন—

(১) প্রথমতঃ, রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে (ক) যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যয় বা কেন্দ্রীয় ব্যয় (খ) রাজ্যের ব্যয় বা প্রাদেশিক ব্যয়, এবং (গ) স্থানীয় ব্যয় বা স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়—প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে দান (grants) বা ক্রয়মূল্য (Purchase Prices)—এইরূপ ভাবে বিভক্ত করা চলে। যে সকল ব্যয়ের দরুণ তৎক্ষণাৎ কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না তাহাদের দান বলে, কিন্তু কোন দ্রব্য বা কার্যাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে ব্যয় করে, তাহাকে ক্রয়মূল্য বলা যায়।

(৩) তৃতীয়তঃ, যে সকল ব্যযের ফলে দেশের সম্পদ সম্ভার বৃদ্ধি পায় তাহাকে উৎপাদনশীল (Productive) ব্যয় বলা যায়; যাহাদের ফলে কোনরূপ সম্পদ সম্ভার বর্ধিত হয় না, তাহাদের অনুৎপাদক (Unproductive) ব্যয় বলা হয়।

(৪) চতুর্থতঃ, ডাল্টন্‌-এর মতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার হাত হইতে দেশকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয়, এবং (খ) সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যয।

(৫) পঞ্চমতঃ, আসল-ব্যয় (Real Expenditure) এবং হস্তান্তর-ব্যয় (Transfer Expenditure)—এই দুই শ্রেণীতেও ইহাকে বিভক্ত করা চলে। যে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের উপকরণ বা সম্পদ সমূহের ব্যবহার হয়, তাহাদের আসল-ব্যয় বলে, যেমন যুদ্ধ বা দ্রব্যোৎপাদন প্রভৃতি। কিন্তু যে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বা ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ হস্তান্তরিত হয় মাত্র, যেমন আভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ বা সুদ প্রদান প্রভৃতি,—তাহাদের হস্তান্তর-ব্যয় বলা হয়।

(৬) ষষ্ঠতঃ, প্লেহ্‌নের মতে জনসাধারণের পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর, ইহা বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে চারি ভাগে ভাগ করা সম্ভব।

(ক) যে সকল ব্যয় সকল নাগরিকের পক্ষে সমান কল্যাণকর, যেমন পুলিশ, সৈন্যবাহিনী, প্রভৃতি (খ) যাহা কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ ধরণের কল্যাণকারী কিন্তু সামগ্রিক ভাবেও কল্যাণকর বলিয়া বিবেচ্য, যেমন সমাজবীমা প্রভৃতির জন্য ব্যয়। (গ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী এবং সকলের পক্ষে কল্যাণকর, যেমন বিচার বিভাগের জন্য ব্যয়। (ঘ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, যেমন সরকারী চাকুরীতে বা শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ব্যয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল (Effects of Public Expenditure) :

(ক) উৎপাদন (Production) : ডাল্টনের মতে উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা যাইতে পারে : কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা (Ability to work and save), কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা (Desire to work and save) এবং সম্পদ ও উপকরণ সমূহের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন (Diversion of economic resources)। যে সকল ব্যয়ের ফলে জনসাধারণের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য ব্যয়, তাহারা লোকের কর্মোদ্যম বাড়াইতে সাহায্য করে। আয় বৃদ্ধি পায়, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও বাড়ে। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একাংশ জনসাধারণকে সাহায্য, বেকারভাতা, বৃদ্ধবয়সে পেন্‌শন্ ইত্যাদি হিসাবে দেওয়া হয়, ডাল্টনের মতে ইহার অর্থনৈতিক ফলাফল অশুভ, কারণ ইহা কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহাকে কমাইয়া দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র নিজেই শিল্প স্থাপন করে বা অর্থসাহায্য করিয়া বিশেষ ধরণের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করে। এইরূপ ব্যয়ের ফলে উৎপাদক উপকরণ সমূহ কোনো ব্যবহার হইতে সরিয়া আসিয়া অপর ব্যবহারে নিযুক্ত হইতে থাকে, উহাদের নিয়োগের দিক্‌পরিবর্তন ঘটে। এইরূপ দিক্ পরিবর্তনের ফলে যদি মোট উৎপাদন ও জাতীয় আয় এবং উপাদান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় আয়ের ফল অর্থনৈতিক বিচারে সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচ্য।

(ক) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা
(খ) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা
(গ) উপকরণের নিয়োগে দিকপরিবর্তন

(খ) বণ্টন (Distribution) :

এরূপভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা সম্ভব যাহার ফলে সমাজে আয়-বৈষম্য কমাইয়া ফেলা যায়। যেমন ধনীদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেকারভাতা, বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌শন্, বিনাব্যয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ব্যয় করিলে আয়বৈষম্য কিছুটা কমে। ডালটনের মতে এইরূপ উদ্দেশ্যে ব্যয় প্রগতি-মূলক (Progressive) নীতিতে করা দরকার, অর্থাৎ ব্যক্তি যত অধিক গরীব হইবে তত অধিক হারে রাষ্ট্রের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইবে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সাহায্যে আয়-বৈষম্য কমাইয়া মোটামুটি বণ্টন-সাম্য আনিবার এই নীতির উৎপাদনের উপর প্রভাব অর্থনৈতিকভাবে শুভকর না-ও হইতে পারে। ধনীদের উপর অধিকহারে কর বসাইলে তাহাদের

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয় বণ্টন

কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া যাওয়া, অপরদিকে গরীবদের মধ্যে আলস্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমিয়া যাওয়া—উভয় প্রকার প্রভাব-ই ঘটিতে পারে।

(গ) কর্মসংস্থান ও আয় (Employment and Income) :

সমাজে মোট কর্মসংস্থান ও আয়ের স্তর মোট ব্যয়ের পরিমাণের দ্বারা স্থির হয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় মোট ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ। সমাজে ব্যক্তিদের মোট ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া গেলে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা; সুতরাং এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়াইয়া কর্মসংস্থান ও আয়স্তরে হ্রাস ঠেকান যাইতে পারে। বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধির যুগে যখন অত্যধিক ব্যবসাস্ফীতি ঘটে, তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয় হ্রাস করিলে দামস্তরে ও বাণিজ্যে অস্বাভাবিক স্ফীতি কমিতে পারে; বাণিজ্য-চক্রের সঙ্কটের যুগে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি দামস্তরে ও বাণিজ্যে উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান না থাকিলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়াইয়া অপূর্ণকর্মসংস্থান স্তর হইতে ক্রমোন্নতির পথ প্রশস্ত করা রাষ্ট্রিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই, অবশ্য এই কথা মনে রাখা প্রযোজন যে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে বৃদ্ধিব ফলে যদি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বাড়িবে না, উপাদানসমূহের নিয়োগে দিক্‌-পরিবর্তন হইবে মাত্র। ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রযোজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে কি পরিমাণে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকেব (Multiplier and Acceleration) আয়তনের উপর।

অপূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিলে, বাণিজ্যচক্রের সঙ্কটকালে বা সঙ্কট প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ব্যবহার

পুরণকারী ব্যয় (Compensatory Spending) বা পুরণকারী রাজস্বনীতি (Compensatory Fiscal Policy) :

যখন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের দ্বারা সেই ফাঁক পূরণ করিতে পারিলে সমাজে সর্বাধিক জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বজায় রাখা চলে। বাণিজ্য সঙ্কটের যুগে যখন ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয় কম, তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়; যখন বাণিজ্যোন্নতি (recovery) সুরু হইয়াছে তখন ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয়; চরম উন্নতির (boom) কাছাকাছি আসিয়া পড়িলে রাষ্ট্রীয়

ব্যয় খুবই কমাইয়া দিতে হয়, এমন কি ঋণাত্মক রাষ্ট্রীয় ব্যয় (negative public spending), অর্থাৎ ব্যয় না করিয়া করের সাহায্যে অধিক আয় তুলিয়া উদ্বৃত্ত বাজেট করিতে হয়।

দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান কমিতে থাকিলে এবং বাণিজ্যসঙ্কট গভীরতর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা সঙ্কুচিত হইতে থাকে; রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়স্রোতে অধিক অর্থ সঞ্চালিত করা। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অধিক ব্যয় করিতে থাকিবে। জনসাধারণের মজুত-প্রবণতা (Propensity to hoard) বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সঙ্কোচনশীল (Contractionary) প্রভাবসমূহ দূর করিয়া প্রসারশীল (Expansionary) প্রভাবসমূহকে শক্তিশালী করাই এই প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের উদ্দেশ্য। এইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ সাধারণতঃ খুবই বেশী হওয়া দরকার; কারণ, দেখা যায় যে, সঙ্কটের সময়ে ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় আরও কম থাকে, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয়ও কম।

দামস্তর আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর কমিতে থাকিলে

পূরণমূলক ব্যয় সাধারণতঃ ঘাটতি ব্যয়, কারণ কর বৃদ্ধির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে ব্যক্তির হাত হইতে আরও অর্থ সরাইয়া আনা হইবে, ব্যক্তিক্ষেত্রে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয় আরও কমিয়া যাইবে। অবশ্য করের সাহায্যে লুকান মজুত অর্থ আদায় করিতে পারিলে এরূপ কিছু ঘটিবে না। যে অর্থ ব্যক্তির হাতে থাকিলে ভোগে বা বিনিয়োগে নিযুক্ত হইতে পারিত তাহা করের দ্বারা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া আনিয়া ব্যয় করিলে উহার প্রসারশীল প্রভাব (Expansionary Effects) অনেক কম হইবে। রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে সর্বাধিক প্রসারশীল প্রভাব পাইতে হইলে এরূপ ভাবে উহা ব্যয় করা দরকার যে, যাহাদের হাতে সেই ব্যয় ব্যক্তিগত আয় হিসাবে যাইবে তাহারা উহা মজুত না করিয়া পুনরায় ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ, এরূপ ভাবেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় হওয়া দরকার যে, সমাজে যে শ্রেণীর ভোগপ্রবণতা সর্বাধিক তাহাদের হাতেই উহা আয় হিসাবে চলিয়া যায়।

দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিলে এবং সমাজ চরমসমৃদ্ধির (boom) দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা বিস্তৃত ও প্রশস্ত হইতে থাকে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়স্রোত হইতে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে অর্থ তুলিয়া লওয়া। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ব্যয়-সঙ্কোচন করিতে থাকিবে। ব্যক্তি-ক্ষেত্রে ব্যয় যত বাড়িতে থাকিবে, রাষ্ট্র তত নিজের ব্যয় কমাইবে। যে পর্যন্ত উপাদানের পূর্ণনিয়োগ না ঘটে সেই পর্য্যন্ত কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকিবে। পূর্ণ কর্ম নিয়োগ

দামস্তর, আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িতে থাকিলে

স্তরের কিছু পূর্ব হইতেই এইরূপে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সঙ্কোচন প্রয়োজন হইবে ; যদি সেই স্তরের পরেও অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রসার লাভ করিতে থাকে তাহা হইলে ঋণাত্মক রাষ্ট্রীয় ব্যয় করিতে হইতে পারে অর্থাৎ করবৃদ্ধির দ্বারা ব্যয়ের তুলনায় আয়াধিক্য সৃষ্টি করার প্রয়োজন হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতিমূলক প্রসার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বাজেট উদ্বৃত্ত করিতে হইবে।*

বাজেট (The Budget):

এক বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের পরিমাণ এবং উহার বিভিন্ন প্রকার আয়ের উৎস ও আয়ের পরিমাণ সম্বলিত হিসাবকে বাজেট বলা হয়। পূর্ব বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ও প্রকৃত আয় ছাড়াও আগামী বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব ; ব্যয়ের তুলনায় আয় অধিক হইলে সেই অর্থ কি করা হইবে ; আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইলে কোন্ উৎস হইতে সেই ঘাট্‌তি পূরণ করা হইবে, প্রভৃতি তথ্য লইয়া বাজেট গঠিত হয়। সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষা সম্ভাব্য আয় অধিক হইলে তাহাকে উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus budget) বলা হয় ; সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষা সম্ভাব্য আয় কম হইলে তাহাকে ঘাট্‌তি বাজেট (Deficit Budget) বলা হয় ; সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সমান হইলে তাহাকে সমতাসিদ্ধ (Balanced Budget) বলা চলে।

বাজেট কাহাকে বলে

সমতাহীন বাজেট (Unbalanced Budget) :

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, (ক) বাজেট সর্বদাই ছোট হওয়া উচিত অর্থাৎ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তি-প্রধান অর্থনীতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় উভয়ই খুব কম হওয়া উচিত। (খ) প্রতি বৎসর রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সমান হওয়া উচিত, বাজেট ঘাট্‌তি বা উদ্বৃত্ত কিছুই থাকা উচিত নয়। (গ) প্রধানতঃ, ভোগব্যয়ের উপরই কর বসান উচিত, সঞ্চয়ের উপর নহে (ঘ) যদি কোন মতেই ঘাট্‌তি এড়ান না যায়, তবে দীর্ঘকালীন ঋণপত্র দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয় (ঙ) উৎপাদন-ক্ষম বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র ঋণ গ্রহণ করা সঙ্গত (চ) যত দ্রুত সম্ভব রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সমাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগই পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখে, সুতরাং রাষ্ট্র অধিক আয় ও ব্যয়ের চেষ্টা করিলে (ক) ব্যক্তির সঞ্চয় কমিবে, বা (খ) ব্যক্তির কর্মোদ্যোগ ও উৎপাদনের পরিমাণ কমিবে, বা (গ) মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে।

ক্লাসিকাল বাজেটীয় নীতিসমূহ

ক্লাসিকাল যুক্তিসমূহ

*ইহাকে বাণিজ্যচক্রবিরোধী ব্যয়নীতিও বলা হয়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ ও কর্ম প্রচেষ্টায় পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে সমাজ নাও থাকিতে পারে অথবা এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব সর্বদাই ঘটিতে পারে, সুতরাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের নির্ধারিত রাজস্ব নীতি (fiscal policy) গ্রহণযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, ১২ মাস পরে প্রত্যেক বৎসর নিয়ম করিয়া বাজেটে সমতা ঘটাইতে হইবে বা উহারই মধ্যে যে কোন প্রকারে আয়-ব্যয়ের হিসাবগত মিলন সাধন করা দরকার, এইরূপ ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ধরণের।

বাৎসরিক সমতাসাধন নিছক অভ্যাস ও প্রথা মাত্র

উপরন্তু, বাজেটে তথাকথিত সমতা সাধনেরই বা গুরুত্ব কি, আধুনিক ধন-বিজ্ঞানীগণ এই প্রশ্ন করিয়াছেন। দেশের কর্মসংস্থান, আয়স্তর, জীবনযাত্রার মান সকল কিছুই ভারসাম্য-বিহীন থাকিয়া বৎসরান্তে বাজেটে নিছক সমতা বজায় রাখা বিশেষ নৈতিক দায়িত্ব, আধুনিক ধন-বিজ্ঞানীগণ তাহা স্বীকার করেন না। শুধু তাহাই নহে, বৎসরান্তে বাজেটে সমতা সাধনের নীতি বাণিজ্য-সঙ্কট ও বাণিজ্য-সমৃদ্ধিকে তীব্রতর ও গভীরতর করিয়া তুলিতে পারে। সঙ্কটের সময়ে রাষ্ট্রীয় আয় কম থাকায় সমতার নীতি অনুযায়ী (ক) উচ্চ হারে কর বসাইতে হয় এবং (খ) রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাইতে হয়—উভয়ই সঙ্কটকে তীব্রতর করে; সমৃদ্ধির যুগে (ক) রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেশী থাকে এবং (খ) কর কমাইয়া দেওয়া হয়—উভয়ই মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতে সাহায্য করিয়া সমৃদ্ধির অবসান ও আগামী সঙ্কটের সম্ভাবনা বাড়াইয়া দেয়।

বাজেটে সমতা সাধনের নীতি-ও অর্থ নৈতিক যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য নহে

বাজেটে সমতা সাধনের প্রাচীন নীতি পরিত্যাগ না করিয়া, ইহার দোষত্রুটি পরিহার করার উদ্দেশ্যে, আধুনিক কালের কতিপয় সুইডিশ ধনবিজ্ঞানী বাণিজ্য-চক্রকালীন বাজেট (Cyclical Budget) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সমতাসিদ্ধ বাজেট গঠনের চিরাচরিত নীতি ভালই, তবে দেওয়াল-ক্যালেণ্ডারের দ্বারা বারো মাসে এক বৎসর হিসাব করিয়া উহারই মধ্যে আয় ও ব্যয় সমান না হইলেও ক্ষতি নাই। সমৃদ্ধির যুগ ও সঙ্কটের যুগ—উভয় যুগ লইয়া যে বাণিজ্য-চক্র-কাল—ইহার মধ্যে বাজেটের আয় ও ব্যয় সমান হইলেই চলিবে। সঙ্কটের যুগে কয়েক বৎসর বাজেটে ঘাটতি যাইবে, সঙ্কট হইতে উত্তরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যয় অধিক করিবার দরুণ আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইতে থাকিবে। সঙ্কটকালের

চক্র-কালানুযায়ী বাজেট রচনা ও চক্র কালীন সমতা সাধন

শেষে ক্রমে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাইতে হইবে, যত সমৃদ্ধির প্রসার হইবে তত বাজেটে ঘাটতি কমিবে এবং চরম-সমৃদ্ধির স্তরে পৌঁছিবার সময়ে রাষ্ট্রীয় আয় অধিক বাড়াইয়া বাজেটে উদ্বৃত্ত করিতে হইবে। সঙ্কটের যুগের ঘাটতির পরিমাণ সমৃদ্ধির যুগের উদ্বৃত্তের দ্বারা পুরাইয়া লইতে হইবে।

কিন্তু চক্রকালানুযায়ী বাজেট গঠনের এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ কোথাও এখন পর্যন্ত হয় নাই, ইহার কিছু কিছু প্রয়োগ-গত অসুবিধা আছে। আগামী বাণিজ্যচক্র ঠিক কবে আসিবে, কতদিন সমৃদ্ধি বা সঙ্কট থাকিবে, সুরু হইল কিনা, ইহার তীব্রতা কিরূপ, ঘাটতি বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত, ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের আশা-নিরাশার তীব্রতা কতখানি—এই সকল বিষয় বিচাব বিবেচনা করা বাস্তবে খুবই অসুবিধাজনক। এই নীতি সফল হইতে হইলে সবকারী শাসন ব্যবস্থা ও আর্থিক সংস্থাসমূহকে কার্যকারিতার দিক হইতে খুবই নমনীয় ও সচেতন ধরণের হইতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বাস্তব অসুবিধাসমূহ

রাষ্ট্রীয় আয় (Public Revenue)

রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসসমূহ (Sources of Public Revenue):

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রসমূহের ব্যয় বাডিযা যাওয়ায় তাহারা নিত্য নূতন আয়ের উৎস খুঁজিয়া বাহির কবিতেছে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে রাষ্ট্রীয় আয়ের চারি প্রকার উৎস আছে: (ক) কর, (খ) দান ও সাহায্য, (গ) শাসনতান্ত্রিক আদায়-সমূহ, এবং (ঘ) বাণিজ্যিক আদায়সমূহ।

কোন প্রত্যক্ষ উপকারিতা আশা না করিয়া বাধ্যতামূলক ভাবে ব্যক্তি রাষ্ট্রকে যে অর্থ দিয়া থাকেন, তাহাকে কর বলে। আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক-ভাবে এই কর আদায় করা হয় এবং এই করেব বিনিময়ে সরাসরি, প্রত্যক্ষভাবে, সমপরিমাণ কোন সুবিধা ব্যক্তি লাভ করে না।

অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্র অন্যান্য স্থত্র হইতে সাহায্য পায় যেমন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ আর্থিক সাহায্য পায়। কোন দাতা নির্দিষ্ট কোন কার্যে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সরকারকে দান হিসাবে কিছু অর্থ দিয়া যাইতে পারেন, এরূপ ভাবেও রাষ্ট্রের আয় হইতে পারে। এইরূপ সাহায্য বা দান উভয়ই প্রদানকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

শাসনতান্ত্রিক আদায়সমূহ বলিলে বোঝা যায় ফী, লাইসেন্স পাইবার জন্য প্রদেয় অর্থ, জরিমানা, বাজেয়াপ্ত জমা, এবং বিশেষ আদায়সমূহ। সাধারণতঃ, এই সকল শাসনতান্ত্রিক আদায়সমূহ ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং ইহার পরিবর্তে কোন না কোন উপকারের বিনিময়ে প্রদেয়। অবশ্য উপকারের পরিমাণের সহিত প্রদেয় অর্থের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকে না।

বাণিজ্যিক আদায়সমূহ বলিলে রাষ্ট্র যে সকল দ্রব্য বা কার্য বিক্রয় করে তাহাদের জন্য দামসমূহকে বোঝা যায়। নির্দিষ্ট দ্রব্য বা নির্দিষ্ট কার্যের বিনিময়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে দাম পায় তাহাই বাণিজ্যিক আদায়। অবশ্য উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী ফার্মের ক্ষেত্রে যেরূপ গড় বা প্রান্তিক ব্যয় অনুযায়ী দাম নিরূপিত হয়, রাষ্ট্রের দ্রব্যাদির দাম সেইরূপ হিসাবে নির্ধারিত নাও হইতে পারে, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া দাম স্থির থাকিতে পারে। অথবা, উহাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থাকায় একচেটিয়াসুলভ মুনাফা দামের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে।

মনে রাখা দরকার যে, এখন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কর হইতে আদায়ের পরিমাণ অন্যান্য উৎস হইতে আদায়ের পরিমাণ হইতে বেশী। কিন্তু ক্রমেই শাসনতান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক আদায়সমূহ হইতে রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। অবশ্য এইরূপে রাজস্বের সকল উৎসকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। যদি রাষ্ট্রীয় দ্রব্যের বা কার্যের দাম উহার উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হারে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে কার্যতঃ উহা করের পর্যায়ভুক্ত হইল। আবার, অনেক রাষ্ট্রীয় কার্যের জন্য ব্যয় করা হয় কিছুটা দাম এবং কিছুটা কর হইতে, যেমন সরকারী কলেজের ছাত্রগণ মাহিনাও দেন এবং আদায়ীকৃত কর হইতেও তাহাদের জন্য ব্যয় করা হয়।

কর-কানুন (Canons of Taxation):

কর-কর্তৃপক্ষ যে সকল কানুন মানিয়া চলিয়া কর আরোপ করিবে ও আদায় করিবে তাহাদের কর-কানুনসমূহ বলা হয়। অ্যাডাম স্মিথ চারিটি কর-কানুনের কথা বলিয়াছেন।

সমতার কানুন

প্রথমতঃ, কর প্রদান-ক্ষমতা বা সমতার কানুন। 'প্রত্যেক দেশের প্রজাগণ সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য তাহাদের প্রত্যেকের কর-প্রদান-ক্ষমতা অনুযায়ী কর দিবে' ইহাই প্রথম কানুন। অ্যাডাম স্মিথের মতে, কর প্রদান ক্ষমতা অনুযায়ী কর দিলেই সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে ত্যাগ-স্বীকারের সমতা সাধিত হইবে। এইরূপ ঘটিলে ব্যক্তিগত ভাবে সকল

করদাতার আসল-ভার (Real burden) এবং সমাজের 'সামগ্রিক কর-ভার সর্বাপেক্ষা কম থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, নিশ্চয়তার কানুন। 'প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক ভাবে যে কর দিতে হইবে তাহার প্রদানকাল, পরিমাণ প্রভৃতি নিশ্চিত থাকা দরকার'।

নিশ্চয়তার কানুন

অ্যাডাম্ স্মিথের মতে সমতার কানুন হইতেও নিশ্চয়তার কানুন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। করের পবিমাণ ও প্রদানকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিত না থাকিলে কর দাতার বিশেষ অসুবিধায় পডিতে হয়, ঘুষ এবং অব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়, সরকারী বাজেট-গঠনও বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত হইযা পডে।

তৃতীয়তঃ, সুবিধার কানুন। প্রত্যেক কর এরূপভাবে ও এরূপ সমযে আবোপিত হওয়া উচিত যাহাতে করদাতাদের বিশেষ সুবিধা হওযার সম্ভাবনা। এই কানুনের অর্থ হইল করদাতার অসুবিধা যেন সর্বাপেক্ষা কম হয; যখন ও যেভাবে

সুবিধার কানুন

তাহার পক্ষে করপ্রদান সর্বাধিক সুবিধাজনক, যেন ঠিক সেই সময় ও সেই ভাবেই কব আদায করা হয। যেমন, চাষীর নিকট হইতে কর আদায় ফসল উঠিবার পবে করা উচিত, তাহাব পূর্বে নহে।

চতুর্থতঃ, ব্যয় সঙ্কোচের কানুন। প্রত্যেক কর এরূপ হইবে যেন ইহা হইতে রাষ্ট্রেব যে আয় হয় তাহার তুলনায এই কব আদাযেব ব্যয় খুব কম পডে।

কম ব্যয়ে রাজস্বসংগ্রহের কানুন

যদি কর হইতে যে রাজস্ব আদায হয় তাহাব সম্পূর্ণই উহা আদায করিবার জন্য ব্যযিত হইযা যায়, তাহা হইলে সেই কর অর্থ-নৈতিক বিচারে আরোপযোগ্য নহে। উপরন্তু ব্যয়সঙ্কোচ কথাটিকে সঙ্কীর্ণ শাসন-তান্ত্রিক অর্থে গ্রহণ না করিলে বলা চলে যে ইহা লক্ষ্য রাখা দরকার যেন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর কর-আরোপেব ফলাফল সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিকারক না হয়।

করকানুনসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম কানুন হইতে অন্যান্য তিনটি কানুন পৃথক, কারণ প্রথমটি করনীতি সংক্রান্ত এবং অপর তিনটি কর-আদায়-পদ্ধতি সংক্রান্ত।

প্রথম কানুন অর্থাৎ করপ্রদান ক্ষমতা বা সমতার কানুন সম্বন্ধে বলা চলে যে ইহা যথেষ্ট অস্পষ্ট ধরণের; কিছুটা নৈতিক এবং কিছুটা অর্থনৈতিক বিবেচনার উপর

কানুনসমূহের সমালোচনা

ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই কানুনটির অস্পষ্টতার আরও কারণ হইল করপ্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের কোন বাস্তব মানদণ্ডের উল্লেখ ইহাতে নাই। আরও অসুবিধা হইল, আনুপাতিক হার বা ক্রমবর্ধমান হার কোন্

নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং কি পদ্ধতি অনুযায়ী সকলের ত্যাগস্বীকার সমান করিতে পারা যায়, তাহার বিশদ আলোচনা ইহা হইতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য কানুনগুলিও অত্যন্ত সাধারণ ধরণের; উহারা শাসনতান্ত্রিক সমস্যা মাত্র, অর্থনৈতিক আলোচনার দিক হইতে গুরুত্বহীন।

পরবর্তী কালের ধনবিজ্ঞানীগণ উপরোক্ত কানুনসমূহের সহিত আরও দুইটি নূতন কানুন যোগ করিয়াছেন, তাহারা হইল (ক) উৎপাদনশীলতা, ও (খ) প্রসার-ক্ষমতা। করসমূহ উৎপাদনশীল হইবে, অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কর হইতে তত অধিক রাজস্ব আদায় হইতে থাকিবে (যেমন দ্রব্যাদির উপর কর বসাইলে জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে অধিকতর রাজস্ব আদায় হইতে থাকে)—ইহাই উৎপাদনশীলতাব কানুন। প্রসারক্ষমতার কানুন হইল যে রাষ্ট্রের বা দেশের প্রয়োজনে সেই কর হইতে অধিক আয় করা চলে বা আয় কমাইয়া দেওয়া চলে। কব-কাঠামোব এই নমনীয়তা আধুনিক কালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ বাণিজ্যচক্রকালীন বা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এইরূপ নমনীয়তা বিশেষ প্রয়োজন।

উৎপাদন শীলতা ও প্রসার ক্ষমতার কানুন

করসংক্রান্ত নীতিসমূহ (Principles of Taxation):

রাষ্ট্র যে নীতিসমূহ মানিয়া লইয়া জনসাধাবণেব নিকট হইতে কর আদায করে বা কর-কাঠামো গঠন করার পিছনে যে নীতিসমূহ প্রচলিত থাকে, তাহাদের করসংক্রান্ত নীতি বলা হয। প্রধান নীতিসমূহ নিম্নে আলোচিত হইল।

(ক) **উপকারিতা তত্ত্ব (The Benefit theory):** রাষ্ট্রের আঁওতায় ব্যক্তি যতখানি সুবিধা লাভ করে, তাহার করের পরিমাণ সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের নিকট হইতে ব্যক্তি যত বেশী সুবিধা লাভ করিবে তত বেশী কর তাহাকে দিতে হইবে।

কর আরোপ করার নীতি হিসাবে ইহা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নহে। রাষ্ট্র কর্তৃক যে সাধারণ সুবিধাগুলি সকলকে দেওয়া হয়, তাহারই জন্য কর দেওয়া হয়, কোন বিশেষ সুবিধার জন্য নহে। তাহা ছাড়া, সৈন্য, পুলিশ বা বিচারবিভাগ হইতে আমাদের প্রত্যেকের পৃথক সুবিধা পরিমাপের উপায় কি? আরও বলা চলে, যদি গরীব ব্যক্তি ধনীর তুলনায় রাষ্ট্র হইতে বেশী সুবিধা পায় তাহা হইলে তাহাকে অধিক কর দিতে হইবে, ইহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। তবে সামগ্রিক বিচারে এই

তত্ত্ব গ্রহণীয়, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বা সকল নাগরিককে একত্রে বিচার করিলে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত মোট সুবিধা অনুযায়ী সামগ্রিক ভাবে সকলে মিলিয়া মোট করভার বহন করা কর্তব্য।

(খ) কার্যের ব্যয় তত্ত্ব (The cost of Service Theory) :

কার্যের ব্যয় তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি সম্পন্ন করিতে যে ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়, ব্যক্তির নিকট সেই পরিমাণ কর আদায় করিয়া লওয়া উচিত।

সমালোচনা

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নীতির প্রয়োগ অবাস্তব। ডাক বিভাগের দ্রব্যাদির দাম, রেলের ভাডা, সরকারী বাসের ভাড়া বা সরকারী কারখানা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে বটে ; কিন্তু সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্রের কি পরিমাণ ব্যয় হয় তাহার অংশ নিরূপণ করা সম্ভব নহে। বৃদ্ধ বয়সে পেনশনভোগীগণ এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতি মাসে পেনশন তো ফেরৎ দিবেনই, উপরন্তু, সরকারী পেনশন দপ্তরের আংশিক ব্যয়ভারও তাঁহারা বহন করিবেন।

(গ) প্রদানক্ষমতা তত্ত্ব (Ability to Pay Theory) :

প্রদানক্ষমতা তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তি তাহার কর প্রদানক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রকে কর দিবেন। রাষ্ট্র সকলের স্বার্থরক্ষার জন্য স্থাপিত সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান, সুতবাং সকলেই নিজের সাধ্যমত ইহাকে কর দিবেন—ইহাই প্রদান-ক্ষমতার তত্ত্ব। অ্যাডাম্ স্মিথও তাহার করকানুনসমূহের মধ্যে ইহাকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। নৈতিক বা অর্থনৈতিক বিচারে ইহা সর্বোত্তম, ন্যায়সঙ্গতও বটে, সুতরাং আধুনিক কালে এই তত্ত্বই গৃহীত হইয়াছে।

প্রয়োগগত অসুবিধা

কিন্তু এই তত্ত্বানুযায়ী বাস্তবে প্রয়োগগত নীতি নির্ধারণ করিবার সময়ে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। কারণ কর-প্রদান ক্ষমতা পরিমাপের কোন সঠিক ও উপযুক্ত মানদণ্ড পাওয়া যায় না।

প্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের মানদণ্ড : সম্পত্তি : সমালোচনা

পূর্বে ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণকেই কর প্রদান ক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে ধরা হইত। অধিক সম্পত্তি থাকিলে কর অধিক ; সম্পত্তি কম থাকিলে কর কম। কিন্তু দেখা গেল যে সম্পত্তিকে কর প্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের আদর্শ মান হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। অনেক ব্যক্তির প্রচুর আয় অথচ সম্পত্তি কম, তাঁহারা করের আওতায় পড়েন না ; কর-প্রদান-ক্ষমতা অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা কর হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য পরবর্তীকালে ব্যয়কে প্রদান-ক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা হইত। যাহারা অধিক ব্যয় করেন তাহাদের কর-প্রদানের ক্ষমতা বেশী, এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইত। কিন্তু ইহা ঠিক নহে; কারণ ব্যক্তির পোষ্য বেশী থাকিলে বা অসুখ বিসুখের জন্য ব্যয় বেশী হইলে উহা হইতে বুঝা যায় না যে তাহার কর-প্রদান ক্ষমতা অধিক।

ব্যক্তিগত ব্যয়: সমালোচনা

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আধুনিক কালে আয়কেই কর-প্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের সঠিক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ, উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অধিক হারে কর এবং নিম্ন আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর স্বল্পহারে কর আরোপ করা হয়। বলা হয় যে, এই রূপেই সকল ব্যক্তির মধ্যে ত্যাগ স্বীকারে সমতা সাধন করা যাইতে পারে।

ব্যক্তিগত আয়

কিন্তু আয়কেও সম্পূর্ণরূপে সঠিক ও নিখুঁত মানদণ্ড বলা চলে না। ব্যক্তির আর্থিক আয় তাহার কর-প্রদান ক্ষমতার সঠিক পরিচায়ক নহে, কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা পৃথক; ফলে দুই ব্যক্তির আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের কর-প্রদান ক্ষমতা পৃথক হইতে পারে। তাহা ছাড়া, উভয়ের আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয়-পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে। উপরন্তু, উভয়ের ত্যাগস্বীকারে যথেষ্ট তারতম্য থাকা সম্ভব। কাহারও অধিক পরিশ্রম করিতে হইতে পারে; কাহারওবা একই পরিমাণ আয় করিতে কম পরিশ্রম বা কোন পরিশ্রম-ই না করিতে হইতে পারে।

সমালোচনা

সুতরাং ব্যক্তির কর-প্রদান ক্ষমতা সঠিক নিরূপণ করিতে হইলে আয়ের সহিত আরও কয়েকটি বিষয় বিচার ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। স্যার জোশিয়া ষ্টাম্পের মতে

* এতদ্‌সত্ত্বেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যাল্‌ডরের মতে ব্যক্তিগত ব্যয়কর স্থাপন করা বৈজ্ঞানিক নীতিসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার মতে (ক) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আয় গোপন করিয়া কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে। (খ) তাহা ছাড়া, আয়ের উপর অধিক কর স্থাপন করিলে কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমিয়া যায়। ব্যয়ের উপর কর কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহাকে ব্যাহত করে না। (গ) তাহা ছাড়া, বর্তমান আয়-বৈষম্য কমাইতে হইলে বা সম্পদের পুনর্বণ্টন করিতে হইলে ব্যয়-কর অধিকতর উপযোগী। (ঘ) ধনীব্যক্তিগণ পুরানো মজুত সম্পদ, সম্পত্তি ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি হইতে যথেষ্ট আয় অথবা সুখ-সুবিধা ভোগ করেন, তাহাদের করপ্রদান ক্ষমতা অধিক, অথচ ইঁহারা আয়করের আওতায় আসেন না। ব্যয়-কর স্থাপিত না হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কর আদায় করা যায় না।

আর্থিক আয়ের পরিমাণের সহিত আরও পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা নির্ধারণ করা দরকার। **প্রথমতঃ**, কাল-বিচার (Time-Test)। দেখা দরকার যে কোন্ সময়ে ব্যক্তির আয় হইল। সাধারণতঃ, পূর্ববর্তী বৎসরে আয়ের উপর বর্তমান বৎসরে কর লওয়া হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী বৎসরে লাভ হইলেও হয়ত বর্তমান বৎসরে প্রভূত লোকসান হইতেছে, সুতরাং কর দেওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। তাই, যখন আয় হইল তখনই কর আরোপ করিয়া উহা আদায় করিয়া লওয়া দরকার। ইহাকেই আয়করো-আয়-দিতে-থাকো ব্যবস্থা (Pay-as-you-earn) বলা হয়। শুধু তাহাই নহে, ইহাও দেখা দরকার ব্যক্তির ওই আয় নিয়মিত বা অনিয়মিত; উপরন্তু, ওই আয় পাইবার জন্য ব্যক্তি কি সারাবৎসর পরিশ্রম করিয়াছে, না আংশিক পরিশ্রম করিয়া অবশিষ্ট কাল আলস্যে কাটাইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকার। **দ্বিতীয়তঃ**, নীট-আয় বিচার (Pure-Income Test)। দেখা দরকার যে, সেই আয় পাইবার জন্য কিরূপ আনুষঙ্গিক ব্যয় বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। **তৃতীয়তঃ**, আয়-উৎস বিচার (Income-Source Test)। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সম্পত্তি বা পরিশ্রম কোথা হইতে আয় হইতেছে, সম্পত্তি হইতে আয় হইলে অধিক হারে এবং পরিশ্রম দ্বারা আয় হইলে কম হারে কর বসান সঙ্গত। **চতুর্থতঃ**, পারিবারিক অবস্থা বিচার (Domestic-circumstances Test)। পরিবারের পোষ্যসংখ্যা অধিক হইলে কম হারে, এবং সংখ্যা কম হইলে অধিক হারে, কর আরোপ করা যুক্তিযুক্ত। **পঞ্চমতঃ**, উদ্বৃত্ত-বিচার (Surplus-Test)। দেখিতে হইবে যে, আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্তের অংশ কতখানি; ব্যয় করিয়া কিরূপ উদ্বৃত্ত থাকে। শুধু তাহাই নহে; নিম্নতম যোগান দাম-এর (Minimum Supply Price) তুলনায় ব্যক্তির আয় কত অধিক।

আয় অনুযায়ী সঠিক করপ্রদান ক্ষমতা নির্ধারণের পাঁচটি বিচার
১। আয়বিচার
২। নীট-আয়বিচার
৩। আয়-উৎস বিচার
৪। পারিবারিক অবস্থা বিচার
৫। উদ্বৃত্ত-বিচার

(ঘ) অর্থনৈতিক নীতির হাতিয়ার (Instrument of economic policy)

উপকারিতা, কার্যের ব্যয়, প্রদানক্ষমতা বা ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি বিচার না করিয়া অনেকক্ষেত্রে ছোটখাট বহু নীতি অনুযায়ী কর ধার্য করা হয়। রাষ্ট্রের প্রধান অর্থনৈতিক নীতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই অনেক-ক্ষেত্রে করনীতি রচিত হয়। যেমন, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য, কোন দ্রব্যের ব্যবহার কমাইবার জন্য (যেমন নেশার দ্রব্যাদি), যুদ্ধের সময়ে সমরোপকরণ পাইবার জন্য, জনসাধারণের ভোগ কমাইবার উদ্দেশ্যে, প্রভৃতি কারণে কর আরোপ করা হইতে পারে।

অবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী কর-নীতি নির্ধারণ

আধুনিক কালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছান, অথবা আয়-বৈষম্য কমান, ইহাই করস্থাপনের পিছনে প্রধান নীতি। ব্যক্তিদের নিকট হইতে এরূপভাবে কর আরোপ ও আদায় করিতে হইবে যাহাতে সমাজের মোট বিনিয়োগ ও সঞ্চয় কমে না এবং ভোগব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যচক্রের সঙ্কটকালে করহার কমাইয়া অধিক অর্থ ব্যক্তিদের হাতে ভোগ বা বিনিয়োগ-ব্যয়ের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়; সমৃদ্ধিরকালে করহার বাড়াইয়া ব্যক্তিদের হাতে ভোগ ও বিনিয়োগের জন্য অর্থ কম রাখা হয়। ভোগব্যয় বাড়াইবার জন্য ভোগপ্রবণতা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বিক্রয়-কর কমান চলে, অথবা, ধনীদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর বিক্রয়-কর অধিক রাখিয়া গরীবদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর বিক্রয়-কর কমাইয়া দেওয়াও সম্ভব।

শিল্পোন্নত দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান বা আয়-বৈষম্য কমান

শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে করস্থাপন-ই হইল প্রধান নীতি। যেরূপ ভাবে কর স্থাপন করিলে দ্রুত শিল্পসম্প্রসারণ ঘটিবে বা অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি (economic growth) ত্বরান্বিত হইতে পারে তাহা বিচার করিয়া কর নিরূপণ করা হয়। অযথা বিলাস-দ্রব্যের বা ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া সঞ্চয়-স্পৃহা ও কর্মোদ্যম বাড়ান, দেশে মূলধন-গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মজুত (hoards) সরাইয়া আনিয়া রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগ— এই সকলই অনুন্নত দেশসমূহে কর-সংক্রান্ত প্রধান নীতিসমূহ।

অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রসার

করভার বণ্টন সংক্রান্ত আনুপাতিক হারের এবং ক্রমবর্ধমান হারের নীতি (Principles of Proportion and Progression)

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করভারের বণ্টন সংক্রান্ত নীতি আলোচনা করিলে চারিপ্রকার নীতি দেখিতে পাওয়া যায়: আনুপাতিক, ক্রমবর্ধমান, ক্রমহ্রাসমান, ও অধোগতি-মূলক।

আয় যাহাই হউক না কেন, সকল আয় হইতে নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করিবার নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে (Proportional Tax) বলা হয়। উচ্চস্তরের আয় হইতে ক্রমশঃ অধিক হারে কর আদায় করিবার নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে ক্রমবর্ধমান কর (Progressive Tax) বলা হইয়া থাকে। অধিক আয়স্তরের ব্যক্তিদের নিকট হইতে ক্রমশঃ কম হারে কর আদায় করিবার নীতি অনুসৃত হইলে

আনুপাতিক, ক্রমবর্ধমান, ক্রমহ্রাসমান ও অধোগতি-মূলক

উহাকে বলা হয় ক্রমহ্রাসমান কর (Regressive Tax); ইহা ক্রমবর্ধমান নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চ আয়স্তরের উপর অধিক হারে কর আরোপ করা হয়, কিন্তু আয়স্তর যত অধিক হইতেছে করহারে বৃদ্ধি তত কমিতেছে, তাহাকে অধোগতিমূলক কর (Degressive) বলা হয়। সাধারণ ভাবে, আনুপাতিক ও ক্রমবর্ধমানহারের নীতি দুইটিই প্রধান ও আলোচ্য।

আনুপাতিক নীতি অনুযায়ী করস্থাপনের পদ্ধতি খুবই সরল এবং ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল আয়-বণ্টনের বর্তমান ধরণে কোনরূপ পরিবর্তন না আনা। সকল ব্যক্তিই যদি তাঁহার আয় হইতে নির্দিষ্ট একই হারে কর দেন, তাহা হইলে কর স্থাপনের ফলে বণ্টনের কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আসে না। অ্যাডাম্ স্মিথের কর-সংক্রান্ত প্রথম কানুনে তাই এইরূপ করস্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু নিছক প্রয়োগগত সরলতা-ই কর-নীতি নিরূপনের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইতে পারে না। তাহা ছাড়া ইহা ত্যাগ-সমতা নীতির বিরোধী। কারণ, উচ্চ আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা কম এবং নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা অধিক। যেমন, ১০০ টাকা আয়কারী ব্যক্তির নিকট ৫৲ এবং ১০০০ টাকা ব্যক্তির নিকট ৫০৲ কর লইলে তুলনামূলকভাবে প্রথম ব্যক্তির অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।

আনুপাতিক নীতির গুণ ও দোষ

সুতরাং আধুনিক কালে পৃথিবীর সকল দেশেই ক্রমবর্ধমান-হারে কর স্থাপনের নীতি গৃহীত হইয়াছে। এই করের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল; (ক) ব্যক্তির আয় যত বৃদ্ধি পায় তাহার কর-প্রদান ক্ষমতা তাহার তুলনায় অধিকহারে বাড়ে। (খ) তাহা ছাড়া, ত্যাগ-স্বীকারের সমতা নীতি অনুযায়ীও ক্রমবর্ধমান-হারের নীতি গ্রহণযোগ্য। অধিক আয় হইলে ব্যক্তির নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা কম; তাঁহার নিকট হইতে উচ্চহারের দ্বারা বেশী পরিমাণ অর্থ সরাইয়া লইলেই নিম্ন আয়কারী ব্যক্তির কমহারে কর-প্রদানের সহিত সমান ত্যাগস্বীকার করান যাইতে পারে। (গ) উপরন্তু বর্তমান আয়-বৈষম্য কমাইবার উদ্দেশ্যেও ক্রমবর্ধমান হারের কর সমর্থনযোগ্য। (ঘ) ইহা ব্যতীত দেখা যায় যে ধনী ব্যক্তিদের ভোগপ্রবণতা কম এবং কম-আয়কারী ব্যক্তিদের ভোগপ্রবণতা বেশী। তাই দেশে আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে গড় ভোগপ্রবণতা কমিয়া যাইতে থাকে; মোট ভোগব্যয় কমিয়া যায়, কার্যকরী চাহিদা

ক্রমবর্ধমান হার নীতির গুণ ও দোষ

কমে এবং বেকারী ও উপকরণের অনিয়োগ বা অর্ধনিয়োগ সুরু হয়। সুতরাং, বেকারী দূর করিতে হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর আরোপ করিয়া সেই অর্থ নিম্ন-আয়কারীদের নিকট পৌঁছাইয়া দিলে এই সমস্যা বিদূরিত হইতে পারে। (ঙ) সর্বশেষে, নৈতিক বিচারেও বলা চলে যে সর্বাধিক বহনক্ষম ব্যক্তিদেরই সর্বাধিক কর-ভার বহন করা কর্তব্য। তবে, এই নীতি প্রয়োগের একমাত্র অসুবিধা হইল কি হারে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা কমিয়া যায় অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান নীতি কি হারে নির্দিষ্ট করা উচিত তাহা সঠিকভাবে নির্ধারন করা। এই বিষয়ে কোন বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত মাপকাঠি পাওয়া যায় না।

কর-বহন যোগ্যতা (Taxable Capacity):

কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনসাধারণ মোট যে পরিমাণ কর দিতে প্রস্তুত আছে, তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। বিভিন্নভাবে জাতির কর-বহন যোগ্যতাকে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। জোশিয়া ষ্টাম্পের মতে অস্তিত্বরক্ষার স্তরে জনসাধারণকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে অর্থ প্রয়োজন তাহা দেশের মোট উৎপাদন হইতে বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার স্তর কোথায় নির্দিষ্ট করা হইবে বা সেই স্তর বজায় রাখিতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা দরকার হইবে, তাহা স্থির করার কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড নাই। তাহা ছাড়া, এই উদ্বৃত্তের সবটুকুই রাষ্ট্র লইয়া গেলে মূলধন-গঠন হয় না, জাতির ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ কর-বহন যোগ্যতা কমিয়া যায়।

কর-বহন যোগ্যতা কাহাকে বলে

সুতরাং জাতীয় আয় হইতে মূলধন অক্ষুন্ন রাখা এবং জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা, সাধারণতঃ এইরূপেই ইহাকে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও বিশেষ অস্পষ্ট এবং অসুবিধাজনক। মূলধন অক্ষুন্ন রাখা বা জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য কি হারে অর্থ নির্দিষ্ট করিতে হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বাভাবিক সময়ে শুধু মূলধন অক্ষুন্ন রাখিলে চলিবে না, আরও অধিক হারে অর্থ সঞ্চয় করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলেই জাতীয় আয় ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং, এই ধারণার বিশ্লেষণে বিশেষ অসুবিধা আছে। ইহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ; ধরাছোঁয়ার বাহিরে, অপরিমাপযোগ্য বহু বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করে।

কর-বহন যোগ্যতা নির্ধারণের অসুবিধা

করবহনযোগ্যতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না বটে, কিন্তু যে বিষয়গুলির দ্বারা ইহা নির্ধারিত, তাহাদের আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জনসাধারণের মনস্তত্ব। যেমন স্বাভাবিক সময়ে লোক যে কর দিতে রাজী থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাহা অপেক্ষা তাহাদের করবহনযোগ্যতা অনেক বেশী, কারণ ওই সময়ে তাহাদের মনোভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ। দ্বিতীয়তঃ, দেশের অভ্যন্তরে জাতীয়আয়ের বণ্টনের উপরও করবহনযোগ্যতা নির্ভর করে। আয়-বৈষম্য যত বেশী থাকে, করবহনযোগ্যতা তত বেশী। তৃতীয়তঃ, জাতীয় আয়ের অনুপাতে জনসংখ্যার পরিমাণের উপর ইহা নির্ভর করে। জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যায় বৃদ্ধি দ্রুততর বা অধিকহারে হইলে মাথাপিছু আয় কমিয়া যায়, জাতির করবহনযোগ্যতা হ্রাস পায়। চতুর্থতঃ, দেশের সামগ্রিক শিল্প-সংগঠনের প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। যদি মূলধন-গঠনের হার অধিক রাখিতে হয় (যেমন অনুন্নত দেশে পরিকল্পনার সময়ে), তাহা হইলে সেই সময়ে দেশের করবহন যোগ্যতা কম। কিন্তু বর্তমানে মূলধন-গঠনের ফলে ভবিষ্যতে জাতীয় আয় বাড়িতে পারে, এমতাবস্থায় দেশের ভবিষ্যৎ করবহনযোগ্যতা বেশী হইবে। পঞ্চমতঃ, ইহা নির্ভর করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর ; কারণ উহা দ্বারাই তাহাদের মনস্তত্ব, দক্ষতা, কাজ করিবার ক্ষমতা ও স্পৃহা নির্ধারিত হয়। ষষ্ঠতঃ, কর ব্যবস্থার (Tax-System) প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। কর-কাঠামোতে তুলনা-মূলকভাবে প্রত্যক্ষ কর অধিক থাকিলে করবহনযোগ্যতা বেশী ; দেশের উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাদের সাহায্যে অধিক পরিমাণ কর-রাজস্ব আদায় করা চলে। সর্বশেষে, ইহাও লক্ষ্য রাখা দরকার যে, কববহন যোগ্যতা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যদি বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের করবহনযোগ্যতা বাড়িবে। কিন্তু বর্তমানে যদি সমরসম্ভার প্রস্তুত করাতে বা প্রতিযোগিতামূলক সমর-প্রস্তুতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে দেশের করবহনযোগ্যতা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করা চলে।

নির্ধারণকারী বিষয়-সমূহ : মনস্তত্ব, জাতীয় আয়ের বণ্টন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, দেশের শিল্প-সংগঠন, জীবনযাত্রার মান, কর-ব্যবস্থার প্রকৃতি, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি

ডাল্‌টনের মতে এই ধারণা অত্যন্ত ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট, চূড়ান্ত করবহন যোগ্যতা বলিয়া কিছু নাই, রাষ্ট্রিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইহাকে মোটেই স্থান দেওয়া উচিত নয়। অপরপক্ষে, ফিণ্‌লে শিরাস্-এর মতে এই ধারণার কিছুটা বাস্তব কার্যকারিতা আছে ; 'স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন্ দেশ সর্বাধিক কি পরিমাণ কর দিতে রাজী আছে সেই সীমা, অস্পষ্টভাবে হইলেও, সরকারের জানিয়া রাখা সর্বদাই ভাল।'

রাষ্ট্রিক অর্থনীতিতে ইহার স্থান

করঘাত ও করপাত (Impact and Incidence of Taxes):

কোন কর ধার্য করা হইলে যাহার নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর গ্রহণ করেন, তিনি করের প্রথম আঘাত বহন করেন; কিন্তু তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে করের আর্থিক ভার বহন না-ও করিতে পারেন। তাঁহার নিকট হইতে কর আদায় হইল বটে, কিন্তু তিনি করের দরুণ প্রদত্ত অর্থ অপর কাহারও নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারেন। অর্থাৎ, তাঁহার নিকট হইতে কর আদায় হইলেও করের আর্থিক ভার অপর কেহ বহন করিল, এইরূপ ঘটিতে পারে। যাঁহার নিকট হইতে আদায় হইল, তিনি করঘাত (Impact) বহন করেন; আর যিনি সত্যই আর্থিক ভার বহন করেন, নিজের আয় হইতে কর প্রদান করিয়া যাঁহার আর্থিক আয় কমিয়া যায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে করপাত (Incidence) বহন করেন, এরূপ বলা হয়। কাহারও উপর কর আরোপিত হইলে তিনি কর প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট সরাইয়া দিতে পারেন। কর প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট ঠেলিয়া দেওয়ার এই ধারাকে করসরণ (Shifting) বলা হয়।

করের ফলাফল (Effects) এবং করপাত (Incidence) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন, যদি কোন উদ্যোক্তা দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া আরোপিত করকে সরাইয়া ভোগকারী ক্রেতাদের দিকে ঠেলিয়া দেয়, তাহা হইলে বিক্রয় কমিয়া তাহার নিজের, শ্রমিকদের বা কাঁচামালের বিক্রেতাদের আয়, ব্যয়, সঞ্চয় প্রভৃতি কমিবে, সমাজে সেই কর আরোপিত হইবার দরুণ বহু প্রকার ফলাফল দেখা দিবে। করপাত বলিলে এই সকল ফলাফল বুঝায় না; ইহার অর্থ হইল সর্বশেষ স্তরে করের আর্থিক ভার কাহার উপর পড়িতেছে, কে সত্যই কর প্রদান হইতে আর্থিক হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

করসরণের রূপ

করসরণ অনেক প্রকার হইতে পারে। কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উৎপাদক করের পরিমাণ অনুযায়ী দাম বৃদ্ধি করিয়া সেই কর ক্রেতার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, অথবা দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ কমাইয়া দিয়া পূর্বাপেক্ষা খারাপ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া করের আসলভার ক্রেতাদের নিকট পাঠাইতে পারে।

করসরণের দিক্ নির্ণয়

করসরণ অগ্রমুখী (Forward) বা পশ্চাৎমুখী (Backward) হইতে পারে। যদি উৎপাদকের উপর কর আরোপ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদক কর-প্রদানের দায়িত্ব ক্রেতাদের নিকট সরাইয়া দিলে তাহা অগ্রমুখী করসরণ; যদি সে কাঁচামালের বিক্রেতার উপর চাপ দিয়া কম দামে কাঁচামাল ক্রয় করিয়া করভার তাহার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে উহা পশ্চাৎমুখী করসরণ।

করপাতের পরিমাপ নির্ভর করে উৎপাদক ও ক্রেতার পারস্পরিক করসরণের ক্ষমতার উপর। সাধারণতঃ, যিনি করঘাত বহন করেন, তিনি করের সম্পূর্ণ অংশ নিজেই বহন করেন না, অথবা সম্পূর্ণ অংশই অন্যের উপর সরাইয়া দিতে পারেন না। করের পরিমাণ পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি করিতে পারিলে করভার সম্পূর্ণ অন্যের উপর সরাইয়া দেওয়া যায়; দাম মোটে বাড়াইতে না পারিলে করের পরিমাণ সম্পূর্ণ নিজে বহন করিতে হয়। সাধারণতঃ, এইরূপ অবস্থায় দাম অল্প কিছু বাড়িয়া যায়, বিক্রয় ও মুনাফা কমে এবং উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে করপাতের অংশ ভাগাভাগি হইয়া যায়।

করপাতের সাধারণ নীতি

দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে, করসরণের পরিমাপ কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার উপর। করের আর্থিকভার উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে কিরূপে ভাগাভাগি হইবে, তাহা দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের সঙ্কোচপ্রসার-ক্ষমতার উপর নির্ভর করিবে। যদি দ্রব্যের চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার-ক্ষম হয়, তবে দাম বাড়ান বিশেষ চলিবে না, কারণ তাহাতে বিক্রয় খুবই কমিয়া যাইবে; এমতাবস্থায় উৎপাদক বা বিক্রেতাকেই করের অধিক অংশ বহন করিতে হইবে। চাহিদা সঙ্কোচপ্রসার বিহীন হইলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হইলেও বিক্রয় বেশী কমিবে না, ক্রেতাদেরই করের অধিক অংশ বহন করিতে হইবে। যদি যোগান সঙ্কোচ প্রসারক্ষম হয়, তাহা হইলে করেব অধিক অংশ ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে; যদি সঙ্কোচপ্রসাব বিহীন হয়, তাহা হইলে করের অধিক অংশ বিক্রেতা বা উৎপাদককে বহন করিতে হইয়া থাকে।

চাহিদা ও যোগানের সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা

সুতরাং করের আর্থিকভার ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইযা যাইবে, এই বিভাগের পরিমাণ চাহিদা ও যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতার পারস্পরিক শক্তির উপর নির্ভর করিবে।*

বিক্রেতা ও ক্রেতাদের উপর করভাবের এইরূপ বণ্টন হয় দাম ও উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তনের মারফৎ, এবং এই সকল পরিবর্তন কিছুটা সময়সাপেক্ষ। সুতরাং, দীর্ঘকালেই করপাত সম্পূর্ণ ঘটে। স্বল্পকালে, করের প্রভাবে দাম বৃদ্ধি হয় এবং সাধারণতঃ ভোগকারী বা ক্রেতাদেরই সম্পূর্ণ ভার বহন করিতে হয়।

সময়-বিচারের গুরুত্ব

*সূত্রাকারে প্রকাশ করিলে বলা যায়ঃ

$$\frac{\text{করভারের বিক্রেতার অংশ}}{\text{করভারের ক্রেতার অংশ}} = \frac{\text{চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা}}{\text{যোগানের সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা}}$$

দীর্ঘকালে, অপরাপর বহু প্রভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণতঃ, সমাজে সকল দ্রব্যাদির দাম পারস্পরিক ভাবে সংযুক্ত; কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপ করিলে অন্যান্য দ্রব্যাদির (পরিবর্ত দ্রব্যাদি, সহযোগী দ্রব্যাদি, বা কাঁচামাল প্রভৃতি) দাম, উৎপাদন প্রভৃতি প্রভাবান্বিত হয়, যেমন কাঁচামালের উৎপাদক কম দাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের সম্মিলিত প্রভাবে দীর্ঘকালীন করপাত নির্ধারিত হয়।

দীর্ঘকালীন করপাত

সমহার প্রতিদানের নিয়ম ও করপাত

যদি দ্রব্যটি সমহার উৎপন্নের নিয়ম (Law of Constant Returns) অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ আরোপিত করের সম্পূর্ণ পরিমাণ পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি হইতে পারে। কর-আরোপের ফলে দাম-বৃদ্ধি হইবে এবং চাহিদা কমিয়া যাইবে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় সমানই থাকে, সুতরাং করের পরিমাণের অধিক দাম-বৃদ্ধি হইতে পারে না।

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম ও করপাত

দ্রব্যটি যদি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দামে বৃদ্ধি করের পরিমাণ হইতে কম হইবে। যেমন, ধরা যাউক ১০০০ ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় ৭ টাকা। ইউনিট-প্রতি ১ টাকা কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া ৮ টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম উৎপন্ন হইলে, (ধরা যাউক, ৮০০) ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া ৬৷৷০ হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে ৭৷৷০, অর্থাৎ করের পরিমাণের তুলনায় দামে বৃদ্ধি কম হইল।

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম ও করপাত

দ্রব্যটি যদি ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের দামে বৃদ্ধি করের পরিমাণ হইতে বেশী হইতে পারে। যেমন, ধরা যাউক ১০০০ ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৭ টাকা। কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া ৮ টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম উৎপন্ন হইলে, ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িয়া ৭৷৷০ হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে ৮৷৷০, অর্থাৎ করের পরিমাণের তুলনায় দামে বৃদ্ধি বেশী হইল।

একচেটিয়া দ্রব্যের উপর করপাত নির্ভর করে করের প্রকৃতির উপর। সাধারণতঃ, যে পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয় সমান—একচেটিয়াদার সেই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করে এবং সেই অনুযায়ী দাম স্থির করে। মুনাফার উপর কর আরোপিত হইলে, দামে কোন পরিবর্তন হইবে না—তাহার নিজের উপরই সম্পূর্ণ করপাত ঘটিবে।*

একচেটিয়া ব্যবসা ও করপাত

উৎপাদনের পরিমাণের উপর কর আরোপিত হইলে, সাধারণতঃ দাম একটু বাড়িয়া যায় এবং ভোগকারী করপাতের অংশগ্রহণ করে। কর-কে উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লইলে প্রান্তিক ব্যয় বেশী, সুতরাং দামও বাড়িয়া যায়। দাম কি পরিমাণে বাড়িবে বা একচেটিয়াদার ও ভোগকারীগণ কে করপাতের কিরূপ অংশ বহন করিবেন, তাহা চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। চাহিদা যত বেশী সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষম হইবে একচেটিয়াদার তত অধিক অংশ বহন করিবেন। উৎপাদন যত বাড়িবে করহার ততই কমিবে—এইরূপ কর স্থাপিত হইলে একচেটিয়াদার দাম কমাইয়াও (অধিক চাহিদা সৃষ্টি করিয়া) উৎপাদন বাড়াইতে পারে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে তাহার করভার এড়াইবার চেষ্টাতে ভোগকারীদের সুবিধা হইয়া যাইতে পারে।

মুনাফার উপর কর ও উৎপাদনের উপর কর

প্রত্যক্ষকর ও পরোক্ষকর (Direct and Indirect Taxes)

যে ব্যক্তির উপর কর আরোপিত হয়, যদি সেই ব্যক্তিই সর্বশেষস্তরে করের আর্থিকভার বহন করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। (যেমন, আয়কর প্রভৃতি)। যাহার উপর কর-আরোপিত হয় বা যাহার নিকট হইতে কর আদায় করা হয় যদি সেই ব্যক্তি করভার অন্যের উপর সরাইয়া দিতে পারে বা অন্যের নিকট হইতে সেই অর্থ তুলিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সেরূপ করকে পরোক্ষকর বলে (যেমন বিক্রয়কর, আমদানী শুল্ক প্রভৃতি)। অর্থাৎ, করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর হইলে তাহা প্রত্যক্ষকর; করঘাত ও করপাত পৃথক ব্যক্তির উপর হইলে তাহা পরোক্ষ-কর।

প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর কাহাকে বলে

*মুনাফার উপর তিনপ্রকারে কর আরোপিত হইতে পারে (ক) মুনাফা হইতে মোটমাট কিছু পরিমাণ অর্থ, (খ) মুনাফার শতকরা কিছু অংশ, (গ) মুনাফার উপর ক্রমবর্ধমান হারে। সকল ক্ষেত্রেই করপাত একচেটিয়াদারের উপর।

প্রত্যক্ষ-করের সুবিধা হইল যে (১) ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপিত করা যায়, ব্যক্তির করপ্রদানক্ষমতা অনুযায়ী তাহার নিকট হইতে কর আদায় করা সম্ভবপর। (২) প্রত্যক্ষ করের আর্থিক ভার সকলেই নিশ্চিতরূপে জানে। কখন, কি পরিমাণ, কোথায়, কিভাবে কর দিতে হইবে তাহা নিশ্চিত ও স্পষ্ট ; ইহাতে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়েই নিজেদের ব্যয় ও আয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে। (৩) প্রত্যক্ষ-কর আদায়ের ব্যয় খুবই কম ; ইহা ব্যয়সঙ্কোচশীল। (৪) প্রত্যক্ষ কর খুবই প্রসারশীল (elastic) ; করহার অল্প একটু বাড়াইলেই প্রত্যক্ষ-কর হইতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়ান যাইতে পারে। (৫) প্রত্যক্ষ-করদাতা রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে ; নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি দেখা দেয়।

প্রত্যক্ষ-করের সুবিধা

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা হইল (১) ইহা সাধারণতঃ খুবই অপ্রিয়। সরাসরি পকেট হইতে কর দিতে হয় বলিয়া লোকে এইরূপ কর বিশেষ অপছন্দ করে। লোকে ব্যক্তিগত আয়ের উৎস প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহা-ও ইহা অপছন্দের অন্যতম কারণ। (২) প্রত্যক্ষ-কর লোকের কর ফাঁকি দেওয়ার বা অসাধুতা অবলম্বন করার প্রবণতা বাড়াইয়া দেয়। (৩) প্রত্যক্ষ-করের ক্রমবর্ধমান হার সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ক্রমাগত উচ্চ আয়স্তরে যে হারে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা কমিয়া যায়, তাহার সহিত ক্রমবর্ধমান করহারের যোগ থাকা উচিত ; কিন্তু বাস্তবে উহা পরিমাপযোগ্য নহে। (৪) উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর উচ্চহারে প্রত্যক্ষ-কর আরোপ করিলে উহা সঞ্চয়-স্পৃহা বা কর্মোদ্যম কমাইয়া দিতে পারে।

প্রত্যক্ষকরের অসুবিধা

পরোক্ষ করের সুবিধা হইল (১) ধনীগরীব সকলকেই সাধারণতঃ এই কর দিতে হয়, ফলে করকাঠামো বিস্তৃতভিত্তিক (broad-based) হইতে পারে। (খ) এই ধরণের কর প্রদান করা করদাতাদের পক্ষে সুবিধাজনক, কারণ ইহা প্রতিবারে খুবই অল্প পরিমাণে দিতে হয়। (গ) দ্রব্যের দামের মধ্যে কর জড়িত থাকে বলিয়া ইহা বিশেষ অপ্রিয় বোধ হয় না। (ঘ) কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদা সঙ্কোচপ্রসার বিহীন হওয়ায় উহাদের উপর করস্থাপন করিলে প্রভূত রাজস্ব পাওয়া যাইতে পারে। (ঙ) পরোক্ষ-করের সাহায্যে সামাজিক সংস্কারের কার্য কিছুদূর অগ্রসর করান যাইতে পারে (যেমন, মদ প্রভৃতির উপর শুল্ক)।

পরোক্ষকরের সুবিধা

পরোক্ষ-করের অসুবিধা হইল (১) ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ বিবেচনা না করিয়াই ইহা আদায় করা হয়, সুতরাং ইহাকে প্রগতিশীল বলা চলে না; তুলনামূলক-ভাবে গরীবদের উপর এই করের চাপ অধিক পড়ে, তাহাও বাঞ্ছনীয় নয়। (২) এই কর আদায় করার শাসনতান্ত্রিক ব্যয় অনেকক্ষেত্রে খুবই বেশী; সুতরাং ব্যয়নির্বাহ করিয়া বিশেষ উদ্বৃত্ত রাজস্ব পাওয়া যায় না। (৩) সমাজের ভোগ-প্রবণতায় আঘাত দেওয়ায় এই কর মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে। (৪) পরোক্ষকর প্রদান করিলে লোকের মনে রাজনৈতিক চেতনা ও সজাগ দৃষ্টি জাগ্রত হয় না, রাষ্ট্রের কাজকর্মের উপর অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রেরণা সৃষ্টি হয় না।

পরোক্ষকরের অসুবিধা

যদিও ন্যায়ের দিক হইতে বা করপ্রদান ক্ষমতা বিচার করিলে প্রত্যক্ষকর তুলনামূলকভাবে অধিকতর কাম্য, কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রসমূহের রাজস্বের প্রয়োজন এত বেশী যে উভয় প্রকার কর-ই কর-কাঠামোয় স্থান পায়। বরং, দেখা যাইতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রমাগতই পরোক্ষ-করের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

উপসংহার

করের ফলাফল (Effects of Taxation)

ডাল্টনের অভিমতে **উৎপাদনের উপর** করের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা চলে (১) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রভাব, (২) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর প্রভাব, (৩) অর্থনৈতিক উপাদান সমূহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগে দিক্ পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব সমূহ।

যদি কর আরোপের ফলে ব্যক্তি তাহার ভোগব্যয় কমাইতে বাধ্য হয় (যেমন মজুরী বা খাদ্যের উপর কর) তাহা হইলে সেই করের ফলে তাহার কর্মোদ্যম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় খুব কম, কিছু সঞ্চিত থাকে না, তাহারা ব্যতীত অপর সকলেরই সঞ্চয়-ক্ষমতা করআরোপের ফলে কমিয়া যায়। সাধারণতঃ দেশে আয় কর একটি নির্দিষ্ট আয়ের উর্ধ্ব হইতে ধার্য করা হয়; সেই নির্দিষ্ট আয়ের নীচে বা নিম্ন আয়কারী ব্যক্তিদের আয়কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সুতরাং আয়কর তাহাদের কর্মোদ্যম বা কর্মক্ষমতা সঙ্কুচিত করে না।

কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর ফলাফল

কোন কর সম্বন্ধে যদি এরূপ ধারণা হয় যে ইহা স্বল্পকাল স্থায়ী হইবে, তাহা হইলে উহা কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর বিশেষ

প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু কোন স্থায়ী কর করদাতার আয়কে স্থায়ীভাবে কমাইয়া দেয়; সুতরাং তাহার কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের যে শ্রেণীর আয় বেশী, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর উচ্চহারে কর তাহাদের কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমাইয়া দিবে; ডাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা অধিক (the elasticity of demand for income is large)। নিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর কর ধার্য হইলে আয় কমিয়া যাওয়ায় তাহা পূরণ করিবার জন্য কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা বাড়িয়া যাইতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকসংখ্যক পোষ্য আছে বা ব্যক্তি ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট আয় পাইবার জন্য বর্তমানে সঞ্চয় করিতেছে, সেখানে ইহা খুবই সত্য। ডাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা কম (the elasticity of demand for income is small)।

কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর ফলাফল

যে শিল্পের উপর অধিক কর আরোপ করা হইয়াছে সেখানে মুনাফার হার তুলনামূলক ভাবে কমিয়া যাওয়ায় সেই শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া অন্য শিল্পে (যেখানে তুলনায় কর অধিক নহে) চলিয়া যাইতে চাহিবে। অনেক সময়ে এইরূপ মূলধনের ক্ষেত্রান্তরে নিয়োগ সমাজের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়াইতে পারে, বা সামাজিক উপযোগিতার দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় (যেমন মদ, গাঁজা বা আফিমের উপর কর)। যেমন, আমদানী-শুল্কের ফলে দেশের শিশু শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, এইরূপ কর-আরোপনের ফলে মূলধন নিয়োগের যেরূপ দিক্ পরিবর্তন ঘটে তাহা অবাঞ্ছনীয়, যেমন রপ্তানী শুল্কের ফলে দেশের রপ্তানী শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া আসিতে পারে। অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধির উপর (Unearned Increment) এবং মূলধনের সকল ব্যবহারের উপরই সমভাবে কর স্থাপিত হইলে (যেমন, আয় কর) উপাদানের ক্ষেত্রান্তরে নিয়োগ বা নিয়োগে দিক্‌পরিবর্তন ঘটে না।

উপাদানসমূহের নিয়োগে দিক পরিবর্তন সংক্রান্ত ফলাফল

যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে স্থানীয় করের (Local Taxes) হার অধিক হয়, তাহা হইলে মূলধন অপর কোন অঞ্চলে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে।

সাধারণভাবে, কর আরোপনের ফলে দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কিছুটা ব্যাহত হইবেই। যদি অবশ্য সেই আয় হইতে উপযুক্ত ধরণের রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকে, তবে সেই ব্যয়ের দরুণ উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রবণতা করের দরুণ উৎপাদন-হ্রাসের-প্রবণতা হইতে অধিক হইতে পারে।

উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর ফলাফল

বণ্টনের উপর করের প্রভাব নির্ভর করে করের প্রকৃতির উপর (on the Nature of the Tax)।*

যে সকল করের হার ক্রমহ্রাসমান বা আনুপাতিক তাহারা সাধারণতঃ সমাজের আর্থিক বৈষম্য বাড়াইয়া দেয়; যে সকল করের হার ক্রমবর্ধমান তাহারা সাধারণতঃ আর্থিক বৈষম্য কমায়।

সুতরাং, অনেকে বলেন যে বিলাস-দ্রব্য বা ধনীদের উপর অধিক পরিমাণে কর আরোপ করিয়া অধিক রাজস্ব আদায় করা উচিত। কিন্তু ইহার ফলে উৎপাদন, কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং স্পৃহা সকল কিছুই ব্যাহত হইতে পারে।

রাষ্ট্রিক ঋণ (Public Debt):

আয় হইতে ব্যয় অধিক হইলে ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রকেও সেই ফাঁক ঋণ করিয়াই পূরণ করিতে হয় বটে; কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণ ও রাষ্ট্রিক ঋণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

ব্যক্তিগত ঋণ ও রাষ্ট্রিক ঋণের পার্থক্য

(১) রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়া বা বাধ্যতামূলক ভাবে ঋণগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি কাহারও উপর জোর খাটাইতে পারে না। (২) সরকারী ঋণ সম্পূর্ণ অপরিশোধ্য বা চিরস্থায়ী ধরণের হইতে পারে, কবে ইহা শোধ দেওয়া হইবে সে সম্বন্ধে কোন তারিখ নির্দিষ্ট নাও থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঋণ অপরিশোধনীয় অবস্থায় রাখিতে পারে না। (৩) রাষ্ট্র নিজের নাগরিকদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজেরই নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারে না। (৪) ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র দেউলিয়া হয় না। (৫) রাষ্ট্র নূতন কাগজী অর্থ প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, বা পুরাতন ঋণ শোধ দিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সেরূপ কোন সুবিধা নাই। (৬) ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক কর বসাইতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। (৭) দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রিক ঋণের প্রভাব ও ফলাফল ব্যক্তিগত ঋণের প্রভাব ও ফলাফল হইতে পৃথক ও ব্যাপক।

ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্র যত কম ঋণ করে ততই ভাল এবং

* ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীগণের অভিমতে ধনবণ্টন ব্যবস্থা বা আর্থিক বৈষম্য করের সাহায্যে দূর করা সম্ভব হয় না বা তাহা উচিতও নয়; সমাজের বণ্টন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করাই বাঞ্ছনীয়। আধুনিক ধন-বিজ্ঞানীগণ অবশ্য আর্থিক বৈষম্যের পরিধি সঙ্কুচিত করাকে কর-নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রাষ্ট্রের ঋণ করা উচিত নহে। কিন্তু দেখা যায়, কয়েকটি অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হয়। (১) যদি স্বাভাবিক অবস্থায়, হঠাৎ কোন অচিন্ত্যপূর্ব কারণে আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইতে থাকে, তাহা হইলে ঋণ না করিয়া উপায় নাই। যুদ্ধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থায় এত অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন কর-রাজস্ব হইতে সকল ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। (২) অনেক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র নিজেই অর্থ নৈতিক উপাদানসমূহের পূর্ণনিয়োগের উদ্দেশ্যে বা বিশেষ ধরণের শিল্প, ব্যবসা প্রভৃতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রভূত ব্যয় করেন; এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের সাহায্যে সেই অর্থ তোলা চলিতে পারে। এই ধরণের ব্যয় প্রকৃতপক্ষে মূলধন-বিনিয়োগ, ইহা হইতে ভবিষ্যতে অধিকতর সম্পদ বা আয়-সৃষ্টি হইবে, সুতরাং বর্তমানে ঋণ করিয়া সেই ঋণভার ভবিষ্যতের উপর বিস্তৃত করিয়া রাখা চলে। ওই সকল রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হইতে ভবিষ্যতে যে আয় হইবে তাহা হইতেই উহা সুদসহ পরিশোধ করা চলিবে।.

রাষ্ট্রিক ঋণের যুক্তি-সঙ্গত কারণসমূহ

অ্যালেন্ ও ব্রাউন্‌লীর মতে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ঋণের উদ্দেশ্য হইল প্রধানতঃ তিনটি: (ক) যে সকল উপকরণসমূহ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত, তাহাদের সরাইয়া আনিয়া রাষ্ট্রগতক্ষেত্রে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে, (খ) অব্যবহৃত বা অনিযুক্ত উপকরণ-সমূহকে ব্যবহারের বা নিয়োগের উদ্দেশ্যে, (গ) আকস্মিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে।

অ্যালেন ও ব্রাউন্‌লীর মতে

সাধারণ হারে সুদ প্রদান করিয়া যদি উপযুক্ত পরিমাণে ঋণ আকর্ষণ করা না যায় তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে অধিক ঋণ দানে প্ররোচিত করার চেষ্টা হয়। যেমন, (১) ঋণ প্রদান করিলে উহাকে বা উহা হইতে প্রাপ্ত সুদকে আয় কর হইতে অব্যাহতি প্রদান, (২) কর প্রদানের সময়ে সরকারী ঋণপত্রসমূহের মূল্য অধিক ধরিতে দেওয়া, (৩) ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা কমমূল্যে উহা বিক্রয় করা (যেমন, ১০০ টাকার সরকারী ঋণপত্র ৯৯ টাকাতে বিক্রয় করা), (৪) ঋণ পরিশোধের সময়ে ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান (যেমন ১০০ টাকার ঋণপত্র পরিশোধের সময়ে ১০২ টাকা ফেরৎ দেওয়া)।

অধিক ঋণ আকৃষ্ট করার বিশেষ পদ্ধতি-সমূহ

রাষ্ট্রীয় ঋণের পক্ষে যুক্তি হইল, (১) ইহা দ্বারা আকস্মিক প্রয়োজন মিটান

সম্ভবপর হয়। কর আদায় করা সময়সাপেক্ষ, ইতিমধ্যে ব্যয়ের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রাষ্ট্র স্বল্পকালীন ঋণগ্রহণ করে (Ways and Means Advances); অথবা, বাজার হইতে সরকারী বিল ভাঙাইয়া লয় (Treasury Bills)। (২) দীর্ঘকালীন ঋণ ব্যতীত দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কাজ গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

রাষ্ট্রিক ঋণের পক্ষে যুক্তি বা ঋণের উপকারিতা

(৩) যুদ্ধের সময়ে কর দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করা অপেক্ষা ঋণ দ্বারা ব্যয় মিটান তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি। (৪) জনসাধারণের পক্ষে ইহা নিশ্চিত ও কম-ঝুঁকি-সম্পন্ন অর্থ-বিনিয়োগ, ফলে দেশে সঞ্চয়-বৃদ্ধি ও মূলধন-গঠন ত্বরান্বিত হয়। (৬) সরকারী ঋণপত্রসমূহ দেশের ঋণ-ব্যবস্থাকে উন্নত করে এবং ঋণের পরিমাণ-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে (খোলাবাজারে কার্যকলাপ প্রভৃতি); মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বা সঙ্কটত্রাণ ঘটায়, (৭) অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রসার ঘটাইবার পক্ষে উপযোগী আর্থিক নীতি ও কৌশল হিসাবে রাষ্ট্রীয় ঋণ কাজ করে। শিল্পে উন্নত দেশসমূহে পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছান অথবা, অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা রাষ্ট্রীয় ঋণের অন্যতম প্রধান সুফল। লার্ণারের ভাষায় করস্থাপন ও ব্যয়, ঋণগ্রহণ ও ঋণপ্রদান এবং ক্রয় ও বিক্রয়—এই ছয়টি সরকারী রাজস্বনীতির অঙ্গ।

রাষ্ট্রীয় ঋণের ত্রুটি হইল (১) ঋণগ্রহণের সুবিধা থাকিলে অযৌক্তিক বা অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অযথা ঋণগ্রহণে প্রলুব্ধ হইতে পারে। (২) সরকারী রাজনৈতিক দল স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার করিতে পারে। (৩) বিদেশ হইতে ঋণ সত্যই বিশেষ ভারবহুল, কারণ জাতীয় আয়ের একাংশ সুদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের মারফৎ বিদেশে চলিয়া যায়।

রাষ্ট্রিক ঋণের বিপক্ষে যুক্তি বা ঋণের অপকারিতা

(৪) প্রভূত রাষ্ট্রীয় ঋণের ফলে করেব পরিমাণ ও হার খুবই বেশী হইতে থাকে (সুদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনে)। ইহার দরুণ দেশে কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং স্পৃহা কমিতে পারে (৫) সুদের ভার অধিক হওয়ায় উহার আসলভার কমাইবার উদ্দেশ্যে সরকার অনেক সময় 'সস্তা অর্থের নীতি' (Cheap Money policy) গ্রহণ করে; দেশে অত্যধিক পরিমাণ ঋণপত্র প্রভৃতি ছড়াইয়া পড়ায় মূলধন-বাজারে ফাট্‌কাবাজীর সুবিধা হয়, দামস্তর অস্থিতিশীল (Unstable) হইয়া পড়ে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা দেয়।

রাষ্ট্রীয় ঋণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Debt):

বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ঋণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

(১) কোন্ কর্তৃপক্ষ ঋণগ্রহণ করিতেছে সেই অনুযায়ী ঋণকে কেন্দ্রীয় ঋণ, প্রাদেশিক বা রাজ্য-ঋণ এবং স্থানীয় ঋণ প্রভৃতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(২) যদি জোর করিয়া ঋণ আদায় করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্যতামূলক ঋণ, আর যদি ঋণদান ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাকে স্বেচ্ছামূলক ঋণ বলা হয়।

(৩) রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অধিবাসীদের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিলে তাহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণ এবং বিদেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে বাহ্যিক ঋণ বলা হয়।

(৪) যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে নির্দিষ্ট-পরিশোধ্য ঋণ (Redeemable) বলে; এবং যদি ঋণ পরিশোধের কোন সময়-সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে উহাকে অনির্দিষ্ট-পরিশোধ্য ঋণ (Irredeemable) বলা হয়।

(৫) অতি দীর্ঘকাল পরে ঋণ পরিশোধ করা হইবে এইরূপ ঋণকে দীর্ঘ-আবদ্ধ ঋণ (Funded Debt) বলে; এবং স্বল্পকালের মধ্যে, যেমন এক বৎসরের মধ্যেই ঋণ পরিশোধ করা হইবে এইরূপ ঋণকে স্বল্পআবদ্ধ ঋণ বা ভাসমান ঋণ (Unfunded Debt or Floating Debt) বলা হয়। এই সকল শব্দ ইংলণ্ডে একটু পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ইংলণ্ডে দীর্ঘ-আবদ্ধ ঋণ বলিলে বোঝা হয় এমন ঋণ যাহার সুদ দিতে সরকার আইনতঃ বাধ্য, কিন্তু মূল-পরিমাণ (Principal) কখনও পরিশোধ দিতে বাধ্য নহে। ইহা তাই স্থায়ীধরণের ঋণ; যেমন কন্‌সলস্ (Consols)। অপরপক্ষে, স্বল্পআবদ্ধ ঋণ বলিতে বোঝা যায় যে ঋণ নির্দিষ্ট কোন তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হইবে।

(৬) অনেক সময় রাষ্ট্র অ্যান্নুইটির দ্বারা ঋণ গ্রহণ করে। এই অ্যান্নুইটিগুলি সমাপনীয় (Terminable) বা চিরন্তন (Perpetual) হইতে পারে। প্রথমক্ষেত্রে, কয়েকবৎসর যাবৎ সুদ ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ প্রদান করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যতদিন অ্যান্নুইটি ক্রেতা (Annuitant) বাঁচিয়া থাকেন রাষ্ট্র ততদিন নিয়মিতভাবে সুদ ও মূলপরিমাণের কিছু অংশ প্রদান করিতে থাকে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়।

(৭) ঋণের দ্বারা অর্থ তুলিয়া যদি এরূপভাবে ব্যয় করা হয় যাহাতে (ক) সেই মূল্যের সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে থাকে, বা (খ) সম্পত্তি হইতে এমন আয় হয় যাহা দ্বারা সুদ প্রদান বা ঋণপরিশোধ করা সম্ভবপর, অথবা (গ) সমাজের উৎপাদনশক্তি খুবই বাড়াইয়া দেয়—তাহা হইলে সেই ঋণকে উৎপাদনশীল ঋণ (Productive Debt) বলা হয়। মিসেস্ হিক্‌স এইরূপ ঋণকে সক্রিয় ঋণ (Active Debt) বলিয়াছেন।

ঋণের দ্বারা গৃহীত অর্থের বিনিময়ে কোন সম্পত্তিই রাষ্ট্রের হাতে না থাকিলে বা আয় প্রদানকারী সম্পত্তিতে ব্যয়িত না হইলে অথবা সমাজের উৎপাদনশক্তি বাড়ায় না এইরূপ হইলে, উহাকে অনুৎপাদনশীল ঋণ (Unproductive Debt) বলা হয়। যদি তাহা শুধুমাত্র সমাজের ভোগ বা তৃপ্তিকে বাড়াইয়া দেয় (যেমন মিউজিয়াম্ বা পার্ক প্রভৃতি) তাহা হইলে মিসেস্ হিক্‌সের ভাষায় তাহাকে নিষ্ক্রিয় ঋণ (Passive Debt) বলে।

যে সকল ঋণ-সৃষ্টির কারণ অনুৎপাদনশীল ব্যয় এবং কখনই সেইরূপ ব্যয় হইতে সমাজের তৃপ্তি বা উৎপাদনক্ষমতা বাড়িবে না, তাহাদের তিনি মৃতভার ঋণ (Deadweight debt) বলিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় ঋণের ভার (The burden of Public Debt) :

উৎপাদনশীল ঋণের ভার কিছু নাই কারণ উহার ব্যয় দ্বারা যে সম্পত্তি থাকে তাহা হইতে আয় বা উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং সুদ বা ঋণ-মূল পরিশোধ করা যায়। অনুৎপাদনশীল ঋণের ভার দেশের লোকের উপর পড়ে, কারণ কররাজস্ব হইতেই উহা পরিশোধ বা উহার সুদ প্রদান করিতে হয়।

ঋণভার পরিমাপ করিতে হইলে বহু বিষয় গণনার মধ্যে আনিতে হয় যেমন ঋণের পরিমাণ, আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, ঋণের উদ্দেশ্য, পরিশোধের সর্ত ও পদ্ধতি প্রভৃতি। তাহা ছাড়া, জাতীয় আয়ের পরিমাণ, দেশে করব্যবস্থার রূপ, এবং সরকারী ঋণপত্রসমূহ দেশের কোন শ্রেণীর হাতে কিরূপভাবে বণ্টিত আছে—প্রভৃতি সকল কিছু বিচার করা দরকার।

ঋণভার পরিমাপের বিষয়-সমূহ

রাষ্ট্রীয় ঋণভার দুইপ্রকার : আর্থিক ভার ও আসল ভার। ইহার প্রত্যেকটি ভার আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—প্রত্যক্ষ ভার ও পরোক্ষ ভার।

কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাহ্যিক ঋণের প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার হইল, যে পরিমাণ অর্থ সুদ ও ঋণপরিশোধের জন্য ব্যয়িত হয়। সুদ ও ঋণপরিশোধের জন্য দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানী করিবার ফলে সমাজের ভোগ, তৃপ্তি বা অর্থনৈতিক কল্যাণ কমিয়া যায়, তাহাই প্রত্যক্ষ আসল ভার। ঋণের প্রত্যক্ষ আসল ভার নির্ভর করে সমাজের কোন্ শ্রেণীর নিকট হইতে কিরূপ অর্থ আদায় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হইতেছে, তাহার উপর। যেমন, যদি ধনী শ্রেণীর নিকট হইতে অধিক অর্থ আদায় করা হয়, তাহা

বাহ্যিক ঋণভার

হইলে ঋণের প্রত্যক্ষ আসল ভার কম হইবে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কল্যাণ কম হ্রাস পাইবে। বাহ্যিক ঋণের পরোক্ষ আসল ভারও দেখা যায়, কারণ (ক) পরিশোধনীয় অর্থ তুলিবার জন্য অধিক হারে কর বসাইলে দেশের উৎপাদন ও উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে, এবং (খ) বিভিন্ন দিকে নিয়োগ করিয়া দেশের কল্যাণ বাড়াইবার কার্যে ওই অর্থ নিয়োগ করা সম্ভব হয় না।

আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন প্রত্যক্ষ আর্থিকভার নাই কারণ সুদ ও ঋণপরিশোধ করিলে উহা দেশবাসীগণই পাইয়া থাকেন, এক শ্রেণীর নিকট হইতে অপর শ্রেণীর নিকট ওই অর্থ হস্তান্তরিত হয় মাত্র। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের পরোক্ষ আর্থিক ভার দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ (ক) ধনী-গরীব সকলেই কর দেয়, কিন্তু সুদ হিসাবে আয় বৃদ্ধি হয় ধনী শ্রেণীর, তাঁহারাই সরকারী ঋণ-পত্র ক্রয় করেন। এরূপ অবস্থায়; সম্পদ গরীবদের হাত হইতে ধনীদের হাতে চলিয়া যায়—সম্পদের এইরূপ হস্তান্তরণ আর্থিক বৈষম্যের পরিধি বিস্তৃত করে। (খ) উচ্চহারে কর স্থাপনের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (গ) কল্যাণমূলক সরকারী ব্যয় কমে। (ঘ) দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হয়, গরীবদের জীবনযাত্রার মান ও কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। (ঙ) সুদের দরুণ পূর্বাপেক্ষা অধিক আয় পাইতে থাকায় ধনিকশ্রেণীরও কর্মপ্রচেষ্টা হ্রাস পায়। (চ) যুদ্ধের সময়ে গৃহীত ঋণের আসলভার যুদ্ধের পরে বাড়ে, কারণ যুদ্ধোত্তর যুগে দামস্তর ও সুদের হার কমিয়া যায়।

আভ্যন্তরীণ ঋণভার

লার্ণারের মতে কেবলমাত্র বাহ্যিক ঋণই ভারশীল এবং ব্যক্তিগত ঋণের ন্যায় তাহা রাষ্ট্রকে দরিদ্র করিয়া তোলে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের ভার বিশেষ কিছু নাই। বর্তমান ঋণের ভার ভবিষ্যতের বংশধরদের উপর পড়িতেছে, অনেকে তাহা বলিলেও লার্ণারের মতে ইহা ঠিক নয়, কারণ ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সেই ঋণ তাঁহাদের নিজেদেরই পরিশোধ করিতেছেন, তাঁহার মতে, রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ-ও মোটেই গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় নহে। আর, আভ্যন্তরীণ ঋণের সুদকে কখনই ভার বলা চলে না, কারণ উহা ব্যক্তিরা নিজেরাই পাইয়া থাকেন।

লার্ণারের মত

রাষ্ট্রীয় ঋণের অর্থনৈতিক ফলাফল (The Economic Effects of Public Debt)

রাষ্ট্র ঋণ করিলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ রাষ্ট্রের নিকট চলিয়া আসে; সেই অর্থ ব্যয় করিলে পুনরায় তাহা কিছুসংখ্যক ব্যক্তির নিকট

ফিরিয়া যায়; সেই ঋণ পরিশোধের সময়ে সাধারণ করদাতাদের নিকট হইতে অর্থ চলিয়া আসিয়া সরকারী ঋণপত্র ক্রেতাদের নিকট চলিয়া যায়। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় ঋণ, উহার ব্যয় ও পরিশোধ বহুপ্রকার অর্থনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করে।

অর্থের পরিমাণের উপর প্রভাব

যদি রাষ্ট্র ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। ব্যাঙ্কসমূহ সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক দিয়া ঋণ-গ্রহণের দ্বারা জনসাধারণকে ঋণ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-ও সেই ঋণপত্রকে জমা হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিত্তিতে অধিক অর্থ প্রচলিত করিতে পারে। ব্যাঙ্ক-ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন, ব্যক্তির নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করিলে মুদ্রাসঙ্কোচনশীল প্রভাব ঘটে, কারণ ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরাইয়া লইলে সমাজের ব্যয়স্রোত সঙ্কুচিত হয়।*

দামস্তরের উপর প্রভাব

দামস্তরের উপর প্রভাব নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর : (ক) অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন, ও (খ) অর্থনৈতিক কাজকর্মে পরিবর্তন। ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ বাড়ে, দামস্তরও বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক-ব্যতীত অন্যান্য সূত্র হইতে ঋণগ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ কমে, দামস্তরও হ্রাস পায়। রাষ্ট্রীয় ঋণের ব্যয়ের ফলে যদি উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে দামস্তরে বৃদ্ধি না-ও হইতে পারে; অপরক্ষেত্রে, সেই ব্যয়ের ফলে আয় ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে এবং দামস্তরে হ্রাস না-ও হইতে পারে। কেইন্‌সের মতে, দেশে অনিযুক্ত উপাদান থাকিলে উৎপাদন বাড়িবে কিন্তু দামস্তর স্থির থাকিবে এবং পূর্ণনিয়োগের পরেও ঋণ ও ব্যয় করা হইলে উৎপাদন স্থির থাকিবে, কিন্তু দামস্তরে বৃদ্ধি হইবে।†

ঋণ-পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মসমূহের দ্বারা (Debt-Management) সুদের হার প্রভাবান্বিত হয়। ঋণ-পরিচালনার কাজ

* তবে লুকানো মজুত অর্থ হইতে রাষ্ট্রকে ঋণ প্রদান করিলে এইরূপ ফলাফল না-ও ঘটিতে পারে।

† সোমার্সের মতে রাষ্ট্রীয় ঋণ এবং দামস্তরের সহিত কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু অ্যালেন্ ও ব্রাউন্‌লীর মতে ইহাদের মধ্যে কিছুটা সুদূর সম্পর্ক আছে। তবে, যেহেতু বাজেটে ঋণ সুদ ও পরিশোধনীয় অর্থ প্রভৃতির পরিমাণ কম, তাই সাধারণভাবে দামস্তরের উপর ইহাদের প্রভাব-ও কম।

হইল। ঋণগ্রহণের সময়, ঋণগ্রহণের রূপ ও পদ্ধতি, কোন্ শ্রেণীর নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করা হইবে, কি সুদ দেওয়া হইবে, কবে ও কি হারে পরিশোধ করা হইবে, ঋণপত্র ক্রেতাদের কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইবে এই সকল বিষয়ে নীতি-নির্ধারণ করাকে ঋণ-পরিচালনা বলে। যে হেতু স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয় প্রকার ঋণের বাজারেই রাষ্ট্র প্রধান ঋণগ্রহীতা, সেই জন্য ইহার ঋণপরিচালনার প্রভাব সুদের হারের উপর পড়ে।

সুদের হারের উপর ইহার প্রভাব

ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই অর্থ যে দিকে ব্যয় করা হয় সেইদিকে উপাদানসমূহ নিযুক্ত হইতে থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে উপাদানসমূহের নিয়োগে এমন দিক্-পরিবর্তন ঘটা উচিত যাহা সামাজিক ভাবে কল্যাণ বর্ধক।

উপাদানসমূহ নিয়োগের দিক্-নির্ধারণের উপর প্রভাব

সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করেন ধনী ব্যক্তিগণ, কিন্তু উহার সুদ বা পরিশোধ দেওয়া হয় দেশের সকলের নিকট হইতে কর-রাজস্ব তুলিয়া। সুতরাং সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এইরূপে সম্পদের হস্তান্তরণ ঘটে। যদি ব্যয় এরূপ করা হয় যে পুনরায় সেই অর্থ গরীবদের নিকটই বর্ধিত আয়রূপে ফিরিয়া যায়, তবে সামগ্রিকভাবে তাহা কল্যাণজনক।

আয়-বণ্টন কাঠামোর উপর প্রভাব

আধুনিক কালে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্রমেই ইহার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মোটের উপর বলা যায় যে, ইহার প্রভাব নির্ভর করে (ক) কিরূপে ঋণ তোলা হইল, (খ) কিরূপে ইহা ব্যয়িত হইল, এবং (গ) কিরূপে এই ঋণ পরিচালিত হইল, এই সকল বিষয়ের উপর।

উপসংহার

ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি (Methods of Debt Repayment)

সাধারণ ভাবে নিম্নলিখিত পদ্ধতি সমূহের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে।

(১) বাজেট উদ্বৃত্তের দ্বারা: যদি বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্তের দ্বারা আংশিক ভাবে ঋণপরিশোধ করা চলে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় বাজেটে উদ্বৃত্ত হইলে তাহার দ্বারা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয় (যেমন

করহ্রাস বা কল্যাণমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি), এবং শেষ পর্য্যন্ত উহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হইয়া উঠে না।

(২) **নিমজ্জমান তহবিল (Sinking Fund) :** অনেকক্ষেত্রে ঋণপরিশোধের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে নিয়মিত ভাবে অর্থ জমা দেওয়া হয়, এবং কিছু বেশী অর্থ জমা হইলে উহা হইতে ঋণ পরিশোধ করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়মিত ভাবে জমা দিলে তাহাকে নির্দিষ্ট-নিমজ্জমান তহবিল (Definite Sinking Fund) বলা হয়। যখন যে পরিমাণঅর্থ জোটান গেল তাহাই জমা দেওয়া হইলে তাহাকে অনির্দিষ্ট-নিমজ্জমান তহবিল (Indefuite Sinking Fund) বলে। প্রতি বৎসর তহবিলজাত অর্থের সুদ উহার সহিত যোগ করিলে তাহাকে বর্ধনশীল নিমজ্জমান তহবিল (Cumulative Sinking Fund) বলা হয়; উহা হইতে প্রাপ্ত সুদ উহাতেই জমা না রাখিলে তাহাকে স্থির-তহবিল বলে (Constant Sinking Fund)। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রভাবে ওই অর্থ অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইয়া যায় এবং উহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হইয়া উঠে না।

(৩) **রূপান্তরণ (Conversion) :** অধিক সুদবহনকারী ঋণকে কম সুদ-বহনকারী ঋণে রূপান্তরিত করাকে রূপান্তরণ (Conversion) বলে। বাজারে পূর্বাপেক্ষা সুদের হার কমিয়া গেলে কম সুদে নূতন ঋণ করিয়া পুরাতন অধিক সুদ বহনকারী ঋণ পরিশোধ করিলে ঋণের ভার কিছুটা কমে।

(৪) **মূলধনী কর স্থাপন (Capital Levy) :** সকল প্রকার মূলধনের উপর ক্রমবর্ধমানহারে কর বসাইলে প্রভূত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় এবং তাহার দ্বারা রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা চলে; এই পদ্ধতিকে মূলধনী-কর স্থাপন বলা হয়। ইহার সুবিধা হইল : (ক) দ্রুত ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়, (খ) করভার প্রধানতঃ ব্যবসায়ী ও ধনিকশ্রেণীর উপর পড়ে, সাধারণ ব্যক্তিদের উপর নহে। (গ) বৃদ্ধ ও বয়স্ক ব্যক্তিরা ভার বহন করে এবং যুদ্ধে যাহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল অল্প-বয়স্ক ব্যক্তিরা ভারগ্রস্ত হয় না। (ঘ) স্থায়ী ও উচ্চ আয়করের অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহার বিরুদ্ধে বলা চলে যে, (ক) ইহার বহু প্রয়োগগত অসুবিধা আছে। (খ) সমস্ত রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ না করাই উচিত, কারণ সমাজে সরকারী ঋণপত্রসমূহের প্রচুর সুবিধা আছে। (গ) যাঁহাদের সম্পত্তি আছে বা চাকরী করিয়া প্রচুর আয় করেন তাঁহারা করের হাত হইতে বাঁচিয়া যান, কিন্তু মূলধনের মালিকগণের উপর অধিক চাপ পড়ে। (ঘ) ধনিকশ্রেণীর আস্থা ও সঞ্চয় ক্ষমতা আঘাত পাইবে, দেশের সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন হ্রাস পাইবে।

(৫) অস্বীকার করা (Repudiation) : অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশেষে বাধ্য হইয়া ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারে। প্রভূত পরিমাণ ঋণের দায়িত্ব হইতে এই পদ্ধতি দ্বারা সরকার মুক্তিলাভ করিলেও ইহা সঙ্গত নহে, কারণ সরকারের ভবিষ্যৎ ঋণগ্রহণ ক্ষমতা কমিয়া যায় সুনাম নষ্ট হয়।

অনুশীলনী

1. What is Public Finance ? Is there any essential difference between Public and Private Finance ? (B. A. 43) ;

2. Write a short note on the doctrine of maximum social advantage as the aim of Public Finance.

3. State and discuss Adam Smith's canons of Taxation. (B. A. '45)

4. Discuss the main principles of taxation followed by modern Governments. (B. A. '47, '50)

5. Discuss the sources of Public Revenue.

6. Distinguish between Progressive and Proportional Taxation and consider their advantages and limitations.

7. On what grounds can you justify the Principle of Progressive Taxation ? (B.A. 57 ; B.com. 55)

8. Discuss the merits and demerits of Direct and Indirect Taxes. ((B.com. 40 ; B. A. 44, 52)

9. What are the different forms of Public Debt ? Suggest measures by which the burden of taxation may be diminished. (B. A. 39, 51)

10. What are Public Debts ? How do they affect our economic life ? (B. A. 53)

11. Discuss the purposes for which public debts may be legitimately incurred by the Government. (B.com. 56 ; B. A. 43, 46, 49)

12. Write short notes on any two of the following : (*a*) Incidence of a Tax ; (*b*) Taxable capacity ; (*c*) Deficit financing. (B.A. 56)

একাদশ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Planning):

কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্য সকল শক্তি ও উপকরণের সুসংহত ও পরিকল্পিত ব্যবহারকে পরিকল্পনা বলা হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বিশেষতঃ, ১৯২৯।৩০ সালে, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে বিষম অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশসমূহ 'পরিকল্পনা' সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, এবং আধুনিককালের সকল দেশই পরিকল্পনার সাহায্যে সমাজের অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের গতি ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করিতেছে।

পরিকল্পনা কাহাকে বলে

উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পরে কোন কোন দেশ শিল্প বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ও উন্নত হইয়া উঠে। তাহারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তোলেন। রাষ্ট্রের প্রভাব ও কর্তৃত্বমুক্ত হইয়া ব্যক্তিগত মুনাফাকে লক্ষ্য হিসাবে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিযোগিতার দ্বারা শিল্পপতিগণ ও ব্যবসায়ীগণ ব্যক্তিগত ক্ষমতা, উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ভিত্তিতে দেশের উপকরণসমূহের দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি করেন, এইরূপে ব্যক্তি-উদ্যোগী (Private Enterprise) ব্যবস্থা কালক্রমে সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক দর্শন

কিন্তু আধুনিক কালে অধিকাংশ ধন-বিজ্ঞানী অবাধ ও নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুফলদায়ী ও সমাজের অধিকাংশ জনসাধারণের পক্ষে উপযোগী বলিয়া মনে করেন না; এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সমাজ-গঠন অধিকতর কল্যাণজনক, ইহাই দাবী করেন। তাঁহাদের মতে, অবাধ উদ্যোগের (Free Enterprise) ভিত্তিতে শিল্প ব্যবস্থা প্রভৃতি চলিতে থাকিলে বেকারী বৃদ্ধি পায়, আর্থিক অসাম্যের বিস্তৃতি বাড়িয়া যায়, একচেটিয়া ধনতন্ত্রবাদের সৃষ্টি হয়, এবং জনসাধারণ ক্রমেই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অর্থনৈতিক উন্নতির

বিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক দর্শন: ইহার কারণ ১। ব্যক্তি উদ্যোগী প্রথার ত্রুটি

ফল সমাজের সকল শ্রেণী সমভাবে লাভ করিতে পারে না, জাতীয় আয়ের বণ্টন সুসম হয় না। সমাজের অধিকাংশ জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হয় না, মুনাফার সম্ভাবনা অনুযায়ী উপকরণ ও জনশক্তি নিযুক্ত হয়; সম্পদের অপব্যবহার ঘটে।

তাহা ছাড়া, যখন সমাজে বেকারী থাকে, অথবা উৎপাদন ও জাতীয় আয় উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না; সমাজের উপকরণ সমূহ অব্যবহৃত ও অনিযুক্ত অবস্থায় অপচয় হইতে থাকে, এরূপ অবস্থায় অবাধ ও নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা শুধু নিজের শক্তিতে সামগ্রিক ভাবে দেশের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করিতে পারে না; দেশের সকল ক্ষেত্রকে (Sector) প্রয়োজন অনুযায়ী স্তরে একসঙ্গে অগ্রসর করান, ইহা কখনই অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে সম্ভবপর নয়।

২। অপচয় রোধ
৩। সামগ্রিক বৃদ্ধি
৪। সুসম বৃদ্ধি

উপরন্তু, যে সকল দেশ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই, এখনও কৃষিপ্রধান এবং শিল্পবাণিজ্যে বিশেষ অনুন্নত রহিয়া গিয়াছে তাহাদের জাতীয় আয়ের পরিমাণ এবং জীবনযাত্রার মান আধুনিক যুগোপযোগী স্তরে উন্নয়ন করিতে হইলে যে দ্রুত গতিতে শিল্পায়ণ বা শিল্পসম্প্রসারণ প্রয়োজন, সেই দ্রুতগতি পরিকল্পনা ব্যতীত নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া দিলে সম্ভব নহে। সুতরাং, বহু শতাব্দীর অনগ্রসরতা অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে দূরীভূত করিয়া শিল্পবাণিজ্যে দ্রুত অগ্রগতি করিতে হইলে সমগ্র সমাজ-দেহে যে আলোড়ন ও গতিবৃদ্ধির সঞ্চার করা প্রয়োজন তাহা সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যতীত সম্ভব নহে। যে দ্রুতগতিতে মূলধন-গঠন করা এবং মুনাফার প্রত্যাশা না করিয়া বিভিন্নক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ করা প্রয়োজন, তাহা কখনই অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত মুনাফা-ভিত্তিক ব্যক্তি-উদ্যোগের দ্বারা সম্ভব নহে। এই সকল কারণে আধুনিক কালে সকল দেশই ক্রমশঃ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনের পথ গ্রহণ করিতেছে।

৫। অর্থনৈতিক প্রসারের গতি বৃদ্ধি করা

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিপক্ষে যুক্তিসমূহ (Dangers of Planning) :

ব্যক্তি-উদ্যোগী সমাজ ব্যবস্থার দোষত্রুটি এবং বিচ্যুতি দূর করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রসূ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহার ফলে উৎপাদন ও উৎপাদনক্ষমতায় যে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহাও উহার স্বপক্ষে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আয়-বৈষম্য কমান, উন্নত-অনুন্নত দেশ প্রভৃতির তারতম্য

ও প্রভেদ দূর করা, অপ্রয়োজনীয় বিলাস-দ্রব্যের অযথা ব্যবহার বন্ধ করা, সমাজে সম্পদ ও উপকরণের অপচয় রোধ করা, বাণিজ্যচক্র ঘটিতে না দেওয়া এবং সর্বোপরি, জীবনযাত্রার মান ও সার্বজনীন সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা—এই সকল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জনসাধারণের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করিয়া এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলি দিয়াই কেবলমাত্র এই সকল সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে, ইহা ধন-বিজ্ঞানীদের একাংশের বক্তব্য। যেমন, ভোগকারী হিসাবে রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যের চাহিদা করিলে তাহা যে উৎপন্ন হইবেই, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, বরং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নীতি ও নির্দেশেই তাহা নির্দিষ্ট হইবার কথা। উৎপাদন, জীবিকা বা ব্যবসা, ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিযোগের পরিমাণ ও প্রকৃতি কোন কিছুই ব্যক্তির রুচি, অভ্যাস ও ইচ্ছানুযায়ী হইবে না, পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই নির্ধারিত হইবে। অর্থনৈতিক জীবনে যে স্বাধীনতা সমাজে গতিশীলতা আনে, চিন্তাশীলতা ও মননশীলতার পথ উন্মুক্ত রাখে, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামো সেই স্বাধীনতা হরণ করিবে, মানুষকে চিন্তাশক্তিহীন ও উদ্যোগহীন যন্ত্রে পরিণত করিয়া বিরাট রাষ্ট্রযন্ত্রের দাসে পরিণত করিবে।

পরিকল্পনার বিপদ ঃ
১। ব্যক্তি স্বাধীনতা হ্রাস
২। ভোগকারীর সার্বভৌমত্ব খর্ব হওয়া, প্রভৃতি

পরিকল্পনার লক্ষ্য (Objectives of Planning):

পরিকল্পনার লক্ষ্য কি হইবে তাহা সাধারণভাবে নির্ভর করে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর, দেশের প্রধান রাজনৈতিক ভাবাদর্শের উপর, এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রাষ্ট্র-পরিচালকদের ধারণার উপর। অনেক ক্ষেত্রে, দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সকল সম্পদ্ ও উপকরণকে পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করা হয়, যেমন, নাৎসী জার্মানী, ফাশিস্ত্ ইতালী এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জাপানে করা হইয়াছিল।

পরিকল্পনার লক্ষ্য কিসের উপর নির্ভর করে এবং কতরকম লক্ষ্য থাকিতে পারে

দ্বিতীয়তঃ, অনেক দেশে যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য রাষ্ট্র পরিকল্পনার সাহায্য লয় এবং সকল উপকরণের নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত দেশসমূহ অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উদ্ভূত সামাজিক দোষত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বেকারী দূর করিয়া পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে পৌছান, আর্থিক আয় বৈষম্য দূর করা, সামাজিক বীমা ও নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা, প্রভৃতি উন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য বলিয়া ধরা হয়।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক দিক হইতে অনুন্নত দেশসমূহে অবাধ প্রতিযোগিতা শিল্পোন্নয়নের গতি দ্রুততর করিতে পারে না; দ্রুত মূলধন-গঠন ও মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন, নূতন প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার প্রভৃতির জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিশেষ প্রয়োজন। পূর্ণকর্মসংস্থান এরূপ দেশে পরিকল্পনার লক্ষ্য নহে; কারণ উন্নত দেশের ন্যায় বেকারী এরূপ দেশে নাই। এখানে ছদ্মবেকারী এবং অল্প আয়-বিশিষ্ট আত্মকর্মসংস্থান (self-employment) প্রচলিত থাকায় জনসাধারণ কর্মে নিযুক্ত থাকিলেও তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা ও জীবন যাত্রার মান তুলনামূলক ভাবে কম। মূলধন-গঠন ও মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন দ্রুততর করিয়া শিল্পের ভিত্তি সম্প্রসারিত করা, উন্নত যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি দ্বারা কৃষি-উৎপাদন এবং বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার প্রয়োগের দ্বারা যন্ত্র-কৌশল (Technology) উন্নত করিয়া দ্রুত জীবন যাত্রার স্তর উন্নত করা—ইহারাই অনুন্নত দেশ সমূহে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য।*

পরিকল্পনার কৌশল (Technique of Planning) :

পরিকল্পনার জন্য প্রধানতঃ তিনটি প্রাথমিক বিষয় প্রয়োজন। প্রথমতঃ কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। যদিও সকল ব্যক্তি বা ফার্মই নিজ নিজ উৎপাদন, আয়, ব্যয় প্রভৃতি মোটামুটি নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই করিয়া থাকেন, কিন্তু সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে দেশের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি তাহাতে হয় না। পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে দেশের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করিবার উপযোগী ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, উপকরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি, এবং বাস্তব অবস্থা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বাস্তব সম্ভাবনাবিচ্যুত কাল্পনিক লক্ষ্য

প্রাথমিক বিষয়সমূহ

* ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল—(১) জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মনোন্নয়ন, (২) দ্রুত শিল্প-সম্প্রসারণ এবং মূল ও ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব প্রদান, (৩) পূর্ণতর কর্মসংস্থান, ও (৪) সামাজিক ন্যায়-বিচার।

বা উদ্দেশ্য ধার্য করিলে পরিকল্পনায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা কম। তৃতীয়তঃ, দেশে কি পরিমাণ ও কিরূপ উপকরণ আছে তাহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার; উপকরণ সমূহের সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ ব্যবহারের রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন।

পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল বর্তমান অবস্থা হইতে দেশের উৎপাদন, বণ্টন, আয়, ব্যয়, কর্মসংস্থান, জীবন যাত্রার মান প্রভৃতিকে ভবিষ্যতের উন্নততর স্তরে পৌঁছান। তাই নির্দিষ্ট কোন সময় স্থির করিয়া তাহার মধ্যে সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা হয়; যেমন ৫ বৎসর, ৬ বৎসর ইত্যাদি। সাধারণতঃ, রাশিয়ার অনুকরণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা মোটামুটি প্রথা দাঁড়াইয়া গেলেও মনে রাখা দরকার যে, পরিকল্পনা ঠিক পাঁচ বৎসরেরই হইতে হইবে এমন কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই। তবে পরিকল্পনার সময় তেমন ছোট হওয়া উচিত নয়, কারণ, উহার মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (Economic growth) কোন নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছান যায় না; এবং তেমন দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়, কারণ একই পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির কয়েকটি স্তর অতিক্রমণ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ক্রমবৃদ্ধি ও পরিকল্পনা-কাল বা সময়

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির দিক্ ও গতি নির্ণয় করা এবং বাস্তবে সেই পরিকল্পিত ক্রমবৃদ্ধির গতি কার্যকরী করিয়া তোলা পরিকল্পনার কাজ বলা যাইতে পারে। বর্তমান উপকরণ, অর্থনৈতিক পরিবেশ ও ব্যবস্থাকে ক্রমবৃদ্ধির উৎপত্তি-বিন্দু বা উদ্‌যোগবিন্দু (Starting point) ধরিয়া লইয়া ক্রমবৃদ্ধির সুরু হইয়া কোনো বিশেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছান—ইহাকেই সেই সময়ের মধ্যে পরিকল্পনার কাজ বলা চলে। অর্থাৎ, বর্তমান অবস্থায় সমাজের অর্থনৈতিক দেহে যে সকল যোগসূত্র (Links) আছে সেই অনুন্নত সংযোগ সূত্র-গুলিকে টানিয়া তুলিয়া উন্নত স্তরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংগঠন করাই পরিকল্পনার কাজ। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ-দেহের সংযোগ-সূত্রগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্থির করা দরকার এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপযোগী উৎপাদন সংগঠন, আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতির ধারা ও স্রোতকে পরিচালিত করা দরকার। দেখা

পরিকল্পনার কাজ—অর্থনৈতিক কাঠামোর সংযোগ সূত্রগুলিকে একত্রে টানিয়া তোলা; এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উত্তরণ

দরকার যে কি উপকরণ কত পরিমাণে কোথায় অবস্থিত, কিরূপে নিযুক্ত। তাহার পর বিচার করিতে হইবে ইহাদের কোন ক্ষেত্রে, কি পদ্ধতিতে, কত কম ব্যয় করিয়া, কত দ্রুত, পরিকল্পনার লক্ষ্যানুযায়ী, সর্বাধিক পরিমাণে সম্পদ উৎপাদনে নিয়োগ করা সম্ভব। ইহার পরে স্থির করিতে হইবে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে (Sector) উপকরণসমূহ কিরূপে পরিকল্পিত উৎপাদনের প্রয়োজনে নিযুক্ত হইতে পারে এবং উপকরণের ব্যবহার-পরিবর্তনে কোন প্রতিবন্ধক আছে কি না। বর্তমান ব্যবহার হইতে উপকরণ সরাইয়া আনিলে উৎপাদনের যে স্থান শূণ্য হয় তাহা পূর্ণ করা হইবে কি না, এবং কিরূপে হইবে তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন কি ভাবে অপর দ্রব্যের ভবিষ্যৎ বা বর্তমান উৎপাদনকে প্রভাবান্বিত করিবে, তাহা দেখিতে হয়। পরস্পর-সংশ্লিষ্ট সমাজের প্রায় সকল দ্রব্যেরই উৎপাদন ও বণ্টন কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া সুসামঞ্জস্য বজায় রাখে এবং উৎপাদন, আয়স্রোত ও ব্যয়স্রোত সর্বদা অব্যাহত থাকে, ইহাদের গতি ও পরিমাণে সামঞ্জস্যবিহীনতা না ঘটে, তাহার দিকে দৃষ্টি দেওয়াও প্রয়োজন।

ইহার জন্য লক্ষ্যনীয় বিষয়সমূহ

পরিকল্পনা কৌশলের প্রধান বিষয় হইল ব্যালান্স স্থাপন করা অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগমন। এই ব্যালান্স সাধারণতঃ তিন প্রকার : উপকরণের ব্যালান্স (Material Balances), শ্রমের ব্যালান্স (Labour Balances), আর্থিক ব্যালান্স (Financial Balances)। এইরূপ কোন ব্যালান্স গঠন করিতে হইলে। বিভিন্ন বিষয়ের বহু তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং এই তালিকাসমূহ পাশাপাশি সাজাইয়া অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্রমবৃদ্ধি ও অগ্রগমনের সকল স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য ও পরস্পরসংলগ্ন নির্ভরশীলতা (Interrelated interdependence) বজায় রাখা হয়। ক্রমবৃদ্ধির পরিকল্পিত পরিমাণ ও গতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক দেহ বা বিষয়সমূহ সঠিক ভাবে অগ্রসর হইতেছে কি না তাহা এইরূপ ব্যালান্স গঠন করিয়াই জানিতে পারা যায়। অবস্থা বা প্রয়োজনের পরিবর্তনে পরিকল্পনা সংশোধন করিতে হইলে, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার বাড়াইতে বা কমাইতে হইলে, এই সকল ব্যালান্স-গঠনকারী সকল যোগসূত্রকে নূতনভাবে স্থাপন ও সংযোজন করিতে হয়।

পরিকল্পনার কৌশল : বিষয়গত তিন প্রকার ব্যালান্স গঠন

উপকরণের ব্যালান্স বলিলে বোঝা যায় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর

উৎপাদন, ভোগ, মূলধনী দ্রব্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বণ্টন ও উহাদের ক্ষয়ক্ষতি, কাঁচামালের ব্যবহার, ভোগ্যদ্রব্যের মজুত, আমদানী ও রপ্তানী প্রভৃতি বিষয়ের পরিমাণ এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ (Quantum and Corelation)। **শ্রমের ব্যালান্স** বলিলে বোঝা যায় সকল প্রকার নিপুণ ও অনিপুণ শ্রমের যোগান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ ও বণ্টন, ইহাদের ব্যবহারের তীব্রতা ও প্রগাঢ়তা (Intensity of their utilisation), যন্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পরিমাণ এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ। **আর্থিক ব্যালান্স** বলিলে বোঝা যায় দেশে সঞ্চয় এবং বিভিন্ন প্রকার ভোগে জাতীয় আয়ের নিয়োগ ও বণ্টন, বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে বা সামাজিক উন্নতির জন্য পুঁজিরূপে অর্থলগ্নী, মজুরীভাণ্ডারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বণ্টন, ক্রয়শক্তি সৃষ্টি করা ও বিভিন্ন দ্রব্যের বাজারে উহার বণ্টন, সমগ্র অর্থনৈতিক দেহে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ও নগদ অর্থের প্রচলনবেগ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Monetary Institutions) কর্তৃক অর্থ ও ঋণসৃষ্টি—প্রভৃতি বিষয়ের পরিমাণ ও ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ। পরিকল্পনা কমিশন বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাজ হইল এইরূপ প্রত্যেক ব্যালান্সের অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমূহের মধ্যে এবং এই তিন ব্যালান্সের মধ্যে পারস্পরিকসংলগ্ন নির্ভরশীলতা (Interrelated interdependence) বজায় রাখা; সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক দেহে সঞ্চারিত পরিবর্তনের (Generated Change) পরিমাণ, দিক্ ও গতি স্থির করা; যাহাতে জাতীয় অর্থনীতিতে পরিকল্পিত, সুসম ক্রমবৃদ্ধি (Planned and balanced growth) ঘটে।

এই তিন ব্যালান্সের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ, পারস্পরিক সংযোগ

এই সকল ব্যালান্স গঠন করিবার দুই ধরণের পদ্ধতি আছে, পরিকল্পনাকে প্রয়োগগতভাবে রূপদান করিবার জন্য দুইটি বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যালান্স গঠন করা হয়: আড়াআড়ি ব্যালান্স (Crosswise Balances) এবং পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স (Backward Balances)।

দুই পদ্ধতিতে ব্যালান্স গঠন

কাঁচামাল, অর্ধনির্মিত দ্রব্যাদি, শ্রমশক্তি প্রভৃতি সকল উপকরণ অনুযায়ী প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য নির্ধারণ করাই আড়াআড়ি ব্যালান্সের পদ্ধতি। সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ এবং মোট উপকরণের পরিমাণ—ইহাদের মধ্যে সম্ভাব্যতা ও সামঞ্জস্য বজায় রাখাই আড়াআড়ি

ব্যালান্সের উদ্দেশ্য। সকল উপকরণ, যেমন জমি, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, সংগঠন, প্রধান ধাতুদ্রব্যাদি, বিদ্যুৎ বা অন্যান্য যন্ত্র-চালন শক্তি, শ্রমশক্তি প্রভৃতি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, অর্থাৎ অব্যবহৃত থাকিয়া সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ কমাইয়া দিতে না পারে, তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ইহাও দেখা দরকার যে উপকরণসমূহের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী যেন উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়, তাহা না হইলে লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হইবে না, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি পরিকল্পিত স্তরে অতিক্রম করিতে পারিবে না। জনশক্তির ক্ষেত্রে ইহার বিচার ও প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজনীয়; লক্ষ্য কম ধার্য হইলে অনিয়োগ (Unemployment) ও অপূর্ণনিয়োগ (Underemployment) দেখা দিবে, লক্ষ্য মাধ্যাতিরিক্ত ধার্য হইলে নিয়োগাধিক্য (Hyperemployment) ও পূর্ণাধিক কর্মনিয়োগ (over-full employment) দেখা দিবে, উৎপাদনের ধারা ব্যাহত হইবে।

আড়াআড়ি ব্যালান্স গঠন ও পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ

আড়াআড়ি ব্যালান্সের দুইটি বিশেষ সমস্যা আছে: সর্বোত্তম স্থাননির্বাচন (Optimum Location), এবং দ্রব্যসামগ্রীর আকারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সহিত উহা উৎপাদনের উপযোগী অর্থ বিনিয়োগ পরিমাণগত সম্পর্ক। এরূপ ভাবে দ্রব্যোৎপাদনের **স্থান নির্বাচন** করিতে হইবে যেখানে পরিবহন-ব্যয় সর্বনিম্নে এবং উপকরণের যোগান সর্বাধিক সুবিধাজনক। এইরূপে প্রত্যেক পরিকল্পনাতেই স্থান-সম্পর্কীয় ব্যালান্স (Locational Balance) গঠন করা দরকার। এই ব্যালান্সের ব্যাপারে কোনো বিশেষ অঞ্চলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকৃতি এবং সেই অঞ্চলের মোট উপকরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি, উভয়ের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বজায় রাখিতে হয়। দ্বিতীয় সমস্যা হইল দ্রবোৎপাদন-লক্ষ্য ও অর্থ-লগ্নীর লক্ষ্য—এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা। অর্থ-ভিত্তিক সমাজে দ্রবোৎপাদনের লক্ষ্য অর্থের হিসাবে (দ্রব্যের মোট দামের দ্বারা) প্রকাশ করা হয়। আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ সকলই অর্থের হিসাবে করা হয়, সুতরাং ইহাদের সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদি দ্রব্যোৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছাইবার উপযোগী অর্থ-লগ্নী না করিয়া উহাপেক্ষা কম করা হয়, তাহা হইলে সমাজে অব্যবহৃত দ্রব্য ও উপকরণ থাকিয়া যাইবে; যদি উহাপেক্ষা বেশী করা হয় তবে উৎপাদনে নিয়োগোপযোগী উপকরণসমূহের জন্য চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় উহাদের দাম বাড়িতে থাকিবে, মুদ্রাস্ফীতির পথ প্রশস্ত হইবে। সুতরাং,

আড়াআড়ি ব্যালান্সের দুইটি প্রধান সমস্যাবিচার ও পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ

দ্রব্যোৎপাদনের লক্ষ্য ও অর্থ-লগ্নীর পরিমাণ ধার্য করিবার সময়ে এইসকল বিচ্যুতির (Lapses) সম্ভাবনা নজরে রাখিতে হয়; আরও খেয়াল রাখিতে হয়, যেন পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের হাতে দেশের আয়ব্যয় স্রোত হইতে সঞ্চয় তুলিয়া লওয়ার এবং দ্রব্যসামগ্রী বণ্টন নিয়ন্ত্রণের উপযোগী যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে; বিশেষ প্রকার কর-কাঠামো (Tax-Structure) এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণাদির ব্যবস্থা (System of Controls) থাকে।

পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স-এরই অপর নাম হইল সর্বনিম্ন ক্ষেত্র হইতে হিসাব করিয়া পরিকল্পনা রচনা করা (Planning from below)। উৎপন্ন দ্রব্য এবং উহার উৎপাদনে নিযুক্ত উপকরণ সমূহের সহিত সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ও উপকরণের নিয়োগ স্থির করা-ই এইরূপ পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স গঠনের কাজ। যেমন, ছাতার কাপড় উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করার সময়ে দেখিতে হইবে যে ছাতার বাঁট এবং লোহার শিকগুলির উৎপাদন কি পরিমাণ হইতে পারে বা কি পরিমাণে ধার্য করা হইয়াছে। যদি এইরূপে বিভিন্ন লক্ষ্যে সামঞ্জস্য না থাকে তাহা হইলে ছাতাব কাপড় গুদামে পড়িয়া থাকিবে, অপচয় হইবে এবং জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধিতে তখনই সহায়তা করিতে পারিবে না; অথবা বাঁট এবং শিকগুলি অব্যবহৃত থাকিয়া যাইবে। যেমন ট্রাক্টরের উৎপাদন বাড়াইতে গেলে হিসাব করিতে হইবে কি পরিমাণ ইস্পাত, কয়লা, লোহা প্রভৃতি প্রয়োজন, মজুরী বা যন্ত্রপাতিব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি হইবে। এইরূপ অসংখ্য দ্রব্যোৎপাদনেব উদ্দেশ্যে কয়লা, ইস্পাত প্রভৃতির চাহিদা যোগ করিয়া ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষ্য হিসাবে স্থির করিতে হইবে এবং তাহাদের উৎপাদনের জন্য আবার পিছনে চাহিয়া হিসাব লইতে হইবে যে কোন দ্রব্যাদি প্রয়োজন। ইহাই হইল পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স। দেখা যাইবে যে ইস্পাত উৎপাদন বাড়াইতে কয়লা প্রযোজন, আবার সেই প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে কয়লার উৎপাদন বাড়াইতে গেলে ইস্পাতজাত যন্ত্রেব প্রযোজন। এইরূপে গোড়া হইতে সুরু করিয়া সকল দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নির্ধারিত করিতে হইবে। আবও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার সময় সম্বন্ধে। যদি পরিকল্পনা কালের মধ্যে যন্ত্র উৎপন্ন হয় তবেই তাহার দ্বারা কয়লা উত্তোলিত হইতে পারিবে, এবং আরও যন্ত্রোৎপাদন করা চলিবে। সুতরাং, প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণগত লক্ষ্যের সহিত কি সময়ের মধ্যে উহার উৎপাদন ও বণ্টন করিতেই হইবে তাহাও সুনির্দিষ্ট রাখা দরকার; তাহা না হইলে সকল দ্রব্যের উৎপাদন ধারাই ব্যাহত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতিবেগ কমাইয়া দিবে।

পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স গঠন

উৎপন্ন দ্রব্য এবং উহার উৎপাদনে নিযুক্ত উপকরণের মধ্যে এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে পারিলে সকল দ্রব্যের ও উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্য সঠিক ভাবে স্থির করা যায়; ইহার জন্য সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ইহাকে উপাদান-উৎপন্নের বিশ্লেষণ (Input-output analysis) বা আন্তঃশিল্প (Inter-Industry) বিশ্লেষণ বলে। দেখা যায় যে, সমাজের কোন দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া হয় ভোগ কার্যে নিযুক্ত হয় অথবা অপর কোন দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়; অর্থাৎ একের উৎপাদন অন্যের উপকরণ, অন্যের উৎপন্ন অপর কাহারও উপকরণ—এইভাবে প্রত্যেক শিল্প বা উৎপাদন-ক্ষেত্র অন্য শিল্প বা উৎপাদন-ক্ষেত্রের সহিত পারস্পরিক ভাবে সংযুক্ত ও গ্রথিত। যেমন, বীজ হইল উপকরণ, এবং উহা হইতে গম হইল উৎপন্ন দ্রব্য। এই গম কৃষি ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্য হইলেও ময়দার কলের উপকরণ; যাহার উৎপন্ন দ্রব্য হইল ময়দা।

উপাদান-উৎপন্ন বিশ্লেষণ এবং সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল গ্রন্থির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

এই উৎপন্ন ময়দা কিছু পরিমাণে ভোগে ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং কিছুটা আবার রুটি উৎপাদনের শিল্পে উপকরণ হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং, বলা যায় যে, একের উৎপন্ন অন্যের উপকরণ—এবং এইভাবে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রত্যেক উৎপাদন-ক্ষেত্র বা শিল্প পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন শিল্পে, যেমন গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে, উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য কম ধার্য্য করিলে ময়দার কল উপকরণ কম পাইবে ও তাহার উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, যন্ত্রাদি অব্যবহৃত থাকিবে; ফলে রুটির উৎপাদন ক্ষেত্রেও উপকরণের অভাব ঘটিবে, যন্ত্র অব্যবহৃত থাকিবে এবং ময়দার ভোগ কমিয়া যাইবে। যন্ত্রশক্তির অব্যবহারজনিত অপচয়ের দরুণ ও ভোগের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় জীবন যাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার-ও কমিয়া যাইবে। গম উৎপাদনের লক্ষ্য বেশী ধার্য করিলে, অন্যান্য ক্ষেত্রে কি পরিমাণ উপকরণের প্রয়োজন আছে বা তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য কি, এই সকল বিশ্লেষণ না করিলে, গমের সদ্ব্যবহার না হইয়া অপচয় হইতে পারে, তাহাতেও ক্রমবৃদ্ধির হার কমিয়া যাইবে। সুতরাং আন্তঃশিল্প সম্পর্ক বা উপাদান-উৎপন্নের প্রয়োজনীয় অনুপাত বিশ্লেষণ করিয়া সকল ক্ষেত্রের পক্ষে পারস্পরিক ভাবে সর্বোত্তম (optimal) লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন।

সমাজদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিরূপে পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট

আন্তঃশিল্প সম্পর্ক দুইভাবে বিচার করা যায় : ব্যালান্স সমীকরণ (Balance Equation) এবং কাঠামোগত সমীকরণ (Structural Equation)। কোন শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য কিছুটা সেই শিল্পেই ব্যবহৃত হইতে পারে (যেমন কৃষিক্ষেত্রে বীজধান) ; কিছুটা অন্য শিল্পসমূহে নিযুক্ত হইতে পারে ; এবং কিছুটা ভোগে ব্যবহৃতও হইতে পারে। নিজের শিল্পকে হিসাবের মধ্যে ধরিয়া লইলে উৎপন্ন দ্রব্য কিরূপে এবং কয়টি শিল্পে ব্যবহৃত হয় অথবা ভোগ কার্যে চলিয়া আসে, ইহা জানা যায় ব্যালান্স সমীকরণের দ্বারা।*

বিভিন্ন শিল্পের নির্ভরশীলতা বিশ্লেষণ : ব্যালান্স সমীকরণ ও কাঠামোগত সমীকরণ

অপর পক্ষে, কোন শিল্পের উৎপন্নের কি অনুপাত অপর শিল্পের উৎপাদনে নিযুক্ত হইবার জন্য চলিয়া যায় তাহার বিশ্লেষণকে কাঠামোগত সমীকরণ বলে। যেমন 'ক' শিল্পের $\frac{1}{2}$ অংশ উৎপন্ন দ্রব্য 'খ' শিল্পে উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, 'গ' শিল্পে $\frac{1}{4}$ অংশ এবং ভোগকার্যে $\frac{1}{2}$ অংশ নিযুক্ত হইতে পারে।

মনে রাখা দরকার যে কোন শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য নিজে বা অপর শিল্পে তৎক্ষণাৎ নিয়োগ না করিয়া মূলধনী দ্রব্য হিসাবে মজুত করিয়া রাখিয়া দিতে পারে, ভোগকারীগণও ভোগকার্যে তৎক্ষণাৎ উহাদের ব্যবহার না করিয়া কিছু জমাইয়া রাখিতে পারে।

যাহাই হউক, নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যোৎপাদন করিতে হইলে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তাহারা কোথা হইতে আসে এবং সমাজের সকল দ্রব্যের উৎপাদন ও উপকরণ-সংগ্রহ কিরূপে পারস্পরিকভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেই পরিকল্পনার সকল বিষয়ের লক্ষ্য ধার্য্য করা সম্ভব হয় এবং এইরূপেই পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভবপর।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশেষ পদ্ধতি হইল সমাজের সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনের গতিবৃদ্ধি করা অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার ক্রমাগত স্তরে স্তরে বাড়াইয়া চলা। ইহা সম্ভব হয় যদি সর্বদা মূলধন-গঠনের (Capital formation) হার দ্রুততর করা হয়। আজ যে মূলধনী দ্রব্য উৎপন্ন হইল তাহার সাহায্যে পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদন করিয়া সেই অধিক উৎপাদন হইতে বেশী পরিমাণ সরাইয়া লইয়া আসিয়া পুনরায় অধিকতর মূলধন গঠিত হইবে এবং উহার সাহায্যে দ্রব্যোৎপাদন আরও বাড়ান চলিবে। এইরূপে পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তর পূর্ববর্তী স্তরের তুলনায়

পরিকল্পনার সামগ্রিক লক্ষ্য : অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার বাড়ান। ক্রমবৃদ্ধি কাহাকে বলে ও মূলধন-সঞ্চয়ের সহিত উহার সম্পর্ক

* সকল দ্রব্য সামগ্রীর উৎপন্ন ও উপকরণ কিরূপে যে কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ধরণের তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাহাকে উৎপত্তি স্থানের তালিকা বলে।

অধিকতর উৎপাদনশীল, অধিকতর উদ্বৃত্ত (Surplus) সৃষ্টিকারী এবং অধিকতর মূলধনগঠনকারী। দ্রব্যোৎপাদন—কিছু উদ্বৃত্ত সৃষ্টি—অধিক মূলধনের নিয়োগ—অধিকতর দ্রব্যোৎপাদন অধিকতর উদ্বৃত্ত সৃষ্টি—অধিকতর মূলধনের নিয়োগ ; এইরূপ চক্রাকৃতি ঘূর্ণ্যমান গতিধারায় উৎপাদন ও উৎপাদনক্ষমতা বাড়িতে থাকে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতি সঞ্চার হয়। এই গতি নির্ভর করে প্রথমতঃ, মূলধন ও উৎপন্নের অনুপাতের (Capital-output ratio) উপর। মূলধন-উৎপন্ন অনুপাত কাহাকে বলে? যেমন, বৎসরের মধ্যে যদি ১০০ মূলধন হইতে ২৫ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে মূলধন-উৎপন্ন অনুপাত হইল ১০০ : ২৫ ; অর্থাৎ, মু/উ=৪ : ১। এই মূলধন-উৎপন্নের অনুপাতের বিপরীত, অর্থাৎ উ/মু হইল উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাত ; অর্থাৎ, কি পরিমাণ মূলধনের নিয়োগ কিরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, দেশে মূলধনের পরিমাণের উপর। দেশে আয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ সকল স্তরে সকল সময়ে স্থির থাকে না, বরং আয়স্তর বাড়িতে থাকিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া দেশে মূলধনের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আয় ও সঞ্চয়ের অনুপাতকে উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত দিয়া গুণ করিলে সমাজের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার নিরূপণ করিতে পারা যায়। অর্থাৎ, ক্রমবৃদ্ধির হার=পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে **সঞ্চয়/আয়** × উ/মু।

ক্রমবৃদ্ধির হার নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর : সঞ্চয়ের পরিমাণ ও উৎপাদন-ক্ষমতা

ক্রমবৃদ্ধির হার-নিরূপণ

ক্রমবৃদ্ধির হার পরিমাপের এই সূত্রটির পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও বিচারের বিশেষ তাৎপর্য আছে ; উৎপাদন-পদ্ধতি বা উৎপাদন-সূত্রে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োগ বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ কি অনুপাতে মূলধন নিয়োগ করিলে ক্রমবৃদ্ধির হার বর্ধিত করা যায়, তাহা নির্বাচন করিতে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে এই সূত্রটির দিকে নজর রাখিতে হয়। দেখা যায়, মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত বেশী হইলে উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত কম এবং মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত কম হইলে উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত বেশী। যেমন, যদি মূলধন উৎপন্নের অনুপাত হয় ৪:১, তাহা হইলে উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত বা উ/মু হইল ¼। অপরপক্ষে, যদি মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত হয় ২:১, তাহা হইলে উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাত বা উ/মু হইল ½। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, কম মূলধন নিয়োগ করিয়া একই উৎপন্ন পাওয়া গেলে বা মূলধন উৎপন্নের অনুপাত কম হইলেই উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাত বেশী।

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ক্রমবৃদ্ধির হার পরিমাপের সূত্র ব্যবহারের তাৎপর্য

আয় ও সঞ্চয়ের অনুপাত সমান ও স্থির ধরিয়া লইলে যে পদ্ধতিতে উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত বেশী তাহারই প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহাতেই ক্রমবৃদ্ধির হার অধিক পাওয়া যাইবে। যেমন, সঞ্চয়/আয় যদি $\frac{২০}{১০০}$ ধরা হয় তাহা হইলে বৃদ্ধির হার হইল প্রথম ক্ষেত্রে, $\frac{২০}{১০০} \times \frac{১}{৪} = \frac{১}{২০}$। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, $\frac{২০}{১০০} \times \frac{১}{২} = \frac{১}{১০}$। অর্থাৎ পরিকল্পনার সুরুতে জাতীয় আয় ৫০০ ধরিয়া লইলে পরিকল্পনার স্তরের শেষে প্রথম ক্ষেত্রে জাতীয় আয় $৫০০ \times \frac{১}{২০} = ২৫$ বৃদ্ধি পাইল; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, $৫০০ \times \frac{১}{১০} = ৫০$ বৃদ্ধি পাইল।

বাস্তবক্ষেত্রে, পরিকল্পনাকালে দেশের মধ্যে সর্বদাই আয়, সঞ্চয়, মূলধন ও উৎপাদন-পদ্ধতি প্রভৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হইতে থাকে; সুতরাং ক্রমবৃদ্ধির-হার পরিমাপের উপযোগী কোন স্থির ও নির্দিষ্ট সূত্র পাওয়া যায় না। তবে ইহা হইতে অনেকে পরিকল্পনাকালীন ক্রমবৃদ্ধির গড়হার (Average Rate of growth within the plan-period) বাহির করিতে চেষ্টা করেন, এবং ইহার দ্বারা বৃদ্ধির রূপও বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন।

এইরূপে পরিকল্পনার সময়ে (ক) সঞ্চয় বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ এবং, (খ) উৎপাদনক্ষমতা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। এই দুই-এর ক্রমাগত বৃদ্ধি পরস্পরসংশ্লিষ্ট, কারণ মূলধন বাড়িলেই উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ে এবং উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি (মজুরী না বাড়াইলে) অধিক উদ্বৃত্ত ও সঞ্চয় সৃষ্টি করিতে পারে। উভয়ের সম্মিলিতভাবে অগ্রগমন জাতীয় আয় ক্রমাগত বাড়াইতে থাকে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ঘটে। পরিকল্পনার সুরুতে উৎপাদনক্ষমতা স্থির থাকে, তাই মূলধন নিয়োগ বাড়াইতে হয়; বর্ধিত নিযুক্ত মূলধন উৎপাদনক্ষমতা, উৎপাদন ও উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়াইয়া অগ্রগতির বেগ সৃষ্টি করে।

সঞ্চয় ও উৎপাদনক্ষমতা পরস্পরকে বাড়াইয়া তোলে

অনুন্নত দেশসমূহে দেখা যায় পরিকল্পনার প্রথম স্তরে মূলধনের পরিমাণ এবং সঞ্চয়, উদ্বৃত্ত, মূলধনগঠন প্রভৃতি সবকিছুর হার বিশেষ কম; উৎপাদনক্ষমতাও কম। এই সকল দেশে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির ধারার সূচনা করিতে হইলে, হয় বিদেশ হইতে মূলধন ঋণ করিয়া আনিতে হয়, অথবা ঘাটতি-ব্যয়ের নীতি অবলম্বন করিয়া মূলধনীদ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়াইয়া অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় প্রথমদিকে অধিক হারে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটাইতে হয়। প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন শিল্পে ও ক্ষেত্রে অগ্রগতির হারে ভারসাম্য রক্ষা করা চলে না; উপাদান ও উপকরণসমূহ মূলধনী-

ব্যালান্সসহ ক্রমবৃদ্ধি ও ব্যালান্সবিচ্যুত ক্রমবৃদ্ধি

দ্রব্যোৎপাদন ক্ষেত্রে অধিক অনুপাতে নিয়োগ করিতে হয়। এই পদ্ধতিকে ব্যালান্সচ্যুত ক্রমবৃদ্ধি (Unbalanced growth) বলে।

বলা যায়, যখন অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল গ্রন্থি অর্থাৎ সকল শিল্প বা উৎপাদনক্ষেত্র একই অনুপাতে বাড়িতে থাকে ; ফলে আয়, ভোগ ও বিনিয়োগ একই হারে বৃদ্ধি পায়, তাহাকে ব্যালান্সসহ ক্রমবৃদ্ধি (Balanced growth) বলা হয়। কিন্তু ব্যালান্সচ্যুত পদ্ধতিতে পরিকল্পনার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোগের তুলনায় আয়, এবং আয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বেশীহারে হইতে থাকে ; মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন ভোগ্য-দ্রব্যোৎপাদনকে পিছনে ফেলিয়া অধিক হারে অগ্রসর হইতে থাকে। উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িলেও মজুরীর হার সেই তুলনায় বাড়ান হয় না, অধিক হারে উদ্বৃত্ত-সৃষ্টি ও মূলধন-গঠন চলিতে থাকে। বিভিন্ন মূলধনী দ্রব্য পরস্পরের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, একের বৃদ্ধি অন্যের বৃদ্ধি ঘটাইয়া সকল মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন ও উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বাড়াইয়া চলে। বিদ্যুৎউৎপাদনের বৃদ্ধি ইস্পাতের উৎপাদন বাড়ায়, বর্ধিত ইস্পাত উৎপাদন বিদ্যুৎ-এর উৎপাদন-ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া দেয়। উভয়ে মিলিয়া সিমেণ্ট ও রেলওয়ের উৎপাদন বাড়াইলে ইহাদের বর্ধিত উৎপাদন বিদ্যুৎ ও ইস্পাতের উৎপাদন বাড়াইতে থাকে। এইরূপে মূলধনী শিল্পসমূহের ত্বরান্বিত বৃদ্ধি (Accelerated growth) পরিকল্পনার প্রথম কয়েক যুগের বিশিষ্ট পদ্ধতি হিসাবে, (সোভিয়েট রাশিয়ার অতিদ্রুত ক্রমবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা হইতে) বিশেষত: অনুন্নত দেশসমূহে গৃহীত হইয়াছে। কিছুকাল পরে বর্ধিত পরিমাণ মূলধনীদ্রব্যের সাহায্যে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি পাইবে, উভয়ের বৃদ্ধির হারে ব্যালান্স আসিবে ; সেই স্তর হইতেপরবর্তী ভবিষ্যৎ স্তরসমূহে ব্যালান্সসহ ক্রমবৃদ্ধি (Balanced growth) চলিতে থাকিবে। সুতরাং, পরিকল্পনার প্রথম কয়েক যুগে ব্যালান্সবিচ্যুতির পদ্ধতি (unbalancing method) গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির বর্তমান গতি ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য গতি উভয়েরই বেগ দ্রুততর হয়।

এইরূপ ব্যালান্সচ্যুত ক্রমবৃদ্ধির প্রধান বিপদ হইল মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা। মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অধিক হারে বিনিয়োগ কর্মসংস্থান ও মোট আয় বাড়ায় বটে, কিন্তু ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন অধিক হারে না বাড়াইবার ফলে অধিক ব্যয়োপযোগী আয় (Disposable Income) সৃষ্ট হইয়া মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক (Inflationary Gap) বাড়াইয়া দেয়। ইহার প্রতিষেধক হিসাবে সমাজে কম মূলধনের সাহায্যে (বা দেশে জনসংখ্যাধিক্য থাকিলে শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতির দ্বারা) প্রধান ভোগ্যদ্রব্যসমূহের

ব্যালান্স বিচ্যুত ক্রমবৃদ্ধির বিপদ ও তাহা রোধের উপায়

উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। তাহা ছাড়া, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ (Price Control), রেশনিং, প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির প্রসার অবরোধ করার চেষ্টা হয়। আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয় করাইবার উদ্দেশ্যে প্রচার, স্বেচ্ছামূলক বা বাধ্যতামূলক ঋণগ্রহণ, প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে, পরোক্ষ করের পরিমাণ ও হারও বাড়ান হইয়া থাকে।

মূলধন-গঠনের সমস্যা (Problem of Capital Formation):

আয় হইতে সঞ্চয় অর্থাৎ ভোগব্যয় কমাইয়া উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা মূলধন-গঠন করা হয়—সুতরাং, উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রচার, ঋণগ্রহণ, কর-স্থাপন প্রভৃতির দ্বারা জনসাধারণের হাত হইতে উদ্বৃত্ত সরাইয়া আনা চলে। দেশে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যত বেশী থাকে এবং জনসাধারণ রাষ্ট্রের সহিত যত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে এই সকল পদ্ধতি উদ্বৃত্ত-সংগ্রহে তত অধিক সাফল্য লাভ করে।

উদ্বৃত্ত-সংগ্রহ ও তাহার বিভিন্ন পদ্ধতি

ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অসংখ্য জনসাধারণের তুলনায় একত্র-সংগঠিত সমবায় সমিতি বা ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা বিশেষ সুবিধাজনক। অনুন্নত দেশসমূহে স্বর্ণালঙ্কার, বা মূল্যবান ধাতুদ্রব্যে সঞ্চয় মজুত থাকে, তাহাদের বিনিয়োগ ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া আসিবার উপযোগী পদ্ধতি ও সংগঠন থাকা দরকার। তাহা ছাড়া, দেশে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যাদির ক্রয় সঙ্কুচিত করিয়া সেই অর্থকে সরাইয়া আনা সম্ভবপর। ইহা ব্যতীত, সমাজে সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত (Potential surplus) থাকিতে পারে। অনেকে বলেন যে দেশে অব্যবহৃত জনশক্তিই সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের ন্যায়; (অর্থাৎ বেকারী বা ছদ্ম-বেকারী থাকিলে, বা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে, গৃহকর্মে ভৃত্যাদির ন্যায় কার্যে নিযুক্ত থাকিলে) শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতির দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি করা এরূপ ক্ষেত্রে সুবিধাজনক এবং উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা সহজ; যন্ত্রের কাজ অধিক পরিমাণে শ্রমিক নিয়োগের দ্বারা করিতে পারিলে জনশক্তি নিজেই মূলধনরূপে কার্য করে এবং মূলধন-গঠন সম্ভব করিয়া তোলে।

জনশক্তিই সম্ভাব্য মূলধনের আধার

সুতরাং যে সকল দেশে জনাধিক্যতা থাকে সেখানে জীবিকাক্ষেত্রের পুনঃসংগঠনের (Occupational Reorganisation) দ্বারা স্তরে স্তরে মূলধন-গঠন করিতে হয়। পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তরে পূর্বাপেক্ষা অধিক জনশক্তিকে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগের জন্য অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিতে হয়, এবং এইরূপে পূর্ববর্তী স্তরের তুলনায় প্রত্যেক পরবর্তী স্তরেই মূলধন-গঠন বেশী হইতে থাকে, মূলধন-গঠনের গতিবৃদ্ধি ঘটে। যেমন, দেশের জনসংখ্যা ১০০, সকলেই কৃষিতে নিযুক্ত,

মূলধন গঠনের সমাজ-তান্ত্রিক পদ্ধতি

আয় হইতে সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত হয় না, দেশে দারিদ্র্য থাকায় সকল আয়ই ভোগে ব্যয় হইয়া যায়, মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হয় না। এইরূপ অবস্থায় কৃষিপ্রধান দরিদ্র দেশ নিছক জনশক্তির উপর ভিত্তি করিয়া মূলধন-গঠন সুরু করিল। ১০০ জন লোক ধরা যাউক, ৮০০ মণ ধান উৎপাদন করে। বাহির হইতে কিছু উন্নত ধরণের কৃষির যন্ত্রপাতি পাইলে সেই যন্ত্রের সাহায্যে যদি ৯০ জন লোক ৮০০ মণ ধান উৎপাদন করিতে পারে তাহা হইলে অতিরিক্ত ১০জন লোককে সরাইয়া আনিয়া প্রথমে কৃষির উন্নতির জন্য আরও অধিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা যায়। এইভাবে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী মূলধনী দ্রব্য কিছুটা বাড়িলে ৮০জন লোককে কৃষিতে নিযুক্ত রাখিয়া (তাঁহারাই এখন বর্ধিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে ৮০০ মণ ধান উৎপাদন করিতে পারে) আরও ১০ জনকে মূলধন-গঠনের কার্যে নিয়োগ করা চলে। এইরূপে স্তরে স্তরে ক্রমশঃ অধিকতর হারে মূলধন-গঠন সম্ভবপর।

যদি বাহির হইতে প্রথমে কিছু যন্ত্রপাতি পাওয়া না যায় তাহা হইলে, অথবা মূলধন-গঠন দ্রুততর করিতে হইলে, অনেক সময় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন প্রথম দিকে কমিয়া যাইতে পারে। যেমন, প্রথমেই ১০ জন লোককে কৃষি হইতে সরাইয়া আনিয়া প্রধানতঃ, কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধিকারী মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করা হইল। ৯০ জন লোক পুরাণো পদ্ধতিতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকায় উৎপাদন কমিয়া ৭২০ মণ অর্থাৎ ৮০ মণ ধান কম উৎপন্ন হইল। এই কম দ্রব্যই ১০০ জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে, সকলের জীবন যাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা নামিয়া যাইবে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় সকলে এই ত্যাগ স্বীকারে রাজী হইবে, রেশনিং ও নিয়ন্ত্রণ প্রথার দ্বারা ভোগ্যদ্রব্য সকলে যাহাতে পাইতে পারে উহার ব্যবস্থা করা হইবে। যতদিন না ১০ জন লোক কিছু মূলধনী দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া ফেলে এবং উহারা অধিক কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না হয়, ততদিন এই কৃচ্ছ্রসাধন চলিতে থাকিবে। যদি জনসাধারণ ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহারে আরও অধিককাল ত্যাগ স্বীকারে রাজী থাকে, তাহা হইলে পরবর্তীস্তরেও কৃষির উৎপাদন না বাড়াইয়া আরও অধিক শ্রমিককে যেমন ৩০ জনকে সরাইয়া আনিয়া মূলধন গঠনে-নিয়োগ করা হইবে; এই ৭০ জন শ্রমিক ৩০ জনের দ্বারা উৎপন্ন যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন অন্ততঃ ৭২০ মণ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে, নিজেদের এবং মূলধনী ক্ষেত্রে নিযুক্ত ৩০ জনের জন্য

মূলধন-গঠন ও ভোগ-সঙ্কোচন

ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে থাকিবে; জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে না বটে কিন্তু মূলধন-গঠনের পরিমাণ ও গতি বাড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ কৃষিজাত দ্রব্যের উদ্বৃত্তই মূলধন গঠন সম্ভব করিয়া তুলিবে। এই কারণে সাধারণতঃ কৃষি-প্রধান অনুন্নত দেশে কৃষির উন্নতিই অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রথম স্তর।

যদি দেশে ছদ্মবেকারী থাকে, অর্থাৎ কৃষিতে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক লোক নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে কৃষি হইতে কিছু লোক সরাইয়া আনিলেও উৎপাদন হ্রাস পাইবে না—এইরূপ অবস্থায় কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার না করিয়া, জীবন যাত্রার মান না কমাইয়া মূলধন-গঠনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রমন অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধাজনক। দেশের বাহির হইতে অপর দেশ যদি কৃষিজাত দ্রব্যাদি বা ভোগ্য দ্রব্যাদি ঋণ দেয়, তাহা হইলেও জীবন যাত্রার মান না কমাইয়া জননিয়োগ কাঠামোর পুর্ণ সংগঠনের দ্বারা, উপকরণের নিয়োগ-বিন্যাস বদ্‌লাইয়া মূলধন-গঠনের প্রাথমিক স্তর সুরু করা চলে। তবে, যে কোন উপায়ই গ্রহণ করা হউক না কেন, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজী থাকা চাই, * অথবা তাহারা নিজেরাই ভোগের পরিমাণ অর্থাৎ জীবন যাত্রার মান তৎক্ষণাৎ বাড়াইতে না পারে তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকার।*

ভোগ-সঙ্কোচন না করিয়া মূলধন-গঠনের সম্ভাবনা

বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের বিনিয়োগ নীতি (Principle of Allocation of Surplus):

উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় হইলেই ক্রমবৃদ্ধি ঘটে না, উহাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে (Sector) বা উৎপাদন-কেন্দ্রে বিনিয়োগ করা দরকার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি অনুপাতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা হইবে, পরিকল্পনায় তাহা নির্ধারিত থাকে। মূলধনের এই বিনিয়োগ-বিন্যাস (Investment Pattern) কি নীতি অনুযায়ী করিতে হয়?

মূলধন-বিনিয়োগের নিয়োগ-বিন্যাস

প্রথমতঃ, পরিকল্পিত বিনিয়োগ-বিন্যাস তিনপ্রকার বিষয়ের দিকে নজর রাখিয়া উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা করিবে: (ক) জীবিকার দিক,

* রাশিয়ার কুলাকগণ তাহাতে রাজী না হওয়ায় রাষ্ট্র জোর করিয়া সমবায় কৃষির প্রচলনের দ্বারা কৃষির উদ্বৃত্ত নিজের হাতে আনিয়া মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

(খ) সময়ের দিক, এবং (গ) উৎপাদন-অঞ্চলের দিক। (ক) অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে বহু ধরণের জীবিকা ও কার্যাদির প্রয়োজন, সমাজে সেই ধরণের জীবিকা ও কার্যের সুযোগ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা মনে রাখিতে হইবে। (খ) পরিকল্পনা অগ্রসর হইবার প্রত্যেক স্তরেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ও প্রকৃতি বদ্‌লাইতে থাকে, সুতরাং প্রথম হইতেই সেই দিকে নজর রাখিতে হয়; প্রত্যেক স্তর অতিবাহিত হইবার পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াইতে বা কমাইতে হইতে পারে, বা বিনিয়োগের ধরণ পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে, এরূপ অবস্থায় বিনিয়োগের সময়-বিচার করা বিশেষ প্রয়োজন। (গ) বিনিয়োগের অঞ্চল-বিচার করা দরকার এই কারণে যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে বা শিল্পের ঘনসন্নিবেশের বা সন্নিবেশ-ঘনতার (Density) ত্রুটি দূর করার জন্য বা শত্রুর হাত হইতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (সীমান্ত হইতে দূরবর্তী) শিল্প রক্ষার উদ্দেশ্যে শিল্প স্থাপনের কথা চিন্তা করিতে হয়।

১। জীবিকার দিক, সময়ের দিক উৎপাদন অঞ্চলের দিক।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক ক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্য ও গতিবেগ অনুযায়ী বিনিয়োগ-বিন্যাস স্থির করিতে হয়। যদি ব্যালান্সসহ ক্রমবৃদ্ধির পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে সকল শিল্প বা উৎপাদন ক্ষেত্র যাহাতে সমহারে বাড়ে সেইরূপ বিনিয়োগ-বিন্যাস দরকার; যদি ব্যালান্সচ্যুত ক্রমবৃদ্ধির পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অন্যক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় অধিক রাখিতে হয়।

২। ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্য ও গতিবেগ

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-বিন্যাস নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে উৎপাদনের যন্ত্রকৌশলগত পদ্ধতি (Technological method applied in Production) পূর্বে নির্ণয় করিতে হয়। মূলধন-প্রগাঢ়, জটিল ও উন্নত ধরণের যন্ত্রকৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে অথবা শ্রম-প্রগাঢ় সরল পদ্ধতি উৎপাদনে প্রয়োগ করা হইবে—ইহাই বিচার্য বিষয়। কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত ইহা নির্ভর করিবে মূলধন, জনশক্তি ও যন্ত্রজ্ঞানী শ্রমিকের পরিমাণ প্রভৃতির উপর। উন্নত দেশের পরিকল্পনায় মূলধন-প্রগাঢ়, জটিল যন্ত্রকৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য। আর অনুন্নত

৩। যন্ত্রকৌশলগত পদ্ধতি

দেশের উপকরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী ইহা স্থির হইবে। সাধারণতঃ দুই ধরণের অনুন্নত দেশ বিচার করা যায়: জমি বেশী ও জনসংখ্যা কম এবং জমি কম ও জনসংখ্যা বেশী। জমি বেশী ও জনসংখ্যা কম অবস্থায় পরিকল্পনার প্রথমস্তরে কৃষিতে বিনিয়োগাধিক্য ঘটাইয়া জটিল, মূলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতি প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। জমি কম ও জনসংখ্যাধিক্য থাকিলে শিল্পের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়া শ্রম-প্রগাঢ়, সরল পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ এই পদ্ধতিতে (ক) বেকারী ও ছদ্মবেকারী পরিমাণ কমিতে পারে (খ) যন্ত্রজ্ঞানের স্তব ও যন্ত্রজ্ঞানী শ্রমিকের পরিমাণ কম, এবং (গ) সরল পদ্ধতিতে উৎপাদন-সূত্রে মূলধনের পরিমাণ কম, অর্থাৎ (মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত কম থাকায়) উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত বেশী থাকে এবং ইহার ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন হইতে অর্থনৈতিক ক্রম বৃদ্ধির হার অধিক পাওয়া যায়।*

অনুশীলনী

1. What is Economic Planning? Discuss its merits and dangers.

2. Discuss the objectives of an Economic Plan.

3. What is Economic growth? How can you accelerate economic growth through Planning?

4. Discuss suitable techniques of an economic plan.

5. What is meant by the rate of economic growth? How can you measure the rate of growth of a country?

6. What is balanced and unbalanced growth? Discuss the merits and dangers involved in them.

7. Discuss the methods of capital-formation with a view to accelerate the rate of growth in under-developed countries.

8. Discuss the Principle of the allocation of surplus savings among different sectors or the investment-pattern under economic planning.

9. Discuss the characteristic features of a Private Enterprise economy and a planned economy. (B. A. '57)

---

* পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic Systems)

ব্যক্তিগত মালিকানা (Private Property)

এক বা একাধিক ব্যক্তি দ্রব্যসামগ্রীর উপর আইনতঃ সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারিলে এবং উহা হইতে প্রাপ্ত সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারিলে সেইরূপ ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা (System of Private Property) বলা হয়। ভোগ্য দ্রব্য, মূলধনীদ্রব্য, প্রকৃতির দান (যেমন জমি), প্রভৃতির উপর মালিকানা বজায় রাখা এবং নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারা—ইহা যদি দেশের আইন দ্বারা রক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থা বলা চলে। প্রাচীনকালে আদিম সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না; দ্রব্যসামগ্রী বা জমি প্রভৃতির উপর সমষ্টিগত মালিকানা ও ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কালক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ভিত্তি করিয়াই সমাজ-সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে।

ব্যক্তিগত মালিকানা কাহাকে বলে

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিলে সাধারণতঃ বোঝা যায় অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া একক ভাবে ব্যবহারের অধিকার; উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাইবার অধিকার এবং উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করিবার অধিকার; বিক্রয়; বন্ধক প্রদান; অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার অধিকার। অবশ্য রাষ্ট্র এই সকল অধিকারকে আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার পক্ষে (ক) প্রথমেই বলা যায় যে মানুষ যদি নিজেব শ্রমলব্ধ সম্পদকে নিজে ব্যবহারের সুযোগ না পায় অথবা শ্রমফলের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপন করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার পরিশ্রম-স্পৃহা কমিয়া যাইবে। যদি লোকে ব্যক্তিগত ভাবে সম্পদ লাভ করিবার, ভোগ ও ব্যবহার করিবার সুযোগ না পায় তাহা হইলে তাহার কর্মোদ্যম হ্রাস পাইবে। (খ) ইহাও বলা হয় যে ব্যক্তিগতভাবে সম্পদ সঞ্চয় করিতে না পারিলে মূলধন-গঠন সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয় করিতে পারা, এবং তাহা আরও অধিক আয় ও সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে পারা, এই প্রেরণা না থাকিলে ব্যক্তির কর্মোদ্যম নষ্ট হইয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণের মূলে ছিল ব্যক্তিগত

ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি

মালিকানা—উহাই সঞ্চয় ও কর্মোদ্যমকে বাড়াইয়া দিয়াছে। (গ) অপরের সহিত স্বাধীনভাবে চুক্তি (Contract) করিয়া দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয় করিবার অবাধ স্বাধীনতা না থাকিলে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়ে অবাধ স্বাধীনতা থাকিতে পারে না; সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানা-ই সমাজে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখিয়াছে। (ঘ) ইহাও বলা হয় যে সমাজে বিজ্ঞানের অগ্রগতি বা শিল্পক্ষেত্রে নিত্য নূতন আবিষ্কার সম্ভব হইত না, যদি আবিষ্কারক বা উৎপাদক সেই আবিষ্কারের ফল ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করিতে না পারিত। (ঙ) ইহাও বলা হয় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইল দর্পণের ন্যায়, ব্যক্তি নিজের গুরুত্ব, ক্ষমতা ও অস্তিত্ব ইহারই প্রতিবিম্বে দেখিতে পায়; নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে; কর্তৃত্ববোধ বিচার ও বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়; ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন উন্নত হইয়া উঠে।

ব্যক্তিগত মালিকানার বিপক্ষে যুক্তি

কিন্তু, (ক) ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার ফলেই সমাজে শ্রেণী বিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছে, ব্যক্তিদের মধ্যে আর স্বাভাবিক সাম্যভাব নাই। অর্থ বা সম্পত্তি অনুযায়ী ধনী ও গরীব শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়ায় অবিরাম শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ ও শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তি রচিত হইয়াছে। (খ) উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকায় মালিকশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করার সুযোগ পাইতেছে। (গ) বিনা পরিশ্রমে এইরূপ ধনসম্পদ এবং বৈষম্যমূলক সুযোগ সুবিধা গণতন্ত্রকে ধনিকতন্ত্রে বা মালিকতন্ত্রে পরিণত করিয়াছে।* (ঘ) জমি ও খনিজ সম্পদ প্রকৃতির দান, সুতরাং ইহারা কোন কারণেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পারে না, ইহাদের উপর মালিকানা স্থাপন করিয়া শোষণ করা নিতান্তই অন্যায়। (ঙ) অনেকে বলেন যে এই ব্যবস্থার দরুণ মূলধন-গঠন হয় বা কর্মোদ্যম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে মূলধন-গঠন বা কর্মোদ্যম-বৃদ্ধি কিছুই ঘটে না।

এই সকল কারণে, আধুনিক কালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার উপর বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতেছে। সমাজতান্ত্রিক

*এই বৈষম্য সম্পদের পুনর্বণ্টন করিলেও রোধ করা যায় না, কারণ ব্যক্তিগত মালিকানা-ব্যবস্থা চালু থাকায় শোষণের দ্বারা মালিকের মুনাফা বৃদ্ধির ফলে আবার সম্পদের বৈষম্য দেখা দিবে।

দেশগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানাকে ভোগ্যদ্রব্যাদির মধ্যে সঙ্কুচিত রাখা হইতেছে; ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ভোগ্য দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্য সকল কিছুর উপরই ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখিয়া আর্থিক বৈষম্য কমাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। তিন প্রকারে এই নীতি গ্রহণ করা সম্ভবপর: (ক) করের ক্রমবৃদ্ধিহার বাড়ান (খ) উচ্চহারে মৃত্যুকর বসান ও (গ) সামাজিক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন।

উপসংহার

ধনতন্ত্র (Capitalism):

পৃথিবীর সকল দেশের সমাজই বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান কাঠামোতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এমন এক সময় ছিল যখন উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ-সমূহের উপর সামাজিক মালিকানা বজায় ছিল; ব্যক্তিরা সমবেত ভাবে পরিশ্রম করিয়া পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ একত্রে ভোগ করিত। সেইরূপ সমাজ ব্যবস্থার নাম হইল আদিম সাম্যবাদ। ক্রমে কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি উৎপাদনের প্রধান উপায় হিসাবে গৃহীত হইল; ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ অপর ব্যক্তিদের দাসরূপে পরিশ্রম করাইয়া তাহাদের শ্রমলব্ধ সম্পদ ব্যক্তিগত মালিকানায় ভোগ ও ব্যবহার সুরু করিল—সমাজের সেই স্তরের নাম হইল দাসযুগ। ক্রমে দাস-ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়া সমাজ-ব্যবস্থায পরিবর্তন আসিল; সমাজ ব্যবস্থার রূপ হইল সামন্ততন্ত্র। সমাজের শীর্ষে অবস্থিত হইল রাজা,তাহার নীচে সামন্ত, উহাদের অধীনে উপসামন্ত, সর্বনিম্নে কৃষক বা ভূমিদাস—এইরূপ ছিল সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো। এই সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রধান উপকরণ ছিল জমি—ভূমি দাসদের দ্বারা কর্ষিত জমি হইতে উৎপন্ন সম্পদ অন্যান্য শ্রেণীরা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইত। সামন্ত তান্ত্রিক এই কাঠামোর মধ্য হইতে একদল ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিল, বিজ্ঞান ও শিল্পের নিত্য নূতন আবিষ্কারকে তাঁহারা উৎপাদনের কার্যে ব্যবহাব করিবার প্রয়াস পাইলেন। মূলধন-সংগ্রহের ও প্রয়োগের দ্বারা শিল্পোৎপাদন, ব্যবসা ও বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ইঁহাদের গুরুত্ব বাড়াইয়া দিল; সামন্তযুগীয় বাধানিষেধের বেড়াজাল ভাঙিয়া এবং জমি হইতে উদ্বৃত্ত আদায়ের পরিবর্তে অন্যান্য বহু প্রকার দ্রব্যাদির উৎপাদনে মূলধন নিয়োগের দ্বারা শ্রমিককে ভাড়া খাটাইয়া তাঁহারা সম্পদশালী ও ফলে প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। পুরাতন সামাজিক আভিজাত্য ভাঙিয়া দিয়া তাঁহারা গণতন্ত্রের নবযুগের প্রবর্তন করিলেন, ভূমিদাসত্ব হইতে কৃষককে "মুক্তি" দিয়া তাহাদের কর্মক্ষমতা নগদ মজুরীতে ক্রয়

কিরূপে ধনতন্ত্রের উৎপত্তি ও তাহার রূপ কি

করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মূলধনের প্রাধান্য, শিল্পবাণিজ্য ও ব্যবসার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা; তথাকথিত "স্বাধীন" শ্রমিকদের নগদ মজুরীতে খাটানো, মূলধন হইতে দ্রুত মুনাফালাভ এবং সেই মুনাফাকে পুনরায় উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া মূলধন-সংগ্রহ ও নিয়োগকে নিরন্তর বাড়াইয়া যাওয়া; এইরূপে সমাজে মূলধনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা—ইহাকেই ধনতন্ত্র (Capitalism) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মনে রাখা দরকার যে সমাজ বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে এই ব্যবস্থার উৎপত্তি এবং ইহার রূপ সর্বদা পরিবর্তনশীল। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সকল দেশে একইভাবে এইরূপ স্তরোন্নতি না-ও ঘটিতে পারে; সকল দেশের স্তরোন্নতি এখনও এইরূপ অবস্থায় পৌঁছায় নাই এরূপ হইতে পারে; একস্তরের মধ্যে পূর্বের স্তরগুলির ভগ্নাবশেষ যুক্ত থাকিতে পাবে।

সুতরাং, যে উৎপাদনপদ্ধতিতে মূলধনের প্রাধান্য, মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফাকে নিরন্তর মূলধনরূপে খাটানো প্রভৃতি বজায় থাকে তাহাকে ধনতন্ত্র বলে। অনেকে ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনটি বিষয়কে ধরেন: ব্যক্তিগত মালিকানা, ভোগকারীর স্বাধীনতা, কর্মোদ্যম ও ব্যবসাসংগঠনের স্বাধীনতা। আবও বলা হয় যে, ধনতন্ত্রে দেশের উপকরণসমূহ কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকিবে (Allocation of Resources), কি পরিমাণ বা কি প্রকৃতির দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইবে এই সকল নির্ভর করে দাম এবং মুনাফার উপর অথবা, সংক্ষেপে দাম-মুনাফা পদ্ধতির উপর (Price-profit Mechanism)। মুনাফা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই উৎপাদন হয় এবং মুনাফা দামের উপর নির্ভর করে। ভোগকারীগণ নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যাদির দাম দিতে চান, সুতরাং তাহাদের পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিয়া বিক্রয়ের দ্বারা মুনাফা হয়। যে ক্ষেত্রে বা যে শিল্পে মুনাফাব হার অধিক, তাহার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, উপাদানসমূহ সেই দিকে নিয়োজিত হইতে থাকে। সুতরাং এইরূপে দাম-মুনাফা ব্যবস্থা-ই সমাজে উৎপাদনের পরিমাণ, প্রকৃতি ও উপাদানসমূহের নিয়োগের দিক্-নির্ণয় করে।

ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

(ক) উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসাব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। ধনতন্ত্রের পূর্বে জীবনযাত্রার মান, দ্রব্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ,প্রকৃতি ও উৎকর্ষের তুলনায় বিচার করিলে ধনতন্ত্রের সাফল্য প্রশংসার্হ।

ধনতন্ত্রের গুণ বা পক্ষে যুক্তিসমূহ

(খ) ধনতান্ত্রিক সমাজে দাম-মুনাফা ব্যবস্থার মারফৎ উপকরণসমূহের নিয়োগের দিক-নির্ণয় আপনা-আপনি নির্ধারিত হইয়া পড়ে, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আমলাতন্ত্রের বিনা পরিচালনায় উৎপাদনের পরিমাণ, প্রকৃতি, উপকরণের নিয়োগ স্থির হইয়া যায়। (গ) ব্যবসা-উদ্যোগ ও সংগঠনের

স্বাধীনতা থাকিলে উৎপাদকদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে—যোগ্যতমই বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সমাজ সর্বাপেক্ষা দক্ষ উদ্যোক্তার কাজকর্মের ফললাভ করে, উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায়। (খ) প্রতিযোগিতার ফলে সকল ব্যক্তির ক্ষমতা ও প্রতিভা বিকাশ লাভ করে। (ঙ) ধনতন্ত্রে ভোগকারীদের স্বাধীনতা বজায় থাকে, ভোগকারীদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যোৎপাদন হয়, ব্যক্তির তৃপ্তির পরিমাণ সর্বাধিক ঘটে।

ধনতন্ত্রের দোষ বা বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

ধনতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা দোষ হইল (ক) ইহা শ্রেণীবিরোধ বা শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ তীব্রতর করে। পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বাঁচিতে হয় বলিয়া উৎপাদকগণ প্রতিযোগিতামূলক শোষণ চালাইতে থাকে। (খ) সুযোগ সুবিধার বৈষম্য এরূপ বৃদ্ধি পায় এবং আয়-বৈষম্য এত বাড়িয়া যায় যে ক্রমে গণতন্ত্র বিপন্ন হইয়া পড়ে। (গ) অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপে একচেটিয়ার উদ্ভব ঘটে। দুর্বল ও সবলের মধ্যে প্রতিযোগিতায় দুর্বল নিশ্চিতরূপে পরাজিত হয়। উপকরণ-সমূহের প্রভূত অপব্যয় হয়। (ঘ) ভোগকারীর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ধারণা। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর চাপে, বিজ্ঞাপন ও মিথ্যাপ্রচারের মোহে ভোগকারীরা দ্রব্যাদি ক্রয় করে; সুতরাং তাহাদের মত ও পছন্দ অনুসারে উৎপাদন চালান হয়, ইহা বাস্তব সত্য নহে। (ঙ) উপাদান-সমূহের নিয়োগ নির্ধারিত হয় মুনাফার ভিত্তিতে; জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যাদির উৎপাদনে নিযুক্ত না হইয়া বিলাসদ্রব্য বা সখের সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ নিযুক্ত হইয়া পড়ে। (চ) ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফল হইল বেকারী, বাণিজ্যচক্র এবং জনসাধারণের অসহনীয় দুর্দশা।

সমাজতন্ত্র (Socialism):

সমাজ বিবর্তনের পথে ধনতন্ত্রের পরবর্তী স্তরের সমাজ ব্যবস্থার নাম সমাজতন্ত্র। ধনতন্ত্রের মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণী বর্ধিত হয়, ক্রমে অধিকাংশ জনসাধারণ সর্বহারাতে পরিণত হয়, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সমাজের অধিকাংশ উপকরণ ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন, শ্রম-বিভাগের প্রসার এবং অধিক সংখ্যক শ্রমিক কর্তৃক একত্রে উৎপাদন—এই সকল কারণে উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক বা সংঘগত আকার ধারণ করে, কিন্তু ব্যক্তিগত শোষণ ও মুনাফা চলিতেই থাকে। উৎপাদন-ক্ষমতা প্রভূত বৃদ্ধি পায় কিন্তু পুরাতন অর্থনৈতিক সম্বন্ধ বা কাঠামো সেই ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে থাকে। অবশেষে সমাজ বিপ্লব সংঘটিত হইয়া ধনতন্ত্রের

কিরূপে সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি ও তাহার রূপ কি

উচ্ছেদ হয়, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রবর্তিত হয়। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, উপকরণসমূহ প্রভৃতির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা স্থাপিত হয়; মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন বন্ধ হয়; শোষণকারী ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ দূর হয়; উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক অবিচার ও অস্বাভাবিকতা থাকে না; পরিকল্পনার দ্বারা দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকরণের নিয়োগ নির্ধারিত হয়।

অনেক সময় কোনো সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইবার পূর্বেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শক্তির চাপে সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-ধনতান্ত্রিক অবস্থা হইতেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে। সেই অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা শিল্পোন্নয়ন, মূলধন-গঠন ত্বরান্বিত করিয়া তোলে। এরূপ অবস্থায় প্রাথমিকভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় কিছু পরিমাণ ব্যক্তিগত ব্যবসা ও ব্যক্তি-উদ্যোগী শিল্প-প্রচেষ্টা চলিতে থাকে; সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে তাহারা পরিচালিত হয়। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সকল সময় সহিংস বিপ্লবের দ্বারাই সমাজবিপ্লব ঘটে তাহা নহে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন শক্তির চাপে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল থাকিলে অহিংসভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে বুলেটের পরিবর্তে ব্যালটের দ্বারাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, (ক) ইহা ধনতন্ত্রের অবিচার ও ত্রুটিসমূহ দূর করে। (খ) পরিকল্পনা দ্বারা, সর্বসাধারণের উপকারের জন্য (মুনাফার উদ্দেশ্যে নহে) উপকরণসমূহের নিয়োগ হয়, অপচয় বা অপব্যবহার কিছুই হইতে পারে না।

সমাজতন্ত্রের গুণ বা পক্ষে যুক্তিসমূহ

(গ) একচেটিয়া শোষণ, জনসাধারণের দুর্দশা, সম্পদের বৈষম্য ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া, প্রভৃতি দূর হয়। (ঘ) কাহারও ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়াইবার জন্য উৎপাদন পরিচালনা করা হয় না বলিয়া জনসাধারণের দেশপ্রেম, কর্মদক্ষতা ও কর্মোৎসাহ বৃদ্ধি হয়। (ঙ) অর্থনৈতিক অভাব, বেকারী ও জীবনযাপনের অনিশ্চয়তা দূর করিয়া স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত জীবন যাপন সম্ভবপর হয়; ব্যক্তির উন্নতি হয়, প্রকৃত গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করে। শুম্‌পিটারের মতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় সমাজতন্ত্র উন্নততরের, কারণ, (ক) রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যবস্থায় উৎপাদন-ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, (খ) আর্থিক বৈষম্য কম থাকায় অধিকতর অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়, (গ) একচেটিয়া ব্যবসা

ও রীতিনীতি থাকিতে পারে না, (ঘ) বাণিজ্য চক্র থাকে না এবং বেকারী দূরীভূত হয়।

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলা হয় যে (ক) সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা শিল্পসমূহের পরিচালনা কখনই ব্যক্তিগত পরিচালকদের ন্যায় উন্নত স্তরের এবং নিখুঁত হইতে পারে না। স্থায়ী সরকারী চাকুরিয়াদের উৎসাহ, উদ্যম ও উদ্দীপনা নষ্ট হইয়া যায়; দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বা নূতন-প্রচলনের স্পৃহা ও প্রেরণা থাকে না। (খ) শ্রমিকদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে বলিয়া তাহাদের কর্মোৎসাহ কমিয়া যায়। ইহাও বলা হয় যে, ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশের জীবনযাত্রার মান অনেক নীচু। (গ) দেশের মূলধন-সঞ্চয়ের হারের উপর (Rate of Capital Accumulation) উহার উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফালাভের প্রেরণায় ব্যক্তির উদ্যোগে দ্রুত মূলধন-গঠন হইয়া থাকে। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিকল্পনা করিয়া মূলধন-সঞ্চয়ের হার নির্ধারণ করে। যদি অধিক হারে মূলধন-সঞ্চয় করা হয় তাহা হইলে দ্রুত উন্নতি হইতে পারে বটে, কিন্তু জনসাধারণের ভোগ বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া দুঃখ, দুর্দশা বা ত্যাগ স্বীকারের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। রাশিয়ার উদাহরণ হইতে বলা যায় যে মূলধন-সঞ্চয়ের সর্বাধিক হার সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় হার না-ও হইতে পারে। (ঘ) ইহাও বলা হয় যে, ভোগকারীর স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া যায়—দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকৃতি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের দ্বারা স্থির হয়। (ঙ) পরিচালনা-সংক্রান্ত জটিলতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। (চ) দাম-মুনাফা ব্যবস্থা উপকরণসমূহকে সর্বাধিক উৎপাদনক্ষম ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে; কিন্তু সমাজতন্ত্রে উহা আপনা-আপনি নির্ধারিত না হইয়া রাষ্ট্র দ্বারা স্থির হয়। ফলে উপকরণসমূহের নিয়োগে সঠিক নীতি অনুসরণ করার অসুবিধা দেখা দেয় এবং কোনো দ্রব্যে অধিকোৎপাদন ও কোনো দ্রব্যে অল্পোৎপাদন দেখা দিতে পারে। (ছ) উপকরণ-সমূহের নিয়োগে বা অর্থনৈতিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ত্রুটি হইলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্যোক্তা একাই উহার ফলভোগ করে; কিন্তু সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের ব্যক্তিগত ভুল বা ত্রুটি সমাজের অসংখ্য লোকের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। আর, মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, তাহার ভুল বা ত্রুটি ঘটিতে পারে। (জ) সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যুক্তি হইল এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা

সমাজতন্ত্রের দোষ বা বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

থাকিতে পারে না; ব্যক্তির স্বাধীনতা, অধিকার, সুসম্পূর্ণ মনোমত জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও চিন্তা প্রভৃতিকে রাষ্ট্রের বেদীমূলে বলি দিতে হয়। জীবিকা ও জীবন যাপনের ধরণ, স্থান, কাল; আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় সকল কিছুই রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত; এবং হায়েক তাই ইহাকে 'দাসত্বের রাস্তা' (Road to Serfdom) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Mixed Economy):

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে দোষ গুণ বিচার এখনও চলিতেছে—মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ধনতন্ত্রিক ব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধির দিক হইতে প্রশংসনীয় হইলেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেই সম্পদের বণ্টনের দিক হইতে তুলনামূলক বিচারে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

মিশ্র অর্থনীতির উদ্ভব

ধনতন্ত্রে ব্যক্তির উন্নতি ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইলেও সামাজিক সুখ স্বস্তি নিরাপত্তা ও আনন্দ ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র অধিক বর্ধনের কাম্য। সুতরাং আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রই উভয় ব্যবস্থার দোষগুলি পরিহার করিয়া উভয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়া নূতন ধরণের মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপন করার দিকে (Mixed Economy) ঝুঁকিয়াছেন।

ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, ধনতন্ত্রের বিভিন্ন দোষগুলি দূর করিয়া উহার গুণগুলি রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। যেমন, (ক) মূল ও ভারী শিল্পসমূহ এবং জনকল্যাণমূলক শিল্পসমূহকে (Public Utilities) রাষ্ট্রায়ত্ত

মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

করার চেষ্টা করা হয়। (খ) ক্রমবর্ধমান হারে কর বসাইয়া এবং মৃত্যুকর স্থাপন করিয়া আর্থিক বৈষম্য কমাইবার চেষ্টা করা হয়। (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা ও সম্পত্তিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয় যাহাতে উহার অপব্যবহার না হয় বা শোষণের কার্যে উহাদের নিয়োগ করা ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়ে। (ঘ) ব্যাপকভাবে সামাজিক বীমাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, অর্থাৎ বেকারী-বীমা, বার্ধক্য-বীমা, দুর্ঘটনা-বীমা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। (ঙ) রাষ্ট্রের পরিচালনায় পরিকল্পিত ভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি ও ক্রমবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

খাঁটি ধনতন্ত্রবাদী এবং খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদী উভয়েই মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ পছন্দ করেন না। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে এই ব্যবস্থা ধনতন্ত্রেরই পরিবর্তিত-রূপ; ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রমিক-শোষণ, মালিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সামাজিক আভিজাত্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে ভাঁওতা দেওয়া মাত্র। উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-সম্বন্ধ (Mode and Relations of Pro-

duction) সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া নিছক আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটাইলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল রূপান্তর ঘটে না, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। কেবল মাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেই উহা সমাজতন্ত্র নহে ; রাষ্ট্রের রূপ কি, উহা পরিচালনার ভার প্রধানতঃ কোন শ্রেণীর হাতে, তাহাদের রাজনৈতিক ভাবাদর্শ কিরূপ, শ্রমিকদের হাতে পরিচালনা ও সংগঠনের ভার আসিল কি না, এই সকল বিষয়ের বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ (যেমন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জার্মানীর শিল্পসমূহকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল বটে কিন্তু উহাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই)। শ্রমিক কৃষককে শোষণ করিয়া এবং শোষণের পথ (উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা) উন্মুক্ত রাখিয়া মুনাফা হইতে কিছু অংশ ছড়াইয়া দিলেই (বীমা প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা) সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রগতিশীল হইয়া উঠে না। শুম্‌পিটার ইহাকে ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস বা মুমূর্ষু অবস্থা বলিয়াছেন (Capitalism in the oxygen tent)।

ইহার বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক যুক্তিসমূহ

ধনতন্ত্রবাদীগণ বলেন যে, মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও কর্মোদ্যোগের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করায় ধনতন্ত্রের কোন সুফল পাইবার আশা এক্ষেত্রে থাকে না। শুধু তাহাই নহে, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণের ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া 'দাসত্বের পথ' খুলিয়া যায়।

ইহার বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক যুক্তিসমূহ

অনুশীলনী

1. Discuss the Institution of Private Property and arguments in its favour and against it.
2. What is capitalism ? Discuss its merits and demerits.
3. What is Socialism ? Discuss its merits and demerits.
4. What is Mixed Economy ? Do you support the Concept of mixed economy ?



শুদ্ধিপত্র

তাড়াতাড়ি ছাপার দরুণ কিছু ত্রুটি রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া যাহারা উল্লেখযোগ্য তাহাদের তালিকা নীচে দেওয়া হইল।

পৃঃ	লাইন	স্থলে	হইবে
৮৫	৬	কম	কয়
১৫৫	১১	পপ১	পপ২
১৬৪	১৮	চা	কফি
১৭০	১১	গরীবেরা	ধনিকেরা
১৯০	৬	Dichonomy	Dichotomy
২০৪	৫	অন্যন্য	অনন্য
২০৫	১০	কয়	কম
২৪৯	১২	মালিককে	শ্রমিককে
২৬০	২৫	না হইলে	হইলেই
২৮৪	২৪	ভাবে	ক্রেতা
,,	,,	ক্রেতা	ভাবে
৩১৪	৯	ত২	ত১
৩১৬	২৬	পুঁজি	পুঁজিতান্ত্রিক
৩২৪	৭	ধনাত্মম	ধনাত্মক